সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের
কবিতা ও কাব্যরূপ

হরপ্রসাদ মিত্র

কথামালা প্রকাশনী
১৮এ, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২

উৎসর্গ

কবিপত্নী

শ্রীযুক্তা কনকলতা দত্ত

পূজনীয়াসু

বর্তমান সংস্করণে পূর্বসংস্করণের কোনো কোনো অংশের পরিবর্তন ও পরিবর্ধন ঘটেছে।

বন্ধুবর ডক্টর অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় ও অধ্যাপক হরিদাস মুখোপাধ্যায়ের কয়েকটি পরামর্শ এই সূত্রে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করি।

আমার অধ্যাপক ডক্টর সুকুমার সেন মহাশয়ের সস্নেহ আনুকূল্য ব্যতিরেকে এ আলোচনা হয়তো সম্ভবই হোতো না, এই সূত্রে সে-কথাও পুনর্বার স্বীকার্য।

রবীন্দ্র-সমকালীন কবিদের যে বিচিত্র সন্ধান ও সামর্থ্যের ধারায় সত্যেন্দ্রনাথের আবির্ভাব ঘটেছিল, ইতিমধ্যে সেই ধারা সম্বন্ধে অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত আলোচনা করেছি 'কবিতার বিচিত্র-কথা' বইখানিতে। সত্যেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এই আলোচনা ছাপা হবার পরে কুমুদরঞ্জন মল্লিক, প্রমথ চৌধুরী, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, মোহিতলাল মজুমদার ইত্যাদি কবিদের সম্বন্ধে যাঁরা বিস্তৃত আলোচনা করেছেন, এই সূত্রে কবিতানুরাগী সহযোগী বন্ধুবোধে তাঁদের প্রযত্নের কথা স্বভাবতঃই মনে পড়ছে।

হ. মি.

অধ্যায়ক্রম

কথারম্ভ

তুমি বঙ্গ ভারতীর তন্ত্রী-'পরে
একটি অপূর্ব তন্ত্র এসেছিলে পরাবার তরে।
সে তন্ত্র হয়েছে বাঁধা ; আজ হতে বাণীর উৎসবে
তোমার আপন সুর কখনো ধ্বনিবে মন্দ্ররবে,
কখনো মঞ্জুল গুঞ্জরণে। —রবীন্দ্রনাথ

সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরে প্রসিদ্ধ একটি কবিতায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর সম্পর্কে অনেক প্রশংসার কথা লিখেছিলেন। সেই কবিতা স্মরণ করে এই আলোচনা শুরু হলো। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার দীপ্তিতে সে-যুগে অন্যান্য কবির অস্তিত্ব কতকটা ম্লান হয়ে গিয়েছিল। করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৭-১৯৫৫), যতীন্দ্রমোহন বাগচী (১৮৭৮-১৯৪৮), কুমুদরঞ্জন মল্লিক (জন্ম ১৮৮২), যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (১৮৮৭-১৯৫৪), কিরণধন চট্টোপাধ্যায় (১৮৮৭-১৯৩১), মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮৮-১৯৫২), কালিদাস রায় (জন্ম ১৮৮৯) প্রভৃতি রবীন্দ্র-কালীন কবিদের বিষয়ে পাঠক-সমাজে পর্যালোচনার উৎসাহ জাগেনি বিশেষ। রবীন্দ্রনাথের কাব্যরীতি সজ্ঞানে বেশ কিছু পরিমাণে এড়িয়ে গিয়েছিলেন বলেই কাজী নজরুল ইস্‌লামের (জন্ম ১৮৯০) স্বাতন্ত্র্য কিছু লোকের শ্রুতিগম্য হয়েছিল।

যতীন্দ্রনাথ ও নজরুল সম্বন্ধে বিচার-বিশ্লেষণের ব্যাপক প্রয়াস অপেক্ষাকৃত আধুনিক ব্যাপার। সমকালীন বর্ষীয়ান কবিদের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৩০-১৯২৬), বিহারীলাল চক্রবর্তী (১৮৩৫-১৮৯৪), অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী (১৮৫০-১৮৯৮), দেবেন্দ্রনাথ সেন (১৮৫৮-১৯২০), অক্ষয়কুমার বড়াল (১৮৬৫-১৯১৮) এবং আরো কারো কারো নাম রবীন্দ্রনাথের নানান রচনায় ছড়িয়ে আছে। বঙ্কিম-যুগশেষের বৈদগ্ধ্যের প্রতিনিধি এবং নিজের যৌবন-কালের বন্ধু কবি প্রিয়নাথ সেনকে (১৮৫৪-১৯১৬) তিনি 'সাহিত্যের সাত সমুদ্রের নাবিক' বলে স্মরণ করেছিলেন। 'জীবনস্মৃতি'-তে অক্ষয়চন্দ্র

চৌধুরীর 'উদাসিনী' (১৮৭৪) কাব্যের উল্লেখ আছে। বিহারীলাল সম্পর্কে তাঁর আলোচনা সর্ববিদিত। অল্প বয়সে 'অবোধবন্ধু'-পত্রিকায় বিহারীলালের কবিতার সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয় হয়েছিল। 'জীবনস্মৃতি'-তে তিনি লিখেছিলেন—

> তাঁহার সেই সব কবিতা সরল বাঁশির সুরে আমার মনের মধ্যে মাঠের এবং বনের গান বাজাইয়া তুলিত।

সারদাচরণ মিত্র এবং অক্ষয়চন্দ্র সরকার পুরোনো বাংলা কবিতার যে প্রসিদ্ধ সংকলন প্রকাশ করেছিলেন, সেগুলি তাঁর খুবই প্রিয় ছিল। প্রাচীন বাংলা কাব্যের অন্যান্য অঞ্চলেও তাঁর অনুরাগ কম ছিল না। ১৩১৭ সালের 'প্রবাসী'-তে লালন ফকিরের গান ছাপা হয় তাঁরই উৎসাহে। 'জীবনস্মৃতি'-তে অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী সম্বন্ধে এই মন্তব্য পাওয়া যায়—

> রচনা সম্বন্ধে তাঁহার ক্ষমতার যেমন প্রাচুর্য তেমনি ঔদাসীন্য ছিল।...সাহিত্য ভোগের অকৃত্রিম উৎসাহ সাহিত্যে পাণ্ডিত্যের চেয়ে অনেক বেশি দুর্লভ। অক্ষয়বাবুর সেই অপর্যাপ্ত উৎসাহ আমাদের সাহিত্যবোধ-শক্তিকে সচেতন করিয়া তুলিত।

সেই বইয়ের মধ্যেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিষয়ে লেখা হয়েছিল—

> সাহিত্যের শিক্ষায় ভাবের চর্চায় বাল্যকাল হইতে জ্যোতিদাদা আমার প্রধান সহায় ছিলেন।

আবার, দ্বিজেন্দ্রনাথের 'স্বপ্নপ্রয়াণ' সম্বন্ধে তিনি বলেছিলেন—

> 'স্বপ্নপ্রয়াণ' যেন একটা রূপকের অপরূপ রাজপ্রাসাদ। তাহার কত রকমের কক্ষ, গবাক্ষ, চিত্র, মূর্তি ও কারুনৈপুণ্য। তাহার মহলগুলিও বিচিত্র। তাহার চারিদিকের বাগানবাড়িতে কত ক্রীড়াশৈল, কত ফোয়ারা, কত নিকুঞ্জ, কত লতাবিতান। ইহার মধ্যে কেবল ভাবের প্রাচুর্য নহে, রচনার বিপুল বিচিত্রতা আছে।

'প্রভাত সংগীত-এর প্রথম সংস্করণে (১৮৮৩) 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতাটির সঙ্গে 'ভারতী'-তে প্রকাশিত অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর 'অভিমানিনী নির্ঝরিণী' নামে একটি কবিতা ছাপা হয়েছিল।

বাংলা ১৩১৩ থেকে ১৩১৬-র মধ্যে (১৯০৬-১৯০৯) দ্বিজেন্দ্রলাল ও রবীন্দ্রনাথের অনুরাগীদলের দ্বিধা-বিভক্ত দুই শাখার শ্লেষকটাক্ষতাড়িত বাদপ্রতিবাদে সেকালের পত্র-পত্রিকা যদিও কণ্টকিত হয়ে উঠেছিল, তবু, ব্যঙ্গ-পরিহাসের সুদক্ষ কবি হিসেবে দ্বিজেন্দ্রলালের সামর্থ্য স্বীকার

করতে রবীন্দ্রনাথ কখনই কুণ্ঠা বোধ করেন নি। দ্বিজেন্দ্রলালের 'আষাঢ়ে' এবং 'মন্দ্র' সম্পর্কে অবিমিশ্র না-হলেও আংশিক প্রশংসাই তিনি করে গেছেন[1]। দ্বিজেন্দ্রলালের মৃত্যুর পরে ১৯১৫-র অক্টোবর মাসে তাঁর 'আলেখ্য' থেকে 'নূতন মাতা' কবিতাটির ইংরেজি অনুবাদ করে প্রমথ চৌধুরীর কাছে তিনিই পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। ঐ একই লেফাপায় দেবেন্দ্রনাথ সেনের 'অশোক গুচ্ছ' থেকে 'যুবতীর হাসি' এবং 'সোহাগিনী ইথে তোর এত অভিমান' কবিতা দু'টির অনুবাদ পৌঁছেছিল। সেই চিঠি এবং অনুবাদত্রয়ী বর্তমানে বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়ের 'চিঠিপত্র' পঞ্চম খণ্ডে সংরক্ষিত আছে। দেবেন্দ্রনাথ সেনকে রবীন্দ্রনাথ 'কবিভ্রাতা' বলে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন; ১৩১৩ সালে যতীন্দ্রমোহনের 'লেখা'-র কবিতাগুলি গ্রন্থাকারে ছাপা হবার আগে সেগুলি তিনি দেখে দিয়েছিলেন এবং ১৮৯৪ সালের জানুয়ারি মাসে প্রকাশিত 'সোনার তরী' বইখানি তাঁরই নামে উৎসর্গ করা হয়েছিল। আবার 'মালঞ্চ' নামে নব্য রোম্যান্সের নায়িকা নীরজা রোগশয্যায় শুয়ে ব্যাকুল হয়ে স্বামী আদিত্যকে বলেছেন, 'এইবার আলো জ্বালাও! আমাকে পড়ে শোনাও অক্ষয় বড়ালের এষা'।[2] 'মালঞ্চ' যখন ছাপা হয়, তার অল্পকাল আগে ১৯৩২-এর ১১ই ফেব্রুয়ারি মহাত্মা গান্ধীর সম্পাদনায় 'হরিজন' নামে যে ইংরেজি পত্রিকা বেরিয়েছিল, তারই প্রথম সংখ্যার জন্যে রবীন্দ্রনাথ সত্যেন্দ্র-নাথের 'মেথর' কবিতাটির ইংরেজি অনুবাদ পাঠিয়েছিলেন। তাঁর 'Fruit Gathering'-এর মধ্যেও সত্যেন্দ্রনাথের একাধিক কবিতার অনুবাদ ছাপা হয়েছে। একদিকে রবীন্দ্রনাথ, অন্যদিকে অন্যান্য কবিদের গোষ্ঠী—এই দুই পক্ষের পারস্পরিক বা অন্যোন্য (mutual) সংস্পর্শের বিশেষত্ব বুঝতে হলে এই পর্বের উল্লেখযোগ্য কবিদের সাধনার ইতিহাস দরকার।

১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারি (৩০ মাঘ ১২৮৮, শনিবার), নিমতা গ্রামে কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত জন্মগ্রহণ করেন। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর প্রথম কবিতার বই 'সবিতা' ছাপা হয়। ৪১ বছর বয়সে, ১৯২২ সালের ২৫-এ জুন তাঁর তিরোধান ঘটে। সর্বসমেত তাঁর চোদ্দখানি কাব্যগ্রন্থের মধ্যে আয়ুষ্কালের

১। 'আধুনিক সাহিত্য': রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

২। 'মালঞ্চ': রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১০ম অধ্যায়)।

মধ্যে বারোখানি এবং মৃত্যুর পরে অন্য দু'খানি প্রকাশিত হয়।[৩] এ-ছাড়া তিনি কিছু গদ্য এবং নাট্যগ্রন্থও লিখেছিলেন।

(মুষ্টিমেয় ভালো কবিতার সঙ্গে ধ্বনিময় অজস্র পদ্য মিলে মিশে একাকার হয়ে সত্যেন্দ্রনাথের রচনাবলীর কলেবর যে-পরিমাণে বাড়িয়েছে, তাঁর কাব্যের সর্বত্র রসের নিবিড়তা ঘটে নি সে-অনুপাতে। তা-হলেও তাঁর প্রভাবে অণুমাত্র আকৃষ্ট হননি, এমন সমকালীন কবির সংখ্যাও নগণ্য) বর্ষীয়ান সাহিত্য-সাধকদের প্রীতি আকর্ষণে তিনি সমর্থ হয়েছিলেন। আবার, উত্তরবর্তী কবিগোষ্ঠীও কতকটা সমান উৎসাহে তাঁর দক্ষতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। একালের প্রতিষ্ঠিত বাঙালী কবিদের মধ্যে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের প্রথম দিকের কয়েকটি কবিতার ছন্দোনৈপুণ্য দেখে এক সময়ে তাঁর সমালোচকদের মধ্যে কেউ কেউ দু'জনের নাম একই সঙ্গে স্মরণ করেছিলেন।[৪]

সত্যেন্দ্রনাথের প্রসঙ্গের বৈশিষ্ট্য, ছন্দের বৈচিত্র্য ইত্যাদি গুণ লক্ষ্য করে ডক্টর সুকুমার সেন তাঁর 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' বইখানির তৃতীয় খণ্ডে লিখেছেন—

> সত্যেন্দ্রনাথের কবিপ্রকৃতির মধ্যে বিজ্ঞানী বুদ্ধির অংশ ছিল প্রবল। তাই তাঁহার কবিতা যত তথ্যবহুল তত ভাবগভীর নয়। মানব-সংসারের জ্ঞানভাণ্ডারের সকল সামগ্রীর প্রতিই কবির যে সজাগ কৌতূহল ছিল তাহার পরিচয় তাঁহার কাব্যে সর্বত্র পাই, তা সে বৈদিক সূক্তই হউক আর আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানই হউক। ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের প্রতি তাঁহার বিশেষ আকর্ষণ ছিল। ইহার ফলে আমরা তাঁহার চমৎকার গাথা-কবিতাগুলি পাইয়াছি। ইহার ইঙ্গিত কবি পাইয়াছিলেন সতীশচন্দ্র রায়ের রচনায়। সত্যেন্দ্রনাথের বিশেষ কৌতূহল ছিল শব্দচয়নে। তৎসম, তদ্ভব ও দেশী—সর্ববিধ পরিচিত ও অপরিচিত শব্দের ব্যবহারে তিনি যে দুঃসাহসিক সার্থকতা দেখাইয়াছিলেন তাহা পরবর্তী কবিদের নূতন পথ দেখাইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের

৩। সবিতা [১৯০০]; সন্ধিক্ষণ [১৯০৫]; বেণু ও বীণা [১৯০৬]; হোমশিখা [১৯০৭]; তীর্থসলিল [১৯০৮]; তীর্থরেণু [১৯১০]; ফুলের ফসল [১৯১১]; কুহু ও কেকা [১৯১২]; তুলির লিখন [১৯১৪]; মণিমঞ্জুষা [১৯১৫]; অভ্রআবীর [১৯১৬]; হসন্তিকা [১৯১৭]।

মৃত্যুর পরে প্রকাশিত :—বেলা শেষের গান [১৯২৩]; বিদায় আরতি [১৯২৪]। এই কয়খানি ছাড়া ১৯৩০-এ তাঁর নির্বাচিত কবিতা-সংগ্রহ 'কাব্য সঞ্চয়ন' এবং ১৯৪৫-এ 'সত্যেন্দ্রনাথের শিশুকবিতা' নামে আর একটি সংকলন-গ্রন্থ ছাপা হয়।

৪। An Acre of Green Grass—বুদ্ধদেব বসু · পৃষ্ঠা ৪৯ (১৯৪৮)।

অনুসরণ করিয়া সত্যেন্দ্রনাথ বাংলা ছন্দে নূতন নূতন ঝঙ্কার তুলিয়াছেন। এই ছন্দোবৈচিত্র্য এবং ছন্দোনৈপুণ্য বাংলা কাব্যে তাঁহার বিশিষ্ট দান।৫

'আধুনিক বাংলা সাহিত্য' (১৩৫৩) বইখানির মধ্যে 'সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত' প্রবন্ধে মোহিতলাল লিখে গেছেন—

> সৃষ্টিকে তিনি বিদ্যা ও বুদ্ধিমার্জিত চিত্তফলকে প্রতিফলিত করিয়া দেখিয়াছেন; জগতের সকল পূর্ব কবি ও মনীষিগণের সাক্ষ্য এবং পুরাবৃত্ত ও প্রত্নতত্ত্বের প্রমাণপুঞ্জ তাঁহার ধারণা ও কল্পনাকে একটি বিশিষ্ট ভাবমার্গে প্রবর্তিত করিয়াছিল। এই জন্য আধুনিক বিজ্ঞানের সাহস ও সত্যবাদের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা থাকিলেও এবং সকল কুসংস্কারপ্রসূত দুর্বলতা ও সংকীর্ণতাকে এক মুহূর্ত্ত সহ্য না করিলেও, তিনি অতীত যুগের মানব ও তাহার কীর্তি—বিশেষ করিয়া ভারতীয় হিন্দু সংস্কৃতির প্রতি নিরতিশয় আস্থাবান ছিলেন।

আবার বাঙালী পাঠক-সমাজের হুজুগ-প্রিয়তার দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে ঐ বইয়েরই অন্যত্র তিনি লিখেছিলেন—

> কবি সত্যেন্দ্রনাথের যশোভাগ্য ইতিমধ্যেই ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে। জীবিত কালে তাঁহার যে কারণে যে প্রতিষ্ঠা ঘটিয়াছিল, বাঁচিয়া থাকিলে হয়ত তাহা এখনও অটুট থাকিত। অবশ্য যদি তিনি প্রতিমাসে একগুচ্ছ কবিতা (সাময়িক ঘটনা অবলম্বনে লিখিত হইলে আরও ভাল) প্রকাশ করিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি বাঁচিয়া নাই, ইহাই তাঁহার সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য।৬

সত্যেন্দ্রনাথের রচনায় 'সাম্প্রতিক' বিষয়ের বাহুল্য,—তা'ছাড়া তাঁর অপরিসীম প্রাচুর্য এবং সবচেয়ে-বেশি, ছন্দের দিকে তাঁর অতি-মনোযোগ,—'হুজুগ-প্রিয়' বাঙালীজাতি তাঁর সম্পর্কে প্রধানত এই তিনটি প্রসঙ্গ স্মরণ করেই তৃপ্তিলাভ করেন!

অধ্যাপক সুকুমার সেন তাঁর 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস'-এর দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডে রবীন্দ্র-সমকালীন কবিদের রচনা সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। এইসব কবিদের মধ্যেও দু'একজন এই পর্বের কাব্যকলার বিশ্লেষণ করেছেন। এঁদের আলোচনা সব ক্ষেত্রে ঠিক ধারাবাহিক অথবা সামগ্রিক নয়,—সেগুলি প্রীতিবশে এবং বিভিন্ন প্রবণতা অনুসারে রচিত। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, শশাঙ্কমোহন সেন, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়,

---

৫। 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস': সুকুমার সেন (তৃতীয় খণ্ড)।

৬। 'আধুনিক বাংলা সাহিত্য': মোহিতলাল মজুমদার ('সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)।

ডক্টর সুশীলকুমার দে, অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন, ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, মোহিনীমোহন মুখোপাধ্যায়, মোহিতলাল মজুমদার, প্রবোধচন্দ্র সেন, অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র হোম, দিলীপকুমার রায়, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত ইত্যাদি লেখকরা রবীন্দ্র-সমকালীন বাংলা কাব্যপ্রবাহের পূর্ণ আলোচনায় উদ্যোগী হননি বটে,—তবে, পরস্পর-বিচ্ছিন্ন নানা প্রবন্ধে এই পর্বের পর্যালোচনার পথ এঁরা আংশিক ভাবে প্রস্তুত করে রেখেছিলেন। যতীন্দ্রমোহন বাগচীর লেখা 'রবীন্দ্রনাথ ও যুগসাধনা' বইখানি 'ভারতী','মানসী', 'যমুনা', সাহিত্য' প্রভৃতি পত্রিকার কবিগোষ্ঠী সম্পর্কে বহুমূল্য তথ্যসম্ভারে সমৃদ্ধ। শ্রীযুক্ত কালিদাস রায়, হেমেন্দ্রকুমার রায়, উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস প্রভৃতি লেখকদের আত্মকথা-শ্রেণীর নানান লেখাতে যেমন 'ভারতী'-গোষ্ঠীর বিষয়ে,—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, ভূপতি চৌধুরী প্রভৃতির রচনায় যেমন 'কল্লোল' সম্বন্ধে,—পবিত্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের 'চলমান জীবন' থেকে যেমন 'সবুজ পত্রে'র বিষয়ে,—অথবা হিরণকুমার সান্যালের 'পরিচয়'-গোষ্ঠী সম্পর্কে লেখা ব্যক্তিগত স্মৃতি-নিবন্ধগুলিতে যেমন 'পরিচয়'-এর বিষয়ে বহু বিচিত্র তথ্যাদি প্রকাশিত হয়েছে,—যতীন্দ্রমোহন বাগচীর এই বইখানি থেকে নজরুল-পূর্ববর্তী বিশ শতকের রবীন্দ্রকালীন কবিদের বিষয়েও তেমনি অনেক তথ্য জানা যায়। তাছাড়া, মোহিতলাল মজুমদার, শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, সুধীরচন্দ্র সরকার, নরেন্দ্র দেব, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, কালিদাস রায়, শান্তি পাল, অমলচন্দ্র হোম ইত্যাদি সত্যেন্দ্র-পার্শ্বচর কবি ও সাংবাদিকের সঙ্গে কথোপকথন-সূত্রেও এই পর্বের রবীন্দ্র-শাসিত বাংলা কাব্যাকাশের লঘুগুরু অনেক খবর শোনা গেছে।

'সাহিত্য', 'ভারতী', 'প্রবাসী', 'মানসী', 'মানসী ও মর্মবাণী', 'নব্যভারত', 'নারায়ণ' ইত্যাদি পত্রিকায় সে-সময়ের কাব্যবিচারমূলক কিছু কিছু আলোচনা ছাপা হয়েছিল। আরো আধুনিক কালের পত্র-পত্রিকার মধ্যেও কিছু কিছু তথ্য ছড়িয়ে আছে। ১৩২৫ সালের বৈশাখের 'ভারতী'-তে 'ছন্দ-সরস্বতী' নামে তিনি যে প্রবন্ধটি লিখেছিলেন, তাতে ছন্দ সম্পর্কে তাঁর ক্রমানুশীলনের কয়েকটি স্তর তিনি নিজেই দেখিয়ে গেছেন। তাঁর মৃত্যুর ঠিক পরেই ১৩২৯-এর শ্রাবণের 'নব্যভারত' পত্রিকায় 'সত্যেন্দ্র-স্মৃতি' নামে তথ্যপূর্ণ যে প্রবন্ধ বেরিয়েছিল, 'ভারতবর্ষে' (ভাদ্র, ১৩২৯) তার পুনর্মুদ্রণ প্রকাশিত হয়। ১৩৫৪ সালের 'মাসিক বসুমতী'তে সত্যেন্দ্রনাথের শেষ

জীবনের বন্ধু শ্রীশান্তি পাল পর্যায়ক্রমে 'কবি সত্যেন্দ্রনাথ' নামে কয়েকটি প্রবন্ধ লেখা শুরু করেছিলেন। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার হেদুয়া-পুষ্করিণীতে Central Swimming Association স্থাপিত হবার সঙ্গে সঙ্গে ঐ সংঘের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে তিনি সত্যেন্দ্রনাথ, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসেন। 'প্রবাসী' পত্রিকায় পত্নী কনকলতা দত্ত ও বন্ধু ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের কাছে লেখা সত্যেন্দ্রনাথের কয়েকখানি চিঠি ছাপা হয়েছিল। শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার মিত্রের আনুকূল্যে আরো অনেক বাংলা পত্রিকায় তাঁর কিছু কিছু অপ্রকাশিত কবিতাও ছাপা হয়েছে। 'মানসী ও মর্মবাণী' পত্রিকায় শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায় 'মণিলালের আসর' নামে তথ্যপূর্ণ ধারাবাহিক আলোচনা করেছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথের জ্যোতিষচর্চা, দর্শনপাঠ, ইতিহাস আলোচনা,—অন্যান্য বিচিত্র জ্ঞান-বিজ্ঞানের স্পৃহা,—বিভিন্ন সাহিত্য-পত্রিকার সঙ্গে সঙ্গে 'Monist'-এর মতো সম্পূর্ণ ভিন্ন শ্রেণীর কাগজ পড়ার ঝোঁক,—তাঁর বন্ধুরা এইসব এবং এরকম আরো অনেক তথ্য পরিবেশন করেছেন। ১৯১৫ সালে তিনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কাশ্মীরে গিয়েছিলেন। ১৯১৮ সালে তাঁর মাতুলপুত্র সুধীরকুমার মিত্র তাঁর সঙ্গে দার্জিলিঙে গিয়েছিলেন। ১৯২১ সালে তাঁর দ্বিতীয়বার দার্জিলিং ভ্রমণের খবর পাওয়া গেছে। কাশ্মীরে শ্রীনগর বাজার থেকে Murray-র ভারত-ব্রহ্ম সিংহল ভ্রমণের Handbook কিনে সত্যেন্দ্রনাথ সেখানি আদ্যন্ত পড়ে নিয়ে বইয়ের শেষ দিকে স্বহস্তে এই শ্লোকটি লিখে রেখেছিলেন—

প্রভাত নিশৎ বাগেতে কাটাও
সন্ধ্যা নিশিম্ বাগে
শালেমারে তুমি কাটাও জীবন চির-নব অনুরাগে।

অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী, বিহারীলাল চক্রবর্তী, দেবেন্দ্রনাথ সেন, অক্ষয়কুমার বড়াল, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, মোহিতলাল মজুমদার প্রভৃতি স্বর্গত কবিদের রচনাবলীর বিচার-বিশ্লেষণ এখন যতোটা সম্ভব, একালের জীবিত কবিদের সম্বন্ধে এখনও তেমন আলোচনার সময় আসেনি। প্রথম দু'জনের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ এক সময়ে বেশ আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। আবার অন্যত্র তিনি অন্য কথার ইঙ্গিতও দিয়েছেন। 'কড়ি ও কোমল'-এর শেষতম সংস্করণে 'কবির মন্তব্য' অংশে বলা হয়েছিল—

> তখন হেম বাঁড়ুজ্যে এবং নবীন সেন ছাড়া এমন কোন দেশপ্রসিদ্ধ কবি ছিলেন না যাঁরা নূতন কবিদের কোনো একটা কাব্যরীতির বাঁধা পথে চালনা করতে পারতেন, কিন্তু আমি তাঁদের সম্পূর্ণই ভুলেছিলুম। আমাদের পরিবারের বন্ধু কবি বিহারীলালকে ছেলেবেলা থেকে জানতুম এবং তাঁর কবিতার প্রতি অনুরাগ আমার ছিল অত্যন্ত। তাঁর প্রবর্তিত কবিতার রীতি ইতিপূর্বেই আমার রচনা থেকে সম্পূর্ণ স্খলিত হয়ে গিয়েছিল। বড়োদাদার স্বপ্নপ্রয়াণের আমি ছিলুম অত্যন্ত ভক্ত; কিন্তু তাঁর বিশেষ কবিপ্রকৃতির সঙ্গে আমার বোধ হয় মিল ছিল না, সেইজন্যে ভালো লাগা সত্ত্বেও তাঁর প্রভাব আমার কবিতা গ্রহণ করতে পারেনি।

এ কথা বিশেষভাবে স্মরণীয় যে, সমকালীন কবিদের রচনায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের প্রভাব অবশ্যই সঞ্চার করেছিলেন,—পরস্পরের প্রভাবে তাঁরা নিজেরাও অল্প-বিস্তর প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন,—এবং তৃতীয়ত, তাঁদের বিভিন্ন ধারা রবীন্দ্রনাথের নিজের লেখার মধ্যে একেবারে কোনো স্পর্শই রেখে যায়নি, সেকথা ভাবাও সুবিবেচনা নয়। নিজের রচনায় সমকালীন কোনো-কোনো কবির কোনো-কোনো রীতি তিনি বরং পরিমার্জন করেছিলেন। 'আষাঢ়ে'-র সমালোচনা লিখতে গিয়ে দ্বিজেন্দ্রলালের ছন্দশৈথিল্যের তিনি তারিফ করেন নি। Byron-এর Don Juan-এর রীতিতে 'নির্দোষ ছন্দের সুকঠিন নিয়মের মধ্যে' কৌতুকরস অবলীলাসাধ্য হয়ে উঠেছিল বলে সেই রীতির প্রশংসা করে, সেই সূত্রেই দ্বিজেন্দ্রলাল সম্বন্ধে তিনি বলেছিলেন, 'অথচ ছন্দের এবং মিলের উপর গ্রন্থকারের যে আশ্চর্য দখল আছে তাহাতে সন্দেহ নাই'—এবং সেই সঙ্গে তিনি আরো লিখেছিলেন—

> তাঁহার হাস্য স্ফুটির নীহারিকা ক্রমে ছন্দোবন্ধে ঘনীভূত হইয়া বঙ্গ সাহিত্যে হাস্যলোকের ধ্রুব নক্ষত্রপুঞ্জ রচনা করিবে।

তিনি নিজে অতঃপর হাস্য-পরিহাসমূলক যে-সব কবিতা লিখেছিলেন, সেই সব লেখা উপভোগের সময়ে ইতিহাস-সচেতন পাঠকের মনে তাঁর এই পুরোনো মন্তব্যটি স্বতই জেগে ওঠা স্বাভাবিক এবং সেই সূত্রে দ্বিজেন্দ্রলাল-প্রবর্তিত বাংলা কৌতুক-কবিতার মান রবীন্দ্র-প্রতিভার লোকোত্তর সামর্থ্যের গুণে কী পরিমাণে যে পরিবর্তিত হয়েছে, সে-কথাও বিচার করে দেখবার ইচ্ছা জাগে। ঈশ্বর গুপ্তের পরে অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে বাংলায় যাঁরা কৌতুক-কবিতা রচনা করেছেন, তাঁদের মধ্যে কান্তকবি রজনীকান্ত সেনের নাম স্মরণীয়। ১৩০১-২ সালে দ্বিজেন্দ্রলাল যখন রাজসাহীতে ছিলেন, তখন

সেখানকার এক সভায় তাঁর হাসির গান শুনে কান্তকবি নিজে হাসির গান লেখায় মন দিয়েছিলেন। নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত কান্ত-কবির যে মূল্যবান জীবনী লিখে গেছেন, তাতে সে ঘটনার উল্লেখ আছে। বিশ শতকের বাংলা হাসির কবিতার ধারায় রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল এবং কান্তকবি (১৮৬৫-১৯১০)—কৌতুকরসের এই তিন সাধকের সাক্ষাৎ অথবা তির্যক প্রভাবের প্রসঙ্গ এড়িয়ে চলা অসম্ভব।

সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরে যতীন্দ্রমোহন, স্বর্ণকুমারী, কুমুদরঞ্জন, প্যারী-মোহন, কিরণধন, নজরুল এবং আরো অনেকে তাঁর স্মৃতিবন্দনামূলক কবিতা লিখেছিলেন। সেই লেখাগুলির সাধারণ লক্ষ্যই ছিল সত্যেন্দ্রনাথের ছন্দোনৈপুণ্যের দিকে। যতীন্দ্রমোহন জানিয়েছিলেন—

> হে দীর্ঘ পথের বন্ধু, হে কবি সচ্ছন্দ ছন্দরাজ!
> এ কি অভিনব ছন্দে মৃত্যুমন্ত্রে বরি নিলে আজ...

কুমুদরঞ্জন লিখেছিলেন—

> বিশ্ববাণীর নূপুরধ্বনি বাজতো তোমার সুরটিতে
> বর্ণে আলোয় গন্ধে নূতন সুর মিশাতে জানতে গো...

প্যারীমোহন লিখেছিলেন—

> ছন্দে তব চিত্ত নাচে, বেণু বীণা কুহু বাজে, যাদুকর মোহে যেন মন
> কভু লঘু কভু গুরু কভু বাজে দুরু দুরু মাদল মৃদঙ্গ অগণন।

যতীন্দ্রমোহন, প্রমথ চৌধুরী, কুমুদরঞ্জন, প্যারীমোহন, বুদ্ধদেব বসু ইত্যাদি অনেকেই একবাক্যে সত্যেন্দ্রনাথের একটি গুণেরই প্রাধান্য ঘোষণা করেছিলেন!

১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে 'ক্ষণিকা' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সেই সব ছন্দের আকর্ষণে বাংলার নবীন কবিমাত্রেই মুগ্ধ হয়েছিলেন। তখন সত্যেন্দ্রনাথের বয়স ছিল আঠারো বছর মাত্র। বাংলা কথ্যভাষার হসন্ত; শব্দের গুণ দেখিয়ে 'ক্ষণিকা'য় ধ্বনিমাধুর্যের যে অভিনবত্ব স্থাপিত হোলো, কিশোর সত্যেন্দ্রনাথের স্পর্শকাতর মনে সে-কীর্তির স্থায়ী প্রভাব সঞ্চারিত হয়ে থাকা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। অক্ষয়কুমার বড়াল, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রভৃতি সে সময়ের অপেক্ষাকৃত প্রবীণ কবিরাও ছন্দের দিকে অভিনবত্বস্পৃহাহীন ছিলেন না। ছন্দের বৈচিত্র্য-প্রয়াসী এইসব নবীন-প্রবীণ কবিদের রচনাবলী বিচার করে দেখলে সত্যেন্দ্রনাথকেও এই প্রদেশের 'স্বয়ম্ভু মহারাজ' মনে হয় না,—

রবীন্দ্রনাথকেও তাঁর সমকালীন সহকর্মীদের সংস্পর্শবিমুখ বলে ভাবা যায় না। পূর্বগামী আলোচকদের মধ্যে কেউ কেউ সে কথা আভাসে ইঙ্গিতে বলে গেছেন। শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন লিখেছেন—

> রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী'-র খরতাল নৃত্যচপলতার পূর্বাভাস রহিয়াছে অক্ষয়-কুমারের (বড়াল) 'বৃন্দাবন'-এ…।৭

কেবল এইসব প্রবীণ ছন্দোবৈচিত্র্যপ্রয়াসীদের অস্তিত্বই যে রবীন্দ্রনাথ অথবা সত্যেন্দ্রনাথের ছন্দ-সিদ্ধির একমাত্র কারণ ছিল, তা' নয়। রবীন্দ্রনাথ এবং মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রসঙ্গে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত যা' বলেছিলেন, এইসূত্রে সে-কথাই বরং বিশেষভাবে স্মরণীয়।

> 'মাইকেলকে পথপরিচায়ক হিসাবে না পেলে, বঙ্গসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব হতো না, এমন অনুমান পাগলামি। কারণ তাঁর সমান কবি হয়তো শতবর্ষে একবার জন্মায়; এবং তাঁদের আগমন ধূমকেতুর মতোই স্বয়ম্বশ ও স্বতঃসিদ্ধ। তৎসত্ত্বেও একথা অতি সত্য যে মাইকেল ও বিহারীলালের বৈফল্য তাঁর সামনে জাজ্বল্যমান না থাকলে, অনেক অকিঞ্চিৎকর পরিশ্রমেই তাঁর অধিকাংশ শক্তি ফুরতো।৮

সেকালের এইসব কবিদের অন্যোন্য সংস্পর্শের আর এক দৃষ্টান্ত আছে অনুবাদ-কবিতার ক্ষেত্রে। রবীন্দ্রনাথ অতি অল্প বয়সেই ভিক্টর হুগো, শেলি, ব্রাউনিং, শ্রীমতী ব্রাউনিং ইত্যাদি কবিদের রচনা অনুবাদ করেছিলেন। তবে, মোহিতচন্দ্র সেনের সম্পাদনায় তাঁর যে 'কাব্যগ্রন্থ' প্রকাশিত হয়, তাতে 'সন্ধ্যাসংগীত'-এর আগেকার রচনা তিনি ছাপতে দেন নি। কিন্তু তৎসত্বেও বিদেশী কবিতার সাবলীল সুন্দর অনুবাদের যে আদর্শ তিনি স্থাপন করেছিলেন, তাঁর ভক্ত সত্যেন্দ্রনাথের মন থেকে সে-প্রভাব অপসারিত হওয়া সহজ ছিল না। সে যুগে অনুবাদ-কবিতার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর একজন শক্তিমান কর্মী ছিলেন কবি ও নাট্যকার জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর সম্বন্ধেও গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। তাঁর কয়েকটি চিঠিপত্রের ছত্রে ছত্রে তার প্রমাণ আছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের চিঠিতে 'হোমশিখা'র প্রশংসা পেয়ে তিনি কতো-যে অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন, তার প্রমাণ আছে বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রমের শিক্ষক এবং বন্ধু ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের কাছে ১৩১৪ সালের মাঘ মাসে লেখা তাঁর এক চিঠিতে। ১৩৪৯-এর অগ্রহায়ণ

৭। 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' (দ্বিতীয় খণ্ড) [১৩৫৬] পৃঃ ৪১৭।

৮। 'স্বগত' (প্রথম সংস্করণ): পৃঃ ৬৭-৬৮।

ও মাঘ সংখ্যার 'প্রবাসী'তে সত্যেন্দ্রনাথের কয়েকটি চিঠি ছাপা হয়েছিল। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা'র 'সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত'-পুস্তিকায় এই পত্রাবলীর দু'খানি মাত্র ছাপা হয়েছে। এইসব চিঠির সাক্ষ্য ছাড়া জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রতি সত্যেন্দ্রের শ্রদ্ধার প্রমাণ অন্যসূত্রেও প্রাপ্য। 'তীর্থসলিল' নামে অনুবাদ-কবিতার বইখানি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নামেই উৎসর্গ করা হয়েছিল। 'তীর্থসলিল' ছাপা হয় ১৯০৮-এর ২০-এ সেপ্টেম্বর। তার কিছুকাল আগে দার্জিলিং থেকে কলকাতায় ফিরে বন্ধু ধীরেন্দ্রনাথ দত্তকে লেখা তারিখহীন একখানি চিঠিতে (জুন, ১৯০৮ ?) তিনি জানিয়েছিলেন—

> তিন চারিটি কবিতা দার্জিলিঙে লিখিয়াছি। এখানে আসিয়া কয়েকটা অনুবাদ করিয়াছি। অনুবাদগুলি শীঘ্রই প্রেসে দিব। পূজনীয় জ্যোতিরিন্দ্র বাবুর নামে উৎসর্গ করিতেছি।

ছন্দের কায়দা-কৌশল সম্পর্কে আমাদের তৎকালীন কবিদের অতি-মনোযোগের কারণগুলির মধ্যে অন্তত একটির ইঙ্গিত এখানেই দেওয়া যেতে পারে। ১৩৩৯-এ বৈশাখ-সংখ্যার 'পরিচয়' পত্রিকায় 'আধুনিক কাব্য' নামে রবীন্দ্রনাথের যে প্রবন্ধটি বেরিয়েছিল, তাতে তিনি লিখেছিলেন—

> বাল্যকালে যে ইংরেজি কবিতার সঙ্গে আমার পরিচয় হোলো তখনকার দিনে সেটাকে আধুনিক বলে গণ্য করা চলত। কাব্য তখন একটা নতুন বাঁক নিয়েছিল কবি বার্নস থেকে তার সুরু। কবি বার্নসের সঙ্গে ইংরেজী কাব্যে যে যুগ এল সে যুগে রীতির বেড়া ভেঙ্গে মানুষের মর্জি এসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন তাঁর Western Influence in Bengali Literature বইখানির পঞ্চম অধ্যায়ে সত্যেন্দ্রনাথের 'তীর্থসলিল'-এর অন্তর্গত 'একটি মূষিকের প্রতি' কবিতাটির ছন্দ সম্পর্কে লিখেছিলেন—

> This is evidently modelled on Burns' metre.

স্কটল্যাণ্ডের উপভাষায় Ramsay, Fergusson প্রভৃতি কবির যে সব রচনার সঙ্গে বার্নসের পরিচয় হয়, সেইসব ভঙ্গি-রীতি-কৌশল তিনি মনে-প্রাণে মেনে নিয়েছিলেন। পরে, Dr. Moore-এর পরামর্শে, স্কটল্যাণ্ডের উপভাষা পরিহার করে অষ্টাদশ শতকের ইংরেজ কবিরা যে ধারায় কাব্যানুশীলন করে গিয়েছিলেন, সেই ধারার অনুসরণেই তিনি আত্মনিয়োগ করেছিলেন— কিন্তু তৃপ্তি পান নি। তাঁকে ফিরে যেতে হয়েছিল তাঁর অভ্যস্ত দেশী বুলির সহজ আশ্রয়ে। Thomson-কে তিনি বলেছিলেন—

> These English songs gravel me to death. I have not the command of the language that I have of my native tongue. In fact I think my ideas are more barren in English than in Scottish. ৯

একদিকে স্কটল্যাণ্ডের কৃষকী ভাষায় বার্নসের বিশেষ প্রতিপত্তি,—আঠারোর শতকের অন্তিম প্রহরে Lyrical Ballads-এ Wordsworth ও Coleridge-এর চলিত ভাষার বন্দনা,—Byron-এর Burns-প্রীতি,—অন্যদিকে, রাষ্ট্র-চিন্তার ক্ষেত্রে য়ুরোপে ফরাসী বিপ্লবের দামামা-ধ্বনির মধ্যে বিশ্বের দলিত মানবাত্মার নবজাগরণের অকৃতার্থ স্পৃহা ও প্রাক্তন আভিজাত্যের শঙ্কিত প্রাণ-ধারণ,—সেই অবস্থার মধ্যে ইংলণ্ডে, ফ্রান্সে, জার্মানিতে আঠারোর শতক শেষ হোলো,—উনিশ শতকের উন্মেষ ঘটলো,—এবং আরো পরে ইংরেজি কাব্যের ক্ষেত্রে টেনিসন গ্রাম্য ভাষায় তাঁর Idylls লিখলেন,—সেকালের অভ্যস্ত কাব্যের অত্যন্ত বিরোধী মার্কিন কবি হুইটম্যানকে কাব্যের ত্রাণকর্তা বলে বন্দনা জানালেন সুইনবার্ন। এই ঘটনার কিছু পরে সুইনবার্ন অবিশ্যি তাঁর মত বদলেছিলেন। হুইটম্যানের অতি-স্পষ্টতা তাঁর ভালো লাগেনি। কিন্তু তারপর W. B. Yeats-এর 'Rhymers' Club'-এর উদ্যোগে ও-দেশে ছন্দের যে নতুন অনুশীলন ঘটলো, তাতে—

> বোঝা গেল যে আবৃত্তির যোগ্য কাব্যে অলঙ্কারের ভার সয় না। সুতরাং ছন্দের গ্রন্থি খুলে ভাষার স্বাভাবিক ধ্বনিবৈচিত্র্য ছাড়া পেলে, রূপকের পালা চুকিয়ে প্রত্যক্ষের অনুসন্ধান চললো, অপরিচয়ের অসীম বিস্ময় পরিচয়ের পরিতৃপ্তির কাছে হার মানলে। ১০

ইংরেজি সাহিত্যে Burns, Wordsworth, Tennyson, Yeats প্রভৃতি কবিরা কবিতার ভাষা ও রীতি সম্পর্কে ধারাবাহিকভাবে যে সাধনা চালিয়ে এসেছেন, তার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিলো কবিতার ক্ষেত্রে কবিদের আটপৌরে ভাষাকেই সর্বোপযোগী করে তোলা। বাংলায় কিন্তু অনুকরণটাই প্রধান কথা। তবে, কেউ কেউ সজ্ঞানে পশ্চিমের অনুরূপ কাজও করেছেন। ১৩১৪ সালে প্রকাশিত 'আলেখ্য' বইখানির ভূমিকায় দ্বিজেন্দ্রলাল রায় লিখেছিলেন—

> যতদূর স্বাভাবিক ও প্রচলিত ভাষা ব্যবহার করতে পারি (সুশ্রাব্যতা, মর্যাদা ও সদর্থ বজায় রেখে) চেষ্টা করেছি।

বাংলার লোকসাহিত্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের অনুরাগ,—তাঁর 'ক্ষণিকা'

৯। The Cambridge History of English Literature Vol. XI, Chap X.

১০। 'স্বগত' : সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৩৪৫) পৃঃ ৬৫।

(১৯০০), 'পলাতকা' (১৯১৮) প্রভৃতির বিশেষ রীতি,—সত্যেন্দ্রনাথের কবিতায় বাংলার নিজস্ব বাগ্ধারা, দেশী শব্দ ও ধ্বনিপ্রকৃতির বিশেষ ব্যবহার, —কিরণধন চট্টোপাধ্যায়ের 'আবারের আবঘণ্টা'তে পূর্বোক্ত-প্রকার ধ্বনিধর্মিতা এবং সে-পর্বের এই রকম অন্যান্য রীতি বা বিধির মূলে পশ্চিমের কাব্যপ্রেরণার অন্তর্নিহিত লক্ষণগুলি কী পরিমাণে এবং কোন্ কোন্ সূত্রেই বা প্রভাব বিস্তার করেছিল, সে-ইতিহাস এখন আর উপেক্ষিত হতে পারে না। কিন্তু প্রেরণা তো শুধু একমুখী নয়,—এবং তা কেবল পশ্চিম থেকেই আসেনি। প্রেরণা এসেছিল জগতের অজস্র কাব্যের বিচিত্র কানন-অরণ্যের সৌরভে সমৃদ্ধ হয়ে,— স্বদেশের দীর্ঘবিস্মৃত অথবা অবহেলাপুঞ্জিত অতীত কাব্যের বিস্তীর্ণ, বর্ণাঢ্য স্নিগ্ধতা থেকে! 'তীর্থসলিল'-এর মুখবন্ধে সত্যেন্দ্রনাথ তাই লিখেছিলেন—

আমার কণ্ঠে গাহিছে আজিকে জগতের যত কবি।
আমার তুলিতে আঁকিছে তাদের সুখ দুঃখের ছবি।
শত বিচিত্র সুর,
আজি একত্রে বিহরে হরষে অখণ্ড সুমধুর!
আমার কণ্ঠে গাহিছেন ব্যাস, বাল্মীকি, কালিদাস!
দান্তে, হোমার, শেক্ষপীয়ার, কণ্ঠে করিছে বাস!
গেটে, হুগো, বায়রন,
হেণ্ডজু, হাফেজ, স্যাফো, অবৈয়ার, খুসহাল, টেনিসন।
ওমরখৈয়াম আসিয়া মিলিছে, এসেছে ভলটেয়ার
হায়েন এসেছে, শেলি, সাদি, কীট্‌স্, বার্ন্‌স্, বেরাঞ্জার;
আরো যে এসেছে কত!
মোদের পদ্মবনে জগতের জুটেছে মধুব্রত।

সত্যিই, সারা জগতের কবিদল তাঁর কণ্ঠে ভর করেছিলেন! এবং সেই বিচিত্রতা তিনি তাঁর সমবেদনা দিয়েই আত্মসাৎ করবার চেষ্টা করেছিলেন। তবে এরকম প্রয়াসের সাফল্য সর্বত্র সমান হতে পারে না। সত্যেন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও তা' হয়নি। তিনি নিজে সে-বিষয়ে সচেতন ছিলেন এবং 'তীর্থসলিল'-এর সংক্ষিপ্ত ভূমিকায় সেই কথা স্বীকার করেই লিখেছিলেন—

ক্ষেত্রবিশেষে অনুবাদের অনুবাদ,—সকল স্থানে মূলের ছন্দ রাখিতে পারি নাই।

অনুবাদ-প্রয়াসের এই অনিবার্য ব্যর্থতার কথা স্বীকার করলেও তিনি কিন্তু

সে প্রচেষ্টা ত্যাগ করেন নি। আর শব্দ, ছন্দ, অলঙ্কার ইত্যাদি বহিরঙ্গ চর্চাতেও তাঁর ক্লান্তি ছিলনা। ইংরেজি ও সংস্কৃত কবিতার ছন্দ,—বাংলার তানপ্রধান, ধ্বনিপ্রধান, স্বরাঘাতপ্রধান ত্রিবিধ ছন্দ—এই বিচিত্র ছন্দরাজ্যে তাঁর আজীবন পরিক্রমা ঘটেছে। তা'ছাড়া গীতিকবিতার বিভিন্ন ও রূপগঠন (forms) সম্পর্কেও তিনি ছিলেন বিশেষ অনুরাগী। 'অভ্র-আবীর'-এর 'কবিপরিচয়' অংশে তাঁর বন্ধু চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছিলেন—

…ভাষা ও ছন্দের সৃষ্টিই তাঁহার কবি-প্রতিভার সর্বাপেক্ষা মৌলিক কীর্তি।

১৩২৯-এর শ্রাবণ-সংখ্যার 'প্রবাসী'তে চারুচন্দ্র এই সম্পর্কে আরো লিখেছিলেন—

কাজরী, গরবা সম্বন্ধে কবিতা লিখেছিলেন বলে তিনি চেষ্টা করে ঐ সব সুরের গান শুনেছিলেন; ফুলের কবিতা লিখতে বহু ফুলের নাম ও প্রকৃতি সংগ্রহ করেছিলেন; মেঘঘটাকে যুদ্ধ আয়োজনের রূপক দেবার জন্য তিনি বহু পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করেছিলেন।

চারুচন্দ্রের এই লেখাটি থেকেই জানা যায় যে, তাঁর কাছে সত্যেন্দ্রনাথ ছ'মাস ফার্সি শিখেছিলেন। নানা ভাষায় এবং নানা সাহিত্যে তাঁর গতি ছিল নির্বাধ। শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র হোমের 'সত্যেন্দ্র-স্মৃতি' প্রবন্ধ থেকে জানা যায়—

তাঁর ঠাকুরদাদার * লাইব্রেরীতে ইংরেজী এবং সংস্কৃত সাহিত্য ও দর্শন, ভারতবর্ষের পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক কেতাব সংগ্রহ অনেক ছিল। দর্শনে তাঁর অভিরুচি খুব ছিল না বটে, কিন্তু তাও যে তাঁর পড়া ছিল না এমন নয়। ইতিহাস, দেশের ও বিদেশের তাঁর মত পড়া খুব অল্প লোকেরই দেখেছি। তারপরে কাব্য ও সাহিত্যের তো কথাই নেই। পুরাণই কি তাঁর কম পড়া ছিল? যখনই কোথাও পৌরাণিক কিছুর উল্লেখ নির্ণয় করতে না পেরে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছি, তখনই তা কোথায় আছে বলে দিয়েছেন। …ফরাসী ভাষা জানা থাকাতে, য়ুরোপীয় সাহিত্যের সকল মহলের চাবি যেন তাঁর মুঠোর ভিতর ছিল।

মেধা এবং অধ্যবসায়ের এই বিরল বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন বলেই রবীন্দ্র-শাসনের মধ্যাহ্ন লগ্নে আবির্ভূত হয়েও সত্যেন্দ্রনাথ অল্পকালের মধ্যেই স্বকীয়তা অর্জনে সমর্থ হয়েছিলেন! তাঁর কবিত্ব সম্পর্কে সমালোচকদের মধ্যে যতোই মতানৈক্য ঘটুক না কেন, অন্তত এই একটি বিষয়ে সকলেই

---

* অক্ষয়কুমার দত্ত

নিঃসন্দেহে একমত। (কবিতার বাহনে তাঁর অনুশীলিত তন্ত্রটি ছিলো পৃথক। সে তাঁর ব্যক্তিত্বের বিশিষ্টতায় চিহ্নিত। রবীন্দ্রনাথ সেই কথাই লিখেছিলেন—

তুমি বঙ্গভারতীর তন্ত্রী পরে
একটি অপূর্ব তন্ত্র এসেছিলে পরাবার তরে।)

সত্যেন্দ্রনাথের কবিতা ও কাব্যরূপের সামগ্রিক মূল্য নির্ণয়ের প্রচেষ্টায় রবীন্দ্রশাসিত বিশ শতকের বাংলা কাব্যের প্রথম পঁচিশ বছরের ধারাবাহিক পরিণতির সকল স্তরই বিচার্য। এই সময়ের মধ্যে, অর্থাৎ, ১৯০০ থেকে ১৯২৫ অবধি বাংলা কবিতার বিস্তারে রবীন্দ্রনাথের নিজের লেখার পরিমাণ অমেয় বললেও অত্যুক্তি হয় না। এই বহুধা সমৃদ্ধ রবীন্দ্রকাব্যের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ এ-গ্রন্থের উদ্দেশ্য নয়। সত্যেন্দ্রনাথের সমসাময়িক অন্যান্য বাঙালী কবির কলাবৈচিত্র্যের সার্বিক আলোচনাও এ-বইয়ের পরিসীমাভুক্ত নয়। লক্ষ্যহীনভাবে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের গদ্য-পদ্য-নাট্য শ্রেণীভুক্ত সমস্ত রচনার বিশ্লেষণ করাও বর্তমান লেখকের অভীষ্ট নয়। এখানে মুখ্যত তাঁর আত্মবিকাশের ভিন্ন-ভিন্ন স্তরগুলিই পূর্ণভাবে আলোচ্য এবং সেই কারণেই তাঁর সমকালীন অন্যান্য কবির কাব্যকলার কিছু কিছু আলোচনা প্রসঙ্গসূত্রে অপরিহার্য।

মোটামুটি বিশ শতকের প্রথম পঁচিশ বছরের মধ্যেই তাঁর রচনাকাল সীমিত। 'সবিতা', 'সন্ধিক্ষণ' (১৯০০) থেকে শুরু করে 'বিদায় আরতি' (১৯২৪) অবধি বইগুলির প্রকাশকাল অনুসারে কবিতা ও কাব্যরূপের বিশ্লেষণে, কবিতার প্রসঙ্গ (subject) এবং পদ্ধতি (treatment) দু'দিকেই পর্যালোচকের দৃষ্টিক্ষেপ ঘটা উচিত। প্রসঙ্গের কথাসূত্রে অক্ষয়কুমার দত্ত, সতীশচন্দ্র রায় প্রভৃতি আত্মীয় ও বন্ধুজনের প্রভাব,—এবং পদ্ধতি বিষয়ে অনুসন্ধানসূত্রে সমকালীন বর্ষীয়ান ও বয়ঃকনিষ্ঠ কবিদের উল্লেখ আলোচনা অপরিহার্য। রবীন্দ্র-সমসাময়িক কবিদের মধ্যে অক্ষয়কুমার বড়াল, দেবেন্দ্রনাথ সেন, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রজনীকান্ত সেন, স্বভাবকবি গোবিন্দ দাস প্রভৃতির রচনায় কবিতার কলাবিধি ও মনন ব্যাপারে অল্প-বিস্তর নতুনত্ব লক্ষ্য করা যায়। এঁদের পরবর্তীদের মধ্যে রমণীমোহন ঘোষ, প্রমথনাথ রায়চৌধুরী, জগদিন্দ্রনাথ রায়, চিত্তরঞ্জন দাস, কায়কোবাদ, গোলাম হোসেন ইত্যাদি,—মহিলাদের মধ্যে মানকুমারী বসু, গিরীন্দ্রমোহনী দাসী, কামিনী রায় প্রভৃতি রবীন্দ্রনাথের ভাব, ভাষা, শব্দ ও ছন্দের কৌশল নানাভাবে অনুকরণ করে গেছেন বটে,—তবে, এঁদেরই মধ্যে কেউ কেউ আবার পরিবর্তনের অনুকূলে

ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। 'নারায়ণ' পত্রিকার বাংলার গীতি-কবিতা সম্পর্কে চিত্তরঞ্জন তাঁর বহুশ্রুত প্রবন্ধে বাংলার খাঁটি দেশীয় ভাষার রূপলাবণ্যের এবং গিরিশচন্দ্র ঘোষের ভাষারীতির প্রশংসা করেছিলেন। সেকালের কবিদের রচনায় নিজের অনুকরণের ব্যাপকতা লক্ষ্য করে রবীন্দ্রনাথ নিজেও কতকটা অস্বস্তি অনুভব করেছিলেন। 'শিশু'-র (১৯০৯) কবিতা সম্পর্কে আলমোড়া থেকে লেখা একটি চিঠিতে তাই মন্তব্য করা হয়েছিল—

> এ কবিতাগুলি কোন মাসিকপত্রে দিয়ে আমি নষ্ট করতে ইচ্ছা করিনে…বেশ তাজা টাটকা অবস্থায় বইয়েতে বেরবে এই আমার অভিপ্রায় নইলে মাসিক পত্রের পাঠকদের হাতে হাতে যেখানে সেখানে ঘুরে ঘুরে অনুকরণকারীদের কলমের মুখে ঠোকর খেয়ে খেয়ে কবিতার জেল্লা সমস্ত চলে যায়।১১

সাহিত্যের এ-হেন অবস্থায় সত্যেন্দ্রনাথের ছন্দোবৈচিত্র্য প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে অনুকরণনিষ্ঠ কবিযশঃপ্রার্থীরা নতুন আদর্শ দেখতে পেলেন। তখন রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিকতা ও অন্তর ভাবগ্রামের চর্বিতচর্বণের প্রয়াস পরিত্যাগ করে তাঁরা সত্যেন্দ্রনাথের পদ্ধতি অনুকরণেই আগ্রহান্বিত হলেন। তাই, যতীন্দ্রমোহন বাগচী প্রমুখ সেকালের বর্ষীয়ান কবিরাও তাঁর কলা-কৌশলের প্রভাব সম্পূর্ণ এড়িয়ে যেতে পারেননি। আবার মোহিতলাল বা নজরুলের লেখাতেও সত্যেন্দ্র-প্রভাবের স্বাক্ষর বিদ্যমান। দাম্পত্য প্রীতিমাধুর্যের কবিতাগুলি লেখার সময়ে কিরণধন চট্টোপাধ্যায় সত্যেন্দ্রনাথের আদর্শ বিস্মৃত হননি। হেমেন্দ্রকুমার রায় সত্যেন্দ্র-প্রভাবেই আত্মসমর্পণ করেছিলেন। এই সূত্রে এই সব অপেক্ষাকৃত খ্যাতিমান কবি ছাড়া অন্যান্য আরো অনেকের নাম মনে পড়ে।

সত্যেন্দ্রনাথ যখন লিখতে আরম্ভ করেন, বাংলা দেশে স্বদেশী আন্দোলনের চাঞ্চল্য তখন দিগ্‌বিদিকে পরিব্যাপ্ত হয়েছে। সে সময়ের অন্যান্য প্রসঙ্গ থেকেও তিনি প্রেরণা পেয়েছিলেন। বস্তুত এ-ব্যাপারও অভিনব নয়। উনিশ শতকে হেমচন্দ্রের রচনায় এবং উত্তরকালে সত্যেন্দ্রনাথের সমকালীন নজরুল ইসলামের লেখাতেও বহু 'সাম্প্রতিক' ঘটনার উল্লেখ দেখা যায়। প্রবহমাণ সময়ের ধারায় উত্তরবর্তী পাঠকের পক্ষে এইসব প্রসঙ্গ সম্পর্কে যথোচিত স্মৃতি রক্ষা করা সহজসাধ্য নয়। তাঁদের রসগ্রহণের পথ সুগম করা চাই।

১১। 'বিশ্বভারতী পত্রিকা' : ফাল্গুন ১৩৪৯

সেজন্যে তাঁর কবিতা পর্যালোচনার সঙ্গে সঙ্গে চাই নির্ভরযোগ্য শব্দটীকা। তাঁর কবিত্বের ক্রমবিকাশ,—দেশ-কাল সম্বন্ধে তাঁর সচেতনতা,—বাংলা কবিতার কলাবিধি সম্বন্ধে তাঁর সাধনা,—রবীন্দ্রনাথের প্রভাব সম্বন্ধে তাঁর এবং সমসাময়িক অন্যান্য কবিদের প্রতিক্রিয়া,—রবীন্দ্র-সমসাময়িক বাঙালী কবিপরিবারে তাঁর বিশেষ স্থান ইত্যাদি বিষয়গুলি সুপরিস্ফুট করে তোলাই এ-আলোচনার উদ্দেশ্য। আলোচনার মূল লক্ষ্যটি নিহিত আছে এ-বইয়ের শিরোনামে। এই আলোচনার নাম 'সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা ও কাব্যরূপ'।

জীবন-প্রসঙ্গ ও রচনাবলী

সত্যেন্দ্রনাথের মাতুল শ্রীকালীচরণ মিত্রের মতে তাঁর জন্ম হয়েছিল ১২৮৮ সালের ২৯-এ মাঘ, শনিবার, দ্বিপ্রহর রাত্রে।[১] 'সাহিত্য-সাধক চরিত মালার মধ্যে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কিন্তু জানিয়ে গেছেন—

> ২৯-এ মাঘ শুক্রবার হয়, এই কারণে আমরা কবির জন্ম তারিখ ৩০-এ মাঘ ধরিলাম।[২]

১৩২৯-এর ফাল্গুনের 'প্রবাসী'তে শ্রীযুক্ত সুধীর মিত্র এই তারিখই স্বীকার করেছিলেন।

সত্যেন্দ্রনাথের জীবনীতে তাঁর গ্রন্থাবলীর প্রকাশ-কালের পর্যায় সম্বন্ধেও আলোচকদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা যায়। 'অভ্র আবীর'-এর তৃতীয় সংস্করণে (কার্তিক, ১৩৫২) জানানো হয়েছিল যে, তাঁর 'রঙ্গমল্লী' ছাপা হয় ১৩১৯ সালে (ইং ১৯১২)। 'চীনের ধূপ'-এর প্রকাশকাল সম্বন্ধে তাতে কিছুই বলা হয়নি। তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'অভ্র-আবীর-এর 'কবি পরিচয়' অংশে লিখেছিলেন—

> 'সবিতা' তাঁহার প্রথম কবিতা পুস্তক। ইংরেজী ১৯০৫ সালে স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে 'সন্ধিক্ষণ' নামে একটি স্বদেশপ্রেম-মূলক কবিতা প্রকাশ করেন। তৎপরে

১। প্রবাসী, শ্রাবণ, ১৩২৯।

২। 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা'—৬৩ সংখ্যক পুস্তিকা দ্রষ্টব্য।

'বেণু ও বীণা', হোমশিখা', 'তীর্থসলিল', 'তীর্থরেণু', 'ফুলের ফসল', 'জন্মদুঃখী', 'কুহু ও কেকা', 'রঙ্গমল্লী', 'তুলির লিখন, 'মণিমঞ্জুষা', 'অভ্র আবীর', 'হসন্তিকা', 'চীনের ধূপ', পর্যায়ক্রমে প্রায় প্রতি বৎসর একখানি করিয়া প্রকাশ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে নানা পত্রিকায় প্রকাশিত অনেকগুলি কবিতা সংগ্রহ করিয়া 'বেলাশেষের গান', 'বিদায় আরতি' 'ধূপের ধোঁয়ায়' এবং 'কাব্যসঞ্চয়ন' প্রকাশিত হয়।

চারুচন্দ্রের দেওয়া এই পর্যায় ব্রজেন্দ্রনাথ স্বীকার করেন নি। তাঁর মতে 'চীনের ধূপ' প্রকাশিত হয়েছিল ১৯১২-র ৫ই অক্টোবর। এই তারিখের আগে 'কুহু ও কেকা' (১০ই সেপ্টেম্বর, ১৯১২) এবং পরে 'রঙ্গমল্লী' (৫ই ফেব্রুয়ারি, ১৯১৩) ছাপা হয়।

শ্রীযুক্তা মমতা ঘোষ 'দেশ' পত্রিকায় (৮ই জুলাই ১৯৪৪) 'সত্যেন্দ্র কথা' নামে যে আলোচনা করেছিলেন, সেই লেখাটিতে এবং ঐ ধরনের অন্যান্য প্রবন্ধে তাঁর জীবন ও ব্যক্তিত্বের বিষয়ে অনেক কথাই ছাপা হয়েছে। এঁদের ব্যক্তিগত স্নেহ-প্রীতির অতিশয়োক্তি এবং অনুরঞ্জনের সম্ভাবনা সম্পর্কে যথাসম্ভব সতর্কতা রক্ষা করে এইসব মালমশলা ব্যবহার করা দরকার। ১৩৪৯-এর অগ্রহায়ণ ও মাঘ সংখ্যার 'প্রবাসী'-তে (তাঁর বন্ধু বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রমের শিক্ষক ধীরেন্দ্রনাথ দত্তকে লেখা) সত্যেন্দ্রনাথের কয়েকখানি চিঠি ছাপা হয়েছিল। সত্যেন্দ্র-সম্পর্কিত অন্যান্য যে-সব চিঠিপত্র বা প্রবন্ধ-নিবন্ধ পাওয়া গেছে, এখানে সে-সব উপাদানও যথাসম্ভব ব্যবহার করা হয়েছে।

সত্যেন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় প্রধানত 'প্রবাসী' এবং 'ভারতী' পত্রিকাতেই তাঁর লেখা ছাপা হোতো। এই দুখানি ছাড়া 'বিচিত্রা', 'বঙ্গলক্ষ্মী' প্রভৃতি আরো যে-সব কাগজে তাঁর মৃত্যুর পরেও তাঁর অনেক লেখা ছাপা হয়েছে, সে-সব পত্র-পত্রিকাও উপেক্ষিত হয়নি। মৃত্যুর অব্যহিত পরে, তাঁর গুণগ্রাহীদের যে লেখাগুলি তখনকার নানা সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়, তার মধ্যে ১৩২৯-এর শ্রাবণ সংখ্যার 'প্রবাসী'তে কালীচরণ মিত্রের 'সত্যেন্দ্রনাথের কথা', চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সত্যেন্দ্র পরিচয়' এবং ১৩২৯-এর ভাদ্র সংখ্যার 'ভারতবর্ষে' অমলচন্দ্র হোমের 'সত্যেন্দ্র স্মৃতি'—এই তিনটি প্রবন্ধই বিশেষভাবে ধর্তব্য। এগুলির কথা আগেই বলা হয়েছে।

শ্রীযুক্তা মমতা ঘোষ তাঁর পূর্বোক্ত প্রবন্ধে লিখেছেন যে, সত্যেন্দ্রের জন্মের কয়েকদিনের মধ্যে খুব ঝড় হয় বলে তাঁর ডাকনাম রাখা হয় 'ঝড়ু'। অপ্রয়োজনীয় বোধে এসব কথা পরিহার করা হয়েছে। অপর পক্ষে, তাঁর

অনুরাগী সমকালীন একজন কবির সঙ্গে মৌখিক আলাপ-আলোচনার মধ্যে যখন শোনা গেল—

> দেবেন সেনের পড়বার সুরটা বড়ো ভালো ছিল। তাঁর গলা ছিল অপূর্ব। সত্যেন দত্ত ভালো পড়তে পারতেন বলে আমি মনে করি না। যতীন বাগচী সত্যিই ভালো পড়তেন।৩

—তখন, সেটা ব্যক্তিবিশেষের নিজস্ব মন্তব্য হলেও সত্যেন্দ্রনাথের বিষয়ে সে-কথা আগের বৃত্তান্তের মতো তুচ্ছ বা অবান্তর বলা চলে না। অনুরূপ কারণেই 'বসুমতী'-সম্পাদকের দেওয়া পরের তথ্যটিও অনুপেক্ষণীয়—

> তাঁহার 'বেণু ও বীণা' যখন প্রকাশিত হয়, তখন পরলোকগত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় আমাদিগকে তাহা উপহার দিয়া 'কলিকাতা রিভিউ' পত্রে সমালোচনা করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন।৪

এই ধরনের টুকরো-টুকরো খবর থেকে সত্যেন্দ্রনাথ সম্পর্কে অভিপ্রেত আলোচনার পথে উল্লেখযোগ্য সাহায্য পাওয়া যায়।

সত্যেন্দ্রনাথ যখন মাস-ছয়েকের শিশু, মাতামহ রামদাস মিত্র তখন লোকান্তরিত হন। এই মাতামহ-পরিবার মূলে ছিলেন বরিশালের অধিবাসী। বেলঘরিয়া রেল-স্টেশনের অদূরবর্তী নিমতা গ্রামে এঁরা অধিষ্ঠিত হন সত্যেন্দ্রনাথের জন্মের প্রায় ছ'সাত পুরুষ আগে। তাঁর মাতামহীর নাম বিমলা দেবী, পিতামহ অক্ষয়কুমার দত্ত। অক্ষয়কুমার দত্তের সন্তানদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ছিলেন অপুত্রক,—দ্বিতীয় অকৃতদার,—কনিষ্ঠ রজনীনাথ দত্তই সত্যেন্দ্রনাথের পিতা। কবির মায়ের নাম মহামায়া দেবী।

দত্ত-পরিবারের আদিবাস ছিল চব্বিশ পরগনার টাকি মহকুমার গন্ধর্বপুর গ্রামে। এঁরা বঙ্গজ কায়স্থ। অক্ষয়কুমারের প্রপিতামহ সেখানকার বাস তুলে দিয়ে নবদ্বীপের চুপী গ্রামে উঠে এসেছিলেন। তারপর অক্ষয়কুমারের আমল থেকেই কলকাতায় এঁদের নতুন বাসের পত্তন হয়। মসজিদ-বাড়ি স্ট্রীটের সেই বাড়িতে থেকেই পূর্ণচন্দ্র ঘোষ ও প্রকাশচন্দ্র ঘোষ লেখাপড়া করতেন। সত্যেন্দ্রনাথের প্রথম শিক্ষার পরিচর্যা করেছিলেন পূর্ণচন্দ্র। সত্যেন্দ্রনাথ যখন তের বছরের কিশোর, সেই সময়ে রজনীনাথ তাঁকে

৩। কবি মোহিতলাল মজুমদারের উক্তি।

৪। বসুমতী (মাসিক), আষাঢ়, ১৩২৯ : সম্পাদকীয় মন্তব্য।

কলকাতা থেকে মধুপুরে নিয়ে যান। মধুপুরে স্বল্পকালের প্রবাস-অভিজ্ঞতার ফলেই তিনি প্রথম কবিতা লেখা আরম্ভ করেছিলেন বটে, কিন্তু সে-সব লেখার সবই কালক্রমে লুপ্ত হয়েছে। তখনকার সাপ্তাহিক 'হিতৈষী' পত্রিকার সঙ্গে তাঁর ক্ষীণ যোগ ছিল বলে জানা গেছে।

ইস্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র অবস্থাতেই তিনি Shelley-র 'Sky Lark' কবিতাটির অনুবাদ করেন। O. W. Holmes-এর রচনা থেকেও তিনি কিছু অনুবাদ করেছিলেন। এসব রচনা প্রধানত অভিভাবকের প্রেরণায় লেখা। হয়তো তাঁর কিশোর মনে অক্ষয়কুমারের প্রভাবই ধীরে ধীরে উন্মোচিত হচ্ছিল। কালীচরণ মিত্রের সান্নিধ্যেও সাহিত্যপ্রীতি অঙ্কুরিত হবার কতকটা সুযোগ ঘটেছিল। রজনীনাথ ছেলেকে সুশিক্ষিত করবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু কৃতী ছাত্র হিসেবে তাঁর কখনোই সুনাম ছিল না। ১৮৯৯ সালে কলকাতার সেণ্ট্রাল কলেজিয়েট স্কুল থেকে দ্বিতীয় বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ১৯০১-এ জেনারেল এসেমব্লিজ ইনষ্টিউশন থেকে তিনি তৃতীয় বিভাগে এফ-এ পরীক্ষাতেও উত্তীর্ণ হয়ে গেলেন। কালীচরণ মিত্রের লেখা থেকে জানা যায় যে, কলেজের সেই প্রথম দু'বছরের মধ্যে সুরেশচন্দ্র সমাজপতির প্রভাবে তিনি গল্প লেখায় মন দিয়েছিলেন। গণিতে তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল না, কিন্তু পদার্থবিদ্যায় ছিল বিশেষ উৎসাহ। তখন তাঁর গৃহশিক্ষক ছিলেন তারকনাথ সরকার। ছাত্রের ওপর তাঁর কী রকম প্রভাব ছিল, সেকথা নিশ্চিতভাবে জানা যায় না। তবে, পদার্থবিদ্যায় উৎসাহের প্রসঙ্গ থেকেই ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের পুরোনো একটি ঘটনা মনে পড়তে পারে। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে অক্ষয়কুমার দত্ত 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় 'নানা ইংরাজী গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত ও অনুবাদিত' পদার্থবিদ্যা সংক্রান্ত অনেকগুলি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। ১৮৫৬ সালে (১৭৭৮ শকের শ্রাবণ মাসে) সেই লেখাগুলি আলাদা বই হয়ে বেরিয়েছিল। তারই এক জায়গায় বলা হয়েছিল—

> 'যে বিদ্যা শিক্ষা করিলে নির্জীব জড় পদার্থের গুণ ও গতির বিষয় জ্ঞাত হওয়া যায় তাহার নাম পদার্থবিদ্যা।'[৫]

সেই পদার্থবিদ্যার জ্ঞানকে কবিতায় রূপান্তরিত করেছিলেন তাঁরই পৌত্র

৫। পদার্থবিদ্যা—অক্ষয়কুমার দত্ত প্রণীত ; 'জড় ও জড়ের গুণ' দ্রষ্টব্য।

সত্যেন্দ্রনাথ। ইংরেজি ১৯০০ সালে মাত্র ২৬ পৃষ্ঠার এক পুস্তিকা ছাপা হয়। সেইখানিই তাঁর প্রথম বই 'সবিতা'। কালীচরণ মিত্র জানিয়েছেন—

> সত্যেন্দ্রনাথের বন্ধু (উকিল) শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ মিত্রের ব্যয়ে গোপনে 'সবিতা' গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়।৬

এই পুস্তিকার 'সূচনা'র শেষ অংশে জানানো হয়েছিল—

> সবিতার মত অদম্য উৎসাহ, অনন্ত তেজ, অশ্রান্ত গতি চাই। তবেই দেশের কল্যাণ—জাতির কল্যাণ—প্রতি অধিবাসীর কল্যাণ। এখনও সময় আছে। পূর্ব প্রতিভার অঙ্গারে এখনও অনল আছে। কে বলিল উৎসুক ফুৎকারে জ্বলিয়া উঠিবে না? ভারত দর্শনে শ্রেষ্ঠ, বিজ্ঞানে না হইবে কেন?

এই বিশেষ জ্ঞানের কথা শোনা গেল 'সবিতা' থেকে তুলে দেওয়া নীচের কয়েকটি চরণে—

> জ্বলিতেছ চিরদিন তুমি হে যেমন
> জ্বলে সদা ধরণী তেমনি,
> মানব সে সিন্ধুনীরে বুদ্বুদের মালা
> তারাও জ্বলিছে দিনমণি!
> বাহিরে স্নিগ্ধতা-ঢাকা—
> শান্তির মাধুরী মাখা
> অন্তরে জ্বলিছে মহানল,
> অভিলাষ—আশা—তৃষা—আকাঙ্ক্ষা কেবল।৭

১৯০০ সালের মধ্যেই তাঁর কবিতা লেখার ঝোঁক বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। পিতামহ অক্ষয়কুমার এবং পিতা রজনীনাথ,—উভয়েই ছিলেন বিদ্বান এবং বিদ্যোৎসাহী। কালীচরণ মিত্রের ছোট গল্পের সংগ্রহ 'যূথিকা' এবং 'অম্লমধুর' তিনি লেখা হতে দেখেছিলেন; সুরেশচন্দ্র সমাজপতির সঙ্গে কালীচরণ প্রভৃতির যোগ থাকার ফলে সুরেশচন্দ্রের দৃষ্টান্তও তাঁর কিশোর-মনে প্রভাব বিস্তার করে থাকা স্বাভাবিক। এইসব সঙ্গ-সান্নিধ্যের ফলে তাঁর ভবিষ্যৎ বিকাশের সম্ভাবনা দেখা গেল 'সবিতা' বইখানির মধ্যেই। এই পর্যন্ত তাঁর কবিত্বশক্তির উন্মেষকালের বিস্তার ধরে নিলে পরের বিভাগটিকে বলা যায় বিকাশ ও পরিণতির-পর্ব।

৬। 'সত্যেন্দ্রনাথের কথা': প্রবাসী, শ্রাবণ, ১৩২৯

৭। 'সবিতা' পৃঃ ৭ (১২শ স্তবক)

রজনীনাথ দত্ত নিজে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় অভিজ্ঞ ছিলেন। তাঁর ইচ্ছে ছিলো যে, সত্যেন্দ্রনাথ চিকিৎসা-বিদ্যায় অধিকারী হয়ে উঠবেন। কিন্তু ছেলের প্রবণতা দেখা গেল অন্য রকম। এফ-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি বি-এ শ্রেণীতে ভর্তি হলেন। তারপর তিনি যখন তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে, তখন কনকলতা দেবীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। এই বিবাহের আগেই পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে রজনীনাথের মৃত্যু হয়। সত্যেন্দ্রনাথের বয়স তখন প্রায় ২১ বছর।[৮] বি-এ পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হতে পারেন নি। তাই, সে অবস্থায় কালীচরণ মিত্রের আমদানী-রপ্তানীর ব্যবসাতে যোগ দেওয়াই স্থির হয়,—এবং সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজও হয়েছিল। কিন্তু আমদানী রপ্তানীর পথ ছেড়ে অচিরেই তিনি ফিরে এসেছিলেন নিজের সাধনার ক্ষেত্রে। ইতিমধ্যে সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত 'সাহিত্য' পত্রিকায় (ফাল্গুন, ১৩০৮) তাঁর একটি কবিতা ছাপা হয়েছিল।[৯]

১৯০৫ সালে দেশে যখন বঙ্গবিভাগ আন্দোলনের চাঞ্চল্য দেখা দেয়, তারই কাছাকাছি সময়ে সত্যেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় কবিতার বই 'সন্ধিক্ষণ' প্রকাশিত হয়। সে প্রসঙ্গে কালীচরণ মিত্র লিখেছেন—

> 'সন্ধিক্ষণ' কবিতা লিখিয়া আমাকে দেখিতে দেয়। 'সন্ধিক্ষণ'...বহু সভায় বিনামূল্যে বিতরিত হয়।[১০]

'সন্ধিক্ষণ' ছাপা হয়েছিল ১৯০৫-এর ১৮ই সেপ্টেম্বর। আলাদা বই হিসেবে এ-বইখানি আর দ্বিতীয়বার ছাপা হয় নি। তবে, তাঁর মৃত্যুর

৮। কবিপত্নী কনকলতা দত্ত ১১।১২।৫২ এবং ১৭।১২।৫২ তারিখে লেখা দু'খানি চিঠিতে জানিয়েছেন—

'আমার পিতার নাম ৺ঈশানচন্দ্র বসু, মাতার নাম ৺গিরিবালা বসু; পিতার দেশ পূর্ববঙ্গে ঢাকা নয়াবাড়ীতে; হাবড়ায় তাঁর নিজের বাড়ী ছিল।...আমার বিবাহ হয় ১৩১০ সালে বৈশাখ মাসে ৪ঠা তারিখে।—

শ্বশুর মহাশয় কেমন ছিলেন তা ঠিক বলতে পারি না, আমার বিবাহের সমস্ত ঠিক করে বৈশাখে বিবাহ দেবেন সব আয়োজন করে চৈত্রসংক্রান্তির দিন মারা যান সামান্য জ্বর হয়ে। বিবাহ এক বৎসর পিছাইয়া যায় অশৌচের জন্য। তাঁকে আমি দেখিনি বা নিয়ে ঘর করিনি, শুনেছি যে সরল, উদার, অমায়িক লোক ছিলেন।'

৯। দেখিবে কি (ভল্টেয়ার হইতে)

১০। 'সত্যেন্দ্রনাথের কথা' : প্রবাসী, শ্রাবণ, ১৩২৯।

প্রায় তিন মাস পরে প্রকাশিত 'বেণু ও বীণা'র দ্বিতীয় সংস্করণে (১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯২২) এই লেখাগুলিও সন্নিবিষ্ট হয়েছিল।

'বেণু ও বীণা' বেরিয়েছিল 'সন্ধিক্ষণ'-এর প্রায় এক বছর পরে ১৯০৬ এর ১৫ই সেপ্টেম্বর।

ইতিমধ্যে কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচীর সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথের বেশ আলাপ হয়ে গেছে। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা থেকেই জানা যায় যে, সম্ভবত ১৯০৩ এর মাঘোৎসবের সময়ে কোন এক অপরাহ্নে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-বাড়ির পথে যতীন্দ্রমোহনের সঙ্গে তাঁকে একত্র দেখা যায়।[১১] চারুচন্দ্রের সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথের বন্ধুত্বের এই ছিল সূচনাকাল। ১৯০৮-এ চারুচন্দ্র যখন কলকাতায় 'ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস' নামে প্রসিদ্ধ বইয়ের দোকানের কাজে যোগ দেন, সেই সময়ে সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর ঘন ঘন দেখা সাক্ষাৎ হোতো। তখন দুই বন্ধু একসঙ্গে মেলা দেখেছেন, সাহিত্যপ্রসঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালিয়েছেন, চারুচন্দ্রের সঙ্গে প্রায়ই সন্ধ্যা ন'টা পর্যন্ত কাটিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ তখন বাড়ি ফিরেছেন। মাতৃভক্তি ছিল তাঁর চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। রাত ন'টার পরে বাড়ির বাইরে থাকা তাঁর মা পছন্দ করতেন না। এই সময়ের কথা-প্রসঙ্গে চারুচন্দ্র লিখে গেছেন—

> চিড়িয়াখানা, জাদুঘর, বোটানিকাল গার্ডেন, পরেশনাথের মন্দির, বায়স্কোপ, ফেরি-ষ্টিমারে উত্তরে শিবুতলা ও দক্ষিণে রাজগঞ্জ আমাদের ভ্রমণ পর্য্যায়ের অন্তর্গত ছিল··· কলকাতায় কবে কোন্ মেলা হবে সত্যেন্দ্র জানতেন।

১৯০৭-এর ১২ই অক্টোবর তাঁর চতুর্থ কবিতার বই 'হোমশিখা' ছাপা হয়। 'হোমশিখা'র পরে ১৯০৮-এর ২০-এ সেপ্টেম্বর বেরুলো পঞ্চম বই 'তীর্থসলিল'।

'তীর্থসলিল'-এর প্রায় তিরিশটি কবিতা প্রথমে ছাপা হয় সুরেশ সমাজ-পতির 'সাহিত্য' পত্রিকাতে। তার পরেও দীর্ঘকাল 'সাহিত্যের' সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল অক্ষুণ্ণ। 'ভারতী' এবং 'প্রবাসী'র সঙ্গেও ক্রমশ তাঁর সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়। ১৯১০-এর ১৯-এ সেপ্টেম্বর তাঁর ষষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ 'তীর্থরেণু' প্রকাশিত হোলো। 'ভারতী' এবং প্রবাসী'তে ছাপা তাঁর অনেকগুলি

১১। 'সত্যেন্দ্র পরিচয়' : চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—প্রবাসী, শ্রাবণ, ১৩২৯।

কবিতা সে-বইয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। 'তীর্থসলিল'-এর ভূমিকার মধ্যে তিনি লিখেছিলেন—

> 'তীর্থসলিল' জগতের সমস্ত সাহিত্য-মহাপীঠ হইতে বিন্দু বিন্দু করিয়া সংগৃহীত হইয়াছে। এই পুস্তকে প্রকাশিত সমস্ত কবিতাই নানা দেশের, বিভিন্ন যুগের বিচিত্র কবিতার পদ্যানুবাদ ; ক্ষেত্রবিশেষে অনুবাদের অনুবাদ।...বিশ্বমানবের নানা বেশ, নানা মূর্তি ও নানা ভাবের সহিত পরিচয় সাধনই এই গ্রন্থ প্রচারের প্রধান উদ্দেশ্য।

সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর কিশোরকাল থেকেই 'বিশ্বমানবের নানা বেশ' ও 'নানা ভাবে'র পরিচয় সংগ্রহের সাধনা আরম্ভ করেছিলেন। তাঁর বয়স যখন তিরিশের কাছাকাছি, সেই সময়কার অভিজ্ঞতা স্মরণ করে অমলচন্দ্র হোম লিখেছিলেন—

> একটি ভদ্রলোক, বয়স ত্রিশের কাছাকাছি, সাদাসিদা পোষাক, চোখে চশমা, বই দেখছেন কিংবা কিনছেন। একদিন দেখলাম তিনি মূল ফরাসী ভাষায় মোলেয়ারের এক সেট্ নাটক কিনে মুটের মাথায় চাপাচ্ছেন। আর একদিন দেখলাম Thiers-এর History of the French Revolution-এর ক' ভল্যুম কিনলেন। আরও একদিন দেখলাম থলিলের দোকান থেকে পুরানো কয়েকখানা Monist কাগজ ও একটা কি ফার্সী বই কিনে নিয়ে বের হচ্ছেন।[১২]

উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে মাদ্রাজে বসে মধুসূদন দত্ত যেমন অধ্যবসায়ের সঙ্গে সাহিত্য চর্চা করেছিলেন,— বাংলা কবিতার সমৃদ্ধি সাধনের আদর্শ মনে রেখে বিশ শতকের প্রথম দু'দশকে সত্যেন্দ্রনাথও তেমনি বিশ্ব-সাহিত্যের নানান অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে তাঁর অভিজ্ঞতা বাড়িয়েছিলেন।

'সবিতা' পর্যন্ত গেছে তাঁর কবিত্বের উন্মেষকাল। তারপর, ১৯০১ থেকে ১৯১০ অবধি দশ বছরের মধ্যে একে একে তাঁর 'সন্ধিক্ষণ', 'বেণু ও বীণা' 'হোমশিখা', 'তীর্থসলিল' এবং 'তীর্থরেণু' প্রকাশিত হয়েছে। সেই পর্বের দ্বিতীয় বই 'বেণু ও বীণা' উৎসর্গ করা হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের নামে। রবীন্দ্রনাথের ধ্যান-ধারণার দিকে তাঁর আগ্রহের লক্ষণ তখন থেকেই বেশ স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে। তাঁর নিজের নিজস্ব অভিরুচি কোন্ ধারায় কী ভাবে যে আত্মপ্রকাশ করবে,—তার নিশ্চিত নির্দেশ পাওয়া গিয়েছিল সেই পর্বেরই নানান্ রচনায়। তাঁর ছন্দোদক্ষতা এবং অনুবাদসামর্থ্যের কথা

১২। 'সত্যেন্দ্রস্মৃতি' : ভারতবর্ষ, ভাদ্র, ১৩২৯। (কলকাতার অ্যালবার্ট হলের নীচে এক পুরোনো বইয়ের দোকানের ঘটনা)।

('তীর্থসলিল' এবং 'তীর্থরেণু' দুখানিই অনুবাদ-কবিতার সংগ্রহ) তখন পাঠক-সমাজে ছড়িয়ে পড়েছে। 'সাহিত্য' পত্রিকার আশ্রয় তো রইলই, তাছাড়া 'প্রবাসী' এবং 'ভারতী',—সেকালের এই দুটি প্রসিদ্ধ মাসিক পত্রিকায় এই ১৯০১ থেকে ১৯১০-এর মধ্যেই তিনি নিয়মিত ভাবে লিখতে আরম্ভ করলেন। সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁর বিশিষ্ট বন্ধুদের মধ্যে যতীন্দ্রমোহন বাগচী, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, 'প্রবাসী'-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এবং তাঁর কাব্যসাধনায় নিত্য-সহায়ক রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এই সময়েই তাঁর ব্যক্তিগত পরিচয়ের ভিৎ শক্ত হয়।

১৯১০ থেকে তাঁর কবি-জীবনের 'সমৃদ্ধি'-পর্বের সূচনা। কোনো বড় পরিবর্তন,—বিশেষ কোনো উত্থান-পতন অথবা অদৃষ্টের চাঞ্চল্যকর কোনো লালন বা বঞ্চনার ব্যাপার তাঁর জীবনে ঘটেনি। প্রধানত কলকাতার নাগরিক পরিবেশের মধ্যেই প্রতিদিনের মসৃণ জীবনযাত্রার আনুকূল্য পেয়েছিলেন তিনি। অন্তরঙ্গ বিদ্বজ্জনের বন্ধুত্ব,—জগতের নানা বিদ্যার অক্লান্ত অনুশীলন,—রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা,—সত্য ও ন্যায়ধর্মের ভিত্তিতে দেশপ্রেমের উপলব্ধি—এই ছিল সত্যেন্দ্রনাথের জীবনের প্রধান প্রধান দিক। এই সুশৃঙ্খল, সুমার্জিত, নিরন্তর ভব্যতার ধারায় ক্বচিৎ দু'একটি চাঞ্চল্যকর তরঙ্গের আলোড়ন ঘটে গেছে। রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলালের পরস্পর-বিরোধী দুই ভক্তদলের তর্ক-বিতর্ক তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে এমনি এক চাঞ্চল্য ঘটিয়েছিল। অন্যথা, তিনি ছিলেন শান্ত ভাবের ভাবুক। তা'বলে হৃত্তাপহীন নাতিশীতোষ্ণ, কোনো অবরোধের মধ্যেই তিনি যে অবিরত স্বেচ্ছানির্বাসিত ছিলেন, তাও নয়! ১৯১৭-১৮ সালে 'নবকুমার কবিরত্ন'-ছদ্মনামে তাঁর গদ্যনিবন্ধ ও ব্যঙ্গ-কাব্য রচনার সূত্রপাত হয়। দেশপ্রেম,—নিপীড়িতের প্রতি সহানুভূতি,—ভারতীয় সংস্কৃতির বন্দনা ইত্যাদি বিষয়ে লেখা কবিতাবলীর মধ্যে তাঁর অন্তরানুভূতির বেশ উষ্ণ-মধুর, তিক্ত-কষায় স্পর্শ আছে! দাম্পত্য-জীবনে গভীর কোনো আসক্তি বা উৎসাহের প্রকাশ তাঁর রচনায় তেমন বেশি ঘটেনি বটে, কিন্তু পারিবারিক সুখ-দুঃখের অভিজ্ঞতা সেখানে অনুচ্চারিত থাকেনি। কালীচরণ মিত্রের বালিকা-কন্যা পুষ্পমালার মৃত্যু উপলক্ষে লেখা তাঁর তিনটি কবিতা 'কুহু ও কেকা'-তে স্থান পেয়েছে। এই লেখাগুলিতে প্রিয়-বিয়োগের আন্তরিকতার লক্ষণ

সন্দেহাতীত। আবার উপযুক্ত ক্ষেত্রে গদ্যে পদ্যে তাঁর উষ্মার অভিব্যক্তিও বিরল ছিল না। ১৩২৩ সালের ভাদ্রের 'ভারতী'তে 'নবকুমার কবিরত্ন' মন্তব্য করেছিলেন—

> গ্যালো ব'শেখের 'সাহিত্য-সংহিতা'য় কাশিমবাজারের খেতাবী মহারাজের স্বাক্ষরে বে-কায়দা চিত্তবিক্ষেপের একটি অপূর্ব নমুনা ছাপা হয়েছে। রচনাটির নাম 'সভাপতির অভিভাষণ'। তা, না হয়ে 'আনাড়ির অভিভাষণ' হলেই হত।

গদ্যে, পদ্যে, স্বনামে, ছদ্মনামে,—কঠোর এবং কোমল দু'রকম ভঙ্গিতেই তাঁর লেখনীর তৎপরতা ছিল সুপরিচিত। শান্তস্বভাব কবিসত্তার মধ্যে শ্যেনদৃষ্টি সংস্কারকের অস্তিত্ব লক্ষ্য করে 'ভারতী'-পত্রিকা সে-সময়ে মন্তব্য করেছিলেন—

> বঙ্গভারতীর নবকুমারের জন্ম-পত্রিকায় দেখা গেল যে তিনি কখনো মন যোগাইতে পারিবেন না।[১৩]

অতঃপর ১৯১১-র ১২ই সেপ্টেম্বর তাঁর 'ফুলের ফসল' ছাপা হয়। 'ফুলের ফসল' রচনাকালের শেষ দিকে নরওয়ের ঔপন্যাসিক Jonas Lie-এর Livsslaven-উপন্যাসের ইংরেজি অনুবাদ অবলম্বনে তিনি 'জন্মদুঃখী রচনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন,—এবং ১৩১৮-র 'প্রবাসী'-তে (জ্যৈষ্ঠ-চৈত্র) ধারাবাহিক ভাবে তাঁর এই প্রথম দীর্ঘ গদ্য-রচনা প্রথম প্রকাশিত হয়। ঐ বছর ১০ই সেপ্টেম্বর, রাখীপূর্ণিমা-তিথিতে তাঁর অষ্টম কবিতার বই 'কুহু ও কেকা' ছাপা হয়। 'কুহু ও কেকা'র ভূমিকায় তিনি লিখেছিলেন—

> এই গ্রন্থের অল্প কয়েকটি কবিতা ভারতী, প্রবাসী, সাহিত্য, বঙ্গদর্শন এবং আরও দুই একখানি কাগজে ইতিপূর্বে প্রকাশিত হইয়াছে, বেশীর ভাগ নূতন।

'কুহু ও কেকা'র পরে ১৯১২-র ৫ই অক্টোবর 'চীনের ধূপ' নামে ৬৪ পৃষ্ঠার একখানি পুস্তিকায় 'চীনদেশের ঋষি ও মনীষীদের ভাব-স্ফুট'—এবং পরের বছর ১৯১৩-র ৫ই ফেব্রুয়ারি তাঁর 'রঙ্গমল্লী' অনুবাদ-নাটকের সংকলনে ষ্টিফেন ফিলিপ্‌স, মেটারলিঙ্ক প্রভৃতির অনুবাদ ছাপা হয়। তারপর, ১৯১৪-র ২২-এ আগষ্ট তাঁর নবম কবিতার বই 'তুলির লিখন' এবং ১৯১৫-র ২৮-এ সেপ্টেম্বর দশম বই (অনুবাদ-কবিতার তৃতীয় সংগ্রহ) 'মণিমঞ্জুষা' বের হোলো।

১৯১৫ সালে রবীন্দ্রনাথ কাশ্মীর ভ্রমণ করেন। তাঁর সহযাত্রীদের মধ্যে ছিলেন রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রতিমা দেবী এবং সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। প্রথম বিশ্ব-

---

১৩। মাসকাবারী—'ভারতী': আশ্বিন, ১৩২৩ ; পৃঃ ৭১৪।

মহাসংগ্রাম তখন শুরু হয়েছে। কাশ্মীরে শ্রীনগরের নীচে বিতস্তা নদীর ওপর রাজার একখানি হাউস-বোটে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন রাজ-অতিথি। প্রভাতকুমারের 'রবীন্দ্র-জীবনী' থেকে জানা যায়—'তিনি মার্তণ্ডের সূর্যমন্দির একবার দেখিতে যান ; তা ছাড়া শ্রীনগরের বাহিরে আর কোথাও যান নাই।'

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং যতীন্দ্রমোহন বাগচীর সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠতার কথা বলা হয়েছে। ক্রমশ 'ভারতী' পত্রিকার কর্ণধার মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গেও তাঁর বন্ধুত্ব হয়। রবীন্দ্রনাথের তরুণ অনুরাগী সতীশচন্দ্র রায় এবং অজিতকুমার চক্রবর্তীর সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল। বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রমের শিক্ষক ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ছিলেন তাঁর বিশিষ্ট বন্ধুদের অন্যতম। 'বেণু ও বীণা'-র পরের বই 'হোম শিখা' (১৯০৭) প্রকাশের বছরে ধীরেন্দ্রনাথের কাছে সত্যেন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—

> এইমাত্র পূজনীয় জ্যোতিরিন্দ্র বাবুর পত্র পাইলাম। পত্র পড়িয়া আনন্দিত যে হইয়াছি তাহা বোধ হয় লিখিয়া জানাইতে হইবে না। তিনি লিখিয়াছেন,—"হোমশিখা" পাঠ করিয়া পরম আনন্দলাভ করিলাম। নামটি সার্থক হইয়াছে…"
>
> …এই ফাল্গুনের প্রথম দিনে তুমি পূজনীয় রবীন্দ্রবাবুর 'বসন্ত যাপন' মর্মে মর্মে অনুভব করিবে এবং বোলপুরের শাল এবং মহুয়া গাছের আকস্মিক কিশলয় এবং মুকুল অঙ্কুরিত হওয়া প্রত্যক্ষ করিয়া কল্পনাকে বাস্তবের সঙ্গে মিলাইয়া লইতে সক্ষম হবে সন্দেহ নাই।…[১৪]

এই চিঠির তারিখ,—মাঘ সংক্রান্তি ১৩১৪।

১৩১৩ থেকে ১৩১৬ সালের (১৯০৬-১৯০৮) মধ্যে রবীন্দ্রনাথ আর দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিদ্বন্দ্বী দুটি দলের কথা আগেই বলা হয়েছে। এই দুর্ঘটনার ইতিহাস শুরু হয় ১৯০৪-এর সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশিত হরিমোহন-মুখোপাধ্যায়ের 'বঙ্গভাষার লেখক'-এ রবীন্দ্রনাথের প্রথম আত্মজীবনীমূলক রচনাটি উপলক্ষ করে। দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনচরিতকার দেবকুমার রায়চৌধুরী তাঁর বইয়ের ৪৭৫-৪৭৭ পৃষ্ঠায় এই ঘটনা সম্বন্ধে যে আলোচনা করেছেন, তা থেকে জানা যায় যে, রবীন্দ্রনাথের আত্মজীবনী পড়ে দ্বিজেন্দ্রলাল 'অভাবিতরূপে বিরক্ত, উত্যক্ত ও উত্তেজিত' হয়েছিলেন। কবি হিসেবে তিনি 'Divine Inspiration' ('ঐশ্বরিক অনুপ্রেরণা') দাবি করেছিলেন বলেই নাকি দ্বিজেন্দ্রলাল 'উত্যক্ত' বোধ করেন!

১৪। প্রবাসী, ১৩৪৯।

তৎসত্ত্বেও ১৩১১-র ৮ই চৈত্র (২১-এ মার্চ, ১৯০৫) দ্বিজেন্দ্রলালের কলকাতার বাড়িতে 'পূর্ণিমা মিলনের' প্রথম যে বৈঠক বসে, তাতে রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত ছিলেন। প্রভাতকুমার লিখেছেন—'দ্বিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্রনাথকে মুঠো মুঠো ফাগ দিয়া রঞ্জিত করিয়া দিলেন।' এই অধিবেশনে তিনি 'সে যে আমার জননীরে' গানটি স্বয়ং গান করেছিলেন। এই ঘটনার পরে ১৩১৩ সালের বৈশাখ মাসে বরিশালে প্রাদেশিক-সমিতির যে অধিবেশন হয়, তাতে সাহিত্য-সম্মেলনের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। 'বঙ্গবাসী'-তে এবং অন্যান্য কাগজে এই নির্বাচন সম্পর্কে অসন্তোষ প্রকাশিত হয়েছিল। তখন লাখুটিয়ার জমিদার ও সাহিত্যসেবী,—এবং উত্তরকালে তাঁরই জীবনীলেখক দেবকুমার রায়চৌধুরীকে দ্বিজেন্দ্রলাল এক চিঠিতে জানিয়েছিলেন—

> …শিবনাথ শাস্ত্রী, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, চন্দ্রনাথ বসু অথবা নবীনচন্দ্র সেনকে রবিবাবুর আগে সভাপতি করা উচিত। তিনি যতবড় সাহিত্যিকই হৌন না, ইঁহাদের অপেক্ষা তাঁহার বয়স অল্প। সুতরাং ইঁহাদের দাবীকে অগ্রগণ্য না করায় আমার মতে অবিবেচনা ও অকৃতজ্ঞতার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে।১৫

অতঃপর, ১৯০৬-এর জুলাই মাসে (আষাঢ় ১৩১৩) দ্বিজেন্দ্রলাল গয়ায় বদলি হলেন। সে-সময়ে রবীন্দ্রনাথের বন্ধু সাহিত্য-রসিক লোকেন্দ্র পালিত ছিলেন গয়ার জেলা-জজ। তাঁর সঙ্গে কথায় কথায় দ্বিজেন্দ্রলাল প্রকাশ্যভাবে রবীন্দ্রনাথের নিন্দা আরম্ভ করেন। গয়া থেকে লেখা এই সময়ের এক চিঠিতে দেবকুমারকে দ্বিজেন্দ্রলাল জানিয়েছিলেন—

> এতদিন চুপ করিয়াছিলাম, স্পষ্ট হাতে কলমে রবিবাবুর বিপক্ষে কোন কথা বলিনি। কিন্তু ক্রমে যেরূপ দেখা যাচ্ছে, রবিবাবুর এই সব অন্ধ স্তাবক এবং অনুকারকদের মধ্যে তাঁর দোষগুলির বড়ই বেশী প্রতিপত্তি বেড়ে চল্‌ল এবং রবিবাবুর-প্রতিভার যে রকম দুর্দম্য প্রতাপ তাতে নিশ্চয়ই পরিণামে এসব দোষ আমাদের সাহিত্যে অধিকাংশ নবীন লেখকদের মধ্যে অল্পাধিক সংক্রামিত হয়ে পড়বে।১৬

বাংলা ১৩১৩ সালে রবীন্দ্রনাথ 'বঙ্গদর্শনে'র সম্পাদনাভার পরিত্যাগ করেন। সেই বছর শ্রাবণ সংখ্যার 'বঙ্গদর্শনে' 'কাব্যের প্রকাশ' নামে যে লেখাটি ছাপা হয়, তারই নিন্দাসূত্রে মূল রচনার আসল প্রসঙ্গ অতিক্রম করে

১৫। 'দ্বিজেন্দ্রলাল' : দেবকুমার রায়চৌধুরী, পৃঃ ৫১২।

১৬। 'দ্বিজেন্দ্রলাল' : দেবকুমার রায়চৌধুরী, পৃঃ ৫৬৭-৬৮।

দ্বিজেন্দ্রলাল ১৩১৩-র কার্তিকের 'প্রবাসী'তে রবীন্দ্রকাব্যের অস্পষ্টতা সম্পর্কে আলোচনা করলেন। 'সোনার তরী' সম্পর্কে তিনি লিখলেন—'এ কবিতাটি দুর্বোধ্যও নয়, অবোধ্যও নয়—একেবারে অর্থশূন্য স্ববিরোধী…।'

সুরেশচন্দ্র সমাজপতির 'সাহিত্য' পত্রিকাটি ছিল সে-সময়ের রবীন্দ্র-বিরোধী আলোচনার প্রধান মুখপত্র। এই পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' সম্বন্ধে কটাক্ষপাত করে দ্বিজেন্দ্রলাল 'পান খাইয়া যাও বঁধু পান খাইয়া যাও'—এই গ্রাম্য গানের ব্যঙ্গ-ব্যাখ্যা লিখেছিলেন। ১৩১৬ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার 'সাহিত্য' পত্রিকায় 'কাব্যে নীতি' নামে দ্বিজেন্দ্রলাল যে-প্রবন্ধটি লিখেছিলেন, তাতে 'দুর্নীতি'র দৃষ্টান্ত হিসেবে রবীন্দ্রনাথের রচনা থেকে অংশ তুলে দেখানো হয়েছিল। 'চিত্রাঙ্গদা' নাট্যকাব্য সম্পর্কেও দ্বিজেন্দ্রলালই প্রথম প্রবলভাবে অশ্লীলতার অভিযোগ প্রচার করেন।

এই বিরোধের ফলে উভয় পক্ষেই পৃথক্ পৃথক্-সমর্থক গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল। বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথ নিজে কোনো কটূক্তি প্রকাশ করেন নি।

অবশেষে, 'আনন্দ-বিদায়'-এর[১৭] ব্যর্থতা লক্ষ্য করেই দ্বিজেন্দ্রলালের সমর্থকরা বোধ হয় এই ব্যাপারে ক্ষান্ত হয়েছিলেন। এই ইতিহাসের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত, অর্থাৎ,—১৯০৪-এ 'বঙ্গভাষার লেখক' প্রকাশিত হবার সময় থেকে ১৯১২-র 'আনন্দ বিদায়' অভিনয়-প্রচেষ্টা অবধি সকল ঘটনাই সত্যেন্দ্রনাথ লক্ষ্য করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশপূর্তি উপলক্ষে ১৯১২-র ২৮-এ জানুয়ারী (১৪ই মাঘ, ১৩১৮) কলকাতার টাউন হলে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ থেকে যে সভা

১৭। 'আনন্দ-বিদায়' প্রথমে (১৯০২ ?) সংক্ষিপ্তরূপে 'বঙ্গবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল পরে পুস্তিকা-আকারে পরিবর্দ্ধিত হয় (১৯১২)। লেখক বইটিকে প্যারডি বলিয়াছেন, কিন্তু আসলে ইহা তীব্র ব্যক্তিগত স্যাটায়ার। রচনাটি বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়ের 'নন্দবিদায়'-এর ব্যঙ্গ অনুকৃতি। প্রথমে ইহার ব্যঙ্গের উদ্দেশ্য ছিল কড়ি ও কোমল। পরিবর্দ্ধনের সময়ে রবীন্দ্রনাথের প্রতি দ্বিজেন্দ্রলাল ঘোরতর বিদ্বিষ্ট হইয়া উঠিয়াছিলেন। পরিবর্দ্ধিত আনন্দ-বিদায়ে সেই বিদ্বেষ-বিষ পুরামাত্রায় উদ্গীর্ণ হইয়াছে। বইটি 'ষ্টার' থিয়েটারে অভিনয়ের কালে শিক্ষিত দর্শক উত্তেজিত হইয়া উঠে এবং অভিনয় ভাঙিয়া যায়। মোটের উপর 'আনন্দ-বিদায়' দ্বিজেন্দ্রলালের অক্ষমতম রচনা।'—'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' (দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃঃ ২৯৭-৯৮) : সুকুমার সেন।

হয়, সেই অনুষ্ঠানের কথাও এই সূত্রে স্মরণীয়। পরিষদের পক্ষ থেকে অভিনন্দন পড়ে শুনিয়েছিলেন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। সত্যেন্দ্রনাথের বন্ধু চারুচন্দ্র লিখেছেন—

> সত্যেন্দ্র রবীন্দ্র-সম্বর্দ্ধনা ঘটিয়ে তুলে আমাদের দেশের বিশেষ করে সাহিত্য পরিষদের মুখরক্ষা করেছিলেন। তা না হলে য়ুরোপ নোবেল-প্রাইজ দিয়ে ভারতের যে অপমান করত তাতে আর লোকালয়ে মুখ দেখাবার জো থাকত না। ১৮

এই সময়ে 'বঙ্গদর্শন'; 'সাহিত্য' এবং 'প্রবাসী'—এই তিনখানি সাহিত্য-পত্রের আলাদা আলাদা গোষ্ঠী ছাড়া কলকাতায় 'মানসী' এবং 'ভারতী' পত্রিকারও গোষ্ঠী ছিল। 'মানসী'র সম্পাদকমণ্ডলীর মধ্যে ছিলেন ফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচী। চৌরঙ্গী অঞ্চলে হপ্‌সিং (Hopsing) কোম্পানির দোকানবাড়ির একখানি ছোট ঘরে 'মানসী' পত্রিকার আপিস ছিল। প্রধানত মণিলাল-সৌরীন্দ্রমোহনের 'ভারতী'র সঙ্গেই সত্যেন্দ্রনাথের যোগ ছিল। তবে, মাঝে মাঝে 'মানসী' আপিসেও তিনি যেতেন। তখন 'ভারতী' দলের বৈঠক বসতো সুকিয়া ষ্ট্রীটে (বর্তমান কৈলাস বসু ষ্ট্রীট)। এই দলের সদস্য ছিলেন সৌরীন্দ্রমোহন, মণিলাল, চারুচন্দ্র, সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী, হেমেন্দ্রকুমার রায়, সত্যেন্দ্রনাথ এবং আরো কেউ কেউ। 'মানসী' এবং 'ভারতী' ছাড়া সমকালীন তৃতীয় সাহিত্যিক মজলিশের জায়গা ছিল 'যমুনা' আপিস। ফণীন্দ্রনাথ পাল ছিলেন 'যমুনা'র সম্পাদক। পরে 'মানসী'-র অন্যতম কর্ণধার যতীন্দ্রমোহন বাগচী ফণীন্দ্রনাথের সঙ্গে 'যমুনা'-সম্পাদনায় যোগ দিয়েছিলেন। 'প্রবাসী', 'ভারতী', 'মানসী', এই তিন পত্রিকারই লেখকগোষ্ঠী ছিলেন রবীন্দ্রনাথের অনুরাগী। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় পরিহাস করে বলতেন—'রবীন্দ্রনাথের দুইটি she, এক প্রবা-সী আর দুই···মান-সী।'[১৯] যতীন্দ্রমোহন বাগচী লিখেছিলেন—

> এই সময়ে আমাদের অনামিকা গৃহসভায় একদিন কথা উঠিল,—কবি পঞ্চাশ বৎসরে পদার্পণ করিবেন. এই উপলক্ষে তাঁহার শুভ শতায়ু কামনা করিয়া আমাদের শ্রদ্ধানিবেদনকল্পে একটি প্রকাণ্ড সম্বর্দ্ধনা করিতে হইবে।···

১৮। প্রবাসী : শ্রাবণ, ১৩২৯।

১৯। 'রবীন্দ্রনাথ ও যুগসাহিত্য' : যতীন্দ্রমোহন বাগচী, পৃঃ ৩২।

…চাঁদা সংগ্রহে বাহির হইয়া প্রথমেই মহাপ্রাণ দানবীর চিত্তরঞ্জন দাশের কথা মনে পড়িল। মণিলাল ও আমি তাঁহার সুপরিচিত ছিলাম। সত্যেন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া তাঁহারই কাছে আমাদের প্রথম অভিযান। ২০

চিত্তরঞ্জন, নাটোরের মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ রায়, স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বিচারপতি সারদাচরণ মিত্র, টাকির যতীন্দ্র চৌধুরী, সাহিত্য-পরিষদের প্রধান প্ররিচালক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, কাশিমবাজারের মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী প্রভৃতির উদ্যমে কলকাতার টাউনহলে ১৯১২-র ২৮-এ জানুয়ারি (১৪ই মাঘ, ১৩১৮) এই সভার অধিবেশন হয়। 'প্রবাসী'-তে এই সভার বিষয়ে লেখা হয়েছিল—

টাউন হলে এই উপলক্ষে এরূপ জনতা হইয়াছিল যে যাঁহারা অল্পমাত্র বিলম্বে গিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ প্রবেশ করিতে না পারিয়া বাহিরে দাঁড়াইয়াছিলেন, কিম্বা ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। সভাস্থলে আবালবৃদ্ধবনিতা সর্ব্বশ্রেণীর লোক উপস্থিত ছিলেন। ২১

এই সভায় যতীন্দ্রমোহন বাগচীর 'বাণীবরতনয় আজি স্বাগত সভামাঝে' গানটি অভ্যর্থনা-সংগীতরূপে গাওয়া হয়। রামেন্দ্রসুন্দরের লেখা মানপত্র, গজদন্তের পুঁথিতে সত্যেন্দ্রনাথের কবিতা এবং তাছাড়া যতীন্দ্রমোহনের কবিপ্রশস্তিমূলক একটি রচনা কবিকে উপহার দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানের অল্প কয়েকদিন পরে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই ভক্ত-মণ্ডলীকে নিমন্ত্রণ করলেন।[২২] সে-বিষয়ে যতীন্দ্রমোহন লিখেছেন—

দোতলার সিঁড়িতে উঠিতেই শুনিতে পাইলাম, কবিকণ্ঠে গান চলিতেছে। কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র কানে আসিল—"এখনও তারে চোখে দেখিনি, শুধু কাশি শুনেছি" এবং সমবেত বন্ধুগণ আমাকে দেখিয়াই একসঙ্গে উচ্চস্বরে হাসিয়া উঠিলেন; সত্যেন্দ্র আমার বিস্মিত নেত্রে জিজ্ঞাসুভাব দেখিয়া বলিলেন 'সিঁড়িতে তোমার কাশির শব্দ শুনিয়াই কবি তোমাকে চিনিয়াছেন, তাই 'বাঁশির' স্থানে 'কাশি' আসিয়াছে। ২৩

২০। ঐ, পৃঃ ৩৭-৩৮।

২১। প্রবাসী : ফাল্গুন, ১৩১৮; পৃঃ ৫১১।

২২। যতীমোহন বাগচী, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত—এই সাতজন ভক্ত।

২৩। 'রবীন্দ্রনাথ ও যুগ সাহিত্য' : পৃঃ ৪৫।

১৯১০-এ 'তীর্থরেণু' প্রকাশের সময় থেকে ১৯১৫ সালের 'মণিমঞ্জুষা' পর্যন্ত পাঁচ বছরের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা বেড়েছিল। ১৯০৬ সালে রবীন্দ্রনাথের নামে 'বেণু ও বীণা' উৎসর্গের সময় থেকেই ছাপার হরপে তাঁর রবীন্দ্রানুরাগের স্বীকৃতি পাওয়া যাচ্ছে। তারও আগে সতীশচন্দ্র রায় এবং অজিতকুমার চক্রবর্তীর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয়েছে। ১৯১২-তে টাউন-হলের পূর্বোক্ত অভিনন্দন-সভায় তাঁকে রবীন্দ্র-ভক্তদের কেন্দ্রবর্তী কবি হিসেবে দেখা গেল। ১৯১১ সালের কয়েকটি কবিতায় ('কুহু ও কেকা'য় প্রকাশিত দার্জিলিং, বারাণসী ইত্যাদি) দেশভ্রমণের অভিজ্ঞতা রয়েছে। ১৯১২-তে প্রকাশিত 'কুহু ও কেকা'র একটি কবিতায় এবং ১৯১৪-সালের 'তুলির লিখন'-এর (বাংলা ১৩১৬ সালে এই কবিতাগুলি লেখা হয়) ভূমিকায় তাঁর চোখের অসুখের উল্লেখ আছে। ইংরেজি ১৯০৯-১০ সালে চোখের অসুস্থতায় তিনি বিশেষ পীড়িত ছিলেন। তারপর ১৯১৫-তে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেই তিনি কাশ্মীর ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন।

১৯১৬-র ১৬ই মার্চ 'অভ্র-আবীর' (বাসন্তীপূর্ণিমা, ১৩২২) প্রকাশিত হয়। পরের বছর, ১৯১৭-র জানুয়ারি মাসে 'হসন্তিকা' বইখানিতে (পৌষপার্বণ, ১৩২৩) তাঁর কিছু ব্যঙ্গ-কবিতা ছাপা হোলো। সে বইয়ের পুরোভাগে ছাপা হোলো: "শ্রীনবকুমার কবিরত্ন কর্তৃক প্রজ্বলিত ও সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত-দ্বারা ফুৎকৃত।"

তাঁর কবিতার বই 'কুহু ও কেকা' এবং গদ্যরচনা 'জন্মদুঃখী' ও 'চীনের ধূপ' যখন প্রথম ছাপা হয়, সেই ১৩১৯ বঙ্গাব্দে (২রা মাঘ) লেখা একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ সত্যেন্দ্রনাথকে সাহিত্য-সমালোচনার কাজে নামবার পরামর্শ দিয়েছিলেন। তাঁর সেই চিঠিখানি স্মরণীয়:

> কল্যাণীয়েষু
>
> সত্যেন্দ্র, তুমি ঠিক বলেছ। আমাদের দেশের রসের কারবার বড় ছোট নিতান্ত মুদির দোকানের ব্যাপার। ছোট ছোট শালপাতার ঠোঙার বন্দোবস্ত। সমালোচনার ভঙ্গী দেখলেই সেটি বোঝা যায়—নিতান্ত গেঁয়ো রকমের। সমালোচকরা সাহিত্য-কারবারীদের মুচ্ছদ্দি—তাদের নিজের পুঁজিপাটা থাকা চাই। এবং জগতের বাজার যাচাই করবার মতো অভিজ্ঞতা ও শক্তি না থাকলে তাদের চলে না। আমাদের মূলধন কেবল, আমার কি ভাল লাগে এবং না লাগে সেইটুকু। সেটুর মূল্য কেবলমাত্র আমাদের ঘরের পাঁচ দশজনের কাছে, কিন্তু বড়বাজারে সে টাকা একেবারেই চলে না—এই দৈন্যটি বোঝাবার পর্য্যন্ত শক্তি আমাদের নেই!

তাইত আমি অনেকদিন থেকে তোমাকে বলচি, মাঝে মাঝে সমালোচনার ক্ষেত্রে নাব না কেন? কাব্যকে সাহিত্যিকে একটা বিশ্বভূমিকার উপর দাঁড় করিয়ে দেখাও না কেন? যে কবি সেই ত স্রষ্টা এবং অন্যকে দেখিয়ে দেবার ভার ত তারই।—'প্রভৃতি কাগজের সমালোচনা দেখলে আমার বড় কষ্ট বোধ হয়। এ সমালোচনা ত সাহিত্য-পথের মশাল নয়, এ কেবল চকমকি ঠোকা—ছোট্ট ছোট্ট স্ফুলিঙ্গ কিন্তু তার খটাখট শব্দটাই বেশী। এতে কি পথিকদের কোনো সুবিধা হয়? ইতি—২ মাঘ, ১৩১৯।

স্নেহানুরক্ত

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ২৪

১৩২৯ সালের শ্রাবণ সংখ্যার 'ভারতী' পত্রিকায় 'সত্যেন্দ্র স্মরণে' প্রবন্ধে সত্যেন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ বন্ধু সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় লিখেছিলেন যে, ১৩১৮-১৯ সালের কাছাকাছি 'সময়টায় কবির লেখনীর আর বিরাম ছিল না। নিত্য নব ছন্দে নূতন গান বাঙালীকে তিনি শুনাইয়াছেন। এই সময়েই বাহির হয় তাঁহার 'ফুলের ফসল'।'

রবীন্দ্রনাথের কাছে উৎসাহ পেয়ে 'নবকুমার কবিরত্ন' ছদ্মনামে তিনি সাহিত্যচিন্তানিষ্ঠ গদ্য রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। ১৩২৩ সালের 'ভারতী'-তে প্রকাশিত এই শ্রেণীর একটি লেখাতে ('অতি পাণ্ডিত্যের উপদ্রব') সাহিত্য-সমালোচকদের উদ্দেশে তিনি সতর্কবাণী ঘোষণা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, প্রমথ চৌধুরী, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, বিপিনচন্দ্র পাল, নলিনীকান্ত গুপ্ত, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাধাকমল মুখোপাধ্যায়,—এঁদেরই এক পাশে নবাগত 'নবকুমার' তাঁর আসন অধিকার করলেন। অন্যান্য প্রবন্ধ-লেখকের সংখ্যাও সে-সময়ে কম ছিলো না। 'অতি-পাণ্ডিত্যের উপদ্রব' প্রবন্ধে নবকুমার লিখেছিলেন—

যাঁদের বিদ্যাবুদ্ধি চোপা-রকমের, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁদের রসবোধ ভোঁতা, আবার যাঁদের উপলব্ধি করবার সবিশেষ শক্তি আছে, তাঁদের হয়তো বিচক্ষণা নেই। তাই চণ্ডীদাস বলেছেন—

রসিক রসিক সবাই কহয়ে
কেহ ত রসিক নয়,
ভাবিয়া গণিয়া বুঝিয়া দেখিলে
কোটিতে গোটিক হয়।

২৪। বিচিত্রা, চৈত্র, ১৩৩৭

১৩১৮-১৯ থেকে শুরু করে ১৩২৯-এ তাঁর মৃত্যুকাল অবধি সত্যেন্দ্রনাথের কবিজীবনের কর্মভূয়িষ্ঠ পর্ব। দার্জিলিং, কাশ্মীর প্রভৃতি দূর অঞ্চলে ভ্রমণ,—অক্লান্ত পাঠ ও রচনা,—Monday Club, Marigold Club প্রভৃতি সমিতিতে যোগদান,—হেদুয়া সন্তরণ-সমিতির পৃষ্ঠপোষকতা,—সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শিশিরকুমার ভাদুড়ী প্রভৃতির সাহচর্য-লাভ এবং আরো নানা কাজে তিনি তখন ব্যাপৃত ছিলেন। তাঁর জীবনে হৃদ্যতা আর বিরোধ,—আগ্রহ আর বিমুখতা,—শান্তি এবং সংঘর্ষ ইত্যাদি বিপরীতের ঢেউ এই সময়েই বিশেষভাবে দেখা দিয়েছিল। 'প্রবাসী'-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে প্রথম দিকে তাঁর প্রীতির সম্পর্ক ছিল। কিন্তু তাঁর একান্ত শ্রদ্ধার ধন মহাত্মা গান্ধীর বিরুদ্ধে রামানন্দ যখন সম্পাদকীয় কটাক্ষ করলেন, তখন আহত হয়ে সত্যেন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—

> দিনে দীপ জ্বালি ও রে ও খেয়ালী। কি লিখিস হিজিবিজি ?
> নগরের পথে রোল ওঠে শোন্ 'গান্ধিজী'! 'গান্ধিজী'!
> বাতায়নে দেখ্ কিসের কিরণ! নব জ্যোতিষ্ক জাগে!
> জন-সমুদ্রে ওঠে ঢেউ, কোন্ চন্দ্রের অনুরাগে!

'নবকুমার কবিরত্ন' ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথের প্রীতি-পক্ষপাত-কঠোর এই বিশেষ মনোভঙ্গিরই বাহক!

১৯১৭ সালে 'হসন্তিকা' ছাপা হবার প্রায় চার বছর পরে ১৯২১-এর মে মাসে ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং-হাউস থেকে যে 'বারোয়ারি' উপন্যাস ছাপা হয়, সে-বইখানির ২৯-৩২ পরিচ্ছেদের লেখক ছিলেন তিনিই। ১৯২০ সালে (বঙ্গাব্দ ১৩২৭) মাতুল-পরিবারের সঙ্গে তিনি যুক্তপ্রদেশের জৌনপুর ভ্রমণে যান; জৌনপুরে প্রায় এক মাস কাটিয়ে এবং সেখান থেকে অযোধ্যা, এলাহাবাদ ও ফয়জাবাদেও কিছুদিন বেড়িয়ে অবশেষে কলকাতায় ফিরে আসেন। জৌনপুর থেকে লখনউ-প্রবাসী কবিবন্ধু অতুলপ্রসাদ সেনকে তিনি জানিয়েছিলেন—

> কলিকাতা ফেলি দূরে এসেছি জোয়ানপুরে
> গোমতীর তীরে গেছি থামি।
> তবে ডেরা ডাণ্ডা তুলি লক্ষ্ণৌ-এ এল বুলবুলি
> ডাকাত পড়িবে তব ঘরে।

এই সূত্রে শ্রীমতী মমতা ঘোষ চিঠি লিখে জানিয়েছেন যে, সত্যেন্দ্রনাথ "ডাকাতির ভয় দেখিয়েছিলেন বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত যাওয়া হয়ে ওঠেনি। জৌনপুরে চামেলির ক্ষেত তাঁকে মুগ্ধ করেছিল,—এখানে তিনি অনেক কবিতা লিখেছিলেন। লাহোরেও তাঁকে একবার যেতে হয়েছিল চোখ দেখাবার জন্য।'

তাঁর শেষ দিকের গদ্যরচনার মধ্যে, তা—ছাড়া ১৩৩০ সালের আষাঢ় থেকে কার্তিক অবধি 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত অসমাপ্ত ঐতিহাসিক উপন্যাস 'ডঙ্কানিশান'-এর কথাও স্মরণীয়! 'ধূপের ধোঁয়ায়' নাটিকাটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় তাঁর মৃত্যুর কয়েকদিন পরে। 'কুহু ও কেকা', 'ফুলের ফসল'; 'অভ্র-আবীর' এবং 'হসন্তিকা'—এই চারখানিই তাঁর জীবিতকালের সর্বাধিক প্রসিদ্ধ কবিতার বই।

'হসন্তিকা'-র 'কাশ্মীরী কীর্তন' এবং 'কাশ্মীরী ভাষা' রচনা দু'টির প্রেরণা পাওয়া গিয়েছিল ১৯১৫-র কাশ্মীর ভ্রমণ থেকে। তবে এই কবিতাগুলির প্রেরণা প্রধানত বহিঃপ্রকৃতি-গত বলা চলে না,—সেগুলির উৎস ছিল মনুষ্যপ্রকৃতির ভাবনাতে; দ্বিজেন্দ্রলাল, চিত্তরঞ্জন ইত্যাদি প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের নানা আচরণ লক্ষ্য করে 'হসন্তিকা'র লেখক সেকালে খুবই তীক্ষ্ণ কটাক্ষ করেছিলেন। তাই ব্যক্তিগত প্রীতি-অপ্রীতির ভাব এ-বইয়ের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে। এই পর্বে তাঁর শারীরিক সুস্থতাও ক্রমশ ব্যাহত হচ্ছিল। চোখের অসুখ বেড়েছিল। তবু কাব্য-চর্চায় তিনি ছিলেন নিত্যব্রতী; এবং পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলী সম্পর্কেও তিনি ছিলেন সদাসচেতন। সেকালের ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে প্রতিদিনই তিনি কিছুক্ষণ কাটিয়ে আসতেন। জীবনের শেষ পর্ব পর্যন্ত নানা ভাষার কাব্যগ্রন্থ সংগ্রহের ঝোঁক তিনি বজায় রেখেছিলেন। আর্থিক ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণও এই পর্বে খুবই বেড়ে গিয়েছিল। পিতামহ অক্ষয়কুমারের সঞ্চিত বিত্তের তহবিল ক্রমশ শূন্য হয়ে আসছিল।

বাংলা ১৩২৯ সালের ১০ই আষাঢ় (২৫-এ জুন, ১৯২২) রাত্রি আড়াইটায় কলকাতার মসজিদ-বাড়ি স্ট্রীটের বাড়িতে জ্বর ও পৃষ্ঠব্রণ রোগে সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্মৃতিসভায় (১৯২২ জুলাই) যে কবিতাটি

পড়েছিলেন 'রবীন্দ্র-জীবনী'র লেখক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তারই উল্লেখ করে লিখেছেন—

> এই কবিতাটি যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা জানেন সত্যেন্দ্রনাথ কবির কি প্রিয় ছিলেন, কি গভীর স্নেহের বশে তিনি এইটি রচনা করেন। ২৫

কিরণধন চট্টোপাধ্যায় ছিলেন তাঁর ঘনিষ্ঠ অনুরাগীদেরই একজন। এ-সময়ে তিনি যে কবিতাটি লিখেছিলেন, তাতে প্রসঙ্গত 'ভারতী' মজলিসের একটি নির্ভরযোগ্য রেখাচিত্র ফুটেছিল। শেষ রোগশয্যায় সত্যেন্দ্রনাথকে যে বেশি দিন যন্ত্রণা ভোগ করতে হয় নি, তাঁর কবিতাটিতে সে-তথ্যেরও ইশারা আছে—

> এই সেদিনে, দেখে এলুম দিব্যি তোমায় সুস্থ সবল,
> আজকে হঠাৎ শুনি তুমি নাই!
> পরপারের ডাক এসেছে পাইনিকো তার একটু আভাষ,
> মনে মনে সন্দেহ হয় তাই—
> আবার যদি যাই কোনোদিন কর্মশ্রান্ত সন্ধ্যেবেলা
> 'ভারতী'র সেই উপর তলার ঘরে—
> হয়তো তোমায় দেখতে পাব, যেমনটি ঠিক ছিলে তেমন
> হাসচো হাসি, কইচ মৃদু স্বরে!
> বকচে 'বুড়ো'২৬ এটা-সেটা, হেমেন্দ্র ২৭ সে প্রুফ নিয়ে
> মণিলালের ২৮ উড়চে ধোঁয়া মুখে,
> সৌরীন্দ্র ২৯ খাচ্ছে হাওয়া, তক্তপোষের উপর আমি
> শুনচি কথা উপুড় হয়ে ঝুঁকে,...৩০

২৫। 'রবীন্দ্র-জীবনী'—১৯২২ খ্রীষ্টাব্দ দ্রষ্টব্য

২৬। প্রেমাঙ্কুর আতর্থী

২৭। হেমেন্দ্রকুমার রায়

২৮। মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় } 'ভারতী' সম্পাদক

২৯। সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় } 'ভারতী' সম্পাদক

৩০। 'নতুন খাতা ও অন্যান্য কবিতা' : হরপ্রসাদ মিত্র সম্পাদিত (পৃঃ ১০৯-১০) দ্রষ্টব্য।

দেশ-কাল

...'The year 1905 is one of the darkest and saddest in our annals relieved by the reflection that is witnessed in an upheaval of national life and awakening of national consciousness without parallel in our history. Lord Curzon has divided our province; he has sought to bring about the disintegration of our race, and to destroy the solidarity of our popular opinion. Has he succeeded in this novel endeavour? He has built better than he knew; he has laid broad and deep the foundations of our national life; he has stimulated those forces which contribute to the upbuilding of nations; he has made us a nation; and the most re-actionary of the Indian Viceroys will go down to posterity as the Architect of the Indian national life'. —Speeches : Surendranath Banerjee (1908) vol. vi ; pp 397-8.

সত্যেন্দ্রনাথের ছাপা বইয়ের কালানুক্রম হিসেবে 'বেণু ও বীণা'-র (১৯০৬) স্থান তৃতীয়। ১৩০৩ থেকে ১৩১৩ (১৮৯৩-১৯০৬) সালের মধ্যে সেই কবিতাগুলি লেখা হয়। বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর মন্তব্য দেখা যায় 'বেণু ও বীণার' 'জীবন-বন্যা', 'কোন্ দেশে', 'সন্ধিক্ষণ' 'হেমচন্দ্র', 'দুর্যোগ', 'বঙ্গজননী', 'স্বর্গাদপি গরীয়সী' এবং 'আশার কথা' এই আটটি কবিতায়। এই আটটির মধ্যে 'হেমচন্দ্র' কবিতায় বঙ্গদেশ এবং ভারতবর্ষ দুয়েরই উল্লেখ আছে। আর, এগুলির অতিরিক্ত 'দ্বিতীয় চন্দ্রমা' নামে আর-একটি কবিতায় তিনি জানিয়েছিলেন—

> স্বপনে দেখিনু রাতে, হে ভারত-ভূমি,
> সাগর-বেষ্টিতা অয়ি মর্ত্যের চন্দ্রমা
> কুহকী নিদ্রার বশে সংজ্ঞাহীন আমি,—
> শুনিনু মহিমা তব অয়ি বিশ্বরমা!

কার্জন-শাসিত বাংলাদেশের দুর্যোগের মধ্যে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দেখেছিলেন বাংলার জাতীয় জাগরণের উজ্জ্বল অভিব্যক্তি। আর, সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর 'সন্ধিক্ষণ' কবিতার শেষ স্তবকের শেষ ক'টি চরণে দেশবাসীকে পরামর্শ দিলেন—

> আত্মতেজে করি' ভর—
> কর্মে হও অগ্রসর!
> মূর্খ শুধু বলে এ 'হুজুগ';
> বঙ্গ-ইতিহাসে হের এল স্বর্ণ-যুগ!

'বেণু ও বীণা'র প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় গ্রন্থভুক্ত কবিতাগুলির নির্বাচন সম্পর্কে লেখক তাঁর "শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগ্‌চী এম-এ. শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চী বি-এ. এবং শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের নিকট যথেষ্ট সাহায্য" প্রাপ্তির জন্যে ঋণ স্বীকার করেছিলেন। 'একতারা'-র কবি দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ এবং শান্তিনিকেতনের শিক্ষক ধীরেন্দ্রনাথ,—তাঁর অন্তরঙ্গ এই দুটি বন্ধুই অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে মারা গিয়েছিলেন। সাহিত্যের ক্ষেত্রে বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনের 'স্বর্ণযুগ' সম্বন্ধে যতীন্দ্রমোহন লিখেছিলেন—

> বাঙ্গালার জেলায় জেলায়, গ্রামে গ্রামে, ঘরে ঘরে একই ধ্বনি, একই প্রতিধ্বনি —বাঙ্গালাকে খণ্ডিত হইতে দিব না। কবি সেদিন প্রবন্ধ পাঠে, বক্তৃতায়, গল্পে গানে একেবারে যেন পঞ্চমুখ হইয়া উঠিয়াছিলেন। প্রায় প্রত্যহই গান লিখিতেন এবং সেই গান—সেই 'সোনার বাঙ্‌লা',—'আজ বাঙ্‌লা দেশের হৃদয় হতে কখন আপনি, তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির হলে জননী,—'ওদের আঁখি যতই রক্ত হবে, মোদের আঁখি ফুটবে, ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে, মোদের বাঁধন টুটবে,'—'একলা চল, একলা চল রে',—'বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার-ফল,'—'আমরা পথে পথে যাব সারে সারে, আমরা গান গেয়ে ফিরিব দ্বারে দ্বারে'—প্রভৃতি গান পথে পথে ঘরে ঘরে ধ্বনিত, প্রতিধ্বনিত হইত।···কবির সেই অতন্দ্রিত দেশপ্রীতি,—সেই 'অত্যুক্তি,' 'স্বদেশী সমাজ,' 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম', 'কণ্ঠরোধ' প্রভৃতি প্রবন্ধে,—'শিবাজী,' 'গান্ধারীর আবেদন' প্রভৃতি কবিতায়,—'মেঘ ও রৌদ্র,' 'রাজটীকা' প্রভৃতি গল্পে এবং উল্লিখিত সঙ্গীত রচনায় দেশে দেশাত্মবোধের যেন বন্যা বহিয়া গিয়াছিল।[1]
>
> ···মনে আছে, পান্তির মাঠে শিবাজী উৎসব উপলক্ষে সভাপতি বালগঙ্গাধর তিলকের আবেগময় অভিভাষণে, রবীন্দ্রনাথের 'শিবাজী' কবিতাপাঠে, সুরেন্দ্রনাথ, হীরেন্দ্রনাথ ও বিপিনচন্দ্রের বক্তৃতায় বাঙ্গালীর যে আন্তরিক উৎসাহ ও অন্তর্বিকাশের অভিব্যক্তি দেখিয়াছিলাম, তাহার তুলনা হয় না।

জনমতের বিরুদ্ধে বঙ্গ-ভঙ্গের পরিকল্পনা গ্রহণ করার কিছু আগে থেকেই উত্তেজনার সূত্রপাত হয়। ১৮৯৯ সালের কলিকাতা-মিউনিসিপ্যালিটি-আইন এবং ১৯০৪ সালের ভারতীয়-বিশ্ববিদ্যালয়-আইন—এই ঘটনা দুটিকে কেন্দ্র করে সে সময়ে প্রবল উত্তেজনা দেখা দিয়েছিল। ১৯০৩ সালের ডিসেম্বর মাসের 'ক্যালকাটা গেজেটে' সরকার পক্ষ থেকে বাংলাদেশ দ্বিখণ্ডিত করবার প্রস্তাব ছাপা হয়। ১৯০৪ সালের প্রথম থেকেই (১৩১০-এর পৌষ) সারা বাংলায় এই প্রস্তাবের বিরোধিতা অঙ্কুরিত হতে থাকে। ১৯০৫-এর জুলাই মাসের

১। রবীন্দ্রনাথ ও যুগসাহিত্য, পৃঃ ২৭-২৮

প্রথম দিকে সংবাদপত্রে ঘোষণা করা হয় যে, ভারতসচিব বঙ্গভঙ্গ মঞ্জুর করেছেন। ঐ বছর ১৬ই অক্টোবর (৩০-এ আশ্বিন) বঙ্গচ্ছেদ ব্যবস্থা কার্যকরী বলে কর্তৃপক্ষ স্বীকার করে নিলেন এবং সেই ব্যবস্থা অনুসারে রাজসাহী, ঢাকা, চট্টগ্রাম বিভাগ, আর আসাম-সমেত 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম' প্রদেশ এবং প্রেসিডেন্সি ও বর্ধমান বিভাগ,—বিহার,—ছোটনাগপুর এবং উড়িষ্যা-সমেত রইলো সরকার-স্বীকৃত পৃথক প্রদেশ। এই অঙ্গচ্ছেদের আগে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা ছিল একজন গভর্নরের শাসনে। বঙ্গচ্ছেদের ফলে দুটি পৃথক প্রদেশের জন্য দু'জন গভর্নর নিযুক্ত হলেন।

১৯০৫-এ পুস্তিকাকারে প্রকাশিত 'সন্ধিক্ষণ'-এর ক্রোড়পত্রে দু'ছত্র কবিতায় উৎসর্গের মধ্যে এই উল্লেখ ছিল—

> যাঁহারা আদর্শ আজি বঙ্গে একতার
> তাঁহাদেরি তরে এই ক্ষুদ্র উপহার।

লর্ড কার্জন সম্বন্ধে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন—'he has made us a nation'; ১৯০৫ সালে 'সন্ধিক্ষণ'-এর লেখক সত্যেন্দ্রনাথও 'বঙ্গে একতার' আদর্শই বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছিলেন। এই সূত্রে একতা-চর্চার পূর্বকথা এখানে আলোচ্য। সত্যেন্দ্রনাথ ১৯০৫-সালেই প্রথম কলম ধরেন নি; 'বেণু ও বীণার'-কবিতাগুলির রচনাকালের বিস্তার যে ১৮৯৩ থেকে ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে, সে-কথা আগেই বলা হয়েছে। ১৯০০ সালে যখন 'সবিতা' প্রকাশিত হয়, তখন তাঁর বয়স ছিল আঠার বছর। দক্ষিণ আফ্রিকায় বুয়র-ইংরেজের যুদ্ধ (১৮৯৯, ১১ই অক্টোবর) বেধেছিল তার আগে। রবীন্দ্রনাথ তখন 'নৈবেদ্য' রচনায় হাত দিয়েছেন। বাংলার সমস্ত আন্দোলনের কেন্দ্রস্থান কলকাতায় তখন সত্যেন্দ্রনাথের কৈশোর অতিবাহিত হয়েছে। তাঁর কবিমানসের পরিণতির ধারাটি সূক্ষ্মভাবে লক্ষ্য করতে হলে উনিশ শতকের শেষ দশকের সামাজিক-রাজনৈতিক প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি উপেক্ষিত হতে পারে না। এ-জন্যে ১৯০৫-এর সীমারেখা অতিক্রম করে আরো অতীতে পিছিয়ে গিয়ে ১৮৯০-৯১ থেকে যাত্রা শুরু করাই সঙ্গত।

১৮৮৫-র ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন'-এর সভাগৃহে 'ন্যাশানাল কনফারেন্স'-এর দ্বিতীয় অধিবেশনে বাংলা এবং বহিরাঞ্চলের নানা প্রতিনিধি যোগ দিয়েছিলেন। প্রথম অধিবেশন হয়েছিল

১৮৮৩ সালের ডিসেম্বরে (২৮, ২৯, ৩০-এ ডিসেম্বর)—কলকাতার 'অ্যালবার্ট-হলে'। সেবার প্রথম দিনের অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেছিলেন রামতনু লাহিড়ী; সভায় উৎসাহী কর্মীদের মধ্যে ছিলেন চন্দ্রমাধব ঘোষ, রামতনু লাহিড়ী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের পিতৃব্য কলকাতা হাইকোর্টের ব্যবহারজীবী কালীমোহন দাস, ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষ, দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের মাতামহ ডাক্তার অন্নদাচরণ খাস্তগীর ইত্যাদি লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তি। ১৮৮৫ সালে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির উদ্যোগে এই 'কনফারেন্স'-এর দ্বিতীয় অধিবেশনের কাছাকাছি সময়ে জাতীয় কংগ্রেসের পত্তন হয়। কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন ডব্লিউ, সি, ব্যানার্জি। প্রথম অধিবেশন হয়েছিল বোম্বাইয়ে। ১৮৮৬ সালে দ্বিতীয় অধিবেশন হোলো কলকাতায়। দশ বছর পরে, ১৮৯৬ সালে রহিমতুল্লা সিয়ানীর সভাপতিত্বে পুনরায় কলকাতায় যে অধিবেশন হয়, সেই অনুষ্ঠানে কংগ্রেসের উদ্যোগে প্রথম ভারতীয় শিল্প-প্রদর্শনী খোলা হয়। ব্যারিষ্টার যোগেশচন্দ্র চৌধুরী সেই প্রদর্শনীর পরিকল্পনা করেন এবং দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় সারা ভারত পরিভ্রমণ করে ভারতের বিভিন্ন শিল্পনিদর্শন সংগ্রহ করেছিলেন। এই প্রদর্শনী সম্পর্কে সুরেন্দ্রনাথ তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন—

> Coming events cast their shadows before, and the industrial upheaval that was soon to find expression in the Swadeshi movement was heralded by a new departure.

১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাইয়ে কংগ্রেসের পঞ্চম অধিবেশনে রমাবাঈ রানাডে (মাধব গোবিন্দ রানাডের পত্নী), পণ্ডিতা রমাবাঈ, বিদ্যাগৌরী নীলকণ্ঠ, শ্রীমতী নিকম্ব, কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় এবং স্বর্ণকুমারী ঘোষাল—এই ছয়জন মহিলা-প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। এই অধিবেশনেই নারীর রাষ্ট্রীয় অধিকারের দাবী মেনে নেওয়া হোলো। এই সূত্রে আরো একটি কথা মনে পড়ে। ১৯০১-এর কংগ্রেস-অধিবেশনে স্বর্ণকুমারী দেবীর কন্যা সরলা দেবীচৌধুরাণী ভারতের নানা প্রদেশ থেকে গায়ক আমন্ত্রণ করে স্বরচিত গানে সভাস্থল মুখরিত করে দিয়েছিলেন।

সত্যেন্দ্রনাথের কবিতায় ১৮৮৯, ১৮৯৬ এবং ১৯০১—এই তিন সালের তিনটি অধিবেশনের স্মৃতি যে নিখুঁৎভাবে সঞ্চিত আছে, তা নয়। সরাসরি কংগ্রেস-সভার উল্লেখ 'বেণু ও বীণা'তেও নেই, 'সবিতা'তেও নেই। কিন্তু

১৮৮৯ সালের সভায় নারীর রাষ্ট্রীয় অধিকারের স্বীকৃতি, ১৮৯৬ সালের শিল্পপ্রদর্শনী এবং ১৯০১-এর অধিবেশনে সরলা দেবীর জাতীয় সংগীত—কোনা-না-কোনো ভাবে এই তিন ঘটনার স্মৃতি-প্রভাবিত হিসেবে অনুমিত হতে পারে, এমন অংশ তাঁর নানা কবিতা থেকে খুঁজে পাওয়া গেছে। 'সন্ধিক্ষণ' কবিতায় তিনি যখন লিখেছিলেন, 'নিত্য প্রাতে উচ্চারিব পণ—বাঁচাব দেশের শিল্প—দেশের জীবনে',—তখন অবশ্য বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনের সমকালীন বিদেশী পণ্য বর্জনের সাক্ষাৎ স্মৃতি বা অভিজ্ঞতাই তাঁর মনে থাকা বেশি স্বাভাবিক। ১৮৮৯ সালে সত্যেন্দ্রনাথের বয়স ছিল মাত্র সাত বছর। সেই সময়ে অনুষ্ঠিত শিল্প-প্রদর্শনীর মূল্যবোধের পক্ষে সাত বছর বয়স মোটেই অনুকূল নয়। তবে ঘটনা হিসেবে ১৮৮৯, ১৮৯৬, ১৯০১ সালের ঘটনাগুলি তাঁর কবিমনে অণুমাত্র চিহ্ন রেখে যায় নি ভেবে নেওয়াও ঠিক হবে না। উত্তরকালে ঈশ্বর গুপ্ত, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি কবির মতো 'সাম্প্রতিক' ঘটনাবলীর যিনি চারণ হয়ে উঠেছিলেন, সেই সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর শৈশব ও কৈশোরের এই সব ঘটনা যে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছিলেন, সেকথা মেনে নেবার অনুকূলে কোনো প্রমাণ নেই।

দেশীয় শিল্প উন্নয়নের প্রেরণা তখন কিছুটা ব্যাপকভাবে দেশের চেতনা স্পর্শ করেছিল। সরলা দেবী 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' নামে স্বদেশী শিল্পসামগ্রীর এক দোকান খুলেছিলেন। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (১৮৬৪-১৯১৯) 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথায়' লিখেছিলেন—

> মা লক্ষ্মী, কৃপা কর, কাঞ্চন দিয়ে কাঁচ নেব না। ঘরের থাকতে পরের নেব না। শাঁখা থাকতে চুড়ি পরবো না, পরের দুয়ারে ভিক্ষা করবো না,—মোটা বসন অঙ্গে নেব, মোটা ভূষণ আভরণ করবো, 'পড়শী'কে খাইয়ে নিজে খাব, মোটা অন্ন অক্ষয় হোক, মোটা বস্ত্র অক্ষয় হোক, ঘরের লক্ষ্মী ঘরে থাকুক।...

জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহলে তখনকার দিনের চরকা কাটার বিবরণ দিয়ে অবনীন্দ্রনাথ লিখে গেছেন—

> মার চরকা কাটা দেখে হ্যাভেল সাহেব তাঁর দেশ থেকে মাকে একটা চরকা আনিয়ে দিলেন।২

১৮৯০ থেকে ১৯১০ অবধি পর-পর অবিচ্ছিন্ন দুটি দশকের বিস্তারে দেশের নানা ভাব-তরঙ্গের সমারোহ দেখা গেছে। বালক সত্যেন্দ্রনাথ সেই

২। 'ঘরোয়া' : অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রাণী চন্দ, পৃঃ ১৫।

বিচিত্র উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে তাঁর কৈশোর অতিক্রম করে যৌবনে পদার্পণ করেছেন। ১৮৯৯ সালে লর্ড কার্জন (৬ই পৌষ, ১৩০৫) বড় লাট হয়ে আসার প্রায় দু'বছর পরে ১৯০১ সালের ২১-এ জানুয়ারি (৮ই মাঘ, ১৩০৭) মহারানী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যু হোলো। অতঃপর নতুন সম্রাটের অভিষেক উপলক্ষে দিল্লীতে দরবার বসেছিল। তারই কাছাকাছি সময়ে ১৯০২ এবং ১৯০৫ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পর পর দুটি সমাবর্তন বক্তৃতায় কার্জন দেশের তদানীন্তন শিক্ষানীতি সম্পর্কে এবং প্রাচ্য দেশের মানব-স্বভাব সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছিলেন।

একদিকে ১৯০৩ সালের জানুযারি মাসে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত দরবারের সমারোহ,—অন্যদিকে ১৯০২ সালের বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন-সভায় প্রাচ্য দেশবাসীর স্বভাব সম্পর্কে কার্জন-প্রচারিত অত্যুক্তি ও আতিশয্যের অভিযোগ, এই দুই প্রসঙ্গ স্মরণ করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—

> দিল্‌দরাজ মোগল সম্রাটদের আমলে দিল্লীতে দরবার জমিত। আজ সেদিন নাই, সে দিল্লী নাই, তবু একটা নকল দরবার করিতে হইবে। সংবৎর ধরিয়া রাজারা পোলিটিক্যাল এজেন্টের রাহুগ্রাসে কবলিত;—সাম্রাজ্য চালনায় তাহাদের স্থান নাই, কাজ নাই, তাহাদের স্বাধীনতা নাই—হঠাৎ একদিন ইংরেজ সম্রাটের নায়েব পরিত্যক্ত-মহিমা দিল্লীতে সেলাম কুড়াইবার জন্য রাজাদিগকে তলব দিলেন...৩

১৯০১ সালে কার্জন শিমলা-শৈলে শিক্ষাবিভাগীয় কয়েকজন ইংরেজ কর্মচারীর এক সভা আহ্বান করবার অল্প পরেই 'য়ুনিভার্সিটি কমিশন' বসেছিল। দেশব্যাপী আন্দোলনের ফলে গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে সেই কমিশনের সদস্য হিসেবে গ্রহণ করতে কর্তৃপক্ষ শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়েছিলেন বটে,—কিন্তু ভাইস-চ্যান্সেলার পেড্‌লার এবং চ্যান্সেলার কার্জনের প্রচেষ্টায় বাংলায় উচ্চশিক্ষা ব্যাহত করবার এই চক্রান্ত বেশ কিছুদূর এগিয়েছিল। কার্জনের শিক্ষা-বিল গৃহীত হবার পরে রবীন্দ্রনাথ ১৩১১-র বঙ্গদর্শনে 'অবজ্ঞা অনাদর অশ্রদ্ধার হাত হইতে বিদ্যাকে উদ্ধার' করবার সংকল্প গ্রহণের উদ্দেশ্যে দেশবাসীকে এগিয়ে যাবার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

১৯০২ সালের জুলাই মাসে সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগে 'ডন সোসাইটি' নামে স্বাদেশিকতা-উদ্বোধনের এক নতুন সমিতি স্থাপিত হয়।

৩। 'অত্যুক্তি': রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

এই সভায় ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় (আসল নাম ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়— (১৮৬১-১৯০৭), ভগিনী নিবেদিতা প্রভৃতি বক্তৃতা দিতেন। সরলা দেবীর 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' থেকে তখন 'ভাণ্ডার' নামে একখানি পত্রিকা ছাপা হোতো। ১৯০৪ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ডন্-সোসাইটির মুখপত্র 'ডন' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। বাংলা ১৩১২ সালে রবীন্দ্রনাথের সম্পাদনায় এবং কেদারনাথ দাশগুপ্তের প্রচেষ্টায় 'ভাণ্ডার' প্রথম ছাপা হয়। ১৩১৩ সালের আষাঢ় (ইং ১৯০৬) সংখ্যার 'ভাণ্ডারে' রবীন্দ্রনাথ লিখলেন, 'একটা…জাত নিজের দেশে বাস করিয়া অন্য দেশকে শাসন করিতেছে ইতিপূর্বে এমন ঘটনা ইতিহাসে ঘটে নাই।'

১৩১১-র 'বঙ্গদর্শনে' তিনি অবজ্ঞা, অনাদর, অশ্রদ্ধা থেকে বিদ্যাকে উদ্ধার করবার যে নির্দেশ দিয়েছিলেন, বঙ্গভঙ্গের উদ্দীপনার গুণে সে ইচ্ছা ক্রমশ দেশের অন্তরে প্রবেশ করেছিল। ১৯০৫-এর আন্দোলন দেখে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত যখন লিখছিলেন—

পাঠশালে ছাত্র করে বিদেশী-বর্জন
চমৎকার দৃশ্য চমৎকার,
বিলাস বর্জনে হের তরুণী ছাত্রীরা
অগ্রগামী আজি সবাকার।[৪]

—তখন, তদানীন্তন বাংলা সরকারের সেক্রেটারি কার্লাইল সাহেব অতিশয় উদ্বিগ্ন বোধ করছিলেন। এক সরকারী পরওয়ানার বলে ছাত্রদের রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দেওয়া নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করা হোলো। ১৯০৫-এর ২২-এ অক্টোবর যখন এই পরওয়ানার কথা প্রচারিত হয়ে পড়লো. তখন পরবর্তী কর্তব্য নির্ধারণের জন্যেই ব্যারিষ্টার আবদুল রসুলের সভাপতিত্বে Field and Academy-ভবনে[৫] এক সভা ডাকা হয়। সভার দিন স্থির হোলো ২৪-এ অক্টোবর; সেখানে বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতি বক্তা জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপন করবার প্রস্তাব উত্থাপন করলেন। প্রায় একই সময়ে, বাংলা ১৩১২ সালের ১৯-এ কার্তিক (নভেম্বর, ১৯০৫) ডন্-সোসাইটির ছাত্র-সভ্যদের সভায় রবীন্দ্রনাথ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ সম্পর্কে আলোচনা করেন।

৪। সঞ্চিকণ

৫। বর্তমান কর্নওয়ালিস ষ্ট্রীটের সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সামনে।

১৯০৫-এর নভেম্বর মাসে রংপুর প্রভৃতি অঞ্চলের ছাত্র-নিগ্রহের খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে কলকাতায় এক বিরাট ছাত্র-সভায় শিক্ষা-সংক্রান্ত সরকারী পরওয়ানা অমান্য করবার সংকল্প গৃহীত হয়ে Anti Circular Society দাঁড়িয়ে গেল। ব্রাহ্মসমাজের প্রবীণ আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রী,—তাছাড়া রবীন্দ্রনাথ, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, চিত্তরঞ্জন দাস, বিপিনচন্দ্র পাল, পটলডাঙ্গার মল্লিক-বাড়ির সুবোধচন্দ্র মল্লিক, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি ব্যক্তি জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপনের আদর্শ প্রচার করলেন। ১৯০৫-এর নভেম্বর মাসে রংপুরে প্রথম জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হবার পরে ১৯০৬-এর ১১-ই মার্চ কলকাতায় National Council of Education গঠিত হোলো। বর্তমান যাদবপুর এই জাতীয়-শিক্ষা-পরিষদেরই আধুনিক পরিণতি।

১৯০৫-এর ২০-এ জুলাই তারিখের সংবাদপত্রে কার্জন-শাসিত ব্রিটিশ আমলাতন্ত্রের বঙ্গভঙ্গ-পরিকল্পনার ঘোষণা ছাপা হলে দেশব্যাপী সেই বিক্ষোভের লগ্নেই রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—

> বাহিরের কিছুতে আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিবে একথা আমরা কোনো মতেই স্বীকার করিব না। কৃত্রিম বিচ্ছেদ যখন মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইবে, তখনই আমরা সচেতনভাবে অনুভব করিব যে, বাঙ্গালার পূর্ব-পশ্চিমকে চিরকাল একই জাহ্নবী তাঁহার বাহুপাশে বাঁধিয়াছেন, একই ব্রহ্মপুত্র তাঁহার প্রসারিত আলিঙ্গনে গ্রহণ করিয়াছেন। এই পূর্ব-পশ্চিম, হৃদ্‌পিণ্ডের দক্ষিণ-বাম অংশের ন্যায় একই পুরাতন রক্তস্রোতে সমস্ত বঙ্গদেশের শিরায় উপশিরায় প্রাণ বিধান করিয়া আসিয়াছে, জননীর বাম-দক্ষিণ স্তনের ন্যায় চিরদিন বাঙ্গালীর সন্তানকে পালন করিয়াছে। আমরা প্রশ্রয় চাহি না—প্রতিকূলতার দ্বারাই আমাদের শক্তির উদ্বোধন হইবে। বিধাতার রুদ্র মূর্তিই আমাদের পরিত্রাণ।৬

১৩১২ সালের আষাঢ়-শ্রাবণের (১৩ই ও ২০এ জুলাই, ১৯০৫) 'সঞ্জীবনী' পত্রিকায় 'স্বদেশভক্ত শিক্ষিত ভদ্রলোক'দের বিদেশী জীবনবীমা কোম্পানি বর্জন করবার নির্দেশ দেওয়া হয়। 'সঞ্জীবনী' পত্রিকায় কৃষ্ণকুমার মিত্র চীনের মার্কিন দ্রব্য বর্জন-আন্দোলনের সাফল্য স্মরণ করে ভারতবর্ষে বিদেশী বর্জনের প্রস্তাব তুলেছিলেন। বাংলায় সে প্রস্তাব ব্যাপকভাবে গৃহীত হয়। বাগেরহাটে, মাগুরায়, কলকাতায় এবং অন্যান্য অঞ্চলে আন্দোলনের বিশেষ

৬। 'অবস্থা ও ব্যবস্থা' : রবীন্দ্রনাথ (বঙ্গদর্শন-নবপর্যায় ১৩১২)।

উৎসাহ দেখা গেল। এই সময়ে (১৯০৫) বারাণসীতে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস-অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেন গোপালকৃষ্ণ গোখলে। এই সভায় 'স্বদেশী আন্দোলন' সমর্থিত হ'লেও বিদেশী 'বর্জন-নীতি সম্পূর্ণ অনুমোদিত হয়নি। তবে মহারাষ্ট্রের বালগঙ্গাধর তিলক, পাঞ্জাবের লালা লাজপত রায়, মধ্যপ্রদেশের মুঞ্জে প্রভৃতি নেতা বাংলার বিদেশী-বর্জন-আন্দোলন সমর্থন করলেন। মহারাষ্ট্রের নেতা তিলকের মৃত্যুর পরে উত্তরকালে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছিলেন—

মারাঠা যার চরণ-পাঁড়ি,—কার্তি দিগ্বিদিকে
দৃষ্টিতে যায় উঠ্‌ত কমল ফুটে,
বাংলা-মুলুক সত্যি ভালোবাস্‌ত যে বর্গীকে,
নেই রে সে আর হৃদয় নিতে লুটে!

*

'কেশরী' যার বাহন ছিল—দোসর দেশের শুভ,
স্বাতন্ত্র্যে যে ছিল রাজার মত,
'স্বরাজ' ছিল স্বপ্ন যাহার, স্বদেশ-প্রীতি ধ্রুব,
সেই মহাপ্রাণ আজকে মরণ-হত।

*

সাঁচ্চা পুরুষ বাচ্চা-সে যে মর্দ তেজের প্রীতি—
নয় কোনোদিন ত্রস্ত জুজুর ভয়ে,
ভিক্ষাপন্থী নয় ভিখারী, নয় সে প্রসাদ-লোভী
স্পষ্ট কথা বলত ঋজু হয়ে।[৭]

পুণা থেকে মারাঠী ভাষায় তিলকের সাপ্তাহিক পত্রিকা 'কেশরী' প্রকাশিত হোতো। সত্যেন্দ্রনাথ সেই 'কেশরী'রই উল্লেখ করেছিলেন। 'কেশরী'র মতো কলকাতা থেকে প্রকাশিত ব্রহ্মবান্ধবের দৈনিক 'সন্ধ্যা' পত্রিকাও ছিল বামপন্থী। পাঞ্জাবের লাজপত রায়-ও বাংলার ১৯০৫-৬ সালের আন্দোলন সম্পর্কে সমবিশ্বাসী ছিলেন। ১৯০৬-এর ৬ই আগষ্ট বিপিনচন্দ্র পালের সম্পাদনায় 'বন্দেমাতরম্' বের হবার পরে বাংলার বামপন্থী রাজনৈতিক কর্মীরা আরো সংঘবদ্ধ হলেন। 'যুগান্তর' 'নবশক্তি' প্রভৃতি পত্র-পত্রিকার অভ্যুদয় দেশের তৎকালীন বিপ্লব-চেতনাকে উত্তরোত্তর তীব্র করে তুলেছে।

৭। 'তিলক'—'বিদায়-আরতি' দ্রষ্টব্য।

দেশের এইসব ঘটনায় দ্বারা সত্যেন্দ্রনাথের মনের প্রকৃতি বহু পরিমাণে না হোক, কিছু পরিমাণে যে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। গোখ্‌লের মৃত্যুর পরে তিনি লিখেছিলেন—

ফিরে এস নিষ্ঠারূপে চিত্তে
জাগাও তুমি যতেক 'ভারত ভৃত্যে'
দাও সবে ফের, দাও গো তোমার তিমির হরণ দীক্ষা,
প্রাণের ব্রত হোক আমাদের তিরিশ কোটির শিক্ষা। ৮

গোখলে-প্রবর্তিত 'ভারত-ভৃত্য'-সভার (Servants of India) উল্লেখ এখানে খুবই স্পষ্ট। ১৯০৫ সালে কংগ্রেস-সভাপতির আসন থেকে গোখলে বলেছিলেন—

> Bengal's heroic stand against the oppression of a harsh and uncontrolled bureaucracy has astonished and gratified all India and her sufferings have not been endured in vain, when they have helped to draw closer all parts of the country in sympathy and aspiration.৯

তিনি স্বদেশী আন্দোলন সমর্থন করলেন বটে,—লর্ড কার্জনের স্বৈরশাসনের তীব্র নিন্দাও করলেন,—কিন্তু বিদেশি বর্জন বা 'বয়কট'-আন্দোলন সম্পর্কে চূড়ান্ত কোনো নির্দেশ দিতে ইতস্তত: করলেন; এই অধিবেশনে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার ব্যাপক দমননীতি বর্ণনা করেন। পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়, লালা লাজপত রায় প্রভৃতি নেতা 'বয়কট' সমর্থন করেন।

তারপর ১৯০৫ সালের শেষ দিকে ভারতের বড়লাট হয়ে এদেশে পদার্পণ করলেন লর্ড মিণ্টো। ওদিকে বিলেতে নবগঠিত উদারনৈতিক মন্ত্রিসভায় ভারত-সচিব নিযুক্ত হলেন জন্ মর্লি। মর্লি-সাহেব ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে বাংলার অঙ্গচ্ছেদের নিন্দা করলেও বঙ্গবিভাগ-পরিকল্পনাটি বাতিল করার পরিবর্তে তা' বরং অনিবার্য বলেই মেনে নিলেন।

বঙ্গীয়-প্রাদেশিক-সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন হয় ১৮৮৮ সালে। ১৮৯৫ থেকে প্রতি বছর নিয়মিত ভাবে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে এসেছে। ১৯০৬ সালের ১৪ই-১৫ই এপ্রিল এই প্রাদেশিক সম্মেলনের আয়োজন হয়েছিল বরিশালে। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মতিলাল ঘোষ, ব্রহ্মবান্ধব

৮। 'অভ্র আবীর' গ্রন্থ '৺গোখ্‌লে' দ্রষ্টব্য

৯। Presidential Address—Congress, 1905.

উপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কৃষ্ণকুমার মিত্র, ভূপেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি খ্যাত-নামাদের অনেকেই বরিশালে উপস্থিত হলেন। ব্যারিষ্টার আবদুল রসুল, 'হাবড়া হিতৈষী'-র সম্পাদক গীষ্পতি কাব্যতীর্থ, ব্রজমোহন কলেজের অধ্যক্ষ রজনীকান্ত গুহ এবং আরও অনেকে ছিলেন। তখন পূর্ববঙ্গে 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি ছিল নিষিদ্ধ। সভ্যদের 'বন্দেমাতরম্' ব্যাজ দেখে পুলিশ লাঠি চালায়। ফলে, বেশ কয়েকজন আহত হন। সুরেন্দ্রনাথকে গ্রেপ্তার করা হোলো। জরিমানার টাকা দিয়ে অশ্বিনীকুমার দত্ত প্রভৃতির সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথ সম্মেলনে যোগ দিলেন। অশ্বিনীকুমার ছিলেন অভ্যর্থনা-সমিতির সম্পাদক। তিনি নিজে আসতে পারেন নি। তাঁর অভিভাষণ সভায় পড়া হয়েছিল। দ্বিতীয় দিনে আর অধিবেশন হতে পারেনি বটে, কিন্তু বরিশালের অত্যাচারের খবর সারা বাংলায় ছড়িয়ে পড়লো।

তিলক-প্রবর্তিত 'শিবাজী'-উৎসবের রেওয়াজ সে-সময়ের আর এক-স্মরণীয় ঘটনা। ১৯০৬-সালের ৪ঠা জুন কলকাতায় এসে তিলক শিবাজী-মেলার উদ্বোধন করেন। বাঙালীর তদানীন্তন নানা আগ্রহের টানে শিখ ও মারাঠা জাতির বীরত্বের ইতিহাস বাংলা সাহিত্যের প্রিয় সামগ্রী হয়ে উঠেছিল। ১৯১০-১১ সালের পরেও শিখ ও মারাঠী ইতিহাসের প্রসঙ্গ বাংলার বহু সাময়িক পত্রের নানা সংখ্যায় আত্মপ্রকাশ করেছে। ১৩১৭ সালে (ইং১৯১০) শরৎকুমার রায় 'শিখগুরু ও শিখজাতি' নামে যে ছোট বইখানি লিখেছিলেন, তার ভূমিকা লেখেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত 'শিবাজী' অবিশ্যি তার আগেই (১৯০৪ সালে) লেখা হয়েছিল। সখারাম গণেশ দেউস্করের 'দেশের কথা' ছাপা হয়েছিল ১৯০৪ সালে। এই প্রবাসী মারাঠী দেশপ্রেমিকের কয়েক খানি বাংলা বই সে যুগে বাংলার যুবচিত্তে বিশেষ উদ্দীপনা সঞ্চার করেছিল। রবীন্দ্রনাথ, দীনেশচন্দ্র সেন এবং আরো অনেক গণ্যমান্য বাঙালী এঁর লেখার প্রশংসা করেন। যদুনাথ সরকার প্রভৃতি ঐতিহাসিক পরে মারাঠার ইতিহাস আলোচনা করে গেছেন। শিবাজী-প্রসঙ্গ তাতেই শেষ হয় নি। অপেক্ষাকৃত হাল আমলে ১৩২৫ সালেও যোগীন্দ্রনাথ বসু 'শিবাজী'-নামে এক 'ঐতিহাসিক মহাকাব্য' লিখেছিলেন। অনেক লেখার মধ্যে সেটিও একটি দৃষ্টান্ত। সেই কারণেই এখানে সে লেখাটির উল্লেখ করা হোলো।

সেকালের সেই বীরপূজার লগ্নে প্রতাপাদিত্য, সীতারাম রায় প্রভৃতি

বাঙালী বীরের জীবনকথা বাংলা সাহিত্যের বিশেষ জনপ্রিয় প্রেরণা হয়ে দাঁড়ায়। সরলা দেবী শারদীয়া মহাষ্টমীর দিনে বীরাষ্টমী ব্রত পালনের অনুষ্ঠান প্রবর্তিত করেন। ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ তাঁর 'প্রতাপাদিত্য' নাটক (১৩১৩) 'পদ্মিনী' (১৩১৩), 'পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত' (১৩১৩), 'চাঁদবিবি' (১৩১৪), 'নন্দকুমার' (১৩১৪)—ইত্যাদি ঐতিহাসিক রোম্যান্টিক নাটকগুলি একই সময়ে রচনা করেন। অমরেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৭৬-১৯১৬) 'বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ' নামেই একখানি নাটক প্রকাশ করেছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'চন্দ্রগুপ্ত' (১৩১৮) এবং 'সিংহল-বিজয়' (১৩২২) বই দু'খানির মধ্যে তৎকালীন স্বাধীনতা-আন্দোলনের উদ্দীপনাময় বাংলা-দেশের ছায়া পড়েছে! অমৃতলাল বসুর (১৮৫৩-১৯২৯) 'নবজীবন' (১৩০৮) বইয়ে এবং 'সাবাস বাঙালী' চিত্রনাট্যে স্বদেশী-আন্দোলনের কথা আছে। বীরত্বের আদর্শ, শৌর্যের পিপাসা, আত্মশক্তির স্বীকৃতি, সাম্য ও মনুষ্যত্বের বন্দনা বাংলার সাহিত্যালোকে তখন ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিল। সত্যেন্দ্রনাথের 'হোমশিখা'-র কবিতাগুলি লেখা হয় ১৩০৫ থেকে ১৩১৩ সালের (অর্থাৎ ১৮৯৮ থেকে ১৯০৬-এর) মধ্যে। সেই-বইয়ের মোট আটটি কবিতার শেষেরটির নাম 'সাম্য-সাম'। তাতে তিনি কিন্তু বাংলার স্বদেশী আন্দোলনের কথা লেখেননি,—বিশ্বের সাম্য-সম্ভাবনার কথাই লিখেছিলেন—

> মাংসপেশীর শাসন মানি না, মানি না শুষ্ক নীতি,
> নূতন বারতা এসেছে জগতে মহামিলনের গীতি।

তবে 'বেণু ও বীণা'-র 'আশার কথা' কবিতাটিতে বাংলার স্বাধীনতা-সংগ্রামের সেই বিশেষ পর্বের বিশেষ ছবিই ধরা দিয়েছিল—

> জননী গো—আজি ফিরে,—
> জাগিতেছে তব সন্তান সব
> গঙ্গার উভতীরে।

—এবং কেবল উদ্দীপনাহীন কর্তব্যবুদ্ধির তাড়নাতেই তিনি যে এই নিরাবেগ বর্ণনা মাত্র দিয়ে গেছেন, তা নয়। 'বেণু ও বীণা'-র 'বঙ্গজননী' কবিতাটিতে সেকালের দেশব্যাপী সেই উৎসাহেরই বিশেষ সুর লেগেছিল—

> চরণতলে সপ্তকোটি সন্তানে তোর মাগেরে—
> বাঘেরে তোর জাগিয়ে দে গো, রাগিয়ে দে তোর নাগে রে;

আনন্দমোহন বসুর পরিকল্পনা অনুসারে এবং রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির উৎসাহে

(৩০এ আশ্বিন, ১৩১২, ইং ১৬ই অক্টোবর, ১৯০৫) যে রাখীবন্ধন উৎসব হয়, তাতে বাংলার সন্তজাগ্রত 'নাগ-বাঘের' সর্বোদয়-অঙ্গীকারই ধ্বনিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের নিজেরই ১৩১২ সালের স্বদেশী গানগুলির মধ্যে একটি গানে বলা হয়েছিল—

যদি তোর ভাবনা থাকে, ফিরে যা না
তবে তুই ফিরে যা না।
যদি তোর ভয় থাকে তো করি মানা।

দেশব্যাপী এই উদ্দীপনার লগ্নে সাধারণ লোকচক্ষুর অন্তরালে সে সময়ে আর একটি ষড়যন্ত্র ঘনিয়ে উঠছিল। স্যার ব্যামফিল্ড ফুলারের হিন্দু-মুসলমান-বিভেদনীতি দেশে ছড়িয়ে পড়বার অনেক কাল আগে ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার ব্যবস্থা-পরিষদে মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্যে কয়েকটি আসন সংরক্ষণের প্রস্তাব উঠেছিল। আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁ আলিগড় বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ বেক্ সাহেবের প্রভাবে-প্ররোচনায় তখনকার বাঙালী দেশ-প্রেমিকদের কতকটা বিরোধিতা করেছিলেন। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে লখ্‌নৌয়ে অনুষ্ঠিত এক সভায় কংগ্রেস-বিরোধী বক্তৃতা দিয়ে ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 'ইউনাইটেড্ ইণ্ডিয়ান পেট্রিয়টিক অ্যাসোসিয়েশান'-এর কর্মভার গ্রহণ করেন। কূটকর্মী বেক্ অতঃপর Defence Association নামে একটি পুরোপুরি মুসলমান-সংঘ গড়ে তুলে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি আরো উশ্‌কে দিয়েছিলেন। ১৮৯৮ সালে স্যার সায়েদের মৃত্যু হয়। পরের বছর বেক্‌ও মারা যান। কিন্তু ব্রিটিশ সরকারের কূট কৌশলে এবং বেক্-সাহেবের ষড়যন্ত্রে হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলনের ধ্যান সুদূরপরাহত হয়ে রইলো।[১০] '১৯০৬ সালের ডিসেম্বর মাসে নবাব বাকর-উল-মুল্‌ক-এর সভাপতিত্বে ঢাকাতে অনুষ্ঠিত এক সভায় 'নিখিল ভারত মুসলিম লীগ'-এর পত্তন হয়। পৃথক-স্বার্থবাদী মুসলমান সমাজের এই সভাতে গৃহীত প্রস্তাবে বয়কট্-আন্দোলন অসংগত বলে ঘোষিত হয় এবং বঙ্গব্যবচ্ছেদও যুক্তিযুক্ত সাব্যস্ত হয়।

এই ১৯০৬ সালেই ভারতের 'হিন্দু-মহাসভা' স্থাপিত হয়।

সে বছর কংগ্রেসের অধিবেশন হয়েছিল কলকাতায়। দাদাভাই নৌরজী

১০। 'India Divided' : Dr. Rajendra Prasad ; pp. 94—102.
'মুক্তির সন্ধানে ভারত' : শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল।

ছিলেন সভাপতি। ১৯০৭-এর সুরাট-কংগ্রেসে এবং পরের বছর মাদ্রাজ-কংগ্রেসে সভাপতিত্ব করেছিলেন রাসবিহারী ঘোষ। তারপর ১৯০৯-এর লাহোর-কংগ্রেসের সভাপতি হন পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়।

এদিকে ১৯০৬ থেকেই ভারত-সচিব মর্লি এবং বড়লাট মিণ্টো দেশের মুসলমান, জমিদার এবং বিত্তবান শ্রেণীর সমবায়ে কংগ্রেসের মধ্যে একটি পৃথক গোষ্ঠীর সম্ভাবনা নিশ্চিততর করে তুলতে উদ্যোগী হলেন।

কলকাতা-কংগ্রেসের সভাপতি নৌরজী ঘোষণা করেছিলেন যে, 'স্বরাজ'-ই ভারতবর্ষের তৎকালীন রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের লক্ষ্য! প্রগতিদলের অন্যতম অগ্রণী বিপিনচন্দ্র পাল তাঁর ভাষণে ও রচনার সাহায্যে আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জনমত গড়ে তুলতে ব্রতী হন। প্রাচীনপন্থীরা (ফিরোজ শা মেহ্‌তা প্রভৃতি) চরমপন্থীদের আচরণ কায়মনোবাক্যে সমর্থন করেন নি। দু' দলের বিচ্ছেদ ক্রমশ অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে।

চরমপন্থীদের নেতৃস্থানীয় ছিলেন মহারাষ্ট্রের তিলক, পাঞ্জাবের লালা লাজপত রায় এবং বাংলার বিপিনচন্দ্র। অরবিন্দ ঘোষও ছিলেন। তিনি স্বরাজের বেদান্তসম্মত ব্যাখ্যা শোনালেন। প্রায় একই সময়ে ১৯০৭ সালের শেষ দিকে ব্রহ্মবান্ধব তাঁর 'সন্ধ্যা' পত্রিকায় 'ঠেকে গেছি প্রেমের দায়ে' নামে এক প্রবন্ধ লিখে রাজদ্রোহের অপরাধে অভিযুক্ত হলেন। কিন্তু ইংরেজ সরকারের বিচারে তাঁর যে অণুমাত্র আস্থা ছিলো না, সেই কথা বুঝিয়ে দেবার জন্যেই উপাধ্যায় বরবেশে আদালতে উপস্থিত হয়েছিলেন। মামলার জবানবন্দীতে নিজের সম্বন্ধে তিনি লিখেছিলেন—

'Not responsible to an alien Government for his humble share in the God-ordained mission of Swaraj.'

এই মামলা শেষ হবার আগেই ১৯০৭ সালের ২৭এ অক্টোবর ক্যাম্বেল হাসপাতালে এক অস্ত্রোপচারের ফলে ব্রহ্মবান্ধবের মৃত্যু হয়।

১৯০৮ সালে মজঃফরপুরের দায়রা জজ কিংস্‌ফোর্ড সাহেবের প্রাণনাশের চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসু পুলিশের হাতে ধরা পড়েন। তাঁর সহযোগী প্রফুল্ল চাকী আত্মহত্যা করেছিলেন। বিচারে ক্ষুদিরামের ফাঁশি হয়। এই সন্ত্রাস-আন্দোলনের সূচনাতেই পুলিশ তৎপর হয়ে ওঠে। ঐ বছর জুন মাসে কলকাতার মানিকতলা অঞ্চলে এক বোমার কারখানা আবিষ্কৃত হবার সঙ্গে সঙ্গে বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ

গোস্বামী, কানাইলাল দত্ত, সত্যেন্দ্র বসু প্রভৃতি ধরা পড়লেন। অরবিন্দ ঘোষ তাঁর গ্রে-স্ট্রীটের বাড়িতে ঐ বছর ২রা মে তারিখে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন।

বাংলার এই সন্ত্রাস-আন্দোলনের ইতিহাস সম্বন্ধে যাঁরা বিশেষভাবে অনুসন্ধান করেছেন, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ বলেছেন ব্রাহ্মসমাজের সর্বাঙ্গীন মুক্তির আদর্শই এই আন্দোলনের প্রেরণা জুগিয়েছিল। অনেকে মনে করেন বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ'-ই এ-অধ্যায়ের আদি-কারণ। কেউ বা বলেছেন বোম্বাই-মহারাষ্ট্র অঞ্চলের সন্ত্রাসবাদই বাংলার স্বদেশী যুগের গুলি-গোলার মন্ত্রদাতা। আবার আর এক দল বলেছেন, সন্ত্রাসবাদ হোলো স্বামী বিবেকানন্দ-প্রচারিত সমাজসেবা ও সত্যসাধনার মহান আদর্শেরই এক রকম বিকৃতির নমুনা! ব্রিটিশ সরকার-নিযুক্ত তদন্ত-পরিষদ্ বললেন—

> Vivekananda died in 1902; but his writings and teachings survived him, have been popularised by the Ramkrishna Mission and have deeply impressed many educated Hindus. From much evidence before us it is apparent that this influence was perverted by Barindra and his followers in order to create an atmosphere for the execution of their projects. ১১

যাই হোক, এই মামলায় অরবিন্দের পক্ষ সমর্থন করে চিত্তরঞ্জন দাস সে-যুগে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন।

১৯০৭-১৯০৯ সালে ব্রিটিশ সরকারের দমননীতি বাংলার পল্লীসীমা অবধি ছড়িয়ে পড়েছিল। নেতারা নানাভাবে নিপীড়ন ভোগ করেন। দেশব্যাপী যন্ত্রণা, উদ্দীপনা এবং চাঞ্চল্যের মধ্যে ১৯০৯ সালের মে মাসে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে হিন্দু-মুসলমানের পৃথক-নির্বাচন-পদ্ধতি সমেত ভারতীয়-ব্যবস্থাপরিষদ-আইন বিধিবদ্ধ হয়। এই ঘটনার মাস-দুয়েক পরে খাস বিলেতের মাটিতে ভারতীয় সন্ত্রাসবাদের আর একটি নমুনা দেখা গেল। ১৯০৯ সালের ১লা জুলাই মদনলাল ধিংরা এক পদস্থ ইংরেজকে হত্যা করে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হলেন। বিনায়ক দামোদর সাভারকার-কে গ্রেপ্তার করে বিচারের জন্যে ভারতবর্ষে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তারই অল্পকাল পরে ভারতবর্ষে মর্লি-মিন্টো শাসন সংস্কার প্রবর্তিত হয়।

তারপর মিন্টো গেলেন, হার্ডিঞ্জ এলেন। 'প্রেস্-আইনের' কবলে পড়ে বহু ছাপাখানা আর কতো-যে পত্রিকা বন্ধ হয়ে গেল! ওদিকে সপ্তম এড্ওয়ার্ড

১১। 'Sedition Committee Report' (1918): S.A.T. Rowlatt; p. 17.

মারা গেলেন। ১৯১১ সালের ডিসেম্বর মাসে সম্রাট পঞ্চম জর্জ ও রানী মেরী যখন ভারতে আসেন, ঠিক সেই সময়ে কলকাতায় বিষ্ণুনারায়ণ ধরের সভাপতিত্বে কংগ্রেসের অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথের লেখা 'জনগণ মন অধিনায়ক' গানটি গাওয়া হয়। সম্রাটের বিশেষ ঘোষণায় বঙ্গভঙ্গ রদ হয়ে গেল। সেই সঙ্গে কলকাতা থেকে ভারতের রাজধানী স্থানান্তরিত হোলো দিল্লীতে।

১৯১২ সালের ডিসেম্বর মাসে লর্ড হার্ডিঞ্জ যখন গজবাহনে দিল্লীতে প্রবেশ করেন, সেই সময়ে তাঁর ওপর এক আততায়ীর বোমা এসে পড়ে। হার্ডিঞ্জ তাতে আহত হন। অপরাধীরা কঠোর দণ্ড পেয়েছিলেন। রাসবিহারী বসুকে এই সময়ে পাঞ্জাবের প্রধান বিপ্লবী নেতা বলে ঘোষণা করা হয়। মৃত্যুদণ্ড মাথায় নিয়ে রাসবিহারী ছদ্মবেশে নানা জায়গায় ঘুরে জাপানে গিয়ে দায়িত্বপূর্ণ কাজ নিয়ে বসলেন। উত্তরকালে নেতাজী-সুভাষচন্দ্রের বিশ্বস্ত সহকর্মী হিসেবে ইতিহাসের আর এক বৈপ্লবিক অধ্যায়ে তাঁকে পুনরায় প্রসিদ্ধ হতে দেখা গেছে।

হার্ডিঞ্জের আমলে দেশের কল্যাণের দিকে কর্তৃপক্ষের কিছুটা নজর পড়েছিল বটে, কিন্তু স্থায়ী মঙ্গল সাধনের তেমন কোনো ক্ষমতা বড়লাটের হাতে ছিল না।

অপেক্ষাকৃত দূর ক্ষেত্রে তখন অন্যান্য ঘটনা ঘটছিল। ১৯১১-১৩ সালের মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় বলকান্ এবং ট্রিপলির যুদ্ধ হয়। য়ুরোপ থেকে মুসলমান-অধ্যুষিত, মুসলমান-শাসিত তুরস্কের আধিপত্য দূর করবার বাসনাই ছিল এইসব যুদ্ধের আসল উদ্দেশ্য। ভারতীয় মুসলমানরা এই ব্যাপারে উদ্বিগ্ন বোধ করেন। ১৯১২ সালে কংগ্রেসেরই অনুরূপ স্বায়ত্বশাসনের আদর্শ বরণ করে নিয়ে মুসলিম লীগ কংগ্রেসের নিকটবর্তী হলেন। খিলাফৎ আন্দোলনের সূচনা হিসেবে সে ঘটনাটি এখানে স্মরণীয়।

এদিকে আফ্রিকায় মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর নেতৃত্বে ভারতীয় সত্যাগ্রহীরা আফ্রিকাবাসী ভারতীয়দের লাঞ্ছনার বিরুদ্ধে ব্যাপক অহিংস আন্দোলনে নিযুক্ত ছিলেন। ১৯১২ সালে গোখ্‌লে আফ্রিকায় গিয়ে গান্ধীর সঙ্গে ঘুরে ঘুরে সেখানকার প্রকৃত অবস্থা দেখে এলেন।

ক্যানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, ফিজি প্রভৃতি শ্বেত উপনিবেশগুলিতে ভারতবাসীর তখন লাঞ্ছনার সীমা ছিল না। ক্যানাডার প্রবাসী শিখ-সম্প্রদায় সর্দার

এক সিংকে প্রতিনিধি নির্বাচন করে ভারতীয় কংগ্রেসে পাঠালেন। ফলে শ্বেত-কৃষ্ণের বিরোধ তীব্রতর হোলো। দেশ-কালের এই অবস্থার মধ্যে ১৯১৪ সালের জুলাই মাসে ভারতে য়ুরোপের মহাযুদ্ধের খবর এলো। বহু বাধা-বিঘ্ন সত্ত্বেও স্বদেশে-বিদেশে ভারতের সন্ত্রাসবাদ এবং অহিংস আন্দোলন দুই-ই অব্যাহত রইলো। অ্যামেরিকার ভারতীয় 'গদর পার্টি' (লালা হরদয়াল প্রতিষ্ঠিত), জার্মানির 'ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল পার্টি' (ডক্টর তারকনাথ দাস) প্রভৃতি সংঘগুলি বিদেশে সেকালের ভারতীয় বৈপ্লবিক সংঘের দৃষ্টান্ত হিসেবে বহুশ্রুত।

দু'বছর কারাদণ্ড ভোগ করে লোকমান্য তিলক পুনাতে ফিরে এসে বললেন যে, যুদ্ধকালে ব্রিটেনকে ভারতের সাহায্য করা উচিত। কংগ্রেসের উঁচু মহলে শ্রীমতী অ্যানি বেসাণ্ট্ নরম ও চরম পন্থীদের মেলাবার চেষ্টায় নিযুক্ত রইলেন। ১৯১৫ সালে কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের মধ্যেও প্রীতিবন্ধন দৃঢ় হয়েছিল। ১৯১৬ সালে অ্যানি বেসাণ্টের 'হোমরুল লীগ' স্থাপিত হোলো।

তারপর ভারত-সচিব পদে অধিষ্ঠিত হয়ে মণ্টেগু-সাহেব তদানীন্তন বড়লাট লর্ড চেম্‌সফোর্ডের সঙ্গে আবার একযোগে শাসন-সংস্কারে উদ্যোগী হলেন। ১৯১৮ সালে তাঁদের সংস্কার-বিবরণী প্রকাশিত হোলো। এই বিবরণী সম্বন্ধে দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক মহলে বহু মতানৈক্য ঘটেছিল। সেই বাদ-প্রতিবাদের মধ্যেই ভারত-রক্ষা-আইন সম্পর্কিত রৌলট-কমিটির 'রিপোর্ট' প্রকাশিত হলে এটিকে ভারতের স্বাধীনতা-স্পৃহার চরম দমন-ব্যবস্থা মনে করার ফলে দেশে পুনরায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।

নিরাবেগ পর্যবেক্ষণই ছিল সত্যেন্দ্রনাথের কবি-প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য। দেশে যখন সন্ত্রাসবাদ, বিদেশি কাপড়ের বহ্ন্যুৎসব ইত্যাদি উত্তেজনাকর আন্দোলন চলছিল, তখন রবীন্দ্রনাথের শিষ্য সত্যেন্দ্রনাথ কি সেইসব বাস্তব ঘটনা সম্বন্ধে উদাসীন থেকে কেবল তাঁর ছন্দ-লীলার আপাতপলায়নী কৌশলের মধ্যেই স্বেচ্ছানির্বাসন নিয়েছিলেন? বলা বাহুল্য, বিষয়টি সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণের দাবি জানায়। সন্ত্রাসবাদ সম্বন্ধে তাঁর বেশি কবিতা নেই কেন? তিনি বরিশালের মুকুন্দ দাসের মতো অক্লান্ত চারণ-কবির দায়িত্ব নিতে পারতেন না কি? উত্তরকালের 'অগ্নিবীণার' কবির মতো বিদ্রোহীর গান লিখে যাবার উৎসাহে

কোন্ অন্তরায় তাঁকে বাধা দিয়েছিল? তাঁর কবিতা আলোচনা করতে গিয়ে এসব প্রশ্ন স্বতই মনে আসে।

১৯১৭ সালের নতুন বই 'হসন্তিকায়' তিনি লিখেছিলেন—

(এই) ইতিহাস কারে বলে তা' জানো কি?
শোনো তোমাদের বলি—
(লাখো) লাখো খুন যারা করেছে তাদের
নাম লেখা নামাবলী!
(আহা) সেই নামাবলী অঙ্গে জড়ায়ে
ঘুঘু ডাকে ঘুঘুঘু;
(ওগো) যার যত আছে কামান তাহার
সম্মান তত—
কোরাস্ ... ... হুঃ! ১২

১৯১৫ সালে গান্ধী আফ্রিকা থেকে বিলেত হয়ে ভারতে ফিরেছিলেন। গোপালকৃষ্ণ গোখ্‌লের পরামর্শ অনুসারে তিনি কিছুকাল নিজের চোখে ভারতের আন্দোলনের চেহারা দেখলেন। তারপর একে একে বিহারের চম্পারণ জেলার নীলচাষীদের পক্ষে, গুজরাটের দুর্ভিক্ষপীড়িত পল্লীবাসীর পক্ষে, আহ্‌মেদাবাদের শ্রমিকদের কল্যাণ-কামনায় তিনি আন্দোলন শুরু করেন এবং ১৯১৯ সালের মার্চ মাসে যখন ব্রিটিশ স্বার্থের খাতিরে ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদে রৌলট্‌-আইন গৃহীত হয়ে বিধিবদ্ধ হয় (১৯১৯-এর ৬ই এপ্রিল), তখন তিনি সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু করলেন। সারা ভারতে এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল। আন্দোলন দমন করবার জন্যে পাঞ্জাবের লাট স্যার মাইকেল ওডায়ার জেনারাল ডায়ারের ওপর শান্তিরক্ষার ভার দিলেন। ৯ই এপ্রিল আন্দোলনের অন্যতম নেতা ডাক্তার সত্যপাল এবং ডাক্তার সফিউদ্দিন কিচ্‌লু গ্রেপ্তার হন। শান্তি-ব্যবস্থার সশস্ত্র আয়োজন এবং সভাসমিতি বন্ধ করবার বিজ্ঞপ্তি উপেক্ষা করে ১৩ই এপ্রিল অমৃতশহরের জালিয়ানওয়ালাবাগ উদ্যানে এক সভা হয় এবং ডায়ারের আদেশে সেই সভার ওপরেই ইতিহাস-কুখ্যাত অত্যাচার ঘটে।

জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের পরে লাহোরে, অমৃতশহরে এবং পাঞ্জাবের অন্যান্য কয়েক জায়গায় সামরিক-আইন জারি করা হয়; নৃশংস

১২। 'হুঃ': হসন্তিকা (১৯১৭) দ্রষ্টব্য।

অত্যাচারের খবর যাতে বাইরে প্রচারিত না হয়, সেদিকে কড়া নজর রাখা হয় এবং নেতাদের পঞ্জাব প্রবেশের অনুমতিও তখন স্থগিত রাখা হয়।

সে সময়ে বাংলাদেশের বাঁকুড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, চট্টগ্রাম, রাজসাহী, সাঁওতাল পরগনা, মানভূম প্রভৃতি অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ চলছিলো। ১৩২৬ সালের ভাদ্র-সংখ্যার 'প্রবাসী'তে 'দেশের কথা' বিভাগের প্রথম অনুচ্ছেদেই লেখা হয়েছিল—

> আমার দুর্ভাগা দেশের কথা বারো মাস ত্রিশ দিন সেই একই—দুর্ভিক্ষ, জলপ্লাবন, অনশনে মৃত্যু, বস্ত্রাভাব, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের দৈন্য, এবং ধনীদের মুষ্টিভিক্ষা ও গভর্মেণ্টের চুট্‌কি ভিক্ষা—ব্যস্!

'প্রবাসী'র ঐ সংখ্যাতেই সত্যেন্দ্রনাথের 'দুর্ভিক্ষের ভিক্ষা' কবিতাটি ছাপা হয়।[১৩] তাঁর মৃত্যুর পরে প্রকাশিত 'বেলাশেষের গান' এবং 'বিদায়-আরতি' এই দুখানি বইয়ের মধ্যে সমকালীন রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিক বহু ঘটনার উল্লেখ এবং ইঙ্গিতময় বহু কবিতা সংকলিত হয়েছে। 'চরকার আরতি', 'আখেরী', 'ফরিয়াদ', 'গান্ধিজী' এবং আরো অনেক কবিতা তাঁর সমাজ-চেতনার দৃষ্টান্ত হিসেবে স্মরণীয়।[১৪] এই শেষ পর্বের কবিতাগুলির মধ্যেই 'কাঠগড়া'-তে তিনি লিখেছিলেন:

> বন্ধু! সবুর! কাঠগড়াটার ঝাড়ছ কেন ধুলো মনের ভুলে?
> কাঠগড়াতে যারা দাঁড়ায় অশুচি তো নয়কো তারা মুলে,—
> অন্ততঃ নয় তেমন,—যেমন গলা কাটা মহাজনের দল,
> কিম্বা যেমন জমিদারের জুলুম-জবর আম্‌লা নায়েব খল।
> কাঠগড়া তো অশুচি নয়, অশুচি ও নয়কো কোন মতে,
> ওখানে তো জজ বসে না, ফাঁসীর হুকুম হয় না ওখান হতে।

জালিয়ানওয়ালাবাগ-এর হত্যাকাণ্ডের স্মৃতি আছে সত্যেন্দ্রনাথের 'ফরিয়াদ' কবিতায়—

> বর্বরতার গর্ব করে কাঠগড়াতে কীর্তিমন্ত কত;
> গোঁয়াতু́মির সমর্থনে মানবতার করলে মাথা নত!
> জবাবদিহির ডর ছিল না, ডায়ার গেল খোলসা বাত কয়ে—
> স্তম্ভিতবৎ রইল ভারত, কাণ্ড কি যে, বুঝল রয়ে রয়ে!

১৩। 'বিদায়-আরতি' দ্রষ্টব্য।

১৪। 'বেলা শেষের গান' দ্রষ্টব্য।

নন্-কো-বাদের শঙ্খ হঠাৎ উঠল বেজে ভারত গগন ব্যেপে,
তিরিশ কোটির নমিত শির সোজা হল দাঁতে অধর চেপে ;
সত্য গ্রহণ করলে ভারত, হে বিশ্বরাজ ! তোমায় প্রণাম করে ;
চিত্ত দিল সকল চিত্ত ; গান্ধী দিলেন পুণ্য গন্ধে ভরে ;
নেহ্‌রু দিলেন নহর কেটে ; ত্যাগের প্লাবন উপ্‌চে গেল ভেসে—
যুগল আলির দীপালিতে উজল হল দেশাত্মবোধ দেশে।
চমৎকারের বন্যা এল চামার মেথর দেশের কাজে মাতে !
শুঁড়িখানায় লোক ঢোকে না, বিলাস ব্যসন ডুব্‌ল তপস্যাতে !

সত্যেন্দ্রনাথের 'স্তম্ভিতবৎ রইল ভারত' কথাটির সমর্থন পাওয়া যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক একখানি চিঠিতে। জালিয়ানওয়ালাবাগ-হত্যাকাণ্ডের অল্পকাল পরে ৩০-এ মে তারিখে রবীন্দ্রনাথ 'স্যর' উপাধি ত্যাগ করে চেমস্‌ফোর্ডের উদ্দেশে যে চিঠি লিখেছিলেন, তাতে তাঁর এই মন্তব্য ছিলো—

> Knowing that our appeals have been in vain and that the passion of vengeance is blinding the noble vision of statesmanship in our Government, which could so easily afford to be magnanimous as befitting its physical strength and moral tradition, the very least that I can do for my country is to take all consequences upon myself in giving voice to the protest of the millions of my country-men, surprised into a dumb anguish of terror.

'প্রবাসী'তে প্রকাশিত 'বাতায়নিকের পত্র' লেখাটির মধ্যে এই সময়ে তিনি যা লিখেছিলেন, কিঞ্চিৎ দীর্ঘ হলেও তার অংশবিশেষ এখানে স্মরণীয়—

> …য়ুরোপের শক্তিপূজক আজ বুক ফুলিয়ে বড় সমারোহেই শক্তির পুজো করচেন ; মদে তাঁর দুই চক্ষু জবাফুলের মত টক্‌টক্ করচে ; খাঁড়া শানিত ; বলির পশু যূপে বাঁধা। তাঁরা কেউ কেউ বলচেন, আমরা যিশুকে মানিনে, আবার কেউ কেউ ভারত-চন্দ্রের মত গোঁজামিলন দিয়ে বলচেন, যিশুর সঙ্গে শক্তির সঙ্গে ভেদ করে দেওয়া ঠিক নয়, অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্তিতে দুজনকেই সমান মানবার মন্ত্র আছে। অর্থাৎ একদল মদ খাচ্ছেন রাজাসনে বসে, আরেক দল পুল্‌পিটে চড়ে।
>
> আর আমরাও বল্‌চি, শিবকে মান্‌ব না। শিবকে মানা কাপুরুষতা। আমরা চণ্ডীর মঙ্গল গাইতে বসেচি। কিন্তু সে মঙ্গলগান স্বপ্নলব্ধ। ক্ষুধা, ভয়, পরিশ্রমের স্বপ্ন ! জয়ীর চণ্ডীপূজায় আর পরাজিতের চণ্ডীগানে এই তফাৎ।
>
> …আমরা আজ য়ুরোপের দেবতাকে স্বপ্নে পুজো করতে বসেছি, এইটেতেই য়ুরোপের কাছে আমাদের সব চেয়ে পরাভব হয়েছে। যদি সে আমাদের আঘাত করতে চায় করুক, আমরা সহ্য করব, কিন্তু তাই বলে পুজো করব ? সে চলবে না ; কেন না

পুজো করতে হবে ধর্মরাজকে। সে দুঃখ দেবে, দিক্‌গে! কিন্তু হারিয়ে দেবে? কিছুতে না! মরার বাড়া গাল নেই; কিন্তু মরেও অমর হওয়া যায় এই কথা যদি কিছুতে ভুলিয়ে দেয় তাহলে তার চেয়ে সর্বনেশে মৃত্যু নেই। ১৫

সত্যেন্দ্রনাথের মনের ওপর এই আদর্শেরই প্রভাব পড়েছিল।

গান্ধীর পঞ্জাব-প্রবেশ তখন নিষিদ্ধ। তাঁকে দিল্লীতে গ্রেপ্তার করে বোম্বাইয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়। এই ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় দেশের জনসাধারণ অশান্ত হয়ে উঠেছে দেখে তিনি সত্যাগ্রহ আন্দোলন স্থগিত রাখলেন। রবীন্দ্রনাথ এবং গান্ধী—ভারতবর্ষের এই দুই মনীষী তখন অন্তরে একই কথা ভাবছিলেন—ভারতবর্ষের মুক্তি-সংগ্রামের আদর্শ রাজনৈতিক রক্তপাতের বন্যায় ভাসিয়ে দেওয়া চলবে না! শুধু রণচণ্ডীর বন্দনা নয়,—শিবের শাসনে দেশের সমস্ত বিক্ষোভকে সংযত করাই শুভবুদ্ধি!

১৯১৯ সালের ২৩এ ডিসেম্বর মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড শাসন-সংস্কার ভারত-সংস্কার আইন রূপে বিধিবদ্ধ হোলো। এই সংস্কার-আইনই দেশে 'ডায়ার্কি' বা দ্বৈত-শাসন নামে খ্যাতি লাভ করে।

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে এই দ্বৈতশাসন চালু করার ফলে ভারতবাসীর আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার যেমন কার্যত অস্বীকার করা হোলো, অন্যপক্ষে তেমনি হিন্দু, মুসলমান, শিখ, ফিরিঙ্গি ইত্যাদি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যবস্থা-পরিষদে পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থাটি উত্তরোত্তর ভেদবুদ্ধি ছড়াবার যন্ত্র হিসেবে বিদ্যমান রইলো।

১৯১৯ সালে অমৃতশহর-কংগ্রেসে সভাপতি পণ্ডিত মতিলাল নেহরু, অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, মৌলানা সৌকত আলি ও মহম্মদ আলি এবং অন্যান্য প্রসিদ্ধ জননেতারা এক বাক্যে ঘোষণা করলেন যে প্রস্তাবিত শাসন-সংস্কার অসন্তোষজনক, অনুচিত এবং নৈরাশ্যকর। মুসলিম লীগের নেতারাও দ্বৈত-শাসন সম্বন্ধে অনুরূপ মনোভাব প্রকাশ করলেন। সত্যেন্দ্রনাথের কবিতায় এইসব ভাবনা-চিন্তার কিছু কিছু প্রতিধ্বনি শোনা যায়। সেই সূত্রে আরো একটি কথা মনে পড়ে। সে-কালে ভারত থেকে ব্রিটিশ-উপনিবেশগুলিতে শ্রমিক পাঠাবার যে রেওয়াজ ছিল, ১৯১৯-সালের শেষ দিকেই সে প্রথা রদ করা হয়। এই উপলক্ষে ১৯২০

১৫। প্রবাসী, আষাঢ়, ১৩২৬।

সালের বর্ষারম্ভের দিনটিতে দেশব্যাপী এক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সেই উৎসবের কথা ভাবতে গেলেই সত্যেন্দ্রনাথের লাইন মনে পড়ে :

> বকেয়া হিসাব চুকিয়ে দে রে বছর শেষের শেষ দিনেতে,
> মজ্জাগত গোলাম-সমঝ শেষ করে দে, শেষ করে দে।
> কেউ কারো দাস নয় দুনিয়ায়, এই কথা আজ বলবো জোরে,
> মিথ্যা দলিল তাদের, যারা জীবকে দেখে তুচ্ছ করে!

একদিকে শাসক ইংরেজের রক্তচক্ষু, হিংস্রতা, ঔদ্ধত্য—অন্যদিকে পোলক, দীনবন্ধু এণ্ডরুজ, পায়ার্সন প্রভৃতি ইংরেজের অকৃত্রিম মানবতা—ইংরেজের এই দুই মূর্তির একটিকে বিস্মৃত হয়ে অন্যটিকেই ব্রিটিশ চরিত্রের একমাত্র পরিচয় বলে গান্ধীও স্বীকার করেন নি, রবীন্দ্রনাথও না। রবীন্দ্রনাথের 'সভ্যতার সংকটে' তো বটেই, তা ছাড়া তাঁর 'কালান্তর' প্রভৃতি অন্যান্য প্রবন্ধেও এ-বিষয়ে তাঁর নিজের স্বীকৃতি আছে। গান্ধীও ব্রিটিশ-স্বভাবের এই দ্বৈত সত্যকে উপেক্ষা করেন নি। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের হাতে শত পীড়ন ভোগ করতে-করতেও তাঁর এই সত্যবোধ কখনোই আবৃত হয়নি। তুরস্কের বিরুদ্ধে শ্বেত-শক্তির চক্রান্তের কথা আগেই লেখা হয়েছে। ১৯২০-সালের মে-মাসে যখন 'সেভার্স-সন্ধি'র শর্ত প্রকাশিত হয়, তখন তুরস্কের সুলতানের (অর্থাৎ মুসলমানদের খলিফার) দুরবস্থা সম্বন্ধে মুসলমান-জগৎ নিঃসংশয় হলেন। বড়লাট লর্ড চেম্‌স্‌ফোর্ড, ভারত-সচিব মণ্টেগু, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জ—মুসলমানদের আবেদন-নিবেদনে এঁরা কেউ কর্ণপাত করেন নি। কনষ্ট্যান্টিনোপলে তুরস্কের সুলতান রইলেন শ্বেত-শক্তির নজরবন্দী হয়ে। ১৯২০ সালের ২৮এ মে বোম্বাই সহরে খিলাফৎ-সম্মেলনে অহিংস অসহযোগ প্রস্তাব গৃহীত হবার প্রায় দু'মাস পরে ৩১এ জুলাই তারিখে লোকমান্য তিলকের মৃত্যু হোলো। এদিকে খিলাফৎ সম্মেলনে গৃহীত অসহযোগ-আন্দোলন পয়লা আগষ্ট থেকে শুরু হবে, স্থির ছিল। তিলকের মৃত্যুতে সে-আন্দোলন অনিবার্য ভাবে বাধা পেলো। সেপ্টেম্বর মাসে কলকাতায় কংগ্রেসের এক বিশেষ অধিবেশনে লালা লাজপত রায়ের সভাপতিত্বে খিলাফৎ-সমস্যা এবং জালিয়ানওয়ালাবাগ-অত্যাচারের কথা আলোচিত হয়। মতিলাল নেহরু তাতে গান্ধীর প্রস্তাব সমর্থন করেন; কিন্তু বিপিনচন্দ্র পাল, মদনমোহন মালবীয়, চিত্তরঞ্জন দাস, মহম্মদ আলি জিন্না, বিজয় রাঘব আচার্য প্রভৃতি নেতারা অসহযোগের শর্ত

হিসেবে ব্যবস্থা-পরিষদ বর্জনে সম্মত হননি। তৎসত্বেও গান্ধী যে প্রস্তাব করেছিলেন, সেইটিই গৃহীত হয়।[১৬]

১৯১৪-১৮-র যুদ্ধে সেবাকার্য চালিয়ে ব্রিটিশ সরকারের অনুগ্রহে গান্ধী যে কৈজরি-হিন্দ পদক পেয়েছিলেন, তা তিনি ফিরিয়ে দিলেন।

ব্যবস্থা-পরিষদ বর্জনের শর্তটি বাংলার চরমপন্থী নেতাদের মহলে চাঞ্চল্যের কারণ হয়ে রইলো। চিত্তরঞ্জন দাশ প্রভৃতি নেতারা কংগ্রেসের নির্দেশ পালন করলেন বটে, কিন্তু অসহযোগ-বিরোধিতার উদ্দেশ্যে পরবর্তী নাগপুর কংগ্রেসে (১৯২০; সভাপতি: বিজয়রাঘব আচার্য) তাঁরা বহু প্রতিনিধি নিয়ে উপস্থিত হলেন। সভায় গান্ধী-বিরোধী প্রধানদের মধ্যে ছিলেন মহম্মদ আলি জিন্না এবং আর-কয়েকজন। গান্ধীর ব্যক্তিত্বে এবং তাঁর ঋজু কর্মপন্থার ব্যাখ্যানে আকৃষ্ট হয়ে চিত্তরঞ্জন প্রভৃতি নেতারা তাঁরই প্রস্তাব সমর্থন করলেন। জিন্না কংগ্রেস ত্যাগ করলেন।

মনে পড়ে, ১৯১৯ সালে 'বাতায়নিকের পত্রে' রবীন্দ্রনাথ শিবের উল্লেখ করে সমস্ত দুঃখের মধ্যে মঙ্গলের আদর্শ মনে রাখবার পরামর্শ দিয়েছিলেন। আর, ১৯২১-সালের জানুয়ারি মাসে গান্ধী লিখেছিলেন—

> The Devil succeeds only by receiving help from his fellows. He always takes advantage of the weakest spots in our nature to gain

---

১৬। কংগ্রেস-সভায় অসহযোগের আবশ্যিক কৃত্য হিসেবে কয়েক দফা অনুষ্ঠানের সূত্র লিপিবদ্ধ হয়—

[ক] উপাধি বর্জন; অবৈতনিক পদ ও স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠানগুলির মনোনীত সদস্য-গণের সদস্যপদ ত্যাগ,

[খ] গবর্নমেন্ট দরবার, লেভী এবং সরকারী বা আধা-সরকারী সর্ববিধ অনুষ্ঠান বর্জন,

[গ] সরকারী বা সরকার অনুমোদিত স্কুল-কলেজ ক্রমিক বর্জন ও বিভিন্ন প্রদেশে জাতীয় স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠা,

[ঘ] উকিল মক্কেল কর্তৃক সরকারী আদালত বর্জন ও পক্ষ-প্রতিপক্ষের মধ্যে মামলা মেটাবার জন্যে সালিশী আদালত গঠন,

[ঙ] সৈন্য, কেরানি জনমজুরদের মেসোপোটেমিয়ায় কর্ম গ্রহণ করায় অস্বীকৃতি,

[চ] ব্যবস্থা-পরিষদে সদস্যপদ-প্রার্থীদের নির্বাচন পত্র প্রত্যাহার এবং যাঁরা এই নির্দেশ অমান্য করে প্রার্থী হবেন এমন সব প্রার্থীকে ভোট না দেওয়া,

[ছ] বিদেশী দ্রব্য বর্জন।

—'মুক্তির সন্ধানে ভারত': যোগেশচন্দ্র বাগল; (১৩৫২) পৃঃ ৩৭৫ দ্রষ্টব্য।

mastery over us. Even so does the Government retain control over us through our weaknesses or vices. And that we could render ourselves proof against its machinations, we must remove our weaknesses It is for that reason that I have called Non-co-operation a process of purification. As soon as that process is completed, this government must fall to pieces for want of necessary environment..... ১৭

তবু, গান্ধী এবং রবীন্দ্রনাথের মধ্যে দৃষ্টিভেদ ঘটেছিল। দুজনের ধ্যানে কিছু পার্থক্য ছিল; উভয়ে ঠিক এক দৃশ্য দেখেননি। অসহযোগের আদর্শ যখন উত্তেজনার ঝোঁকে প্রধানত ছাত্রদের বিদ্যাবর্জনের মধ্যেই আত্মপ্রকাশ করলো, রবীন্দ্রনাথ তখন ফ্রান্সে (১৯২০) ছিলেন। সেখান থেকে এণ্ডরুজ সাহেবকে তিনি লিখেছিলেন—

It is criminal to turn moral force into a blind force. ১৮

তৎসত্ত্বেও শান্তিনিকেতনের আশ্রমে তখন অসহযোগের উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছিল। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিধুশেখর শাস্ত্রী প্রভৃতি এই আন্দোলনে উৎসাহী ছিলেন। সৌকত আলিকে বিধুশেখর স্বয়ং রান্নাঘরে নিয়ে আহারে বসিয়েছিলেন।[১৯] হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতির দিক থেকে ব্যাপারটি উল্লেখযোগ্য সন্দেহ নেই! ক্ষেত্রান্তরে, আন্দোলনের অন্যান্য আয়োজনের মধ্যে অধ্যাত্মশক্তিকে অন্ধ মারণ শক্তিতে পরিণত করতে রবীন্দ্রনাথ কখনই রাজি ছিলেন না। তাঁর বন্ধু এণ্ডরুজ সাহেব এবং শান্তিনিকেতনের প্রবীণ ও বিশ্বস্ত অনুচরদের মধ্যে অনেকেই গান্ধীর এই আন্দোলনের কল্যাণকারিতায় নিঃসংশয় ছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন আর একদিক। ১৯২১ সালের ৮ই মার্চ শিকাগো থেকে জগদানন্দ রায়ের কাছে তিনি যে চিঠি লিখেছিলেন, তাতেই তাঁর বিশেষ দৃষ্টির নির্ভুল পরিচয় আছে—

সেদিন খবরের কাগজে পড়লুম মহাত্মা গান্ধী আমাদের মেয়েদের বলেছেন তোমরা ইংরেজি পড়া বন্ধ কর, সেইদিন বুঝেছি আমাদের দেশে দেয়াল গাঁথা সুরু হয়েছে, অর্থাৎ নিজের ঘরকে নিজের কারাগার করে তোলাকেই আমরা মুক্তির পথ বলে মনে করচি—আমরা বিশ্বের সমস্ত আলোককে বহিষ্কৃত করে দিয়ে নিজের ঘরের অন্ধকারকেই পূজা করতে বসেছি—একথা ভুলচি, যে-সব দুর্দান্ত জাতি পরকে আঘাত করে বড়

১৭। Young India, January, 19, 1921.

১৮। 'Letters from Abroad' : Rabindranath Tagore.

১৯। রবীন্দ্র-জীবনী—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়; [১৯২১ খ্রীঃ] দ্রষ্টব্য।

হতে চায় তারাও যেমন বিধাতার ত্যাজ্য তেমনি যারা পরকে বর্জন করে স্বেচ্ছাপূর্বক ক্ষুদ্র হতে চায় তারাও তেমনি বিধাতার ত্যাজ্য।২০

১৩২৮ সালের জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়ের 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের একাধিক চিঠিতে এবং তা ছাড়া চৌরিচৌরা হত্যাকাণ্ডের আগেই ১৯২২ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারির The Bengali পত্রিকায় তাঁর যে চিঠি ছাপা হয়, তাতেও তাঁর এই মনোভাবই ফুটেছিল।

গান্ধী-রবীন্দ্রনাথের এই মতভেদের প্রসঙ্গ এখানে অবান্তর নয়। সত্যেন্দ্রনাথ এই দুই মনীষীরই ভক্ত ছিলেন। শতাব্দীর দ্বিতীয়-তৃতীয় দশকের সন্ধিকালে চিত্তরঞ্জনের ত্যাগের দৃষ্টান্তে এবং অন্যান্য বহু ত্যাগব্রতী ব্যক্তির গান্ধী-প্রীতির প্রভাবে গান্ধীর আসন যখন বাংলার জনচিত্তের শীর্ষস্থানে সুপ্রতিষ্ঠিত, তখন পশ্চিম-প্রবাসী রবীন্দ্রনাথের স্বাতন্ত্র্য ছিল নিঃসঙ্গতার নামান্তর! এই সময়ের একখানি চিঠিতে এণ্ডরুজ সাহেবকে তিনি লিখেছিলেন—

> I am afraid I shall be rejected by my own people when I go back to India. ২১

বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথের সে মনোভাবের অংশীদার যে আর কেউ ছিলেন না, তা নয়। ১৩২৭ সালে 'সবুজ পত্র' জানিয়েছিলেন—

> বর্তমানে নন-কো-অপারেশন মুভ্‌মেণ্টের সবার চাইতে interesting ব্যাপার হয়ে উঠেছে কলিকাতায় ছাত্রদের ইস্কুল কলেজ ত্যাগ।...
>
> ...যেমনি ব্যারিষ্টার চিত্তরঞ্জন দাশ ঘোষণা করলেন যে, তিনি ইংরেজের আদালতে আইনের মুন্সিগিরি আর করবেন না—অমনি কলিকাতাব্যাপী হৈ হৈ ব্যাপার রৈ রৈ কাণ্ড।...
>
> ...এটা ছাত্রদের নন্‌ কো-অপারেশনও নয়, পলিটিক্স করাও নয়,—এটা হচ্ছে তাদের ভক্তিযোগ বা ভক্তিরোগ। রোগ বলছি এই জন্যে যে, যে-কোন বস্তুর আত্যন্তিক অবস্থাই রোগবিশেষ।...
>
> ...গুজরাতের শ্রীযুক্ত মোহনচাঁদ (sic) করমচাঁদ গান্ধী যে mass-এর কাছে দেবতা হয়ে উঠেছেন তা ত চোখেই দেখছেন ও কানেই শুনছেন। কিন্তু তিনি যদি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কাছেও তাই হয়ে ওঠেন তবে গান্ধীজির পুজো চলতে পারে বটে কিন্তু দেশসেবায় মন অন্যমনস্ক হবেই হবে কিছু। কেননা দেশ জিনিসটার অনেকখানিই abstract, অন্তত এ কালে তাই হয়ে উঠেছে; সুতরাং তা বুঝতে হলে জ্ঞান জিনিসটা

২০। প্রবাসী, ১৩২৮, জ্যৈষ্ঠ।

২১। 'Letters from Abroad': Rabindranath Tagore.

আহরণ দরকার, অপরপক্ষে মানুষ জিনিসটার অনেকখানিই concrete,—তা দেখতে হলে চোখ খুললেই যথেষ্ট।...২২

এই দু'তরফের দুরকম ধারণার মধ্যে ঐতিহাসিক সত্যের খাতিরেই আরো কয়েকটি বিষয় স্মরণীয়। 'বয়কট্'-আন্দোলনের ফলে একদিকে যেমন 'গোলামখানা' অপবাদ দিয়ে বিদ্যালয় বর্জনের হুজুগ চলেছিল, অন্যদিকে তেমনি অনেক জাতীয় বিদ্যালয়ও গড়ে উঠেছিল। মহারাষ্ট্রে, অন্ধ্রদেশে, পাটনায়, আলিগড়ে, কলকাতায়, বারাণসীতে সে সময়ে নানা নামে নানা শিক্ষায়তন স্থাপিত হয়। অন্য দিকে আন্দোলনের ফলে সারা ভারতের নারীসমাজে নতুন এক সাড়া জেগেছিল। কস্তুরবাঈ, সরোজিনী নাইডু, বাসন্তী দেবী—এঁরা তো ছিলেন-ই, এঁরা ছাড়া চিত্তরঞ্জনের বোন উর্মিলা দেবী, মোহিনী দেবী প্রভৃতি আরো অনেক মহিলা-কর্মীর নাম ইতিহাসের এই পর্বে প্রসিদ্ধ হয়ে উঠেছিল। নারীসমাজের জাগরণ এবং নারীর অধিকার সম্বন্ধে পুরুষদের সহানুভূতি—দুটি লক্ষণই তখন ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছিল।

বাংলার প্রত্যন্তবর্তী পল্লী-অঞ্চলেও উৎসাহ উদ্দীপনার প্রসার ঘটেছিল। সত্যেন্দ্রনাথ যখন 'চরকার গান' লিখছিলেন, সে সময়ে বাংলার পল্লী-অঞ্চলের মেয়েরা গাইতেন—

চরকা আমার সোয়ামি পুত, চরকা আমার নাতি
চরকার দৌলতে মোর দুয়ারে বাঁধা হাতি।

শরৎচন্দ্রের 'নারীর মূল্য' (প্রথম প্রকাশ : 'যমুনা' : ১৩২০), 'পল্লীসমাজ' ('ভারতবর্ষ' : ১৩২২) প্রভৃতি রচনা বাংলা দেশের মনকে কয়েক বছর আগে থেকেই নারীজীবন এবং পল্লীজীবন সম্বন্ধে সমবেদনাশীল করে তুলেছিল। অসহযোগ-আন্দোলন এসে দেশের সেই নবজাগ্রত চেতনায় আরো কিছু উদ্দীপনা জুগিয়েছিল।

১৯২১ সালের এপ্রিল মাসে লর্ড রেডিং বড়লাট হয়ে ভারতে পদার্পণ করার কিছু পরে ২১এ নভেম্বর তারিখে যুবরাজ প্রিন্স অব্ ওয়েল্স্ বোম্বাইয়ে এলেন। ইতিমধ্যে আসামের চা-বাগানের শ্রমিক-ধর্মঘট, আসাম-বেঙ্গল-রেল-ধর্মঘট, আগ্রা-অযোধ্যার কৃষক-আন্দোলন, পাঞ্জাব অঞ্চলে শিখ-সত্যাগ্রহ, বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের নেতৃত্বে মেদিনীপুর কাঁথি অঞ্চলে আন্দোলন—ইত্যাদি

২২। 'সবুজ পত্র' : ফাল্গুন, ১৩২৭ (আবুল ফজলের পত্র)।

ব্যাপার ঘটে গেল। ২১এ নভেম্বর যুবরাজের আগমন উপলক্ষে সারা ভারতে হরতাল হয়। বোম্বাইয়ে জনসাধারণ অসংযত, উচ্ছৃঙ্খলতার পরিচয় দেওয়ায় গান্ধী পাঁচদিন অনশন করলেন। দাঙ্গা থেমে যাবার পরে সরকারের দমন-ব্যবস্থা আবার প্রচণ্ড হয়ে উঠলো। চিত্তরঞ্জন, সুভাষচন্দ্র, আবুল কালাম আজাদ, মতিলাল এবং জহরলাল নেহরু ইত্যাদি বহু নেতা বন্দী হলেন। ১৯২১ সালের আহমেদাবাদ-কংগ্রেসে কারারুদ্ধ চিত্তরঞ্জনের লিখিত অভিভাষণ পড়লেন সরোজিনী নাইডু। এই অধিবেশনে খিলাফৎ-সমস্যা, পাঞ্জাবের অত্যাচার এবং স্বরাজের দাবী সম্পর্কে সরকার-পক্ষের উপেক্ষার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে গান্ধী আঠার-বছরের বেশি বয়সের স্ত্রী-পুরুষকে স্বেচ্ছাসেবক নিযুক্ত করার নির্দেশ দিলেন। স্বেচ্ছাসেবকদের কাজের প্রধান শর্ত এই ছিল যে, তাঁরা অহিংস হবেন এবং হিন্দু-মুসলমান-ঘটিত সাম্প্রদায়িকতা আর অস্পৃশ্যতা সর্বপ্রকারে বর্জন করবেন। তা'ছাড়া, দেশের সমস্ত অধিবাসীকেই খদ্দর ব্যবহারের, সুরা-বর্জনের এবং (হিন্দুদের ক্ষেত্রে) অস্পৃশ্যতা বিতাড়নের নির্দেশ দেওয়া হোলো।

কংগ্রেসের ইতিহাসে কয়েক মাসের মধ্যেই আরো কয়েকটি ঘটনা ঘটে গেল। বার্দৌলি এলাকায় গান্ধী-প্রবর্তিত খাজনা বন্ধের অন্দোলন শুরু হোলো। পূর্ণ সত্যাগ্রহীর কর্তব্যবোধেই তিনি সে আন্দোলনের নেতৃত্ব করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু উত্তেজিত জনতা ১৯২২ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারি উত্তর-প্রদেশের (পূর্বকালের যুক্তপ্রদেশ) গোরক্ষপুর জেলার অন্তর্গত চৌরী-চৌরা থানার একজন দারোগা এবং একুশ জন সিপাহীকে পুড়িয়ে মেরেছে শুনে গান্ধী মর্মাহত হয়ে তাঁর আইন-অমান্য-আন্দোলন 'হিমালয় প্রমাণ ভুল' আখ্যা দিয়ে অনির্দিষ্টকালের জন্যে আন্দোলন বন্ধ করে দিলেন। আগেকার চরকা, সুরা-বর্জন, অস্পৃতা-বিতাড়ন প্রভৃতি গঠনমূলক কাজগুলি পরবর্তী কর্মপদ্ধতিতে স্থান পেলো বটে, কিন্তু উৎসাহের নেশা-লাগা জন-সাধারণের মন তা'তে নৈরাশ্য বোধ করলো!

মার্চ মাসে রাজদ্রোহের অপরাধে বন্দী হয়ে বিচারে তিনি ছ'বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন।

অতঃপর ১৯২২ সালের গয়া-কংগ্রেসে নরম ও চরম পন্থীদের মধ্যে দীর্ঘ-লালিত ভেদ-রেখাটি প্রশস্ত হয়। চিত্তরঞ্জন, মতিলাল, বিঠলভাই পটেল

প্রভৃতি চরমপন্থীরা কংগ্রেসের নিয়মাধীন থেকে পৃথক এক 'স্বরাজ্যদল' গঠন করেন। প্রধানত 'কৌন্সিল'-প্রবেশ সমর্থনের আদর্শেই এই নতুন দল ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলেন।

ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় মুক্তি-সংগ্রামের ধারায় এর পরে ১৯২৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসটি বিশেষ স্মরণীয়। অসুস্থ অবস্থায় কারামুক্ত হয়ে গান্ধী বোম্বাইয়ের সমুদ্রতীরে জুহু-স্বাস্থ্যনিবাসে কিছুকাল বাস করলেন। 'নরম' এবং 'চরম'—দু'দলের সঙ্গেই তাঁর আলাপ-আলোচনা চললো। চিত্তরঞ্জন-সুভাষচন্দ্রের স্বরাজ্যপন্থী মতামত এবং রাজাগোপাল প্রভৃতির নরমপন্থী মন্তব্য ইত্যাদি শুনে পরবর্তী কার্যক্রমের দিকে তিনি নিজেও এগিয়ে গেলেন, তাঁর সঙ্গে দেশের আন্দোলনও এগিয়ে গেল।

গয়া-কংগ্রেসের আগেই ১৯২২ সালের জুন মাসে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের মৃত্যু হয় (১০ই আষাঢ়, ১৩২৯ সন)। তার আগের মাসের 'প্রবাসী'তে (জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯) কাজী নজরুল ইস্‌লামের একটি কবিতা ছাপা হয়েছিল। সে লেখাটির নাম 'প্রলয়োল্লাস'। সত্যেন্দ্রনাথ যখন মারা গেলেন, দেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রলয়োল্লাস তখন সুস্পষ্ট।

উনিশ শতকের শেষ দশক থেকে যাত্রা শুরু করে ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দ অবধি ভারতবর্ষের মুক্তি-আন্দোলনের যে সংক্ষিপ্ত ঘটনাধারা এখানে দেওয়া হোলো, তা থেকে দেশের রাষ্ট্র, শিক্ষা, সমাজ ও ধর্মসম্পর্কিত অবস্থার কিছু পরিচয় পাওয়া গেল। সে সময়ে মুসলিম-লীগ, হিন্দু-মহাসভা, সন্ত্রাসবাদী নানা দল, বিপ্লবী শ্রীসংঘ, অনুশীলন-সমিতি, যুগান্তর দল ইত্যাদি বহু শ্রেণী-রাজনৈতিক মত ও পথের পৃথক অস্তিত্ব সত্বেও কংগ্রেসই ছিল প্রধানতম বহু রাজনৈতিক গোষ্ঠি; এবং যদিও রাষ্ট্রীয় আন্দোলনই ছিল এই শতকের প্রথম পাদের প্রধান মনোযোগের বিষয়, তথাপি রাষ্ট্রীয় কর্মচাঞ্চল্যের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা, সমাজ এবং ধর্মের ক্ষেত্রেও নতুন ভাবধারার প্রভাব পড়েছিল। বিশ্লেষণ করে সূত্রাকারে এই পর্বের সামাজিক আদর্শ পরিবর্তনের এবং নতুন প্রবণতা স্বীকৃতির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে হলে প্রধানত এই ক'টি বিষয়ের উল্লেখ অনিবার্য বলে মনে হয়—

[ক] ধনী-নির্ধন নিম্নবিত্ত-মধ্যবিত্তের মধ্যে পারস্পরিক আত্মীয়তাবোধের কিঞ্চিৎ অনুশীলন,

[খ] কতকটা আদর্শের খাতিরে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে তথাকথিত অশিক্ষিতদের সম্বন্ধে উপেক্ষা-হ্রাস,

[গ] কায়িক শ্রমের মর্যাদাবৃদ্ধি,

[ঘ] দেশের পুজাপার্বণের মধ্য দিয়ে গণসম্মেলনের আগ্রহ বৃদ্ধি,

[ঙ] অস্পৃশ্যতা বর্জনের প্রতি কথঞ্চিৎ আগ্রহ,

[চ] সুরানিবারণী প্রচেষ্টা,

(ছ) সাম্প্রদায়িক স্বার্থ-প্রসূত পার্থক্য সত্ত্বেও বাংলা দেশের হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে, ঐক্যচর্চার বহু দৃষ্টান্ত।

ধর্মের ক্ষেত্রে দেশের সুবিপুল সংকীর্ণতা কাটিয়ে ওঠবার চেষ্টা শহর-অঞ্চলের শিক্ষিত হিন্দু অধিবাসীদের দিক থেকে ক্রমশ পল্লী-অঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়েছিল। সন্ত্রাসবাদীরা আপন আপন প্রয়োজন বা বিশ্বাস অনুসারে সেকালে শক্তিপূজা করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠে'—'মা যাহা হইয়াছেন' —সেই কল্পনার সূত্রে 'অন্ধকারসমাচ্ছন্না কালিমাময়ী কালীমূর্তির' উল্লেখ ছিল। মহেন্দ্রের কাছে ব্রহ্মচারী সত্যানন্দ ঠাকুরের কালীমূর্তি ব্যাখ্যানের দৃশ্যটি এই সূত্রে স্মরণীয়।[২৩] রাষ্ট্র-দুর্যোগের সঙ্গে সঙ্গে শক্তিতন্ত্রের অভ্যুদয়ের দৃষ্টান্ত 'আনন্দমঠ' রচনার আগেও অনেকবার দেখা গেছে। ষোড়শ-সপ্তদশ শতকের সীমানা ছেড়ে এসে উনিশ শতকেও এ-রকম ঘটনার দৃষ্টান্ত পাওয়া যাচ্ছে। ১৮৭৬ সালে রাজনারায়ণ বসুর নেতৃত্বে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-বাড়িতে 'হানচু পামু হাফ্' নামে যে অভিনব গুপ্ত সমিতিটি স্থাপিত হয়েছিল, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি থেকে তারই আংশিক পরিচয় পাদটীকায় তুলে দেওয়া হোলো।[২৪]

দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণের শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দের অভ্যুদয়ের ফলে সে-সময়ে রাষ্ট্র, সমাজ এবং ধর্ম—এই তিন দিকেই উদ্দীপনা সমন্বয়ের কাজ এগিয়েছিল। মনে পড়ে পরিব্রাজক বিবেকানন্দ দেশের শাসক-সম্প্রদায়ের উদ্দেশে বলেছিলেন—

> You Christians who are so fond of sending out missionaries to save the souls of the heathen, why do you not try to save

---

২৩। "কালী—অন্ধকার সমাচ্ছন্না কালিমাময়ী। হৃতসর্বস্বা, এই জন্য নগ্নিকা। আজ দেশে সর্বত্রই শ্মশান—তাই মা কঙ্কালমালিনী। আপনার শিব আপনার পদতলে দলিতেছেন—হায় মা!"—আনন্দমঠ

২৪। "টেবিলের দুই পাশে দুইটি মড়ার মাথা থাকিত, তাহার দুইটি চক্ষুকোটরে দুইটি মোমবাতি বসানো ছিল। মড়ার মাথাটি মৃত ভারতের সাংকেতিক চিহ্ন। বাতি দুইটি জ্বালাইবার এই অর্থ যে মৃত-ভারতে প্রাণ সঞ্চার করিতে হইবে ও তাহার জ্ঞান-চক্ষু ফুটাইয়া তুলিতে হইবে।"

> their bodies from starvation?...It is an insult to a starving people to offer them religion; it is an insult to a starving man to teach him metaphysics.

আমাদের বহুদিনের বৈষ্ণব সহনশীলতার ঐতিহ্য তখনো সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হয়নি বটে, তবে শাক্ত আদর্শের দিকেই দেশের মনের একটি ধারা তখন নিঃসন্দেহে উন্মুখ হয়ে উঠেছিল। গান্ধীর অহিংসা, সত্যাগ্রহ এবং বিশেষভাবে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ-নীতির ফলে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই ঐক্যের ইচ্ছা বলবতী হয়েছিল। ব্রাহ্মসমাজের সর্বাঙ্গীন মুক্তিসাধনার আদর্শে বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, দেবব্রত বসু, কানাইলাল দত্ত প্রভৃতি বিপ্লবীরা প্রভাবিত হয়েছিলেন।[২৫] অরবিন্দ ঘোষের জীবনে সে-সময়ে সন্ত্রাসবাদ এবং বেদান্ত, এই দুই বিপরীত ভাবের অনুশীলন চলছিল। অরবিন্দের এই ভিন্ন ভিন্ন মনোভাব যেহেতু তাঁর জীবনের ভিন্ন ভিন্ন পর্বে দেখা দিয়েছিল, সুতরাং তা নিয়ে বাদানুবাদ অনুচিত,—বাংলাদেশের সংস্কৃতিক্ষেত্রে প্রায় বছর পঁচিশেক আগে (আনুমানিক ১৯২০-১৯৩০) এই ধরনের আলোচনাও বিশেষ বাদ-প্রতিবাদের প্রেরণা জুগিয়েছিল।[২৬] সৈয়দ আমির আলির Central Mohammedan Association-এর প্রেরণায় বাংলায় মুসলমানরা বহুস্থানে 'আঞ্জুমান' স্থাপন করে হিন্দু-মুসলমানের পার্থক্য-বুদ্ধি জাগিয়ে তোলবার চেষ্টা করেছিলেন বটে; কবি ইকবালের (১৮৭৩-১৯৩৮) প্রভাবে সে-সময় শিক্ষিত বাঙালী মুসলমান আত্মশক্তির পূর্ণ দায়িত্ববোধ স্বীকার করতেও বেশ কিছুটা উৎসাহিত হয়েছিলেন; কিন্তু তৎসত্ত্বেও দেশের মুক্তিসাধনায় স্থিতলক্ষ্য বহু শক্তিমানের প্রভাবে সাম্প্রদায়িকতা প্রতিরোধের অদম্য বাসনা সে যুগে নানাভাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। সে ব্যাপারে কংগ্রেসী এবং সন্ত্রাসবাদী উভয় দলের মধ্যেই ঐক্য ছিল।[২৭]

২৫। এ বিষয়ে ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের 'ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম: অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাস' (১ম খণ্ড) দ্রষ্টব্য। তবে ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব সম্বন্ধেও বিস্তৃততর আলোচনার অবকাশ আছে।

২৬। 'বাংলার বিপ্লব প্রচেষ্টা': শ্রীহেমচন্দ্র কানুনগো—এবং 'নির্বাসিতের আত্মকথা': শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দ্রষ্টব্য।

২৭। বিপ্লবী উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আন্দামানের নির্বাসন-অভিজ্ঞতা সম্পর্কে লিখেছেন:

'আমরা হিন্দু মুসলমান সকলকার হাত হইতেই নির্বিচারে রুটি খাই বলিয়াই মুসলমানেরা

বিশ শতকের প্রথম পাদের দেশাত্মবোধ বাঙালীকে জাতি-ধর্ম-আচারভেদের সংকীর্ণতা বর্জনের পথ দেখিয়েছিল। সেই উদ্দীপনাময় যুগসন্ধিতে বাস করে সত্যেন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—

এক অরূপের অঙ্গ মোরা লিপ্ত পরস্পর,—
নাড়ীর যোগে যুক্ত আছি নইক স্বতন্তর ;
একটু কোথাও বাজলে বেদন বাজে সকল গায়,
পায়ের নখের ব্যথায় মাথার টনক নড়ে যায় ,
ভিন্ন হয়ে থাকব কি, হায়, মন মানেনা বুঝ,—
ছিন্ন হয়ে বাঁচতে নারি —নইরে পুরুভুজ।২৮

রাষ্ট্র, সমাজ, ধর্ম এবং শিক্ষা—এই চতুর্দিকের ভাববন্যায় পুষ্টি লাভ করে শতকের প্রথম পঁচিশ বছরের পর্বটি দেশব্যাপী কর্মনিষ্ঠা এবং মানসিক সম্প্রসারণের লক্ষণে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল। এই চতুর্মুখী জাগরণের অধ্যাত্মকথা প্রকাশিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের গল্পে, কবিতায়, প্রবন্ধে, উপন্যাসে, চিঠিপত্রে। ১৯০৫ সালে প্রকাশিত 'আত্মশক্তি' থেকে আরম্ভ করে পর্যায়ক্রমে 'ভারতবর্ষ' (১৯০৬), 'রাজা প্রজা' (১৯০৮), 'সমূহ' (ঐ), 'স্বদেশ' (প্রবন্ধ : ঐ), 'সমাজ' (ঐ) ইত্যাদি প্রবন্ধসংগ্রহগুলির মধ্যে তাঁর উপলব্ধির প্রকাশ ঘটেছিল। ১৯২১ সালে প্রকাশিত তাঁর 'শিক্ষার মিলন' রচনাটিও এই প্রসঙ্গে বিশেষ স্মরণীয়।

সত্যেন্দ্রনাথের কবিতায় বাঙালীর সমকালীন শিক্ষাদর্শ বা শিক্ষাবিধি সম্পর্কে বিশেষ কোনো উল্লেখ নেই। হয়তো, গীতিকবিতার বাহনে সে প্রদেশের আলোচনা সংগতও নয়, প্রত্যাশিতও নয়। রবীন্দ্রনাথ নিজেও সে-সব বিষয়ে কবিতায় মন্তব্য প্রকাশ করেন নি—তাঁর মতামত জানিয়েছেন প্রবন্ধের মাধ্যমে। স্ত্রী-পুরুষ-শিশু-বৃদ্ধ নির্বিশেষে যে-শিক্ষা আত্মশক্তি ও সংঘকল্যাণের পক্ষে প্রকৃত সহায়ক, রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সেই শিক্ষারই পক্ষপাতী। কিছু কিছু পার্থক্য সত্ত্বেও গান্ধী-প্রচারিত শিক্ষাবিধিতে এবং এই পর্বের জাতীয় শিক্ষা-আন্দোলনের অন্যান্য পরিকল্পনা বা প্রচেষ্টার মধ্যেও এই মূল লক্ষ্যটি

প্রথম প্রথম আমাদের পরকালের সম্পত্তির আশায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল, হিন্দুরা কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল ; শেষে বেগতিক দেখিয়া উভয় দলই স্থির করিল যে আমরা হিন্দুও নই, মুসলমানও নই—আমরা বাঙালী! রাজনৈতিক কয়েদী মাত্রেরই শেষে সাধারণ নাম হইয়া উঠিল—বাঙালী।'—'নির্ব্বাসিতের আত্মকথা', ১০ম পরিচ্ছেদ।

২৮। 'সেবা সাম'—বিদায়-আরতি : সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

নিষ্ঠাবান ছিল। দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ সমালোচনা অথবা শিক্ষার আদর্শ সম্পর্কে স্পষ্ট কোনো ঘোষণা সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর কোনো কবিতাতে প্রকাশ করেন নি বটে, কিন্তু তাঁর আপন দেশ-কালের প্রত্যক্ষ যে শিক্ষা তিনি নিজের আয়ুকালের বিচিত্র ঘটনাসূত্রে পেয়েছিলেন, তা তাঁর বহু কবিতার মধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে। 'কুহু ও কেকা'র 'শূদ্র', 'মেথর' প্রভৃতি কবিতায়,—তার অনেক আগে 'বেণু ও বীণা'র নানা কবিতায় এবং আরো বেশি পরিমাণে তাঁর শেষ জীবনের কয়েকটি রচনায় দেশ-কালের প্রত্যক্ষ শিক্ষারই স্বাক্ষর পড়েছিল। শেষ পর্বের একটি কবিতায় তিনি লিখেছিলেন—

> পাইকারীতে তরায় না আর জাতের টিকিট মাথায় এঁটে,
> সে যুগ গেছে, সে দিন গেছে, সে কুয়াসা যাচ্ছে কেটে।
> সেক্সপীয়রের স্বজাত বলে পুজবে না কেউ কিপ্‌লিঙেরে,
> চৌচাপটে ভক্তি করার রোগটা ক্রমে আসছে সেরে!
> বার্ক-সেরিডান্ মহৎ বলে ইম্পে-ক্লাইব পুজবে কে বা?
> হেয়ার-বেথুন স্মরণ করে গৌৎকা গোরার চরণ-সেবা?
> কর্জনেরে কেউ দেবে না লর্ড ক্যানিঙের প্রাপ্য কভু
> লঙ্‌ সাহেবের মর্যাদা কি লুটবে জিঙ্গো পাদরী প্রভু?[২৯]

বিশ শতকের প্রথম পঁচিশ বছরের মধ্যেই বাংলার সংস্কৃতির ইতিহাসে বিচিত্র এই সর্বোদয়ের সম্ভাবনা দেখা গিয়েছিল।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় সেই সম্ভাবনার স্পষ্ট অভিব্যক্তি ফুটেছে। একদিকে তিনি যেমন 'পিয়ানোর গান', 'পাল্কীর গান', 'ঝর্নার গান', 'কাজরী', 'গরবা', 'চরকার গান' প্রভৃতি প্রসঙ্গে ধ্বনি-বৈচিত্র্য সৃষ্টির উৎসাহে বিভোর হয়েছিলেন,—অথবা, 'ঘুমতী নদী', 'হিন্দোল বিলাস', 'জাফরানিস্থান', 'ফুলমুলুকের গান' ইত্যাদি বিষয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন দৃশ্য-গন্ধ-মাধুর্যের বর্ণনায় অক্লান্ত উৎসাহী ছিলেন,—অন্য দিকে তেমনি বাংলাদেশের 'কচি মেয়ের একাদশী' ('নির্জলা একাদশী'), দক্ষিণ-আফ্রিকার গান্ধী-আন্দোলন ('ইজ্জতের জন্য'), স্নেহলতার আত্মহত্যা ('মৃত্যু স্বয়ম্বর'), প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধে বাঙালী সেনাবাহিনীর উৎসাহ ('বাঙালী পল্টনের গান'), কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা সাহিত্যের পঠন-পাঠনের রীতি ('নাপ্তি-পীরিতি কথা'), হেদুয়া-পুষ্করিণীতে সাঁতারুদের কলা-কৌশল ('জলচর ক্লাবের জলসা রঙ্গ') ইত্যাদি দেশ-বিদেশের সমকালীন বহু ঘটনা ও বিচিত্র যুগানুভূতি অবলম্বন করে কাব্য রচনা করে গেছেন।

২৯। আখেরী।

'ভারতী'-গোষ্ঠীর কবি হেমেন্দ্রকুমার রায় লিখেছিলেন—

মণিলাল, সত্যেন্দ্র, অজিতকুমার, দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ, চারুচন্দ্র, সৌরীন্দ্রমোহন, মোহিতলাল, সুরেশচন্দ্র, কিরণধন, প্রেমাঙ্কুর ও নরেন্দ্র দেব প্রভৃতি লেখকরা রবীন্দ্রনাথের আওতার ভিতর থেকেই স্ব স্ব বিভাগে অল্পবিস্তর নূতনত্ব সৃষ্টির জন্ম চেষ্টা করেছেন প্রাণপণে। বিচ্ছিন্ন ভাবে থাকলে তাঁদের ব্যক্তিগত ভঙ্গি হয়তো বিশেষ ভাবে সফল হতে পারত না, কিন্তু সংহতির গুণে তাঁরা রবিমণ্ডলের ভিতরে থেকেও তখনকার বাংলা সাহিত্যের ধারাকে আধুনিক যুগের দিকে যে অনেকটা এগিয়ে আনতে পেরেছেন, সে বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশের অবকাশ নেই।…

সত্যেন্দ্রের…জীবনের উপরে যে দুই মহামানুষের প্রভাব পড়েছিল সবচেয়ে বেশী, তারা হচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজী।১

আবার সেকালের রবীন্দ্র-প্রভাব সম্বন্ধে মোহিতলাল লিখেছিলেন—

রবীন্দ্রনাথ যে কাব্যজগতের প্রতিষ্ঠা করিলেন, তাহা যেমন অত্যুচ্চ কল্পনার জগৎ, তাহার গীতিমূর্চ্ছনায় যেমন ঊর্ধ্বতম আকাশের নক্ষত্রলোক স্পন্দিত হইতে লাগিল—তেমনই, তাহার অন্তর্গত সেই দুর্ধর্ষ আত্মকেন্দ্রিকতাই, দেহ-বাস্তবের যে ব্যক্তিত্ব, তাহাকে একরূপ অস্বীকার করিল,··সে কবিতায় কবির যে ব্যক্তিত্ব-আছে, তাহা ব্যক্তি-মানুষের ব্যক্তিত্বকে অতিক্রম করিয়া একটা ঊর্ধ্ব-ভূমিতে মানব-সাধারণের সহিত আত্মীয়তা স্থাপন করিয়াছে, সেই সার্বজনীন ব্যক্তিত্বের যোগেই আমরা ঐ কবির সাযুজ্যলাভ করিতে পারি, এবং তাহা করিতে পারিলে যে রস আস্বাদ করা যায় তাহা এই দেহগত ব্যক্তিত্বের ভাবোদ্ধৃত রস নয়, তাহাই খাঁটি রস,—যেমন উৎকৃষ্ট সঙ্গীতের রস, যে রসকে আমাদের আলঙ্কারিক 'ব্রহ্মাস্বাদ-সহোদর' বলিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ সেই রসেরই রূপ-সৃষ্টি করিয়াছেন—তেমন আর কোন কবি করিতে পারেন নাই।…এ রসে সকলের অধিকার নাই, তথাপি রবীন্দ্রনাথের কবিতার প্রসাধন-কলা এমনই মনোহর যে, নিম্নাধিকারেও তাহা হইতে যেটুকু রস আদায় করা যায়, তাহাতে আকৃষ্ট হওয়া যেমন সহজ, বদ্ধ হওয়াও তেমনই অনিবার্য। ইহার ফলে, বাংলা কাব্যে একটা নূতনতর কাব্য-কলার প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। রবীন্দ্রকাব্যের সেই গূঢ় অন্তর্নিহিত রস সাধারণের পক্ষে দুর্লভ হইয়া রহিল বটে, কিন্তু ঐ কাব্যকলাই একটি নূতন কবি-সম্প্রদায়ের প্রধান উপজীব্য হইয়া উঠিল।২

১। 'মণিলালের আসর': হেমেন্দ্রকুমার রায় (মানসী ও মর্মবাণী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৬ দ্রষ্টব্য)।

২। 'সাহিত্য-বিতান': মোহিতলাল মজুমদার (১৩৫৬) পৃঃ ১৯১-১৯২।

(বিশ শতকের বাংলা কবিতায় রবীন্দ্র-প্রভাবের বিকিরণ ঠিক যে ঐ শতকেই শুরু হয়েছিল, তা নয়। অতি অল্প বয়সেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনুকরণকারী কবিগোষ্ঠী সৃষ্টি করেছিলেন। তবে, মোহিতলাল ঠিকই লিখেছেন,—রবীন্দ্র-কাব্যের 'খাঁটি রসে' অল্প লোকেরই অধিকার ছিল। রবীন্দ্র-কাব্যের প্রসাধনসৌকর্যই ছিল সাধারণের আকর্ষণের বিষয়। প্রথম যুগে তাঁর বোদ্ধা পাঠকের সংখ্যা ছিল নগণ্য। উনিশ শতকের শেষ পাদে 'ভারতী' (১২৮৪)[৩], 'বালক' (১২৯২)[৪], 'সাধনা' (১২৯৮)[৫], পুণ্য (১৩০৪)[৬] ইত্যাদি পত্রিকার গোষ্ঠীবন্ধনে রবীন্দ্র-প্রভাবের চিহ্ন দেখা গিয়েছিল। এই পর্বে গদ্যের ক্ষেত্রে ঠাকুর-পরিবারের সুধীন্দ্রনাথ, ঋতেন্দ্রনাথ প্রভৃতি লেখকরা যেমন রবীন্দ্র-প্রভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, কবিতার ক্ষেত্রে তেমনি বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রিয়ংবদা দেবী প্রভৃতি লেখক-লেখিকা তাঁর মননের বিশিষ্টতার আকর্ষণ স্বীকার করেছিলেন। ১৩০৮ থেকে ১৩১৩ সাল পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ নব-পর্যায় 'বঙ্গদর্শন' সম্পাদনা করেন। সেই সময়ের রবীন্দ্র-প্রভাবিত কবিদের মধ্যে নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য [রবীন্দ্রনাথ এই লেখকের 'গৃহহারা' (১৩১২) গাথাকাব্যের পাণ্ডুলিপি দেখে দিয়েছিলেন], গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম স্মরণীয়। 'বঙ্গদর্শনে'র সম্পাদনা-ভার গ্রহণ করে রবীন্দ্রনাথ লিখে ছিলেন—

> এখন লেখক ও পাঠকের সংখ্যা গণিয়া উঠা কঠিন। এখন রচনা বিচিত্র ও রুচি বিচিত্র।...
>
> ...এখনকার সম্পাদকের একমাত্র চেষ্টা হইবে বর্তমান বঙ্গচিত্তের শ্রেষ্ঠ আদর্শকে উপযুক্ত ভাবে এই পত্রে প্রতিফলিত করা।[৭]

৩। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংকল্পক্রমে, রবীন্দ্রনাথ ও অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী উৎসাহে, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পাদনায় ১২৮৪ সালের শ্রাবণ মাসে (১৮৭৭, জুলাই) প্রথম সংখ্যা 'ভারতী' প্রকাশিত হয়। ১২৯৩ সালে 'বালক'-পত্রিকা 'ভারতী'র সঙ্গে যুক্ত হয়। ১৩০৯ সালে রবীন্দ্রনাথ সম্পাদক হন।

৪। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর আনুকুল্যে ঠাকুর-পরিবারের তরুণ লেখকদের মুখপত্ররূপে এক বৎসর মাত্র প্রকাশিত হয়েছিল। জ্ঞানদানন্দিনী নামে সম্পাদিকা ছিলেন,—প্রকৃত সম্পাদক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ

৫। সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন সম্পাদক, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ছিলেন প্রকৃত কর্ণধার।

৬। হিতেন্দ্রনাথ ও ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্যোগে প্রকাশিত হয়।

৭। 'বঙ্গদর্শন' : ১৩০৮ দ্রষ্টব্য।

ক্লাসিক আদর্শে অল্পবিস্তর নিষ্ঠাবান্ মধুসূদন-হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্র—এই তিনজনের সমকালীন বিহারীলাল, অক্ষয় চৌধুরী প্রভৃতি কবিরা যখন অন্তরঙ্গ গীতিকবিতার নতুন যুগ সৃষ্টি করলেন, তখন খ্যাত-অখ্যাত বহু লেখকই কাব্য রচনায় নিযুক্ত ছিলেন। তাঁদের অনেকের লেখাতেই অল্পবিস্তর রবীন্দ্র-প্রভাব বিদ্যমান। যাঁদের জন্মকাল ১৮৫০ থেকে ১৮৭০ সালের মধ্যে,—এই পর্বের রবীন্দ্রানুসারী সেইসব কবিদের মধ্যে স্মরণীয় কয়েক জনের নাম পাদটীকায় সংকলিত হোলো।[৮] রবীন্দ্রনাথের প্রভাব এঁদের প্রত্যেকের রচনাতেই কোনো-না-কোনো ভাবে সঞ্চারিত হয়েছিল।

আবার, ১৮৭০ থেকে ১৯০০ সালের মধ্যে যাঁদের জন্ম-তারিখ, সত্যেন্দ্র-নাথের সমকালীন, রবীন্দ্র-প্রভাবিত সেইসব কবিদেরও অনুরূপ একটি তালিকা দেওয়া হোলো:

চিত্তরঞ্জন দাস (১৮৭০-১৯২৫), বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭০-১৮৯৯), হিরণ্ময়ী দেবী (জন্ম ১৮৭০), প্রমীলা (নাগ) বসু (১৮৭১-১৮৯৬), প্রিয়ংবদা দেবী (১৮৭১ ?-১৯৩৫), সরলা দেবী (জন্ম ১৮৭২), বিনয়কুমারী বসু (জন্ম ১৮৭২), প্রমথনাথ রায়চৌধুরী (১৮৭২-১৯৪৯), ভুজঙ্গধর রায়চৌধুরী (১৮৭২-১৯৪০), দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী (১৮৭৩-১৯২৭), রমণীমোহন ঘোষ (১৮৭৫-১৯২৮), করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৭-১৯৫১), যতীন্দ্রমোহন বাগচী (১৮৭৮-১৯৪৮), মৃণালিনী সেন (জন্ম ১৮৭৯), ইন্দিরা দেবী (১৮৭৯-১৯১৪), সতীশচন্দ্র রায় (১৮৮১-১৯০৩), কুমুদরঞ্জন মল্লিক (জন্ম ১৮৮২), সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৮৫-১৯২৯), যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (১৮৮৭-১৯৫৪), সুকুমার রায় (১৮৮৭-১৯২৩), কিরণধন চট্টোপাধ্যায় (১৮৮৭-১৯৩১), নরেন্দ্র দেব (জন্ম ১৮৮৮), মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৮৮-১৯২৯), হেমেন্দ্রকুমার

৮। রাজকৃষ্ণ রায় (১৮৪৯ ?-১৮৯৪), অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী (১৮৫০-১৮৯৮), দীনেশচরণ বসু (১৮৫২-৯৮), নবীনচন্দ্র দাস (১৮৫৩-১৯১৪), নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য (১৮৫৩-১৯৩৯), প্রিয়নাথ সেন (১৮৫৪-১৯১৬), গোবিন্দচন্দ্র দাস (১৮৫৫-১৯১৮), ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৫৬-১৮৯৭), গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী (১৮৫৭-১৯২৪), প্রসন্নময়ী দেবী (১৮৫৭-১৯৩৯), দেবেন্দ্রনাথ সেন (১৮৫৮-১৯২০), স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৮-১৯৩২), বিজয়চন্দ্র মজুমদার (১৮৬১-১৯৪২), দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩), মানকুমারী বসু (১৮৬৩-১৯৪৩), কায়কোবাদ (জন্ম ১৮৬৩), কামিনী রায় (১৮৬৪-১৯৩৩), রজনীকান্ত সেন (১৮৬৫-১৯১০), অক্ষয়কুমার বড়াল (১৮৬৫-১৯১৮), জগদিন্দ্রনাথ রায় (১৮৬৮-১৯২৬), প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬) ইত্যাদি।

রায় (জন্ম ১৮৮৮), মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮৮-১৯৫২), কালিদাস রায় (জন্ম ১৮৮৯), কান্তিচন্দ্র ঘোষ, বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (জন্ম ১৮৯০), সুশীলকুমার দে (জন্ম ১৮৯০), প্যারীমোহন সেনগুপ্ত (১৮৯৩-১৯৪৭), শান্তি পাল (জন্ম ১৮৯৪), নিরুপমা দেবী (জন্ম ১৮৯৫), কৃষ্ণদয়াল বসু (জন্ম ১৮৯৬), সুধীরকুমার চৌধুরী (জন্ম ১৮৯৭), দিলীপকুমার রায় (জন্ম ১৮৯৭), কাজী নজরুল ইস্‌লাম (জন্ম ১৮৯৯), জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪), সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী (১৮৯২ ?-১৯৫১), সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রলাল রায় ইত্যাদি।

উনিশ শতকের শেষ দিকেই রবীন্দ্রনাথের অনুরাগী অনুকরণশীল কবিদের লক্ষণীয় বেশ একটি গোষ্ঠি গড়ে উঠেছিল। রাজকৃষ্ণ রায় ('নিভৃত নিবাস' গাথাকাব্য এবং 'সোমরায়ের পদাবলী' স্মরণীয়), প্রিয়নাথ সেন('ভারতী', 'সাহিত্য' প্রভৃতি পত্রিকায় লিখতেন), ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ('চিন্তা'-কাব্যগ্রন্থে রবীন্দ্র-প্রভাব), প্রসন্নময়ী দেবী ('নীহারিকা' কাব্যগ্রন্থে রবীন্দ্র-প্রভাব,) মানকুমারী বসু ('কাব্য-কুসুমাঞ্জলি' ও 'কনকাঞ্জলি' স্মরণীয়), জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ ('বীণা ও বাঁশরী' স্মরণীয়), নিত্যকৃষ্ণ বসু ('মায়াবিনী' স্মরণীয়), নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য ('পুষ্পাঞ্জলি' স্মরণীয়) প্রভৃতি লেখক-লেখিকা রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব বিশেষ প্রসঙ্গরুচি ও শিল্পকলা, উভয় বৈশিষ্ট্যই অল্পবিস্তর অনুকরণ করেছিলেন।

প্রবীণদলের খ্যাতিমানদের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ সেন তাঁর 'অপূর্ব নৈবেদ্য' বইখানির ''রবীন্দ্র-মঙ্গল' এবং 'কবিবর রবীন্দ্রনাথের প্রতি'—এই দুটি কবিতায় রবীন্দ্র-কাব্যের সমৃদ্ধির কথা স্বীকার করেছিলেন। শেষের লেখাটির মধ্যে তিনি বেশ আবেগের সঙ্গেই প্রশ্ন করেছিলেন—

এ মোহিনী বীণা কোথায় পাইলে ?
ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে প্রাণ কেড়ে নিলে !
হেন স্বর্ণবীণা নাহি রে নিখিলে,—
সুধা ভরা, ক্ষুধা হরা।

উল্লাসে, উচ্ছ্বাসে, উছলিছে সুর,
আনন্দ-ঝরনা, ললিত মধুর ;
এ যেন, রতির চরণ নূপুর !
পরশে শিহরে ধরা !

বাজে ছয় রাগ, ছত্রিশ রাগিণী ;
উর্বশীর যেন বীণা বিমোহিনী !
সৌন্দর্য নন্দনে সুধা প্রবাহিনী,
লীলায় উছলে চলে !
এ যেন, গোলাপে শিশির পতন !
পূর্ণিমা রাতির উছল কিরণ !
শেফালীর যেন নিশান্ত স্বপন,
সৌরভ-হিল্লোল ছলে !

রবীন্দ্রনাথের 'রাজা ও রানী'র ইলা-চরিত্রের ওপরেও দেবেন্দ্রনাথ একটি চতুর্দশপদী লিখেছিলেন।[৯] কেবল রবীন্দ্র-মানসের মামুলি প্রশংসামাত্র লিখে তিনি নিজে যে সে-প্রভাব থেকে বিশেষ দূরত্ব রক্ষা করতে পেরেছিলেন, তা নয়। তাঁর 'রাধা' (অশোক গুচ্ছ), 'সোনার শিকলি' (গোলাপ গুচ্ছ) প্রভৃতি কবিতায় রবীন্দ্র-কাব্যের স্পষ্ট অনুরণন শোনা যায়। শেষের কবিতাটির সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের নিজের যে মন্তব্য ছাপা হয়েছে, তা থেকে প্রাসঙ্গিক অংশ পাদটীকায় তুলে দেওয়া হোলো।[১০] রবীন্দ্র-প্রভাবের সজ্ঞান স্বীকৃতির প্রসঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের 'পারিজাত-গুচ্ছে'র 'রবীন্দ্র বাবুর সনেট', 'গোলাপ-গুচ্ছের' 'হার-জিৎ' এবং নাতিনী-সংবাদ' প্রভৃতি লেখাগুলিও উল্লেখযোগ্য। বস্তুত সে-যুগে রবীন্দ্রনাথের সমবয়সীদের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ সেন ছিলেন নবীন-প্রবীণ সকল শক্তিমান সমকালীন কবির অনুরাগী। মধুসূদনের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার স্বীকৃতি আছে 'অপূর্ব ব্রজাঙ্গনা' এবং 'বীরাঙ্গনা' কবিতাবলীতে,—বিহারীলালের উদ্দেশে তিনি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন 'হরিমঙ্গল'-এ এবং অন্যান্য কাব্যে; রবীন্দ্রনাথের যুগনেতৃত্ব তিনি একাধিক রচনায় স্বীকার করেছেন,—আবার, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, চিত্তরঞ্জন দাস, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, কালিদাস রায়, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, কামিনী সেন (রায়) প্রভৃতি লেখক-লেখিকা সম্পর্কেও ছন্দোবন্ধে তাঁর স্বীকৃতি শোনা গেছে।[১১]

সমকালীন প্রবীণ কবিদের মধ্যে 'নব্য ভারত'-এর লেখক ভাওয়ালের গোবিন্দচন্দ্র দাস (১৮৫৫-১৯১৮) যদিও ইংরেজি সাহিত্যে অনভিজ্ঞ ছিলেন

৯। 'অপূর্ব নৈবেদ্য' গ্রন্থের 'ইলা' দ্রষ্টব্য।

১০। "বলা-বাহুল্য, আমার এ সনেটটি রবিবাবুর 'সোনার বাঁধন, কবিতার অনুসরণে লিখিত। প্রভেদ এই যে, তাঁহার খাঁটি সোনা, আর আমার Chemical gold..."।

১১। 'অপূর্ব নৈবেদ্য' দ্রষ্টব্য।

এবং রবীন্দ্রনাথের সূক্ষ্ম, সংযত প্রকাশরীতি অথবা গভীর মননের প্রতি যদিও তাঁর প্রবণতার বিশেষ টান ছিল না, তবু তাঁরও কোনো কোনো রচনায় রবীন্দ্র-প্রভাব দুর্লক্ষ্য নয়।

অক্ষয়কুমার বড়াল (১৮৬৫-১৯১৮) যদিও তাঁর প্রথম জীবনে বিহারীলাল চক্রবর্তীর আদর্শ অনুসরণ করেই কাব্য রচনা শুরু করেছিলেন,—মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, বিহারীলাল চক্রবর্তী, দেবেন্দ্রনাথ সেনের অভ্যাসের ধারায় খাঁটি বাংলার শ্রী ও মাধুর্যের দিকেই যদিও তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল,[১২]—তবু রবীন্দ্রনাথের কাব্যপদ্ধতির প্রভাব তিনিও সম্পূর্ণ অতিক্রম করতে পারেন নি।[১৩]

১২। 'আধুনিক বাংলা সাহিত্য' (অক্ষয়কুমার বড়াল-নামক প্রবন্ধ) : মোহিতলাল মজুমদার।

১৩। "অক্ষয়কুমারের অনেক পূর্ব হইতে রবীন্দ্রনাথ কবিতা লিখিতে শুরু করিয়াছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথের প্রথম-যৌবনের কবিতা অক্ষয়কুমারের রচনাকে প্রভাবিত করিয়াছিল। অক্ষয়কুমারের প্রথম প্রকাশিত (?) কবিতা 'রজনীর মৃত্যু' (বঙ্গদর্শন, কার্তিক, ১২৮৯, 'প্রদীপ') রবীন্দ্রনাথের 'তারকার আত্মহত্যা'র (ভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১২৮৮, 'সন্ধ্যাসংগীত') অনুসরণে লেখা। অক্ষয়কুমারের 'নিদাঘে' ('কনকাঞ্জলি') ও 'মথুরায়' ('ভুল' : কনকাঞ্জলি, দ্বিতীয় সংস্করণ) রবীন্দ্রনাথের 'বনের ছায়া' ও 'বসন্ত অবসান'-এর ('কড়ি ও কোমল') প্রতিধ্বনি। রবীন্দ্রনাথ—'কোথা রে তরুর ছায়া, বনের শ্যামল স্নেহ' ; অক্ষয়কুমার—'কোথা সে নিকুঞ্জ ছায়া অলস পরশ খেলা ?' রবীন্দ্রনাথ—'কখন বসন্ত গেল এবার হল না গান', অক্ষয়কুমার—'আমারি হল না গান আমারি বাঁশরী নাই! বসন্ত যে এল গেল, বসে আছি শূন্যে তাই!' "নিশি রে, কি পত্র লিখিস তুই তারকা-অক্ষরে, আকাশের পরে" ('নিশীথে'—ভুল)—এই উৎপ্রেক্ষাও রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব। রবীন্দ্রনাথের 'কৈশোরক' কবিতায় যে অস্ফুট ব্যাকুলতা এবং অকারণ হৃদয়বেদনা উদ্বেলিত হইয়াছে তাহা অক্ষয়কুমার কবিতাকেও স্পর্শ করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় যাহা হৃদয়ারণ্যে অ-ব্যক্ত যৌবন কবিচিত্তের দিশাহারা চক্রমণ, অক্ষয়কুমারের রচনায় তাহা প্রেমের অকৃতার্থতা ও দেবহত মিলনের অস্থিরতা।

সুরে, শ্বাসে, ত্রাসে, জলে ভেসে গেছে কথা!
যে কথার আগাগোড়া ফেলেছি হারাই,—
কি ক'রে বুঝাব সেই এলোমেলো ব্যথা,
ভাবিয়া, হারায়ে দিশে এও করি তাই!

['কেন—বাঁধিতেছে, খুলিতেছে বারবার বীণা', : 'বীণা' বৈশাখ ১২৯৪ : পৃঃ ২৪৪]

আসল কথা, অক্ষয়কুমারের রচনায় ভাবে বিহারীলালের প্রৌঢ় কবিতা রবীন্দ্রনাথের কৈশোরক কবিতার মধ্যে সেতুবন্ধনের প্রয়াস রহিয়াছে।—"বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (২য় খণ্ড, ১৩৫৬ ; পৃঃ ৪১৪-৪১৫।

সেকালের নবীন কবিযশঃপ্রার্থীদের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের প্রভাবও অল্প ছিল না। তবে, দ্বিজেন্দ্রলালের নিজের লেখাতে রবীন্দ্র-প্রভাবের দৃষ্টান্ত আছে। তাঁর প্রথম কবিতার বই 'আর্যগাথা' (প্রথম ভাগ ১৮৮২ ; দ্বিতীয় ভাগ ১৮৯৩) প্রকাশিত হবার পরে একে একে 'আষাঢ়ে' (১৩০৫), 'হাসির গান' (১৩০৭), 'মন্দ্র' (১৩০৯), 'আলেখ্য' (১৩১৪) ও 'ত্রিবেণী' (১৩১৯)—এই ক'খানি কবিতা ও গানের বই পর পর ছাপা হয়। দ্বিজেন্দ্রলালের গানে এবং কবিতায় একদিকে কৌতুকরসের বিচ্ছুরণ, অন্যদিকে ভাষা ও ছন্দের প্রচলিত আদর্শ উলঙ্ঘনের প্রচেষ্টা সে যুগে বহু কবির অনুকরণপ্রবৃত্তি উৎসাহিত করেছিল। তা ছাড়া, পাশাপাশি বিভিন্ন ভাবের ঘন সমাবেশও তাঁর কবিতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসেবে স্মরণীয়। রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য থেকেই এ-বিষয়ে স্পষ্টতর ব্যাখ্যা পাওয়া গেছে।[১৪]

সে সময়ে রবীন্দ্রনাথের রোম্যান্টিক রহস্যভাবের বিরুদ্ধে দ্বিজেন্দ্রলাল এবং আরো কেউ কেউ অনেক প্রবন্ধ-নিবন্ধ লিখেছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল নিজে কতকটা অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েই সর্বপ্রকারে রহস্য-পরিবেশ এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করেছিলেন। কর্মসূত্রে তিনি যখন গয়াতে ছিলেন, সেই ১৩১৪ সালে, 'আলেখ্য'-বইখানির ভূমিকায় তিনি লিখেছিলেন, এ পদ্যগুলি কবিতা হোক বা না হোক—প্রহেলিকা নয়। এ গ্রন্থের কোন কবিতা পড়ে তার মানে দশজনে দশ রকম বের করে তাঁদের নিজেদের মধ্যে বিবাদ করার প্রয়োজন হবে না।'

পরে চিত্তরঞ্জন দাস এবং আরো কেউ কেউ রবীন্দ্র-কাব্যের রহস্যময়তার বিরুদ্ধে এ-রকম কটাক্ষ অথবা এর চেয়ে স্পষ্টতর নিন্দাবাদ করেছেন। মনো-গঠনের পার্থক্যের জন্যেই রবীন্দ্র-কাব্যের অপেক্ষাকৃত গূঢ় ক্ষেত্রে দ্বিজেন্দ্রলাল কখনোই প্রবেশ করতে পারেন নি এবং সেই কারণেই রবীন্দ্রনাথের ভাবদ্যুতি ও মননের প্রভাব থেকে তিনি অন্যান্য সমকালীন কবির তুলনায় বহু পরিমাণে মুক্ত ছিলেন। তবে, প্রভাব যে আদৌ পড়ে নি, তাও নয়।[১৫]

১৪। 'কাব্যে যে নয় রস আছে, অনেক কবিই সেই নয় রসকে নয় মহলে পৃথক করিয়া রাখেন ;—দ্বিজেন্দ্রলাল বাবু অকুতোভয়ে এক মহলেই একত্রে তাহাদের উৎসব জমাইতে বসিয়াছেন। তাঁহার কাব্যে হাস্য, করুণা, মাধুর্য, বিস্ময়, কখন কে যে কাহার গায়ে আসিয়া পড়িতেছে, তাহার ঠিকানা নাই।'—বঙ্গদর্শন (নবপর্যায়) কার্তিক, ১৩০৯।

১৫। 'মন্দ্রের' 'জাতীয় সঙ্গীত' 'মানসী'র 'দুরন্ত আশা'র অনুকরণ। 'আলেখ্যের একটি

সে-যুগের রবীন্দ্রভক্ত কোনো কোনো কবি তাঁদের একান্ত রবীন্দ্র-প্রীতি সত্ত্বেও একই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলাল—উভয়েরই প্রভাব আত্মসাৎ করেছিলেন। তবে, দ্বিজেন্দ্রলালের প্রভাব ছিল প্রধানত দেশপ্রেম ও কৌতুক-ভাবের অভিমুখী এবং কতকটা গানের ক্ষেত্রে সীমিত। কান্তকবি রজনীকান্ত সেনের কথাও এই সূত্রে স্মরণীয়। তিনি রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্মভাব এবং দ্বিজেন্দ্রলালের কৌতুকভাব,—ভক্তিভরে দুই-ই অনুসরণ করেছিলেন। কবি রমণীমোহন ঘোষ লিখেছিলেন, 'রজনীকান্তের হাসির গানে মুগ্ধ হইয়া অনেকে তাঁহাকে 'রাজসাহীর ডি. এল্. রায়' বলিতেন।'

শুধু হাসির গানেই নয়,—রজনীকান্তের স্বদেশী গানগুলিতেও দ্বিজেন্দ্র-লালের অল্প-বিস্তর প্রভাব বিদ্যমান। 'বাণী,' 'কল্যাণী,' আনন্দময়ী,' 'বিশ্রাম' এবং 'অভয়া'—তাঁর এই পাঁচখানি বইয়ের বেশির ভাগ রচনাই গান। কিন্তু হাসির গান এবং স্বদেশী গান ছাড়া অন্যান্য গানের ভাবে—অর্থাৎ, তাঁর তত্ত্ব-সংগীতে, বৈরাগ্য-সংগীতে, সাধন-সংগীতে একদিকে যেমন রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, কাঙ্গাল হরিনাথের প্রভাব দেখা যায়, অন্যদিকে তেমনি রবীন্দ্র-নাথের প্রভাবও সুস্পষ্ট। মেডিকেল-কলেজ-হাসপাতালে অন্তিম শয্যায় রজনীকান্তের যখন প্রায় বাক্‌রোধ ঘটেছিল, সেই সময়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। তখন তিনি নিজেই রবীন্দ্রনাথকে জানিয়েছিলেন যে তাঁরই 'কণিকা'র আদর্শে তিনি তাঁর 'অমৃত' লিখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে দেখে বোলপুরে ফিরে গিয়ে তাঁকে যে চিঠি লিখেছিলেন (১৬ই আষাঢ় ১৩১৭), সেখানি নলিনীরঞ্জন পণ্ডিতের লেখা 'কান্তকবি রজনীকান্ত' গ্রন্থে ছাপা হয়েছে। এই চিঠি থেকে এবং প্রাসঙ্গিক অন্যান্য বিবরণ থেকে বিশেষ ভাবে রবীন্দ্রনাথ ও রজনীকান্তের ব্যক্তিগত প্রীতি-মাধুর্যের কথা জানা যায়।

এই সূত্রে সেকালের অপেক্ষাকৃত নবীনদের মধ্যে প্রমথনাথ রায়চৌধুরীর কথা স্মরণীয়। তাঁর 'দিল্লীর লাড্ডু' ('পাথেয়') কবিতায় 'কণিকা'র লঘু-ক্ষিপ্র রীতির সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলালের 'হাসির গানে'র লঘু ভাব যেন সম্মিলিত হয়েছে। প্রমথনাথ রবীন্দ্রনাথের 'কণিকার' লঘু চালের অনুকরণই যে করেছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু তাঁর না ছিল রবীন্দ্রনাথের মতো শব্দ নির্বাচনের

কবিতায় 'শিশুর' অনুকরণ প্রচেষ্টা দেখা যায়।'—বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (২য় খণ্ড); (১৩৫৬) পৃঃ ৪২৫।

সামর্থ্য, না মননের কৌলীন্য! কথার অপনির্বাচনে সুরের অনুকরণ যেন কেবলই ব্যর্থ হয়ে গেছে! এই রকম অঘটনের একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হোলো:

আমায় যদি ভালবাস,
বেসো চিরকাল
অল্প ভালোবেসো, তবু
বেসো চিরকাল!
হোক না তোমার স্বর্গীয় প্রেম,
আমার করে ভয়,—
চিরকালের নয় বা সেটা,
চিরকালের নয়!— [পাথেয়: 'শুধু প্রেমে কি করে']

প্রমথনাথের এই কবিতাটির প্রসঙ্গ পৃথক হলেও এর চলনভঙ্গি 'ক্ষণিকা'র 'অসাবধান' কবিতার স্মারক। কিন্তু যে নিপুণ শব্দপ্রয়োগের গুণে রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষণিকা' পাঠকের হৃদয়ে স্থান পেয়েছে, প্রমথনাথের সে গুণ ছিল না। সে যুগে রবীন্দ্রনাথের ভঙ্গি অনুকরণের এ-রকম আরো অনেক নজীর পাওয়া যায়। কিন্তু ভঙ্গির প্রাণ যে মননের বিশিষ্টতার মধ্যেই নিহিত,—অনুকরণকারী কবিরা সেই সত্যটিই ভুলেছিলেন! 'অল্প ভাল বেসো, তবু বেসো চিরকাল'—এ উক্তি নিতান্ত নির্ব্যঞ্জক! রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষণিকা'য় পদান্তিক মিলের যে অভিনব কারুকৃতি দেখা যায় (তুলনীয়: 'একটু খানি সরে গিয়ে কর / সঙের মত সঙীন ঝমঝমর, / আজকে শুধু এক বেলারই তরে / আমরা দোঁহে অমর দোঁহে অমর!—'যুগল'; 'আমি হব না তাপস, হব না, হব না, যেমনি বলুন যিনি; আমি হব না তাপস, নিশ্চয় যদি না মেলে তপস্বিনী'।—'প্রতিজ্ঞা' ইত্যাদি), বিজয়চন্দ্র মজুমদার, প্রমথনাথ রায়চৌধুরী প্রভৃতি কবিরা সেই রকম মিল ব্যবহারেরও চেষ্টা করেছিলেন। বিজয়চন্দ্রের 'বেজায় হেঁয়ালি'-তে দ্বিজেন্দ্রলালের প্রভাবও সুস্পষ্ট। এই কারণে রজনীকান্ত এবং প্রমথনাথের সঙ্গে তাঁর নামও একই সূত্রে উল্লেখযোগ্য।[১৬]

বিশ শতকের প্রথম দিকে বাংলার কাব্যলোকে রবীন্দ্রনাথের শব্দ, ছন্দ,

---

১৬। 'হেঁয়ালী'-র বস্তুনির্দেশে বিজয়চন্দ্র মজুমদার লিখেছেন:—'দ্বাদশী স্মৃতি' যাঁহার অলোপ্য মধুর স্মৃতিতে রচিত, তিনি হাস্যরসের কবিতায় এবং স্বদেশ-প্রেম-উদ্দীপক সঙ্গীত রচনায় বঙ্গসাহিত্যে উচ্চতম স্থান অধিকার করিয়াছেন এবং তাঁহার নাট্যরচনা, এদেশে নূতন যুগের অবতারণা করিয়াছে। (১৩২২)

ভঙ্গি ইত্যাদির অনুকরণ যে কতো ভাবে ঘটেছে, এই সব অনুকরণকারী কবির রচনা বিশ্লেষণ করে দেখলে সে-বিষয়ে কতকটা ধারণা পাওয়া যায়। ‘শ্রীRobin Goodfellow’ স্বাক্ষরে দেবেন্দ্রনাথ সেন তাঁর ‘গোলাপগুচ্ছের’ ‘চারজিৎ’ কবিতার সঙ্গে যে মন্তব্যটি গ্রন্থস্থ করেছিলেন, তাতে সে-যুগের এই অনুকরণ-ব্যাপকতারই স্বীকৃতি আছে। দেবেন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, ‘বঙ্গের নবীন কবিদিগের যিনি শিরোমণি ও নেতা তাঁহার লেখার অনুকরণে এই কবিতাটি লিখিয়াছি। কিন্তু অনেকের দশা যাহা হইয়াছে, আমারও তাহাই হইল। আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি, আমার কবিতাটিতে অর্থের নাম গন্ধ নাই ; মাথাল ফল—শূন্য কলসি।’

এবং শুধু যে শব্দ, ছন্দ, ভঙ্গি,—কেবল এই তিন প্রসঙ্গেই এই পর্বের কবিদের মধ্যে রবীন্দ্র-প্রভাব সঞ্চারিত হয়েছিল, তা নয় ;—কবিতার প্রসঙ্গ-ধারার কথাও বিবেচ্য। তাঁর ‘স্বদেশ’ (১৯০৫), ‘কথা ও কাহিনী’ (১৯০৮) ইত্যাদি দেশপ্রেমময় কবিতা এবং তৎপূর্ববর্তী ‘চিত্রা’ কাব্যের (১৮৯৬) ‘এবার ফিরাও মোরে’-র সুতীব্র গণসংযোগের আগ্রহ বাংলার তৎকালীন কোন কোন কবির অনুকরণের সামগ্রী হয়ে উঠেছিল। সে-কালের সাময়িক পত্র-পত্রিকায় সাহিত্য-সমালোচনা বিভাগে এ মন্তব্যের সমর্থন আছে। অপেক্ষাকৃত হাল আমলেও এ ব্যাপার স্বীকৃত হয়েছে। প্রমথনাথ রায়চৌধুরীর ‘চিত্র ও চরিত্র’ নামক খণ্ড-কাব্যের সমালোচনা প্রসঙ্গে ১৩২৫ সালের ফাল্গুন সংখ্যার ‘মানসী ও মর্ম্মবাণী’ পত্রিকায় কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত লিখেছিলেন, ‘রবীন্দ্রনাথের এই আহ্বান আর কোন কবির মর্মতল বিদ্ধ করিয়াছিল কি না বঙ্গসাহিত্যে তাহার বিশেষ প্রমাণ নাই। আজ ধনী প্রমথনাথ দারিদ্র্য ও দুর্দশার যে সকল চিত্র লইয়া আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইযাছেন তাহাতে দেশের ধনীর চক্ষু ফুটিবে কি ?’

নবীন-প্রবীণ সব কবির রচনাতেই, এই ভাবে কোন না কোনও দিকে রবীন্দ্র-প্রভাব সঞ্চারিত হয়েছিল। বিজয়চন্দ্র মজুমদার, রজনীকান্ত সেন প্রভৃতি লেখকরা যেমন রবীন্দ্রনাথ এবং দ্বিজেন্দ্রলাল উভয়েরই প্রভাব স্বীকার করে নিয়েছিলেন, এই যুগসন্ধির শেষদিকের (অর্থাৎ, ১৯০০ সালের পরে যাঁদের প্রথম রচনা প্রকাশিত হয়) দু’-একজন কবির লেখাতেও তেমনি পূর্বোক্ত দুই কবিরই মিশ্র-প্রভাব দেখ যায়। এই ধারায় শেষ উল্লেখযোগ্য

শক্তিমান কবিদের মধ্যে প্রমথ চৌধুরীর নাম এখানে স্মরণীয়। তাঁর কথা আলোচনার পরে সে যুগের রবীন্দ্রাদর্শনিষ্ঠ অন্যান্য নবীন কবির প্রসঙ্গ উত্থাপন করা সংগত হবে।

প্রমথ চৌধুরীর প্রথম কবিতাগুলি ছাপা হয় ১৩১৮ থেকে ১৩২১ সালের মধ্যে। 'ভারতী' এবং 'সবুজপত্রে'[১৭] তিনি নিয়মিত লিখতেন। ১৯১৩ সালে তাঁর প্রথম কবিতার বই 'সনেট-পঞ্চাশৎ' এবং তারপর ১৯১৯ সালে 'পদ-চারণ' নামে আর একখানি কবিতার বই বেরিয়েছিল। ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে কুটুম্বিতা এবং অন্তরঙ্গ হৃদ্যতার যোগ স্বীকার করে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তিনি তাঁর আত্মকথা'য় (১৩৫৩) শ্রদ্ধা প্রকাশ করে গেছেন।[১৮]

'পদচারণে' সর্বসমেত ৪৬টি কবিতা ছাপা হয়। প্রথম লেখাটির (ওঁ) তারিখ ছিলো ১৯১১ সাল। সেই বইয়ের মধ্যে 'ছোট কালীবাবু' নামে যে Triolet কবিতাটি সংকলিত হয়েছে, তার তারিখ ১৮ই জুন, ১৯১৮। ১৯১১ থেকে ১৯১৮ সালের মধ্যে এগুলি লেখা হয়। 'সনেট পঞ্চাশৎ' এইসব লেখার পূর্ববর্তী। 'পদাচরণে'র একটি কবিতার নাম 'দ্বিজেন্দ্রলাল' (ভাদ্র,

১৭। প্রথম প্রকাশ বৈশাখ, ১৩২১।

১৮। 'আজও আমার বেশ মনে আছে যে, আমার যখন আট বৎসর বয়স, আমি তখন প্রথম রবীন্দ্রনাথের নাম শুনি। রবীন্দ্রনাথ তখন "জ্ঞানাঙ্কুর" কি ঐ রকম একটা কাগজে কবিতা প্রকাশ করতেন। এবং রবি ঠাকুর কবি কি না, দাদা (আশুতোষ চৌধুরী) ও তাঁর বন্ধুবান্ধবদের সে বিষয় আলোচনা করতে শুনেছি। তারপর রবীন্দ্রনাথের কোন কাব্য আমরা দেখিও নি, পড়িও নি। আমার বয়স যখন চৌদ্দ, তখন আমি হেয়ার স্কুলের কোন সহপাঠীর অনুরোধে 'ভগ্নহৃদয়' একটু পড়ি। পড়ে যে খুব উল্লসিত হয়ে উঠি, তা বলতে পারিনে। সত্য কথা বলতে গেলে, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচয়ের পরেই আমি তাঁর কাব্যের সঙ্গে পরিচিত হই। রবীন্দ্রনাথ আমাদের মটস্ লেনের বাড়ীতে প্রায়ই আসতেন দাদার সঙ্গে তাঁর "কড়ি ও কোমল" প্রকাশের পরামর্শ করতে। দাদাই ঐ কবিতা পুস্তক প্রকাশের ভার নিয়েছিলেন। বইটি ছাপা হবার পূর্বে তিনি কবিতাগুলি দাদাকে পড়ে শোনাতেন, সে ক্ষেত্রে আমি উপস্থিত থাকতুম। কবিতা বস্তুটি যে কি, সে বিষয়ে তাঁদের আলোচনা শুনতুম। তার থেকেই আমার ধারণা হয় যে, রবীন্দ্রনাথের কবিতা সম্বন্ধে যথেষ্ট অন্তর্দৃষ্টি আছে, যা হেম-নবীনের ছিল না। এই আলোচনার ফলে কবিতা সম্বন্ধে আমার মন জেগে উঠল। তিনি কবে কি বলেছেন, তা অবশ্য আমার মনে নেই। তবে যেমন তিনি আমাদের পরিবারে সঙ্গীতের আবহাওয়া সৃষ্টি করেছিলেন, তেমনি তিনি আমাদের মধ্যে কাব্যচর্চারও আবহাওয়া সৃষ্টি করেন, এই পর্যন্ত বলতে পারি। খুব সম্ভবত আমি তাঁর দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছি।' 'আত্ম কথা', পৃঃ ৮৫-৮৬ দ্রষ্টব্য।

১৩২০)। রবীন্দ্রনাথের প্রতি প্রমথ চৌধুরীর অনুরাগের স্বীকৃতি আগেই দেখা গেছে। আর, পূর্বোক্ত 'চতুর্দশপদী'র শেষ চারটি চরণে দ্বিজেন্দ্রলাল সম্বন্ধে তিনি লিখেছিলেন—

> যে আলো দিয়েছ তুমি সহাস্যে বিলিয়ে,
> যে সুরে দিয়েছ তুমি ছায়াময়ী কায়া,
> মনের আকাশে কভু যাবে না মিলিয়ে—
> রহিবে সেথায় চির তার ধূপছায়া।

আলোচ্য পর্বের কবিদের মধ্যে তাঁর নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়; কারণ, যদিও গদ্য গ্রন্থ 'আত্মকথা'য় তিনি রবীন্দ্রনাথের দ্বারা খুব সম্ভবত প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন বলে উল্লেখ করেছেন, তবু 'আত্মকথা'[১৯] নামে একটি কবিতায় তিনি আবার এর বিপরীত ইঙ্গিতও রেখে গেছেন। এই চতুর্দশপদীর তৃতীয়-চতুর্থ চরণে তিনি লিখেছিলেন—

> কল্পনা রাখিনে আমি আকাশে তুলিয়ে,—
> নহি কবি ধূমপায়ী, নলে ত্রিবঙ্কুর॥

এবং শেষ চারটি চরণে বলেছিলেন—

> কবিতার যত সব লাল-নীল ফুল,
> মনের আকাশে আমি সযত্নে ফোটাই,
> তাদের সবারি বদ্ধ পৃথিবীতে মূল,—
> মনোঘুড়ি বুঁদ হলে ছাড়িনে লাটাই!

তাঁর গদ্যগ্রন্থ 'বীরবলের হালখাতা' (১৯১৭) রবীন্দ্রনাথের নামে উৎসর্গ করা হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার যে অভাব ছিল না, সে কথার উল্লেখও বাহুল্য। কিন্তু এসব সত্ত্বেও সমকালীন অন্যান্য কবিদের মতো রবীন্দ্র-কাব্যের সূক্ষ্ম কল্পনালোকের টানে তিনি কখনই আকৃষ্ট বোধ করেন নি! তাঁর নিজের কবিতার মূল যে স্থূল পৃথিবীতেই আবদ্ধ, এবং কল্পনার টানে তাঁর মন শূন্যবিহারী হতে চাইলেও তিনি যে বস্তুচেতনা পরিত্যাগ করেন না, পূর্বোক্ত কবিতায় একথা ঘোষণা করে তিনি সমকালীন রবীন্দ্র-প্রভাবের বিরুদ্ধে চাতুর্যময় ও স্বল্পোচ্চারিত প্রতিবাদ জানিয়েছেন! উদ্ধৃত কবিতার মন্তব্যের

১৯। 'সনেট্‌ পঞ্চাশৎ' দ্রষ্টব্য:

সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলালের 'আলেখ্যে'র ভূমিকা থেকে এই আলোচনার অন্যত্র যে মন্তব্যটি তুলে দেওয়া হয়েছে, সেটিও তুলনীয়। তাঁর গদ্য-রচনাবলীর মধ্যেও দ্বিজেন্দ্রলালের কিছু প্রভাব স্বীকার্য। দৃষ্টান্ত হিসেবে 'আমরা ও তোমরা' (বীরবলের হালখাতা) প্রবন্ধটির উল্লেখ করা যায়। এ-ছাড়া অন্যত্র অন্যান্য দৃষ্টান্তও আছে। কিন্তু সে-বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা এ-ক্ষেত্রে অনাবশ্যক।

এই কবিগোষ্ঠীর রচনায় দ্বিজেন্দ্রলালের কিছু কিছু প্রভাব থাকলেও এঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন রবীন্দ্র-কাব্যের বিশেষ অনুরাগী। রজনীকান্ত, বিজয়চন্দ্র, এবং প্রমথ চৌধুরী, তিনজনের প্রত্যেকের সম্পর্কেই এ-মন্তব্য প্রযোজ্য। সমকালীন ভক্ত ও অনুচর-সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁর স্নেহের আর-একটি দৃষ্টান্ত হিসেবে প্রমথ চৌধুরীর 'পদচারণ' বইখানির নামকরণ সূত্রে রবীন্দ্রনাথ যে চিঠি লিখেছিলেন সেই চিঠির কথাও মনে পড়ে।[২০]

১৯১৪ সালের ৬ই জুলাই তারিখের আর একখানি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথের হাতে প্রমথ চৌধুরীর কবিতা সংশোধনের নজির আছে।[২১] ১৯১৩ সালের বাইশে এপ্রিল তারিখের অন্য এক পত্রে 'সনেট পঞ্চাশৎ'-এর প্রশংসা আছে।[২২]

১৩০৫-৬ সালের 'ভারতী'তে প্রসন্নময়ী দেবীর কন্যা প্রিয়ংবদা দেবী যখন কবিতা লিখছিলেন, সেই সময়ে 'ভারতী'র সম্পাদক ছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। বলেন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরীর মতো প্রিয়ংবদা দেবীও তাঁর প্রথম কবিতার বই 'রেণু'-তে (১৩০৭) কিছু চতুর্দশপদী প্রকাশ করেছিলেন। ১৩১৭ সালে সংকলিত 'পত্রলেখায়' তাঁর যে কবিতাগুলি ছাপা হয়, সেগুলির মূলে প্রেরণা জুগিয়েছিল রবীন্দ্রনাথের 'কণিকা'। কান্তকবি রজনীকান্ত সেনের 'অমৃত'-বইখানিও যে 'কণিকা'রই আদর্শানুসারী, সে-কথা আগেই লেখা হয়েছে।

২০। কল্যাণীয়েষু—

তোমার কাব্যগ্রন্থটির জন্যে একটি নাম একরাত্রে স্বপ্নের মত এসে পরক্ষণে হাতছাড়া হয়ে গেছে। তখন মনে হয়েছিল সেটা ভাল কিন্তু মনে মনে থাকলে হয়ত তত ভাল লাগ্‌ত না—অতএব অনুশোচনা না করে আর একটা নতুন নাম ভেবে স্থির করলুম। "পদ-চারণ"—ওর সাদা অর্থ পায়চারী। কিন্তু কাব্যের পদ আর প্রাণীর পদ এক নয়। আমাদের দেশী troubadourদেরও চারণ বলে থাকে।......চিঠিপত্র [৫ম খণ্ড]; পৃ ২৬২ [১৩৫২] দ্রষ্টব্য।

২১। রবীন্দ্রনাথের 'চিঠিপত্র' (৫ম খণ্ড) ১৩৫২ ; পৃঃ ১৭৬ দ্রষ্টব্য।

২২। ঐ

আর, প্রিয়ংবদা দেবীর কবিতায় রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট সুরটি এতো সার্থকভাবে অনুসৃত হয়েছিল যে, রবীন্দ্রনাথের 'লেখন' (১৩৩৪)-এর মধ্যে তাঁর সাড়ে-পাঁচটি কবিতা রবীন্দ্রনাথের রচনা-ভ্রমে তাঁরই নামে গ্রন্থভুক্ত হয়।[২৩]

'বিচিত্র প্রবন্ধে' সতীশচন্দ্র রায় (১২৮৮-১৩১০) সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—

> সতীশ, অনাঘ্রাত পুষ্পরাশির ন্যায়, তাহার তরুণ হৃদয়ের সমস্ত শ্রদ্ধা বহন করিয়া এই নিভৃত শান্তিনিকেতনের আশ্রমে আসিয়া আমার সহিত মিলিত হইল।

বোলপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ের শিক্ষক সতীশচন্দ্র রায় ছিলেন ব্রাউনিঙ্‌ এবং রবীন্দ্রনাথের বিশেষ ভক্ত। তাঁর রচনাবলী প্রকাশিত হয় ১৩১৯ সালে।[২৪] এই রচনাবলীর অন্তর্ভুক্ত 'ডায়ারী'তে সতীশচন্দ্র এক জায়গায় লিখেছেন—

> ...আজ রবীন্দ্রনাথকে আরও ভাল করিয়া চিনিলাম। সন্ধ্যার দিকে আমাদের পাঠ-সভা বসিল। সম্মুখে উদার মাঠে আকাশ মেঘল কোমল আচ্ছাদনে ঘেরা, মাঠে ছায়া, মৃদুশীতল বায়ু। 'কল্পনা' লইয়া প্রথমে 'আজি এই আকুল আশ্বিনে' পড়িলাম। এক রকম লাগিল। কিন্তু 'বর্ষশেষ' পড়িতে গিয়া আমার মধ্যে বিদ্যুৎ সঞ্চার হইল। বুক ফাটিয়া স্বর বাহির হইতে লাগিল। সর্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। এবার কবিতাটি বুঝিলাম। কালিদাসের splendour আছে, সমারোহ আছে—majestic flow আছে, শান্তি আছে। কিন্তু এ কি weird বুকভাঙ্গা বৈদিক কবির মত ক্রন্দন? এ যে রুদ্র ইন্দ্রের দিকে উত্থিত গান। ২৫

সতীশচন্দ্রের গদ্যে যেমন রবীন্দ্র-রীতির প্রভাব দেখা যায়, তাঁর কবিতার মধ্যেও তেমনি রবীন্দ্রনাথের ভূমাবোধ এবং অধ্যাত্মকথার প্রতিধ্বনি শোনা যায়। তাঁর কবিতাবলীর নানা অংশে অলংকার প্রয়োগের মধ্যে রবীন্দ্রনাথেরই বিশিষ্ট পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে। নিচে এমনি কয়েকটি অংশ তুলে দেওয়া হোলো—

১। 'কোথা আসিতেছে সন্ধ্যা চিকুরে জড়ায়ে তন্দ্রা...

[সন্ধ্যার একটি সুর]

২৩। 'প্রবাসী', কার্তিক, ১৩৩৫, পৃঃ ৩৮-৪০ দ্রষ্টব্য।

২৪। অজিতকুমার চক্রবর্তী কর্তৃক প্রকাশিত।

২৫। পৃঃ ২৭০।

২। বসন্ত আভাস লয়ে প্রাণে
যে সমীর আসি' বক্ষ হানে
তা সম ব্যাকুল মোর প্রাণের পিয়াস
ধায় চারি পাশ
স্বপনে পাগল হয়ে সঙ্গোপন মাধুরী খুঁজিয়া
কস্তুরী মৃগের মত মদগন্ধে আত্ম হারাইয়া
আপন নাভির
স্বপ্নভ্রমে অধীর অস্থির! [স্বপ্ন—সম্মুখের]

৩। ইন্দ্রজালে তোর
শত যতনের কাজ শ্লথ করে ছাড়ি'
আধেক ধরণী উঠে হইয়া বিভোর—
মেদুর মদির প্রাণে!—পেয়া দিয়া পাড়ি
সংসারের তট হতে স্বপনের তটে
পঁহুছি জাগিয়া উঠে—জলকুসুমুর
জাগি উঠে, জাগে স্বপ্ন মেঘমালা পটে
পরাণ হইয়া উঠে আপনি বিধুর! [চাঁদ]

এই তিনটি উদ্ধৃতির মধ্যে প্রথমটির সাদৃশ্য আছে রবীন্দ্রনাথের 'কল্পনা' কাব্য-গ্রন্থের (১৩০৭) 'অশেষ' কবিতার এই বর্ণনার সঙ্গে—

'নামে সন্ধ্যা তন্দ্রালসা সোনার আঁচল-খসা,
হাতে দীপশিখা—'

'কল্পনা' সম্বন্ধে সতীশচন্দ্রের শ্রদ্ধার স্বীকৃতি আগেই উদ্ধৃত হয়েছে; 'সোনার তরী'র 'হৃদয়-যমুনা' কবিতা সম্পর্কে তাঁর আর-একটি মন্তব্য নিচে তুলে দেওয়া হোলো।[২৬]

'ক্ষণিকা' সম্বন্ধে সতীশচন্দ্রের একটি প্রবন্ধের মধ্যে 'মানসসুন্দরী', 'চৈতালী' 'চিত্রাঙ্গদা' প্রভৃতির উল্লেখ আছে। 'ক্ষণিকা' পড়ে তিনি লিখেছিলেন,

২৬। 'আমাদের কবি রবীন্দ্রনাথের 'হৃদয় যমুনা' পড়িয়া দেখিলে বুঝা যাইবে, আমাদের হৃদয়ে কোন্ এক গভীর যমুনা,—কোন্ এক মেঘছায়াবৃত, বঞ্জুলবিচিত্রতটা, কলফেনা, মৃত্যুনীলসলিলা, সুগম্ভীরা যমুনা অবিরাম দুলিয়া দুলিয়া নৃত্য করিতেছে।'—সতীশচন্দ্রের রচনাবলী, পৃঃ ১৫৭-১৫৮।

'বাস্তবিক পড়িয়া পড়িয়া এতদিনে 'কণিকা' আমাদের অস্থি-মজ্জায় প্রবেশ করিয়াছে'।[২৭]

রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক আকুতি যে-যুগের নবীন যে ক'জন কবিযশঃপ্রার্থীর অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করেছিল, সতীশচন্দ্র ছিলেন তাঁদেরই অন্যতম।

এই পর্বের প্রত্যেক কবির লেখা থেকে রবীন্দ্র-প্রভাবের বিভিন্ন উদাহরণ তুলে দেখা এ-বইয়ের উদ্দেশ্য নয়। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কাব্যালোচনায় পক্ষে অবশ্যপালনীয় কৃত্য হিসেবে সে-কালের কবিদের রচনায় রবীন্দ্র-প্রভাবের ব্যাপকতা সম্বন্ধে অবহিত থাকা এবং সেই সূত্রে বিশেষভাবে সত্যেন্দ্রনাথের কাব্য-প্রবাহে রবীন্দ্র-প্রভাবের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি লক্ষণ সম্বন্ধে সচেতন হওয়া দরকার। সেজন্যে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব সাধনার সঙ্গে সমকালীন অন্যান্য কবির প্রসঙ্গ এবং প্রযুক্তিগত অর্থাৎ বিষয় এবং রীতিগত সাদৃশ্য সন্ধানের ফলে একে-একে এই ধারাগুলি নজরে পড়া স্বাভাবিক—

[ক] মধুসূদন থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথের অভ্যুদয়-কালের মধ্যে একদিকে অক্ষয় চৌধুরী, বিহারীলাল, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নানা লেখায় জড়-চেতনের ভেদবিলোপী ঐক্যসত্যের উপলব্ধি,—অন্যদিকে সংস্কৃত ও ফার্শি ভাষায় ব্যুৎপন্ন কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের (১৮৩৭-১৯০৬) অথবা পাশ্চাত্ত্য কাব্যে অভিজ্ঞ সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের (১৮৩৮-১৮৭৮) বাস্তবতা ও নীতিকাব্য-চর্চা লক্ষণীয়। বিজয়কৃষ্ণ বসু, আনন্দচন্দ্র মিত্র, নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি ছিলেন হেমচন্দ্রের অনুকরণনিষ্ঠ কবি। 'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব' পত্রিকায় ১২৮৩ সালের কার্তিক সংখ্যায় বালক রবীন্দ্রনাথ নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'ভুবনমোহিনী প্রতিভা', রাজকৃষ্ণ রায়ের 'অবসর সরোজিনী' এবং হরিশচন্দ্র নিয়োগীর 'দুঃখ সঙ্গিনী'—এই তিনখানি কাব্যগ্রন্থের নিন্দাবাদ প্রতিপন্ন করে স্বপ্রবর্তিত ভিন্ন রুচির সারবত্তা ঘোষণা করেছিলেন।

উত্তরকালে বলেন্দ্রনাথ, প্রিয়ংবদা প্রভৃতি কয়েকজনের কবিতায় রবীন্দ্র-কাব্যের অন্তরঙ্গ ভাবস্পন্দনের প্রথম সঞ্চার ঘটেছিল।

[খ] ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠতার ফলে ঠাকুরবাড়ির লেখকরা ছাড়া অন্যান্য যাঁরা রবীন্দ্র-রুচির সাক্ষাৎ সান্নিধ্য পেয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে প্রিয়নাথ সেন, দেবেন্দ্রনাথ সেন, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, সতীশচন্দ্র রায় ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

২৭। ঐ; পৃঃ ২২৬

(গ) রবীন্দ্রনাথের-উপমা-উৎপ্রেক্ষার অনুকরণকারী প্রবীণ লেখকদের মধ্যে অক্ষয়কুমার বড়ালের নাম সর্বাগ্রে স্মরণীয়। 'কণিকার' আদর্শে ছোটো কবিতা লেখেন রজনীকান্ত সেন, প্রিয়ংবদা দেবী এবং আরো কেউ কেউ। 'ক্ষণিকা'র কথ্যরীতি সেকালে অনেকেই অনুসরণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের 'শিশু'র প্রভাব কামিনী রায়ের 'গুঞ্জন' বইখানির মধ্যে বিদ্যমান। আবার 'বলাকা'র অসম-অমিত্রাক্ষর ছন্দ, 'পলাতকা'র প্রসঙ্গ-প্রবৃত্তির বৈশিষ্ট্য ইত্যাদিও বহু কবির অনুকরণের বিষয় ছিল। 'পলাতকা'র কথাসূত্রে 'ভারতী'-'মানসী' গোষ্ঠীর যতীন্দ্রমোহন বাগচী ('তুলনীয় আলোর মেলা'—"জাগরণী"), কিরণধন চট্টোপাধ্যায় ('দুনিয়াদারী'—"নতুন খাতা"), কৃষ্ণদয়াল বসু ('মোহানা' দ্রষ্টব্য) এবং আরো দু'একজন কবির নাম (যেমন নজরুল ইসলামের 'মুক্তি') স্মরণীয়।

দেবেন্দ্রনাথ সেন রবীন্দ্রনাথের চতুর্দশপদী কবিতাবলীর বিশেষ প্রশংসা করেছিলেন। অক্ষয়কুমার বড়াল তাঁর একটি চতুর্দশপদী কবিতায় ('শঙ্খ' দ্রষ্টব্য) এবং প্রিয়নাথ সেন 'বসন্ত অন্তে' নামে একটি চতুর্দশপদীতে রবীন্দ্র-বন্দনা করেছিলেন; রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'প্রত্যুপহার' [২৮] লিখে শেষেরটির জবাব দিয়াছিলেন। কামিনী রায়ের 'জীবন পথে' (প্রকাশকাল ১৯৩০) চতুর্দশপদী-সংগ্রহের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের চতুর্দশপদীর ভাষা ও রীতিগত প্রভাব বিদ্যমান। উত্তরবর্তী অন্যান্য বহু লেখকের চতুর্দশপদী কবিতায় অনুরূপ লক্ষণ চোখে পড়ে।[২৯] প্রমথ চৌধুরীর 'সনেট-পঞ্চাশৎ'-ই এ-বিষয়ে প্রথম এবং বিশেষ উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম।

অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী-প্রবর্তিত জাতীয় রোমান্টিক আখ্যায়িকা কাব্যের ধারায় রবীন্দ্রনাথের 'কথা' 'কাহিনী' শ্রেণীর মহৎ চিত্রাবলী ও নাট্য-কবিতাবলীর অনুসৃতি দেখা যায় রমণীমোহন ঘোষের 'দীপশিখা'-র কয়েকটি লেখাতে এবং তাছাড়া অন্যান্য কবির ভিন্ন ভিন্ন কবিতায়। এই সূত্রে প্রমথনাথ রায়চৌধুরীর 'অম্বা', 'ভীষ্ম', 'যুধিষ্ঠির' প্রভৃতি রচনা স্মরণীয়। পৌরাণিক আখ্যান অবলম্বনে নাট্য-কবিতা রচনার দৃষ্টান্ত অবশ্য প্রাক্-রবীন্দ্র বাংলা সাহিত্যের

২৮। প্রদীপ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৭।

২৯। বিচিত্রা, ১৩৩৫ : কান্তিচন্দ্র ঘোষ, বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি লেখকের 'সনেট' দ্রষ্টব্য। মোহিতলাল মজুমদারের 'ছন্দ চতুর্দশী' এবং নিত্যকৃষ্ণ বসুর 'শঙ্খ' দ্রষ্টব্য।

মধ্য-উনিশ শতকীয় পর্বে বিশেষভাবে চোখে পড়ে। এই অঞ্চলের রবীন্দ্র-প্রভাবিত কবিদের মধ্যে পূর্বোক্ত কবিরা ছাড়া যতীন্দ্রমোহন বাগচী[৩০], কালিদাস রায়[৩১], মোহিতলাল মজুমদার[৩২] ইত্যাদি কবিরাও বিশেষ স্মরণীয়।

ঋতু বিষয়ে লেখা রবীন্দ্রনাথের কবিতা, গান, নাট্যরচনা ইত্যাদির অল্পাধিক প্রভাব দেখা যায় সমকালীন নানা কবির রচনাতে। গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়, রমণীমোহন ঘোষ, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী প্রভৃতির এই বিষয়ের রচনায় হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রের পুরোনো রীতির অনুসৃতি এবং রবীন্দ্রনাথের নব-প্রবর্তনার আনুগত্য দুইই চোখে পড়ে। করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, মোহিতলাল মজুমদার, এঁরা প্রত্যেকেই এ অঞ্চলে রবীন্দ্রানুসরণ করেছেন। কালিদাস রায়ের 'ঋতু-মঙ্গল'-এর সংস্কৃতানুসারিতাও রবীন্দ্র-প্রভাবেরই তির্যক প্রকাশরূপে গণনীয়। রবীন্দ্রনাথ বিশেষ উৎসাহে সংস্কৃত-সাহিত্যে বর্ষাকাব্যের সমৃদ্ধির দিকে তৎকালীন কাব্যরসিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। 'প্রাচীন সাহিত্য' গ্রন্থাকারে (১৯০৭) ছাপা হবার অনেকাল আগে 'মেঘদূত' ('মানসী'), 'নববর্ষা' ('ক্ষণিকা') প্রভৃতি কবিতা সংস্কৃত নিসর্গ-কাব্যরীতির দিকে তৎকালীন রবীন্দ্র-ভক্ত কবিদের আগ্রহান্বিত করেছিল। কেবল যে তাঁর বর্ষাঋতু সম্পর্কিত রচনাগুলিই অন্যান্য কবির অনুকরণের বিষয় ছিল, তা নয়। প্রথম প্রকাশের প্রায় পঁচিশ বছর পরে 'কল্পনার' 'বৈশাখ' (রচনাকাল ১৩০৬) এবং 'বর্ষশেষ' (রচনাকাল ১৩০৫, ৩০এ চৈত্র) যতীন্দ্রমোহন বাগচীর 'বৈশাখ' কবিতায় ('জাগরণী' ১৩২৯) ক্ষীণ,—কিন্তু নিশ্চিত ছায়াপাত করেছে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ'; যতীন্দ্রমোহন লিখেছেন, 'হে নবীন, হে বন্ধু বৈশাখ'! 'বর্ষশেষ' কবিতায় 'নবাঙ্কুর ইক্ষুবনে এখনো ঝরিছে বৃষ্টিধারা' অংশের সঙ্গে যতীন্দ্রমোহনের 'বৈশাখ' কবিতার এই অংশের সাদৃশ্য স্পষ্ট—

> তোমার প্রথম মেঘে বৃষ্টিরূপে দেখা দেয় আসি ;
> তপঃক্লিষ্ট তব মৃত্তিকায়
> তোমারি আশীষ লভি সিদ্ধি-শস্য অঙ্কুরিতে চায়!

৩০। 'মহাভারতী', 'জাগরণী' ইত্যাদি দ্রষ্টব্য।

৩১। 'ভীষ্মদেব', 'একলব্য', 'মদালসা', 'কৌষেয় ও 'কাষায়', 'গঙ্গার প্রতি' [পর্ণপুট ৪র্থ খণ্ড] ইত্যাদি তুলনীয়।

৩২। 'নুরজাহান ও জাহাঙ্গীর', 'মৃত্যু ও নচিকেতা' [বিস্মরণী] দ্রষ্টব্য।

রবীন্দ্রনাথ বৈশাখ-কে দেখেছিলেন রুদ্র তপস্বীর মূর্তিতে। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত 'শীত'-ঋতুর প্রসঙ্গে অনুরূপ মূর্তি কল্পনা করেছেন—

বিশ্বের বিরাট বক্ষে পাতি শবাসন,
সাধিতেছ প্রলয় সাধন
কে তুমি সন্ন্যাসী!

[—শীত : 'মরীচিকা']

(ঘ) স্বদেশপ্রেম সম্পর্কে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রজনীকান্ত গুপ্ত, রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ সেন (১৮৭১-১৯৩৪) ইত্যাদি কবিরা প্রায় একই কালে নানা গান রচনা করেছিলেন। এগুলি এক জাতের লেখা; আর, শিবনাথ শাস্ত্রীর 'জন্মভূমি'-সংগীত, গোবিন্দচন্দ্র রায়ের 'ভারত-বিলাপ', দীনেশচরণ বসুর 'বাজরে বীণা' আর-এক জাতের গান। এই শেষের গানগুলি লেখা হয়েছিল হেমচন্দ্রের ধারায়।

রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্মসংগীতের অল্পবিস্তর প্রভাব দেখা যায় রজনীকান্ত এবং অতুলপ্রসাদের গানে। অতুলপ্রসাদের 'কাকলী', 'গীতিগুঞ্জ', 'কয়েকটি গান', এই তিনখানি গীতিসংগ্রহের অনেক রচনাতেই এ-মন্তব্যের সমর্থন পাওয়া যাবে। শব্দ-বিন্যাসে, উপমা-প্রয়োগে, প্রকৃতি-বন্দনার ভঙ্গিতে এই পর্বের বিভিন্ন রচয়িতার বিচিত্র গীতিমাল্যে রবীন্দ্র-প্রভাবের লক্ষণ সুস্পষ্ট।

(ঙ) কবিতা ও কাব্যগ্রন্থের নামের মধ্যেও রবীন্দ্র-রীতি অনুসরণের চিহ্ন আছে। 'ছবি ও গান' (১৮৮৪) এবং 'কড়ি ও কোমল' (১৮৮৬) গ্রন্থনাম-দুটির সঙ্গে 'আলো ও ছায়া' (কামিনী রায়, ১৮৮৯), 'মাল্য ও নির্মাল্য' (ঐ দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯১৮), 'হাসি ও অশ্রু' (সরোজ কুমারী দেবী, ১৮৯৫), 'প্রীতি ও পূজা' (অম্বুজাসুন্দরী দাসগুপ্তা, ১৩০৪) ইত্যাদি গ্রন্থনামের সাদৃশ্য দেখা যায়। তা ছাড়া, এই পর্বের কোনো কোনো কবির রচনায় রবীন্দ্রনাথের বিশেষ বিশেষ কবিতার নামের প্রতিধ্বনি অথবা পুনরাবৃত্তির নিদর্শনও কম নয়। রবীন্দ্রনাথের 'স্বর্গ হইতে বিদায়' (চিত্রা) এবং যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'মর্ত্য হইতে বিদায়' (মরুশিখা),—রবীন্দ্রনাথের 'নাম্নী' (মহুয়া) এবং যতীন্দ্রমোহন বাগচীর 'শ্রাবণী', 'দেয়ালী' (জাগরণী) ইত্যাদি একই ব্যাপারের দৃষ্টান্ত হিসেবে তুলনীয়।

জন্ম-তারিখের হিসেবে ১৮৭০ থেকে ১৯০০ সালের মধ্যবর্তী রবীন্দ্র-কালীন

কবিদের রচনায় রবীন্দ্র-প্রভাবের এই তথ্যসার থেকে যথাক্রমে এই পাঁচটি ধারার পরিচয় পাওয়া গেল—

[১] অনুবর্তী নবীন কবিদের রচনায় রবীন্দ্র কাব্যের মন্ময়তার স্পন্দন এবং জড়-চেতনের ভেদ-বিলোপী সর্বময় ঐক্যবোধের অনুরণন ও অনুকরণ। [২] ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠতার ফলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে রবীন্দ্র-রুচির অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্মতর দিকের অর্থাৎ তাঁর বিশিষ্ট অনুভূতির সান্নিধ্যলাভ। [৩] রবীন্দ্র-কাব্যের বিষয় ও রীতির অর্থাৎ প্রসঙ্গ-প্রযুক্তির ব্যাপক প্রভাব। [৪] রবীন্দ্র-নাথের গানের প্রভাব। [৫] কবিতা ও কাব্যগ্রন্থের নামেতেও রবীন্দ্রানুস্মৃতির নিদর্শন।

সত্যেন্দ্রনাথ নিজে রবীন্দ্রবন্দনা-প্রধান একাধিক কবিতা লিখেছিলেন। এইসব কবিতায় রবীন্দ্র-প্রতিভার নানা সামর্থ্যের উল্লেখ আছে। 'ভারতী' গোষ্ঠীর কবিদের রচনায় রবীন্দ্র-প্রভাবের বিশেষ যে দিকটি চোখে পড়ে, সেটিকে বলা যেতে পারে স্থূল অনুকরণের দিক। প্রকৃতি-প্রীতি, মানব-প্রীতি, স্বদেশ-প্রীতি ইত্যাদি প্রসঙ্গের জের—এবং রীতির দিক থেকে একরকম কোমলতা বা মাধুর্যের প্রবণতাই সে-প্রভাবের বিশেষত্ব। সত্যেন্দ্র-কাব্যের বিশেষ কয়েকটি দিক সেই সূত্রে স্মরণীয়। দৃষ্টান্ত হিসেবে এমনি কয়েকটি দিকের উল্লেখ করা হোলো—

[১] রবীন্দ্রনাথের 'কথা'-কাব্যগ্রন্থের (১৩০৬) গাথাজাতীয় রচনাবলীর কথা বলা হয়েছে। 'শ্রেষ্ঠভিক্ষা', 'মূল্যপ্রাপ্তি' প্রভৃতি কয়েকটি কবিতায় বুদ্ধদেবের মহান্ জীবনের প্রতি কবির আগ্রহের লক্ষণ সুস্পষ্ট। রবীন্দ্র-সাহিত্যের অন্যান্য স্তরেও বৌদ্ধ সাহিত্যের প্রভাব বিদ্যমান। সেকালের তরুণ কবিদের মধ্যে কেউ কেউ এ-অঞ্চলে আগ্রহান্বিত ছিলেন। এই প্রসঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথের 'বুদ্ধবরণ', 'বুদ্ধপূর্ণিমা', 'পরিব্রাজক', 'মহানামন্',—মোহিতলাল মজুমদারের 'বুদ্ধ' ('স্মরগরল') এবং অন্যান্য কবির এই শ্রেণীর কবিতাগুলি স্মরণীয়।

[২] 'মানসী'র 'নব-বঙ্গ-দম্পতির প্রেমালাপ', 'কল্পনা'র 'জুতা-আবিষ্কার' —এবং সেই সূত্রে 'ক্ষণিকা'র উল্লাসস্পন্দ, পরিহাসমূলক কবিতাবলীর প্রভাবও মনে পড়ে। এ অঞ্চলে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের বিশেষত্বের কথা আগেই আলোচিত হয়েছে। কৌতুক-কবিতায় দ্বিজেন্দ্রলাল-রজনীকান্তের কৃতিত্ব

মনে রেখেও রবীন্দ্রনাথের শুচি, সংযত পৃথক আদর্শের স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করা অপরিহার্য।

[৩] ছন্দের অভিনবত্ব সাধনে রবীন্দ্রনাথের নতুন নতুন প্রয়াস লক্ষ্য করে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর 'ছন্দ-সরস্বতী'তে গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে গেছেন। উনিশ শতকে মধুসূদন, দ্বিজেন্দ্রনাথ প্রভৃতি কবিরা যেমন বাংলা কবিতায় ছন্দ-সাধনার নতুন নতুন পথ দেখিয়ে গেছেন, তেমনি রবীন্দ্রনাথও ছন্দের বিচিত্র অনুশীলনে নিজেকে নিযুক্ত রেখেছিলেন। ছান্দসিক সত্যেন্দ্রনাথ তো বটেই, 'ভারতী' পর্বের অন্যান্য অনেকেই সেই উৎস থেকে ছন্দের প্রেরণা পেয়েছিলেন।

রবীন্দ্র-কাব্যের এই বিচিত্র রূপ-গুণ কতক সজ্ঞানে, কতক বা যুগপ্রভাবে বরণ করে নিয়ে রবি-রশ্মির ব্যাপকতা ও সমারোহ সম্পর্কে নবীন কবিরা একবাক্যে, একযোগে, স্বতঃস্ফূর্ত আবেগে লিখেছিলেন—

[১] নিত্য করি অবগাহন পুণ্য তব কাব্য প্রয়াগ-স্রোতে,
সহস্র দল, সহস্র-রূপ তোমার মানস-লোক,
তপঃফলে বহাও বেণী দ্রবীভূত স্বয-কান্ত হ'তে,—
ভগীরথের শঙ্খধ্বনি শোনায় তোমার শ্লোক।
—করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় ['রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে': শতনরী]

[২] আজি শুধু স্তব্ধ হ'য়ে ভাবি মনে, কী যে তুমি ধন।
বিধাতার আশীর্ব্বাদ,—তব স্পর্শে ধন্য এ জীবন।
কবির প্রেরণা তুমি চিত্তমাঝে, ভক্তের বিনতি ;
তব পদপ্রান্তে আজি জানাইনু প্রাণের প্রণতি।
—যতীন্দ্রমোহন বাগচী ['কবি প্রশস্তি' : রবীন্দ্রনাথ ও যুগসাহিত্য]

[৩] যে রবি পশ্চিমে ডুবে'
নিত্য পুনঃ ওঠে পুবে,
আমাদের সে রবি যে নয় ;
যে রবির পাখি মোরা
আকাশে নাহি যে জোড়া,
ডুবিলে তো হবে না উদয়।
—যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ['রবি-প্রণাম' : সায়ম্]

[৪] হে সুন্দর! অতীন্দ্রিয় সৌন্দর্যের প্রশান্ত বিকাশ!
লভেছি তোমার মাঝে অনন্তের মঙ্গল আভাস।
তোমার অমেয় শক্তি অভ্র ভেদি ছুটেছে দ্যুলোকে,
তব রূপ-নীলাম্বরে আঁখি-পাখি ডুবিল আলোকে,
মুরছি পড়িল আত্মা তব জ্ঞান-সিন্ধু-সিকতায়,
প্রেমানন্দ-বন্যা মাঝে মর্মতট লুকালো কোথায়!
সীমা নাই, কূল নাই, হে বিরাট, সব যাই ভুলে,
স্পন্দহীন, নিশিদিন, দাঁড়াইয়া তব পাদমূলে।
—কালিদাস রায় ['সাহিত্য-সম্রাট রবীন্দ্রনাথ' : পর্ণপুট]

[৫] তোমার প্রখর তাপে কাননের যত বৈতালিক
নিরুদ্দেশ; দুই চারি হেথা'হোথা পল্লবের ছায়
করিছে কূজন বটে—দুঃসাহসী কলকণ্ঠ পিক!—
কে শোনে তাদের গান?
—মোহিতলাল মজুমদার ['রবির প্রতি' : ছন্দ-চতুর্দশী]

বাংলা দেশের তৎকালীন সাহিত্যিক সমাজের মনের কথাটি উচ্চারিত হয়েছিল সত্যেন্দ্রনাথের এই ক'টি কথায়—

রবির রশ্মি তোমাদেরি হিয়া রসে লাবণ্যে দিতেছে ভরি।[৩৩]

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর রবীন্দ্র-কাব্যের ব্যাখ্যান-সম্পর্কিত প্রসিদ্ধ বই-খানির নাম সম্ভবতঃ তাঁর প্রিয় বন্ধুর এই মন্তব্য থেকেই আহরণ করেছিলেন!

৩৩। 'স্বাগত' (কলিকাতার সাহিত্য-সম্মিলন উপলক্ষে)—'অভ্র আবীর' দ্রষ্টব্য।

সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যপ্রবাহ

অক্ষয়কুমার দত্তের পৌত্র, সুরেশচন্দ্র সমাজপতির স্নেহলালনে কাব্যানুশীলনে ব্রতী এবং রবীন্দ্রনাথের স্নেহচ্ছায়ায় ক্রম-মার্জিত সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবি-মানসের বিশ্লেষণে যে বিশেষত্ব সর্বাধিক দৃষ্টি আকর্ষণ করে, সে তাঁর বিস্ময়কর বৈদগ্ধ্য! নানা ভাষায় নানা কবিতার তিনি ছিলেন সজাগ পাঠক। তাঁর ছন্দ-চেতনা ছিল তীক্ষ্ণ, অকুণ্ঠ, নিত্য-নবান্বেষী! কৈশোরে মাতুল কালীচরণ মিত্রের 'হিতৈষী' পত্রিকায় প্রথম কবিতা প্রকাশের সময় থেকে ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু অবধি সুদীর্ঘ তিরিশ বছর ধরে একদিকে কবিতা পাঠে এবং অন্যদিকে কবিতা রচনায় তিনি ছিলেন সমান উৎসাহী। অধ্যয়নের বৈচিত্র্য,—শব্দাহরণের সামর্থ্য,—সমকালের নানা সাম্প্রতিক প্রসঙ্গের প্রতি মনোযোগ,—ছন্দ-দক্ষতা এবং গভীর উপলব্ধির বিরলতা—এই লক্ষণগুলিই তাঁর বিশেষত্ব। তাঁর পিতামহ অক্ষয়কুমার দত্ত,—পিতা রজনীনাথ দত্ত,—বন্ধুদের মধ্যে সতীশচন্দ্র রায়, অজিতকুমার চক্রবর্তী, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়,—ব্যক্তিগত গুণগ্রাহীদের মধ্যে শিশিরকুমার ভাদুড়ী, ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং পারিপার্শ্বিক পরিমণ্ডলের মধ্যে আরো অনেকেই ছিলেন বিভিন্ন তথ্য ও তত্ত্বের সন্ধানী,—বিদ্বান বলেই তাঁদের বিশেষ খ্যাতি।

আঠারোর শতকের কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের পরে বাংলার বিদ্বান কবিদের ধারায় উনিশ শতকের কৃত্রিম-ক্লাসিক পর্বের প্রায় প্রত্যেক কবির নামই স্মরণীয়। মধুসূদন-হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রের মতো 'মহিলা'র কবি সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারও ছিলেন বিদ্যার্জনব্রতী। তারপর, রোমান্টিক পর্বের অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী, বিহারীলাল চক্রবর্তী, অক্ষয়কুমার বড়াল প্রভৃতি লেখকদের নানা রচনায় তাঁদের প্রত্যেকের বিদ্যানিষ্ঠা লক্ষ্য করা যায়। বিহারীলালের বিদ্যাবত্তা সত্ত্বেও তাঁর রচনায় আত্মতন্ময়তা, ভাবনিমগ্নতা এবং গীতিপ্রাণ কবিত্বের প্রকাশ দেখা গিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্যই বহুগুণে পরিবর্ধিত হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। রোমান্টিক পর্বের কবিদের শ্রেণীবিভাগের অন্যতম নিরিখ হিসেবে এই বিদ্যাবত্তা লক্ষণটি ধর্তব্য। সে-পর্বের বাংলা কবিতায় তিনটি

প্রধান শাখার মধ্যে প্রথম দলের লেখাতে কাব্যগুণের তুলনায় বিদ্যাভারের অতিরেক,—দ্বিতীয় দলের মধ্যে মনন-বৈশিষ্ট্যহীন ভাবাবেশ,—আর তৃতীয় শ্রেণীতে রবীন্দ্রনাথ,—এবং তাঁরই রশ্মি-প্রভাবে উত্তরকালের পাঠকের চোখে কতকটা হৃতস্বাতন্ত্র্য অক্ষয় চৌধুরী, বিহারীলাল চক্রবর্তী, অক্ষয়কুমার বড়াল প্রভৃতি কবিদের কথা স্মরণীয়। তবে এঁরা প্রত্যেকেই যদিও বিদ্বান ছিলেন, তবু এঁদের পাণ্ডিত্য এঁদের কবিতার রসস্ফুরণে তেমন কোনো বাধা ঘটায় নি।

সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যুর অল্পকাল পরে ১৩২৯ সালের ভাদ্র সংখ্যার 'মানসী ও মর্মবাণী' পত্রিকায় শিবরতন মিত্র লিখেছিলেন—

> রবীন্দ্রনাথ যেমন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথেরই তপস্যার ফল, তেমনি সত্যেন্দ্রনাথও অক্ষয়কুমারেরই সাধনার পরিণতি।...অক্ষয়কুমারের নেতৃত্বাধীনে, ইউরোপের সমুদয় বিদ্যাকে আত্মসাৎ করিবার চেষ্টা এই 'তত্ত্ববোধিনীর' মধ্য দিয়া আরম্ভ হয়।...তিনি তাঁহার পৃষ্ঠপোষক দেবেন্দ্রনাথকেও বেদের অভ্রান্ততা বিষয়ক ধারণা হইতে বিমুক্ত করিয়াছিলেন এবং অমিত সাহসের সহিত প্রার্থনার আবশ্যকতা অস্বীকার করিয়াছিলেন।

নকুড়চন্দ্র বিশ্বাসের 'অক্ষয়-চরিত' (ভাদ্র, ১২৯৪) এবং মহেন্দ্রনাথ রায়ের 'অক্ষয়কুমার দত্তের জীবন বৃত্তান্ত' (১৮৮৫)—এই দু'খানি প্রামাণ্য জীবনচরিতে অক্ষয়কুমারের বিদ্যানুরাগ ও বিজ্ঞানস্পৃহার বহু কথা আছে। প্রথম বইখানির মধ্যে লেখা হয়েছিল—

> পাঠদ্দশায় ইনি প্রচলিত হিন্দুধর্মের প্রতি বীতরাগ হন। ইলিয়ড, বর্জিল, পদার্থবিদ্যা, ভূগোল, জ্যামিতি, বীজগণিত, ত্রিকোণমিতি, উচ্চ অঙ্গের গণিত-শাস্ত্র, বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, ও ইংরাজী সাহিত্য বিষয়ক ভাল ভাল গ্রন্থ অল্প বা বিনা সাহায্যে অধ্যয়ন করেন। বিজ্ঞানের প্রতি ইঁহার স্বতঃসিদ্ধ অনুরাগ ছিল।

নৃতত্ত্ব, পদার্থবিদ্যা এবং উদ্ভিদবিজ্ঞান,—এই তিন বিষয়ে অক্ষয়কুমার বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। কলকাতার উপকণ্ঠবর্তী বালি-তে বহু যত্নে গড়া 'শোভনোদ্যান' নামে একটি বাগানে কতো যে তরু-লতা-গুল্ম রোপণ করে তিনি হাতে-কলমে উদ্ভিদবিদ্যা অনুশীলন করতেন! বিজ্ঞান-প্রীতির সঙ্গে সঙ্গে ভাষা-চর্চা, নীতিতত্ত্বের অনুসন্ধান, পত্রিকা পরিচালনা, 'তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা' ও 'নর্মাল স্কুলে'র শিক্ষকতা, ভারতবর্ষের বিভিন্ন উপাসক-সম্প্রদায়ের ইতিহাস আলোচনা,—এমন কি প্রথম জীবনে কিছু কবিতা লেখাতেও তিনি মন দিয়েছিলেন। সম্ভবতঃ গুপ্ত-কবির সান্নিধ্যের গুণেই বৈজ্ঞানিক অক্ষয়কুমার

কবিত্বের দিকে ঝুঁকেছিলেন।[১] কিন্তু স্বাভাবিক প্রবণতার অভাবে সে দিকে তিনি আর বেশি দূর অগ্রসর হতে পারেননি। তাঁর রচনাবলীর মধ্যে একখানি 'ভূগোল',—'বাষ্পীয় রথারোহীদিগের প্রতি উপদেশ'-সম্পর্কিত কুড়ি পৃষ্ঠার এক পুস্তিকা,—প্রাচীন হিন্দুদিগের সমুদ্রযাত্রা ও বাণিজ্য-বিস্তার বিষয়ে একটি প্রবন্ধ,—'পদার্থবিদ্যা' এবং এই ধরনের বিভিন্ন প্রসঙ্গনামাবলী তাঁর বহুমুখী মেধারই পরিচায়ক।

সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন পিতামহের যোগ্য পৌত্র। তাঁর অন্তরঙ্গ কোনো কোনো বন্ধুর সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে এ-দিকেও তাঁর আগ্রহের প্রমাণ পাওয়া গেছে। বিভিন্ন ভোজ্য-বস্তুর খাদ্যপ্রাণ বিচার করে তিনি একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। শ্রীযুক্ত শান্তি পাল এবং আরো দু'চারজন তার পাণ্ডুলিপি দেখেছেন। বাংলা কবিতার ছন্দ সম্পর্কে লেখা তাঁর 'ছন্দ-সরস্বতী'র কথা আগেই বলা হয়েছে। বাংলার দেশজ শব্দ সম্পর্কে তিনি অবশ্য কোনো পুস্তিকা লেখেন নি,—কিন্তু এ-বিষয়ে তাঁর বৈজ্ঞানিক-যোগ্য পর্যবেক্ষণ-শক্তির পরিচয় শুধু তাঁর কবিতাগুলির মধ্যেই যে নিহিত, তা নয়; গদ্য-রচনা 'বারোয়ারি' উপন্যাসের ২৯-৩২ পরিচ্ছেদের ছত্রে-ছত্রে সে প্রমাণ আছে। তাঁর জ্ঞানস্পৃহার আর এক অকাট্য-প্রমাণ দেখা যায় বর্তমানে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে সংরক্ষিত তাঁর ব্যক্তিগত 'লাইব্রেরি'-র গ্রন্থ-তালিকায়। পারিপার্শ্বিক জগৎ সম্বন্ধেও তিনি যে খুবই আগ্রহ পোষণ করতেন, তার প্রমাণ আছে তাঁর জীবনের ছোটো ছোটো কয়েকটি ঘটনার মধ্যে। মানুষের সুখ-দুঃখ-হাসি-কান্নার বৈচিত্র্য দেখার জন্যে তিনি তাঁর বাসস্থানের আশে-পাশে শহর ও শহরতলীর নানা অঞ্চলে,—মেলায়, পার্কে, পথে ঘুরে বেড়াতেন। নানা সুযোগে চারুচন্দ্র এবং অন্যান্য বন্ধুর সঙ্গে শ্রীরামপুর, কোন্নগর, গোবরডাঙ্গা, বালি, শিবপুর ইত্যাদি কলকাতার কাছাকাছি অঞ্চলে তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন। 'Monday Club', 'Marigold Club' ইত্যাদি বিশ্রম্ভসভায় অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রমথ চৌধুরী, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শিশিরকুমার ভাদুড়ী প্রভৃতি বিদ্বজ্জনের আলাপ-আলোচনার তিনি ছিলেন মনোযোগী শ্রোতা। Central Swimming Club-এর তিনি ছিলেন আন্তরিক এবং

১। আনুমানিক ১৪ বছর বয়সে অক্ষয়কুমারের 'অনঙ্গমোহন' প্রকাশিত হয়। নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস এখানিকে 'পদ্যময় গ্রন্থ' বলেছেন।

সক্রিয় হিতৈষী। ১৯১১ সালে কলকাতার ফুটবল খেলায় মোহনবাগান দলের জয়লাভ উপলক্ষে 'সঙ্গীতসমাজ'-এর পক্ষ থেকে যে সংবর্ধনার আয়োজন হয়, তাতে কবিতা লেখার আহ্বান এসেছিল তাঁরই কাছে। সত্যেন্দ্রনাথের সেই কবিতাটির নাম 'আমরা'। এই উপলক্ষে প্রকাশিত পুস্তিকার 'নিবেদন' অংশে কর্তৃপক্ষ লিখেছিলেন—

> অক্ষয়কীর্তি অক্ষয়কুমারের পৌত্র, নবীন কবি, শ্রীমান সত্যেন্দ্রনাথ বাঙ্গালীর অতীত ও বর্তমানের সমস্ত গৌরবকাহিনী একত্র গ্রথিত করিয়া একটি মহদ্ভাব-গর্ভিণী সুন্দর-বচন-মনোরমা গাথা রচনা করিয়াছেন এবং তদ্দ্বারা সেগুলিকে নিত্যস্মরণের উপযোগী করায় সমস্ত বাঙ্গালীর ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। বাণীমুখে প্রথম প্রচারিত সেই অমৃতগাথা 'আমরা' আজই এই আনন্দোৎসবে বন্ধুবর্গকে উপহার দিলাম।

এইসব তথ্যের ওপর নির্ভর করে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত সম্বন্ধে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে যে, পিতামহের বিদ্যানুরাগ এবং পারিপার্শ্বিক সমাজ সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহ—উত্তরাধিকারসূত্রে এ দুই-ই তিনি লাভ করেছিলেন।

বন্ধু ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের কাছে লেখা বাংলা ১৩১৪ সালের ২৭এ পৌষ তারিখের একখানি চিঠিতে সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর তৎকালীন দৈনিক কার্যাবলীর বিবরণী প্রসঙ্গে ষ্টার-থিয়েটারে 'চন্দ্রশেখর' অভিনয় দেখার অভিজ্ঞতা,—'Psychology of Sex' এবং Stephen Philips-এর 'Paola and Francesca' পড়ার সংবাদ,—হার্মোনিয়ম-শিক্ষার প্রসঙ্গ ইত্যাদি জানিয়ে উপসংহারে এ-কথাও লিখেছিলেন যে, সে-সময়ে প্রতিদিন হ্যারিসন রোডে গিয়ে পুরানো বইয়ের দোকানে তিনি বই সন্ধান করতেন। ১৩১৫ সালের ২রা বৈশাখের আর-একখানি চিঠিতে তাঁর ফরাসী ভাষা শিক্ষা,—Ruskin-এর 'Elements of Drawing' এবং Cowell-সম্পাদিত বৌদ্ধ জাতক পাঠেরও উল্লেখ আছে।[২]

সত্যেন্দ্রনাথের মাতুল-কন্যা শ্রীমতী মমতা ঘোষ জানিয়েছেন—

> তিনি যে-জ্যোতিষ চর্চা করেছিলেন এ খবর বেশী লোক পান নি। এ বিষয়ে অনেক বই তাঁর পড়া ছিল। বহু রাশি-চক্র সংগ্রহ করেছিলেন, কয়েকটি কোষ্ঠী বিচারও করেছেন দেখেছি।...

২। 'লিপিকার সত্যেন্দ্রনাথ'—শ্রীসুরেশচন্দ্র রায়, 'প্রবাসী' : অগ্রহায়ণ ১৩৪৯।

…যখনই তাঁর বাড়ী গিয়েছি—দুপুরের দিকেই বেশী যেতুম—দেখেছি তাঁর লাইব্রেরী ঘরের দরজা বন্ধ।…আলমারীতে বইয়ের রাশি, সামুদ্রিক জিনিসে ভরা কাঁচের বাক্স,…

…সৌখীন মানুষ ছিলেন তিনি। কোঁচানো ধুতি উড়ুনি ব্যবহার করতেন। দামী দামী শালও তাঁর ছিল দেখেছি। জীবনের শেষভাগে জাপানীদের পোষাকের অনুকরণে 'কিমোনো' তৈরি করেছিলেন। 'কিমোনো' পরা ছবি তাঁর আছে। গাছ, ছবি, বই, সামুদ্রিক দ্রব্যে তাঁর বাড়ী সুন্দরভাবে সাজানো ছিল। …পেন্সিল দিয়ে ছবি আঁকাও তাঁর আসত।৩

সত্যেন্দ্রনাথের কবিতায় তাঁর ব্যক্তিস্বভাবের বৈদগ্ধ্য, নানা কলারুচি, এবং পারিপাট্যস্পৃহা, এই তিনটি গুণই প্রতিফলিত হয়েছে। সাহিত্যে রূপগত পরিপাট্যের দিকে বেশি ঝোঁক দেওয়া বিশেষ এক শ্রেণীর ক্লাসিক্যাল কাব্য-রীতির স্বভাব। 'সবিতা' থেকে শুরু করে তাঁর মুদ্রিত কাব্যগ্রন্থের শেষ রচনাটি অবধি এই সংযম-সংহতির দিকেই তিনি অপেক্ষাকৃত বেশি অভিনিবিষ্ট ছিলেন। মননাতিরেক এবং হৃদয়বিরলতা,—পরস্পরসংবদ্ধ এই দু'রকম বিশেষত্বের লক্ষণ সত্যেন্দ্র-কাব্যপ্রবাহের প্রায় সর্বত্রই সহজদৃশ্য।

পিতামহের উত্তরাধিকার,—বিদ্বান পিতা রজনীনাথ দত্তের প্রভাব,—বাল্য ও কৈশোরের প্রথম সাহিত্যপ্রেরণার সহায়ক সুরেশচন্দ্র সমাজপতির শ্যেন-সতর্ক বিশ্লেষণবুদ্ধির নৈকট্য,—কৃচ্ছ্রসাধক তরুণ বন্ধু সতীশচন্দ্র রায়ের সান্নিধ্য,—অকৃতদার, জ্ঞানতপস্বী ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও অজিতকুমার চক্রবর্তীর সাহচর্য—প্রধানত এই সব কারণেই মননের অতি-চর্চায় তাঁর হৃদয়ের আবেগ বা উত্তাপের দিকটি কতকটা ক্ষীণ হয়ে গিয়েছিল। বিচিত্র প্রসঙ্গ, বিভিন্ন মনন, অজস্র রীতিবৈচিত্র্য এবং অকপট পরিশ্রম তাঁর রচনায় অনায়াসদৃশ্য,—কিন্তু সার্থক হৃদয়োত্তাপ কদাচ অভিব্যক্ত। তাতে প্রাণের বিরলতা, বস্তুর প্রাধান্য,—সহজ লাবণ্যের স্বল্পতা, কৃত্রিম শোভাসৃষ্টির অতিরেক! অবশ্য, ব্যতিক্রমও আছে। 'কয়েকটি গান'-এর মত কিছু সার্থক কবিতাও তাঁর সৃষ্টিতে বিদ্যমান। বস্তুবৈচিত্র্যে অভিনিবেশ সত্ত্বেও তিনি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মতো প্রসঙ্গ-সর্বস্ব অথবা বিদ্রূপাভিলাষী মাত্র ছিলেন না; বস্তুসীমার বাধা পেরিয়ে যাবার মতন ধ্যানের অভাব থাকাতেই তিনি প্রধানতঃ কাব্যের মণ্ডনকলার সঙ্গে বিজ্ঞান ও

৩। প্রবাসী : আষাঢ়, ১৩৫১।

দর্শনের বিশ্লেষণ-প্রবণতার চর্চা করে গেছেন। বাংলার পূর্বগামী কবিসম্প্রদায়ের কাছে তাঁর ঋণের বহু দৃষ্টান্ত তাঁর ঐতিহ্য-চেতনারই সমর্থক। অনুবাদ-চর্চায় তাঁর আগ্রহ তাঁর বঙ্গসাহিত্য-প্রীতিরই নিদর্শন। বিভিন্ন সাময়িক ঘটনা উপলক্ষে পদ্য লেখার ঝোঁক, অথচ, সেইসঙ্গে দেশের উচ্চতম নেতৃমণ্ডলীর সামাজিক, রাজনীতিক ও সাহিত্যিক রুচির সতর্ক অনুসৃতি,—জনখ্যাতির প্রতি তাঁর আগ্রহ,—এবং ধ্বনি-বিলাস ও শব্দ-পাণ্ডিত্য প্রদর্শনের ব্যাকুলতা তাঁর রচনা-প্রবাহে উচ্চ-কোটির কাব্যাবেগের দৈন্য এবং মৌলিক কবিকল্পনার (imagination) আপেক্ষিক অভাব ঘোষণা করে।

গদ্যে শরৎচন্দ্র এবং কাব্যে নজরুল তাঁদের বক্তব্যের জোর যেমন ভাবে দেখিয়েছিলেন, সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যে তেমন সামর্থ্য সত্যিই বিরল। একদিকে পাণ্ডিত্যস্পৃহা, অন্যদিকে সৌখীনতা, পরস্পরগ্রথিত এই দুই প্রবণতাই তাঁর কাব্যের মূল কথা। জীবনের গভীর, ব্যাকুল, পরম উপলব্ধি থেকে তিনি কবিতা লেখার প্রেরণা পেয়েছিলেন মাত্র মুষ্টিমেয় কয়েকটি ক্ষেত্রে। তাঁর কবিতায় তথ্য ও তত্ত্বের আতিশয্য বিস্ময়কর। পিতামহের স্বোপার্জিত, সঞ্চিত বিত্তবল এবং পিতৃকুলের সংস্কৃতির দৃঢ় ভিত্তি—এই দুইয়ের অনুকূল প্রভাবে লালিত হয়ে নিরাপদ, শান্ত, নাগরিক জীবনের নিশ্চিন্ত সমতলবাসী সত্যেন্দ্রনাথ উৎসাহী পর্যটকের মতোই বিশ্বের কাব্যলোকে ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। জীবনের গূঢ়, অনির্বচনীয়, প্রবল আনন্দ-বেদনা-সংশয়ের তাড়নায় তিনি কাব্য-রচনায় আত্মনিয়োগ করেন নি। বরং বহুতীর্থসুখী কাব্যামোদীর আনন্দই তাঁর রচনায় ইতস্ততঃ এবং সর্বত্র ছড়িয়ে আছে।

উদ্ভবপর্ব: ১৮৯৩ ?—১৯০০

'বেণু ও বীণা'র কয়েকটি কবিতা

সবিতা—১৯০০

'বেণু ও বীণা'র 'স্বর্গাদপি গরীয়সী' কবিতাটির রচনাকাল আষাঢ় ১৩০০ সাল। চতুর্থ সংস্করণে ছাপা এই তারিখটি যদি অভ্রান্ত বলে মেনে নেওয়া যায়, তাহলে সত্যেন্দ্রনাথের প্রথম স্থায়ী রচনার নিদর্শন যে এইটিই, সে-বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। 'দুর্দিনের অতিথি' (শ্রাবণ, ১৩০৪) এবং 'সন্ধ্যাতারা' (জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৬) কবিতা দুটিও ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের আগেকার রচনা। ১৯০০-তে

তাঁর 'সবিতা' প্রকাশিত হয়। নতুন শতক শুরু হবার বছর-সাতেক আগে থেকেই কাব্যচর্চার অভ্যাস তাঁর আরম্ভ হয়েছিল।

'বেণু ও বীণা'র পূর্বোক্ত তিনটি কবিতারই রচনা-ভঙ্গিতে অপরিণত কবি-কিশোরের সারল্য সুস্পষ্ট। 'স্বর্গাদপি গরীয়সী'-তে বঙ্গজননীকে আহ্বান করে তিনি জানিয়েছিলেন—

অসুরে ঘিরেছে, হায়, কল্প-তরুবরে
দেবতার কামধেনু দানবে দুহিছে!
আজি হ'তে অন্বেষি' ফিরিব ঘরে, ঘরে,
কোথা ইন্দ্র ?—বলে দে গো, কাঁদিসনে মিছে।

'দুর্দিনের অতিথি'-র বিষয়বস্তুটি এই: দোয়াতের কালি ফেলে দিয়ে সেটিকে কামিনীগুচ্ছের ফুলদানী হিসেবে ব্যবহার করা হোলো। বন্ধ ঘরের মধ্যে সেই ফুলে সংলগ্ন একটি প্রজাপতির খেয়াল দেখে দেখে বর্ষণ-ম্লান দীর্ঘ দিন কাটলো। তারপর সন্ধ্যা হোলো। ঘরের দরজা-জানলা বন্ধ করে প্রদীপ জ্বেলে কবি ভাবছিলেন নানা কথা,—এমন সময়ে

হঠাৎ, উড়ে, আলোয় পড়ে,
প্রজাপতির জীবন গেল ;—
হায়, অতিথি! নয়ন-জলে,
নয়ন আমার ভরে এল।

তৃতীয় কবিতা 'সন্ধ্যাতারা'-র শিরোনামের নিচে বন্ধনী-চিহ্নের মধ্যে ছাপা হয়েছিল 'কীর্তনের সুর'। রবীন্দ্রনাথের 'সন্ধ্যা-সংগীত'-পর্বের দুঃখানুভূতির প্রতিধ্বনিময় এই রচনাটিতে কিশোর কবি তাঁর 'জীবন-সন্ধ্যা-গগনে'-র মৃদুলোজ্জ্বল তারকাকে আহ্বান করে লিখেছিলেন—

তুমি নিরাশার মেঘে ডুবো না,
তুমি প্রলয়ের ঝড়ে নিবো না,
শুধু অমনি আসিয়া,
হাসিয়া, হাসিয়া,
অমিয় ঢালিও পরাণে,—
মম জীবন-সন্ধ্যা-গগনে!

রবীন্দ্রনাথের 'সন্ধ্যা-সংগীত'-এর 'তারকার আত্মহত্যা'-র অনুসরণে অক্ষয়-

কুমার বড়াল 'বঙ্গদর্শনে' 'রজনীর মৃত্যু' নামে একটি কবিতা লিখেছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথের 'সন্ধ্যাতারায়' 'সন্ধ্যা-সংগীত'-এর কোনো বিশেষ কবিতার নিকট অনুসৃতি ঘটেনি বটে, কিন্তু সে যুগের রবীন্দ্রানুসারী আরো কোনো কোনো তরুণ কবির বিভিন্ন রচনাতে যেমন,—তাঁর এই 'সন্ধ্যাতারা' কবিতাটিতেও তেমনি 'সন্ধ্যা-সংগীত'-এর মেদুর প্রভাবই সুনিশ্চিতভাবে ছায়াপাত করেছিল। 'সন্ধ্যা-সংগীত'-এর 'আশার নৈরাশ্য' কবিতায় কিশোর রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'দুঃখক্লেশে আমি কি ডরাই?' 'সন্ধ্যাতারা'য় কিশোর সত্যেন্দ্রনাথও নৈরাশ্যের মেঘ এবং প্রলয়ের ঝড় উপেক্ষা করবার এই ক্ষীণ প্রস্তাব প্রকাশ করলেন! এই প্রস্তাবের সুর কীর্তনের,—শব্দমালা মুখ্যতঃ স্বরান্তিক,—রীতি কোমল,—এবং প্রকাশ ম্রিয়মান।

সন্ধ্যাতারার স্নিগ্ধ রশ্মি উপভোগ করবার অনতিকাল পরে গায়ত্রী মন্ত্র স্মরণ করে সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর 'সবিতা' কাব্যে সূর্য-বন্দনা লেখেন। মোট পঞ্চাশ স্তবকে সম্পূর্ণ এই রচনাটিরই 'সূচনা' কয়েকটি কথা বর্তমান আলোচনার অন্যত্র (পৃঃ ২১ দ্রষ্টব্য) উদ্ধৃত হয়েছে। গদ্যে তিনি 'সূচনা'য় যা লিখেছিলেন, কাব্যের স্তবকে তাঁর সেই বাণীই পুনরুচ্চারিত হয়েছিল। দেশহিতৈষী কবিকিশোর জানিয়েছিলেন—

> জীবনে উৎসাহ চাই, মনে তেজ চাই, কর্মে আনন্দ চাই, হৃদয়ে স্ফূর্তি চাই। দর্শনের অবসাদ ঔদাস্য যথেষ্ট হইয়াছে—আর নয়। ...যদি স্বজাতীয়ের বিলোপ বাঞ্ছিত না হয় তবে এখনও দার্শনিক নিশ্চেষ্টতা পরিহার করিয়া বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানোন্নত শিল্পশিক্ষা কর্তব্য। [সূচনা]

'সবিতা'র তৃতীয় স্তবকে এই একই কথা ছন্দোবন্ধে বলা হয়েছিল—

উষায় উষায় তাই আহ্বানি তোমায়,—
  আলোক—উৎসাহ—আশা—জ্ঞান!
স্তব্ধ হক্ তন্দ্রাময়, অবসাদ-মাখা
  ঝিল্লীরব—কুহকের তান।
  না হ'লে নিদ্রার কোলে
  আবার পড়িব ঢলে,
  সাথী যত—চলে যাব ফেলে,
  রহিব পিছনে একা কাঁদিতে বিফলে।

৩। 'সবিতা'-র প্রথম পৃষ্ঠায় প্রথম স্তবকের নিচে পাদটীকায় 'ওঁ ভূর্ভুবস্বঃ তৎ সবিতুর্বরেণ্যং...' ইত্যাদি ছাপা হয়েছিল

তেরো-র স্তবকে জ্ঞানসন্ধানী কবি সূর্যের সঙ্গে মানব-মনের সাদৃশ্য সম্পর্কে পুনরায় জানিয়েছিলেন—

অবিরাম, অবিশ্রাম জ্বলিছে যেমন,
আমাদের' এ ক্ষুদ্র হৃদয়—
বিশ্বের রহস্যময় দুঃখ সুখে পড়ি,—
জ্বলিছে হে জ্ঞান পিপাসায়।
অমৃত ফেলিয়া তাই
শুধু জ্ঞান-সুধা চাই ;
ধ্রুবতারা আঁধার সাগরে—
মানবের নিত্য-সখা জ্ঞান এ সংসারে।

পনেরো-র স্তবকে রাত্রির শেষে উষার আবির্ভাব এবং উষার পরে সূর্যোদয়ের ক্রমায়ণ লক্ষ্য করে মানবচিত্তোন্মেষের স্তরবৈচিত্র্যের সাদৃশ্য চিন্তা করা হয়েছিল। আদিতে অন্ধকার,—সে অন্ধকারে দৃষ্টি ব্যাহত। তারপর যথাকালে উষার আবির্ভাব! মানবচিত্তের সেই প্রথম উন্মেষলগ্নে দেখা দেয় 'সৌন্দর্য—কবিতা—আস্তবণ'! সেই অবস্থা কেটে গেলে—'অবশেষে, তীব্র, শুভ্র, সত্যের কিরণ'! পরের কয়েকটি স্তবকে ভারতে আর্যজাতির অভ্যুদয় ও ক্রমোন্নতি উপলক্ষে গর্ব প্রকাশ করে কবি তাঁর সমকালীন ভারতবাসীর ক্রমাবনতি সম্বন্ধে খেদোক্তি করেছিলেন। সেই সূত্রে চীন, মিশর, রোম, 'পারস্তান',—এই প্রাচীন সভ্য দেশগুলির বিলুপ্ত গোরবের কথা উঠেছিল। তিনি লিখেছিলেন,—'প্রতীচ্যে জাগিল আলো—প্রাচ্য অন্ধকার'! বত্রিশ-তেত্রিশের স্তবকে স্পষ্টই বলা হয়েছিল যে, শান্তির উদ্দেশ্য সমাজের ঐক্যশক্তির আনুকূল্য করা,—শান্তিময় পরিবেষ্টনীর মধ্যেই প্রকৃত জ্ঞানের সাধনা সম্ভব হতে পারে—

শান্তি যদি হাসে ধরা পরে
সরল জ্ঞানের পথ হবে ধীরে ধীরে।

য়ুরোপের মানস ক্ষেত্রে সেই সত্যসন্ধ শান্তি-সাধনা লক্ষ্য করে সহসা ভাবাবেগের প্রাবল্যে এবং ইতিহাস-বিরোধী কবিস্বপ্নের প্রভাবে তিনি লিখেছিলেন—

সে কিরণে মুছে গেল আফ্রিকা-অপ্রীতি,
আমেরিকা!—আ মরি কি শোভা।

সে কিরণে অষ্ট্রেলিয়া, অসভ্য জাপান,
ধরেছে সৌন্দর্য মনোলোভা !
সে কিরণে সুবিমল
লভেছে নবীন বল—
এতদিনে ভারত আবার ;
ধন্য রে য়ুরোপ ধন্য মহিমা তোমার।

সেদিনের কিশোর বাঙালী কবি যাই বলে থাকুন, আজ একথা সকলেই জানেন যে য়ুরোপীয় শ্বেত-শক্তি আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়ায় আর যাই করে থাকুক, —শান্তির বদান্যতায় কালক্ষেপ করে নি !

'সবিতার' বিয়াল্লিশের স্তবকে পৌঁছে য়ুরোপের বিজ্ঞান-সাধনার প্রশস্তিধারা সহসা ব্যাহত হয়েছে—

একি হ'ল ! একি ছবি দেখালে বিজ্ঞান,—
এ জগতে নাহি কি করুণা ?
একের নিধন বিনা বাঁচে না অপর !
এ বিশ্ব কি দানব-রচনা !

কিন্তু তৎসত্ত্বেও জ্ঞানৈষণা ক্ষান্ত হয় নি! তবে 'প্রাণপণে জ্ঞানপথে' অগ্রসর হবার লক্ষ্যে দৃষ্টি রাখা সত্ত্বেও উপান্ত স্তবকে সত্যেন্দ্রনাথ পুনরায় সন্ধ্যা-ভাবনাতেই ম্রিয়মান বোধ করেছিলেন—

যাই তবে, সন্ধ্যা আসে,—হয়েছে সময়,
স্নেহময়ী জননীর মত ;
ঝিল্লিরব—ঢালে বুঝি সুষমা-সঙ্গীত—
ওই—ওই—ওই অবিরত।

পিছনে আসিছে যারা
দাও আলো, হ'ক তারা
আত্মহারা—প্রফুল্ল হৃদয়।
যাই তবে—আমাদের হয়েছে সময়।

অক্ষয়কুমার বড়ালের প্রথম কবিতার বই 'প্রদীপ' (চৈত্র, ১২৯০)-এর

তৃতীয় সংস্করণে সুরেশচন্দ্র সমাজপতির লেখা ‘প্রস্তুতি’-অংশে মন্তব্য ছিল—

> বড়াল কবি দুঃখের গান গাহিয়াছেন,—কিন্তু সেই দুঃখের হলাহলে সুখের সুধা ঢালিয়া দিয়াছেন। তিনি দুঃখে—অমঙ্গলে বিহ্বল ও আত্মবিস্মৃত হন নাই, মঙ্গলের আবাহন করিয়াছেন। বড়ালের কাব্যে দুঃখবাদের বিষও অমৃতে পরিণত হইয়াছে। তিনি দুঃখবাদাবলম্ব হইয়াও আস্তিক, বিশ্বাসী; বিধাতার মঙ্গল বিধানে তাঁহার একান্ত নির্ভর।

সত্যেন্দ্রনাথের ‘সবিতা’-কাব্যেও একই রকম দুঃখ-স্বীকৃতি বিদ্যমান। বয়োধর্ম ও যুগধর্মের প্রভাবে তিনি দুঃখ-কল্পনা সম্পূর্ণ পরিহার করতে পারেন-নি বটে, তবে তাঁর কাব্যানুশীলনের আদি-পর্বেই চিরপ্রাণোজ্জ্বল সবিতার বন্দনা স্মরণীয়! অক্ষয়কুমার এবং সত্যেন্দ্রনাথ, এঁদের উভয়েরই প্রথম কবিতাবলীর দুঃখবাদ বিশ্লেষণ করলে ব্যঞ্জনাগত বিশেষ সাদৃশ্য চোখে পড়ে। অবশ্য, ভাবাদর্শের ক্ষেত্রে এঁদের সাদৃশ্যের তুলনায় বৈষম্যের ধারণাই পাঠকসমাজে বেশি প্রচারিত। ‘প্রদীপ’-এর ‘নারী-বন্দনা’, ‘অভেদে প্রভেদ’, ‘প্রেম-গীতি’, ‘শেষবার’, ‘কামে প্রেম’ ইত্যাদি কবিতার বিষয়বস্তু সত্যেন্দ্রনাথের স্বাভাবিক আগ্রহের অনুকূল ছিল না। নরনারীর প্রণয়কলা অথবা পারস্পরিক অনুরাগ বা আসক্তির প্রসঙ্গ থেকে তিনি কাব্য রচনার প্রেরণা পেয়েছিলেন অল্প কয়েকটি ক্ষেত্রে। তবে, ‘সবিতা’য় ‘প্রদীপ’-কাব্যের ভিন্ন-প্রাসঙ্গিক বহুশ্রুত অন্য একটি কবিতার প্রতিধ্বনি অস্বীকার করা যায় না। সে লেখাটির নাম ‘মানব-বন্দনা’। Swinburne-এর ‘Hymn of Man’-এর আংশিক অনুস্মৃতির দৃষ্টান্ত হিসেবে বড়াল কবির সে রচনাটি প্রসিদ্ধ। পাশ্চাত্ত্য অভিব্যক্তি-বাদের কয়েকটি সূত্র এই কবিতার মধ্যে ছন্দোবন্ধে ধ্বনিত হতে শোনা গেছে।

সত্যেন্দ্রনাথের ‘সবিতা’য় একদিকে বৈদিক সংস্কৃতির প্রশস্তি,—অন্যদিকে পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান-সাধনার প্রতি আগ্রহ,—এই দুই মনোভাবের যৌগপদ্য অনস্বীকার্য। কিন্তু ‘সবিতা’ লেখবার সময়ে বিজ্ঞান সম্বন্ধে তিনি যে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন, পরবর্তী অন্যান্য কয়েকটি কবিতায় তা বাধা পেয়েছে। বিজ্ঞানসেবী প্রতীচ্য জগতের জড়বাদী সাফল্যে তিনি তৃপ্তি বোধ করতে পারেন নি। ‘বেলা শেষের গান’-এর মধ্যে সংকলিত ‘উড়োজাহাজ’ কবিতায় তিনি লিখেছিলেন—

> সৃজিয়াছে তোরে বিজ্ঞান বুড়ো কানা
> ওরে কদাকার ভূত বাদুড়ের ছানা।

'চরকার আরতি'-তে আরো চড়া সুরে অভিযোগ উচ্চারিত হয়েছিল—

ধ্বসা পশ্চিমা লেগে পচে যায় ছুনিয়া,
ছেয়েছে কুকুর-লোভী কামনার ছোঁয়াচে,
শয়তান লেলিয়েছে বোতলের বেতালে,—
দহিছে আগুন-পানি, কে বাঁচাবে ও আঁচে ?

বিজ্ঞান-বিজ্ঞের বিজ্ঞতা-ঝট্‌কায়
উড়ে গেল 'ওপ্‌পাট' ! উড়ে গেল সত্ত্ব !
হাজারো নিরীহ প্রাণ অকারণ বলিদান
দেমাকে করাতে পান ডাকিনীর মন্ত্র !

সত্যেন্দ্রনাথের বাল্য ও কৈশোরের সাহিত্যচর্চার পথপ্রদর্শক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি প্রতীচ্য সভ্যতার 'দানব-শক্তি' সম্পর্কে খুবই সন্ত্রস্ত বোধ করতেন। ১৯১২ সালে, অর্থাৎ সত্যেন্দ্রনাথের কবিজীবনের 'বিকাশ-পর্ব' অতিক্রান্ত হয়ে যখন 'সমৃদ্ধি-পর্ব' শুরু হয়েছে, সেই সময়ে, অক্ষয়কুমার বড়ালের পূর্বোক্ত 'প্রদীপ' কাব্যগ্রন্থের 'প্রস্তুতি'-অংশে প্রতীচ্য দুঃখবাদ সম্পর্কে সমাজপতি লিখেছিলেন—

> নিরাশ, নিরুপায়, দুঃখপিষ্ট মানব অতীতের স্মৃতি মুছিয়া ফেলিয়া বর্তমানকেই সকল দুঃখের হেতু কল্পনা করিয়া, তাহার সর্বস্ব চূর্ণ বিচূর্ণ করিবার জন্য দানবশক্তির আবাহন করে ; ···

কুড়ি বছর বয়সে লেখা 'ডায়ারি'-র এক জায়গায় সত্যেন্দ্র-সুহৃদ্ সতীশচন্দ্র লিখেছিলেন—

> এখনো অনেক মিথ্যাকে দূর করিতে হইবে। এখনো অনেক কষ্টে বুদ্ধিকে উজ্জ্বল করিতে হইবে। সমস্ত স্বদেশকে, জগৎকে ভাল করিয়া দেখিতে হইবে,—এখনো প্রাণকে শান্ত হইতে শান্ত, নিবিড়লীন হইতে নিবিড়লীন করিতে হইবে। এখনো আলস্য পরিত্যাগ করিয়া পর্যবেক্ষণশক্তিকে সুমার্জিত করিতে হইবে।
>
> কবিতা রচনার মত নিবিড় ব্যথা আমি কোনদিন ধরিতে পারিব না ?

একদিকে পাশ্চাত্ত্য 'নিহিলিজ্‌ম্',—অন্যদিকে নবীন কবিমানসের বয়ঃসন্ধি-কালের দুঃখব্যাকুলতা—এই দুই ভিন্ন শ্রেণীর দুঃখতত্ত্বের নানা আলাপ-আলোচনার মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথের বাল্য ও কৈশোর অতিবাহিত হয়েছে। পিতামহের বিজ্ঞানবুদ্ধির উত্তরাধিকার স্বীকার করে কাব্যচর্চায় হস্তক্ষেপ

করবার প্রথম পর্বেই বয়োজ্যেষ্ঠ সমাজপতি এবং সমবয়স্ক সতীশচন্দ্র ও অজিতকুমার—এই তিন আশাবাদী, মানবকল্যাণ ও সংঘসংহতি-অভিলাষী প্রিয় সুহৃদের সান্নিধ্য লাভের ফলে অন্যথা অবশ্যম্ভাবী কৈশোরক ব্যথাবিলাসের জড়তা থেকে তিনি সহজেই আত্মরক্ষা করতে পেরেছিলেন। ১৩০৯ সালে শান্তিনিকেতন থেকে লেখা একখানি চিঠিতে সতীশচন্দ্র তাঁকে জানিয়েছিলেন—

> আজকাল আমাদের সাহিত্যের Prospect অতি শোচনীয়। আমি সাহিত্য proper-এর কথাই বলিতেছি। কারণ সাহিত্য আলোচনার জন্য যে পরিমাণ সাধুতা, চরিত্রবল, পরিশ্রম এবং মস্তিষ্কের উৎকর্ষের দরকার তা অনেক সাহিত্যযশোলিপ্সু যুবাপুরুষের নাই। আপনার সেইটি আছে এইরূপ আমার মনে হইয়াছিল।…আমার এইরূপ বিশ্বাস যে Prophetsদের পরেই সাহিত্য মানুষের জীবনের উন্নতির সহায়। Prophets কিছু রোজ আসে না—interimগুলি আমাদিগকে সাহিত্যের democratic culture দিয়া ভরিয়া রাখিতে হইবে। স্বদেশের ভাবগতি এবং conditions দেখিয়া তাহার মধ্যে মানবের Highest ideals of beauty জাজ্বল্যমান করিয়া দেখাইতে হইবে।

ঐ পত্রের শেষাংশে বন্ধুকে বিশেষ অনুরোধ করে সতীশচন্দ্র লিখেছিলেন—

> আমি আপনাকে অনুরোধ করিতে পারি কি না জানি না—তবু সাহস করিয়া একটি বিষয়ে অনুরোধ করিব। সে হচ্ছে কলিকাতার young literati দলের বাক্যসভা হইতে আপনি দূরে থাকিবেন।[৪]

সতীশচন্দ্রের মৃত্যুর পরে সত্যেন্দ্রনাথ 'দেবরাত' নামে যে কবিতাটি লিখেছিলেন 'বিশ্বভারতী পত্রিকার ষষ্ঠ বর্ষের তৃতীয় সংখ্যায় সেটি ছাপা হয়েছে। সেই কবিতায় বলা হয়েছিল—

শূন্য আজি গুরু-গৃহ, শূন্য তপোবন,
বক্ষে গুরু মৌনতার ভার ;
মনের জগতে মোর মারী হয়ে যেন
একদিনে হয়ে গেছে সব ছারখার।

আজ হতে একা আমি ভ্রমিব এ বনে
তুমি আর আসিবে না ভাই ;
অশ্বিদ্বয় সম মোরা ছিনু দুইজনে,
আজ আর দুই নাই—ভাবি শুধু তাই।

৪। বিশ্বভারতী পত্রিকা, মাঘ-চৈত্র, ১৩৫৪ ; পৃঃ ১৭৭-১৭৮ দ্রষ্টব্য।

'বেণু ও বীণা'গ্রন্থাকারে ছাপা হবার আগেই সত্যেন্দ্রনাথের জীবনে রবীন্দ্রভক্ত বন্ধুমণ্ডলীর আকর্ষণ দেখা দিয়েছিল। উত্তরকালে তাঁর কবিত্বের 'বিকাশ'-পর্বে একদিকে অক্ষয়কুমার দত্তের বিজ্ঞানী মননাদর্শের ঐতিহ্য ও সমাজপতির নীতি-সংযম-শৃঙ্খলাভিপ্রায়ী মনোভাবের প্রভাব,—অন্যদিকে সতীশচন্দ্র-অজিতকুমার-চারুচন্দ্র প্রভৃতি রবীন্দ্রভক্ত বন্ধুজনের প্রসাদে এবং স্বয়ং রবীন্দ্রনাথেরই স্নেহদাক্ষিণ্যে রোমান্টিক আনন্দ-বিস্ময়-বেদনার অভিমুখে তাঁর কবি-মানসের ক্রমোন্মেষ—পরস্পর-সংঘাতী এই দুই প্রবল আগ্রহ বার বার আত্মপ্রকাশ করেছে। এ সংঘাত তিনি চিরজীবন বহন করেছেন! কতকটা এই কারণেও কবি হিসেবে তাঁর পূর্ণতর সার্থকতা ব্যাহত হয়েছিল।

বিকাশ পর্ব—১৯০০-১৯১০

সন্ধিক্ষণ ১৯০৫
বেণু ও বীণা ১৯০৬
হোমশিখা ১৯০৭
তীর্থসলিল ১৯০৮
তীর্থরেণু ১৯১০

'সবিতা'-কাব্যে প্রতীচ্য বিজ্ঞান-সাধনার দিকে সত্যেন্দ্রনাথের আগ্রহ দেখা দেবার অনেক কাল আগেই পশ্চিমের সাহিত্য ও জীবনাদর্শের দিকে বাঙালী কবিদের মনন আকৃষ্ট হয়েছিল। মধুসূদনের Captive Lady দেখে Council of Eduction-এর তৎকালীন সভাপতি ভারত-হিতৈষী Drinkwater Bethune ১৮৪৯ সালের ২০এ জুলাই-এর এক চিঠিতে গৌরদাস বসাককে জানিয়েছিলেন—

> An ambitious young poet could not desire a finer field for exertion than in taking the lead in giving his countrymen in their own language a taste for something higher and better. He might even do good service by translation. This is the way by which the literature of most European nations has been formed.৬

মধুসূদনের কবিতায় প্রতীচ্য বিজ্ঞান-চর্চার প্রতি আগ্রহ লক্ষ্য করেই যে একথা লেখা হয়েছিল, তা নয়। বিদেশের সাহিত্য-কীর্তির জৌলুষ দেখে তিনি সে-সময়ে স্বদেশের বিশিষ্ট ঐতিহ্য উপেক্ষা করছিলেন, এই ধরনের

৬। যোগীন্দ্রনাথ বসুর মধুসূদনের জীবন-চরিত (৪র্থ সংস্করণ) পৃঃ ১৫৯-৬০ দ্রষ্টব্য।

আশঙ্কার তাগিদেই বীটন্ সাহেব মধুসূদনের বন্ধু গৌরদাসকে শুভকামনা-প্রসূত এই মন্তব্যটি জানাতে বাধ্য হয়েছিলেন!

স্বদেশ ও স্বজাতির ঐশ্বর্য, স্বাতন্ত্র্য এবং কল্যাণের কথা বিস্মৃত হওয়া কোনো শক্তিমান শিল্পীর পক্ষেই মার্জনীয় নয়। সতীশচন্দ্র রায়ের 'ডায়ারি'-তে স্বদেশ-মাহাত্ম্য চিন্তার একাধিক দৃষ্টান্ত আছে। সত্যেন্দ্রনাথের কবিজীবনে স্বদেশমহিমার প্রেরণা ছিল আদ্যন্ত প্রসারিত। কিপ্‌লিং প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য কবির সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক দেশপ্রেমের তিনি ছিলেন কঠোর সমালোচক। বিশ্বমানবের মহামিলনের আদর্শ মনে রেখে আপন কবি-কল্পনাকে সজ্ঞানে তিনি সেই বিশিষ্ট মননেরই বশীভূত করেছিলেন। 'বেণু ও বীণা'র 'ধর্মঘট', 'অন্ধ শিশু', 'অবগুণ্ঠিতা', 'ভিখারিণী', 'বিকলাঙ্গী' প্রভৃতি রচনায় দেশ-কালের সংকীর্ণ সীমার অতিশায়ী সর্বব্যাপক সমবেদনাবোধই প্রাধান্য পেয়েছে। 'হোমশিখা'-র কবিতাগুলিও অনুরূপ মননের তাগিদে লেখা। বৈদিক ঋষির সাধনার লক্ষ্য ও রীতি সমকালীন জনসাধারণের জীবনে তিনি পুনরুজ্জীবিত করতে চেয়েছিলেন। 'তীর্থসলিল'-এর ভূমিকায় তিনি লিখেছিলেন—

> বিশ্বমানবের নানা বেশ, নানা মূর্তি ও নানা ভাবের সহিত পরিচয় সাধনই এই গ্রন্থ প্রচারের প্রধান উদ্দেশ্য।

এই উক্তিটির সঙ্গে 'হোমশিখা'র ললাট-লিপির ঐক্য সহজেই চোখে পড়ে। 'আত্মানং বিদ্ধি',—হিন্দুদর্শনের এই মন্তব্যের সঙ্গে Shakespeare-এর 'To thine own self be true' ইত্যাদি সদুক্তি একত্র স্মরণ করে,—বিশ্বামিত্র, টেনিসন্ ও বেকন, এই তিন ভিন্ন দেশ-কাল-বাসী মনীষির প্রায় সমার্থসূচক তিনটি মন্তব্য উদ্ধার করে তিনি 'প্রাচীন বেদীর পরে নূতন সমিধ্' রচনা করলেন।

বিদ্বান কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের এইসব প্রয়াস-প্রযত্ন দেখে একালের প্রসিদ্ধ এক কবি-সমালোচকের একটি মন্তব্য মনে পড়া স্বাভাবিক—

> There is a great deal. in the writing of poetry, which must be conscious and deliberate. In fact, the bad poet is usually unconscious where he ought to be conscious, and conscious where he ought to be unconscious.৭

৭। The Sacred Wood : T. S. Eliot (1945), p. 58.

মধুসূদন এবং সত্যেন্দ্রনাথ, এই দুই কবির কাব্য-সাধনার ইতিহাস আলোচনা করলে এঁদের লেখার মধ্যে সজ্ঞান প্রয়াসের বহুতর সাদৃশ্য চোখে পড়ে। গৌরদাস বসাকের কাছে লেখা বীটন্ সাহেবের পূর্বোক্ত চিঠির তারিখ থেকে প্রায় একমাস পরে বসাক মহাশয়ের কাছে মধুসূদন নিজে যে চিঠিখানি লিখেছিলেন, বাংলা সাহিত্যের আলোচক-মহলে সেখানি বিশেষ পরিচিত। সেই চিঠি থেকেই জানা যায় যে, মধুসূদন সে-সময়ে তামিল, হিব্রু, গ্রীক, ল্যাটিন, তেলেগু এবং সংস্কৃত শিক্ষায় প্রতিদিন বেশ কয়েক ঘণ্টা যাপন করতেন। এ-ছাড়া ইংরেজি সাহিত্যের চর্চাতেও কিছু সময় যেতো। ১৯০০ থেকে ১৯১০ সালের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথের যে-সব রচনা গ্রন্থাকারে ছাপা হয়েছে, সেগুলির মধ্যেও সজ্ঞান প্রয়াসের পরিমাণ কম ছিল না। আপাততঃ Eliot-কথিত সুকবি-কুকবির লক্ষণ বিচারের উদ্যম স্থগিত রেখে সত্যেন্দ্র-কাব্যপ্রবাহের 'বিকাশ'-পর্বের প্রকৃতি পর্যবেক্ষণে এগিয়ে যাওয়া যাক।

'সন্ধিক্ষণ' (১৮ সেপ্টেম্বর, ১৯০৫)-পুস্তিকাটির প্রথম পৃষ্ঠার উপহারজ্ঞাপক অংশ থেকেই দেখা যায় যে, লেখক সে-সময়ে বাংলাদেশের সামাজিক-রাজনৈতিক আন্দোলন সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহ পোষণ করতেন।[৮] কবিতার প্রথমে স্তবকে—

এতদিনে, এতদিনে বুঝেছে বাঙ্গালী
দেহে তার আজো আছে প্রাণ।
জগতের পূজ্য যাঁরা তাঁহাদেরি মাঝে
আশা হয় পাব মোরা স্থান।
যে খুসী টিট্‌কারী দিক
অন্তরে বুঝেছে ঠিক—
এ কেবল নহেক হুজুগ ;
সন্ধিক্ষণ আজি বঙ্গে, এল নবযুগ !

তদ্ভব ও দেশি-বিদেশি শব্দবৈচিত্র্যের যে বিশেষত্ব সত্যেন্দ্রনাথের আরো পরের কবিতাগুলিতে ব্যাপকভাবে প্রকাশ পেয়েছে, 'সন্ধিক্ষণ'-এ সে বিশেষত্ব

৮। 'যাঁহারা আদর্শ আজি বঙ্গে একতার
তাঁহাদেরি তরে এই ক্ষুদ্র উপহার।'

অনুপস্থিত। 'খুশি', 'টিট্‌কারী', 'হুজুগ', 'ছার' 'খাটো দেহে খাটো ধুতি' ইত্যাদি প্রয়োগসত্ত্বেও এখানে তৎসম শব্দের অপেক্ষাকৃত প্রাচুর্যের কথা অনস্বীকার্য। বিষয়বস্তু এবং প্রকাশরীতি,—দু'দিক থেকেই 'সন্ধিক্ষণ' এবং 'সবিতা' সমশ্রেণীর রচনা। 'সবিতায়' কিশোর কবি প্রতীচ্য বিজ্ঞান-সাধনার দিকে দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন; আর, 'সন্ধিক্ষণে' তিনি লিখেছিলেন—

এদিন অলসে গেলে, কি ক্ষতি যে হবে—
দেখ বুঝে অন্তরে সে কথা ;—
আশাভঙ্গ, মনঃক্ষোভ শক্তি অপচয়,
শত দিকে পাবে শত ব্যথা ;—

শত্রু মিত্র দিবে গালি,
লেপিবে চরিত্রে কালি,—
পঙ্কে ফেলি' দলিবে দু'পায়ে ;
আবার সহস্র বর্ষ পড়িবে পিছায়ে।

দেশের নবজাগরণের প্রহরে ভগবানের কাছে শক্তি প্রার্থনা করে তাই তিনি ধনবানকে বলেছিলেন স্বর্ণ দান করতে,—'শ্রমী'-কে দিয়েছিলেন শ্রম উৎসর্গের পরামর্শ,—শিল্পীকে বলেছিলেন,—'শিল্পী আন নিপুণতা' এবং উদ্যোগীকে জানিয়েছিলেন—উদ্যম, আহুতি দাও! ঐ একই স্তবকে (চব্বিশের) উল্লেখযোগ্য আর একটি মন্তব্য আছে—

পরিশ্রমে লজ্জা নাই ;
জ্ঞানবীর স্পিনোজাই,—
করিতেন কাচের সংস্কার!
মন্ত্রদ্রষ্টা স্বষ্টা ঋষি আদি সূত্রধার!

আরো পরবর্তী কালের পুরাণ-পাণ্ডিত্য-প্রসিদ্ধ সত্যেন্দ্রনাথের বিশেষত্ব উদ্ধৃত কয়েক চরণের মধ্যে স্পষ্টই দৃশ্যমান। 'সবিতা'র পাদটীকার ঋক্‌মন্ত্র এবং 'সন্ধিক্ষণে'র আলোচ্য অংশে স্পিনোজা ও ত্বষ্টার উল্লেখ একই বিশেষত্বের দৃষ্টান্ত হিসেবে স্মরণীয়!

পূর্বালোচিত দুটি লক্ষণই 'বেণু ও বীণা'র মধ্যে আরো ব্যাপক ভাবে

চোখে পড়ে। একদিকে নানা জ্ঞানের উল্লেখ, অন্যদিকে বিচিত্র শব্দের দিকে আগ্রহ,—দুই বিশেষত্বই সেখানে স্পষ্ট। 'বেণু ও বীণা' থেকেই সত্যেন্দ্রনাথের কবিপ্রকৃতির প্রকাশগত স্বাতন্ত্র্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। 'মৎস্যগন্ধা', 'স্বর্ণগোধা' 'মমি', 'যক্ষ-মূর্তি', 'মমতাজ', 'দেবীর সিন্দুর', 'আশার কথা' প্রভৃতি কবিতায় পুরাণ ও ইতিহাস-চেতনা ফুটেছে; অপরপক্ষে, 'দুর্যোগ', 'ধর্মঘট', 'কুলাচার' প্রভৃতি রচনায় সাম্প্রতিক ঘটনা অবলম্বনে কবিতা লেখার বিশেষ ঝোঁকটিও পরিস্ফুট হয়েছে; তৃতীয়তঃ, 'স্থতি', 'ধুনী' ('কুলাচার'), 'টোটা' ('বর্ষীয়ান্'), 'ঝাড়', 'ঝাড়' ('জীর্ণপর্ণ'), 'গোল তুলেছি' ('পথহারা'), 'টনক' ('যাদুঘর'). 'কিল্-কিল্', 'হিল্-বিল্' ('মমি'), 'খাড়া' ,ফাটল', 'খট' (পাহাড়ের খাদ অর্থে —'অধ্রুব') ইত্যাদি তদ্ভব, দেশি ও ধ্বন্যাত্মক শব্দ ব্যবহারের দিকে ক্রমবর্ধমান আগ্রহ সক্রিয় হয়ে উঠেছে। এই তিনটি ছাড়া 'বেণু ও বীণা'র চতুর্থ বিশেষত্ব তার ছন্দ। 'সবিতা'য় এবং 'সন্ধিক্ষণে' লেখক ছন্দ সম্পর্কে তেমন কোনো কৃতিত্বের পরিচয় দেন নি। গতানুগতিক স্তবক-বন্ধের মসৃণ প্রবাহ ছাড়া এই দুখানি কাব্যে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার মতো ছন্দের অন্য কোনো বিশেষত্ব নেই। কিন্তু 'বেণু ও বীণা'য় পৌঁছে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা গেল। 'মেঘের কাহিনী' থেকে সুরম্য ছন্দ প্রয়োগের একটি দৃষ্টান্ত নিচে তুলে দেওয়া হোলো—

> সম্বর হ্রদে, জর্জর দেহে, ঘুমায়ে আছিনু ভাই
> লবণে জড়িত লহরের কোলে ঘুমেও স্বস্তি নাই;
> সহসা পূরবে, তরুণ অরুণ হাসিয়া দিলেন দেখা,
> আমি জাগিলাম, বুকে দেখিলাম অরুণ-কিরণ লেখা!

আর একটি নমুনা—

> ঝর্ঝর রবে ঝরে বারিধার, শিথিলিত কেশ, বেশ;
> গর্জন ধ্বনি সহসা উঠিল ব্যাপিয়া সর্বদেশ।

আবার, তান-প্রধান ছন্দের বাহনে দেশি শব্দের রম্যতা ফুটতে দেখা গেছে নিচের চরণে—

> ঘেসেড়ানি চলে গেছে জল খেতে নদে;
>
> [অরণ্যে রোদন]

তবে, 'বেণু ও বীণা'য় ছন্দের দুর্বলতার দৃষ্টান্তও বিদ্যমান। ঐ কবিতাটিরই

শেষ দুটি চরণের অন্ত্যানুপ্রাসের দুর্বলতার কথা এই সূত্রে মনে পড়ে—

কখন্ থামিবে কান্না,—আসিবে জননী,
ফুরাবে বিজন বাস—জুড়াবে পরাণী।

'জননী'-র সঙ্গে 'পরাণী'-র মিল বাংলা পদ্য-ছন্দের অনুপ্রাস-রীতির অনুকূল নয়। তবে একথাও ঠিক যে 'বেণু ও বীণা'র বিচিত্র অন্ত্যানুপ্রাসমালার মধ্যে এ-রকম অসংগতির দৃষ্টান্ত বেশি নেই। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তিনি ছিলেন মিলের কৃতী স্রষ্টা। প্রসঙ্গতঃ 'অধ্রুব' কবিতাটির উল্লেখ করা যেতে পারে। এ-কবিতায় তিনি পর পর 'ঝুরুঝুরু', 'গুরুগুরু', 'দুরুদুরু',—'ধীরে', 'শিরে', 'চিরে', ইত্যাদি মিল ব্যবহার করেছেন। আবার অন্যত্র এমন মসৃণ মিলের ব্যতিক্রমের দৃষ্টান্তও আছে, যেমন 'আশার কথায়' 'নৌকা ভরেছি পণ্যে' এবং 'আশিষ' দুর্বা-ধান্যে'—এই দুটি উক্তির অন্ত্যানুপ্রাস নিখুঁৎ নয়।

ছন্দোবৈচিত্র্যের দিক থেকে 'বেণু ও বীণা'র 'একদিন না-একদিন' কবিতাটি বিশেষ স্মরণীয়। এবং শুধু ছন্দ-লাবণ্যের দিক থেকেই নয়,—সমগ্রভাবেও তাঁর সামর্থ্যের নজীর হিসেবে এইসব লাইন স্মরণীয়—

একদিন-না-একদিন, কারো না-কারো কপালে,
ঘটেছে যা'—তাই নিয়ে ভাই বৃথাই মাথা বকালে।
সীতার নামে কলঙ্ক আর লক্ষ্মণেরে অবিশ্বাস,
ধ্যানভঙ্গ শঙ্করের ও যুধিষ্ঠিরের নরকবাস;
এমন সকল কাণ্ড যখন আগেই গেছে ঘটে,
তখন তুমি খ্যাতির খেদে গরম কেন চটে?
চলতে গেলেই লাগে ধুলো,
ধুয়ো তখন ও সব গুলো
তা' বলে কি পথ দিয়ে, ভাই, চলবে নাক' মোটে?

রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষণিকা' (১৯০০)-র বক্তব্য ও প্রকাশ-রীতির ছায়া পড়েছিল এই কবিতাটিতে। এই লেখাটির শেষ দিকে সত্যেন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—

অরসিকে রসের কথায় হয়ত' যাবে ভোলাতে,
অপ্রেমিকে মনের ব্যথায় হয়ত' যাবে গলাতে;
অঘটন যা ঘটবে তা'তে—সেটা কিন্তু স্বাভাবিক!
কাজেই তাতে বিলাপাদি, বেশী রকম নহে ঠিক।

পরকে কেন মন্দ কই ?
মনের মত নিজেই নই।
আমাদের এই রোষ তুষ্টি—অধিকাংশই আকস্মিক।

'ক্ষণিকা' লেখার সময়ে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন নিজের মনোরহস্য-চিন্তায় নিবিষ্টচিত্ত! ১৩১০ সালে মোহিতচন্দ্র সেন 'কাব্যগ্রন্থে'র 'লীলা'-পর্যায়ে 'ক্ষণিকা'র লেখাগুলি সংকলন করেছিলেন। বন্ধু লোকেন্দ্র পালিতকে 'ক্ষণিকা'-বইখানি উৎসর্গ করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—

> আশা করি নিদেন পক্ষে ছুটি মাস কি এক বছরই
> হবে তোমার বিজন বাসে সিগারেটের সহচরী।

কবিমানসের লীলাবিলাসের প্রেরণায় হসন্তবহুল চলিত কথার ধ্বনি-মাধুর্যের নিপুণ প্রয়োগ ঘটেছিল 'ক্ষণিকা'র বিভিন্ন কবিতায়। চলিত কথাকে সাহিত্যের জাতে তুলে দেবার প্রয়াস রবীন্দ্রনাথই যে প্রথম করেছিলেন, তা নয়। লোচন দাসের ধামালী ছন্দের গানে,—দাশরথি রায়ের অথবা গোপাল উড়ের বহু রচনার মধ্যে এ-দিকে শিল্পীর সহজ-পটুত্বের পরিচয় বার-বার পাওয়া গেছে। এখানে সে-বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। দ্বিজেন্দ্রলালের 'আলেখ্য' ছাপা হয় ১৩১৪ সালে। কবিতায় শব্দের নির্বাচন সম্পর্কে 'আলেখ্যে'র ভূমিকায় দ্বিজেন্দ্রলাল যা লিখেছিলেন, এ-বইয়ের অন্যত্র সে-মন্তব্য (পৃঃ ১২ দ্রষ্টব্য) তুলে দেওয়া হয়েছে। সু-অভ্যস্ত কুলীন ভাষারীতির পরিসীমা বেড়ে সর্বসাধারণের প্রতিদিনের আটপৌরে কথ্যরীতির দিকে সাহিত্যের নতুন অভিমুখিতা সে যুগে অনেকের মনোহরণ করেছিল। কিন্তু কেবল প্রযুক্তির ক্ষেত্রে সর্বজনীনতার চর্চা দেখে অপেক্ষাকৃত সতর্ক সমালোচকরা খুশি হতে পারেন নি। তাঁরা চেয়েছিলেন প্রসঙ্গের বাস্তবতা। চন্দ্রনাথ বসুর তৎকালীন একটি মন্তব্যে বলা হয়েছিল—

> যখন দেখিব বঙ্গের নূতন কাব্য বা কবিতায় সুপরিচিত ঘরের কথা দেখিয়া দোকানী পশারী পর্যন্ত গাছতলায় বসিয়া কাশীদাস কৃত্তিবাস যেমন মুগ্ধ হইয়া পড়ে, তেমনি মুগ্ধ হইয়া পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে, তখন বুঝিব, বঙ্গে বাঙ্গালীর জাতীয় ও স্বদেশী কাব্য বা কবিতা লিখিত হইতেছে। সাহিত্য যখন মূর্খের মন পর্য্যন্ত অধিকার করে, তখনই উহা শক্তিস্বরূপ হইয়া সমস্ত জাতির মনে শক্তি সঞ্চারিত করে, তাহার আগে করে না।[৯]

৯। পৃথিবীর সুখদুঃখ—চন্দ্রনাথ বসু (১৩১৫)

একদিকে দ্বিজেন্দ্রলাল-রবীন্দ্রনাথের সে-সময়কার কবিতায় চলিত শব্দ প্রয়োগের ঝোঁক—অন্যদিকে, চন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ আলোচকদের রচনায় রোম্যাণ্টিক, তথা আধ্যাত্মিক অস্পষ্টতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা—এই দুই যুগাভ্যাস বা রেওয়াজের মধ্যে বাস করে সত্যেন্দ্রনাথ যথাসাধ্য এই দুই তরফেরই আদর্শ অনুসরণ করবার চেষ্টা করেছিলেন! এই যুগরুচির প্রভাবে তাঁর নিজস্ব রুচি কতকটা সংশয়ক্লিষ্ট হয়ে থাকা অস্বাভাবিক নয়। যে মৌলিক অনুসন্ধানবশে রবীন্দ্রনাথ চলিত কথার দিকে মন দিয়েছিলেন,—অথবা, যে অকৃত্রিম ব্যঙ্গ-পরিহাস-প্রবৃত্তির তাগিদে দ্বিজেন্দ্রলাল চলিত কথার পক্ষ গ্রহণ করেছিলেন,—সত্যেন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে সে-রকম কোনো মৌলিকতার জোর ছিল না। তিনি সমকালের গুণী বর্ষীয়ান্‌দের অনুকরণে বা অনুসরণে এ-অঞ্চলে কিছুদূর এগিয়ে গিয়েছিলেন মাত্র। এবং সেই কারণেই তাঁর 'বেণু ও বীণা'য় একদিকে যেমন ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত তদ্ভব ও দেশি শব্দের বৈচিত্র্য চোখে পড়ে, অন্যদিকে তেমনি সে-কালের সর্বজনবোধ্য সাম্প্রতিক বিষয়াবলীর উল্লেখ ও বর্ণনা পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। একদিকে আত্মস্থতার অভাব, অন্যদিকে অনুকরণের অতিরেক! এই পরীক্ষা-নিরীক্ষাময় আত্মপ্রস্তুতির আয়োজনেই তখনকার দিনগুলি কেটেছে।

সমকালীন বর্ষীয়ান্ কবির অনুকরণের লক্ষণ 'বেণু ও বীণা' নামের মধ্যেও পরিস্ফুট।[১০] 'অরণ্যে রোদন', 'দেবতার স্থান' প্রভৃতি কবিতায় রবীন্দ্রনাথের 'চৈতালি'র (১৮৯৬ সালে সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থাবলীতে প্রকাশিত) ছায়া পড়েছে। অন্যান্য কবিতায় মধুসূদন এবং দেবেন্দ্রনাথ সেনের প্রভাবও দুর্লক্ষ্য নয়। 'বেণু ও বীণা'র নানা কবিতায় কৈশোরের অনুকরণস্পৃহা নানাভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। একটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে ব্যাপারটি এখানে বুঝিয়ে বলা যেতে পারে। মধুসূদনের চতুর্দশপদী কবিতার বিশেষ একরকম মুদ্রাদোষ সকলেরই সুবিদিত। সুরাজ্য, সুহাসিনী, সুবদনা, সুপ্রবাহ ইত্যাদি শব্দের বাহুল্যে তাঁর লেখাগুলি ভারাক্রান্ত। দেবেন্দ্রনাথ সেন পূর্বগামী দত্ত-কবির এই বিশেষ স্বভাবের অনুকরণ করেছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ 'বেণু ও বীণা'য় চতুর্দশপদী কবিতাবলীর সর্বত্র 'সু'-কথাটি বারবার ব্যবহার করেননি বটে। তবে একটি কবিতায় সে-রকম প্রয়োগ দেখা গেছে

১০। এই গ্রন্থের ৮৭ পৃষ্ঠায় (ঙ)-ধারা দ্রষ্টব্য।

—এবং সেখানে মধুসূদনের ছায়া অনস্বীকার্য ভাবে বিদ্যমান। 'মেঘের বারতা' থেকে এতৎপ্রাসঙ্গিক সাদৃশ্যস্মারক বিশেষ ক'টি লাইন নিচে তুলে দেওয়া হোলো—

কাঁপে তরু, পুলকে আপ্লুত পুষ্পলতা ;
বৃষ্টি-ধারা উঠে নাচি বায়ুর প্রহারে,
বাতাহত—বর্ষাহত—শ্যাম সরোবরে
সু-যৌবনা শ্যামাঙ্গীর লাবণ্য-গৌরতা ?

সত্যেন্দ্রনাথের এই ক'লাইনের সঙ্গে মধুসূদনের 'আশ্বিন মাস'-এর প্রথম চরণের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা কষ্টসাধ্য নয়। 'আশ্বিন মাসে'র প্রথম চরণেই মধুসূদন লিখেছিলেন—'সু-শ্যামাঙ্গ বঙ্গ এবে মহাব্রতে রত।'[১১]

চতুর্দশপদী কবিতার রীতি বা প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে 'বেণু ও বীণা'য় মধুসূদনের অন্য প্রভাবও চোখে পড়ে। পরের অধ্যায়ে সত্যেন্দ্র-কাব্যের কলাবিধি সম্পর্কে আলোচনায় সে-বিষয়ে যথোচিত মন্তব্য প্রকাশের অবকাশ রইলো।

প্রসঙ্গবৈচিত্র্যের দিকে চোখ রেখে 'বেণু ও বীণা'র কবিতাবলীর শ্রেণী-বিভাগে উদ্যত হলে প্রধানতঃ এই ক'টি শাখার উল্লেখ করা যায়:—[১] বিশ্বপ্রকৃতির বিভিন্ন সৌন্দর্যকথার বর্ণনা ('কিশলয়ের জন্মকথা', 'আন্ গগনের আলো', 'নব বসন্তে', 'ফাগুনে' ইত্যাদি ; [২] প্রণয়ের ধ্যান ('প্রেম ও পরিণয়', 'সান্ত্বনা', 'রূপ ও প্রেম') ; [৩] ইতিহাস, পুরাণ ও প্রাচীন কাব্যের দৃশ্য বা ঘটনা ('মৎস্যগন্ধা', স্বর্ণগোধা', 'দেবীর সিন্দুর', 'নাভাজী') ; [৪] দেশপ্রেম ও সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর উল্লেখ ('কোন্ দেশে', 'হেমচন্দ্র', 'দুর্যোগ', 'বঙ্গজননী', 'ধর্মঘট' ইত্যাদি) ; [৫] সমাজের নিপীড়িতশ্রেণীর কথা ('কুস্থানাদপি', 'বিকলাঙ্গী', 'বর্ষীয়ান্') ; [৬] কবির কাব্যরহস্য ও আত্ম-চিন্তার লহরী ('আরম্ভে', 'অনিন্দিতা', 'একদিন-না-একদিন', 'রম্যাণি বীক্ষ্য') ;—এবং [৭] কবিমনের বিভিন্ন ভাবকণিকা ('মমতা ও ক্ষমতা', 'আকাশ-প্রদীপ)' ।[১২]

পরবর্তী কাব্যমালার দোষ-গুণের পূর্বাভাস সত্যেন্দ্রনাথের এই বইখানির

১১। চতুর্দশপদী-শ্রেণীর বাইরে অন্যত্র এরকম প্রয়োগের দৃষ্টান্ত—'সু-ললাট' (আনন্দিতা')।
১২। এগুলি রবীন্দ্রনাথের 'কণিকা'র অনুকরণে লেখা।

নানা কবিতায় সঞ্চিত আছে। কবিদের লক্ষ্য সম্পর্কে প্রথম জীবনে তিনি যে ঘোষণাটি জানিয়েছিলেন, সেই সঙ্গে তাঁরই আরো পরবর্তী সৃষ্টি তুলনা করে দেখতে হলে 'বেণু ও বীণা' বিশেষভাবে আলোচ্য। বইখানির প্রথম কবিতায় তাঁর সেই ঘোষণাটি চোখে পড়ে। 'আ রম্ভে'র মধ্যে তিনি লিখেছিলেন—

বাতাসে যে ব্যথা যেতেছিল ভেসে, ভেসে,
যে বেদনা ছিল বনেরি বুকেরি মাঝে,
লুকানো যা ছিল অগাধ অতল দেশে,
তারে ভাষা দিতে বেণু সে ফুকারি বাজে!

মূকের স্বপন মুখর করিতে চায়,
ভিখারী আতুরে দিতে চায় ভালবাসা,
পুলক প্লাবনে পরাণ ভাসাবে, হায়,
এমনি কামনা—এতখানি তার আশা।

মনে এই আশা নিয়েই 'বেণু ও বীণা'র কবি তাঁর কাব্য রচনায় হাত দিয়েছিলেন! 'আরম্ভে'র শেষ দিকে আরো স্পষ্টভাবে তিনি তাঁর এই অন্তরাকুতির কথা প্রকাশ করে গেছেন—

কতদিন হল বেজেছে ব্যাকুল বেণু
মানসের জলে বেজেছে বিভোল বীণা,
তারি মূর্চ্ছনা—তারি সুর রেণু, রেণু,—
আকাশে বাতাসে ফিরিছে আলয়হীনা।

পরাণ আমার শুনেছে সে মধু বাণী,
ধরিবারে তাই চাহে সে তাহারে গানে,
হে মানসী-দেবী! হে মোর রাগিণী-রাণী!
সে কি ফুটিবে না 'বেণু ও বীণা'র তানে?

'বেণু ও বীণা' গ্রন্থনাম সম্বন্ধে স্ব-প্রদত্ত এই ব্যাখ্যার মধ্যে অন্তর্মুখী, আত্মনিষ্ঠ, গীতময় কবিস্বভাবের দিকেই সত্যেন্দ্রনাথের আগ্রহ ফুটেছিল। উনিশ-শতকের রোম্যান্টিক ভাবকল্পনার ঐতিহ্য অনুসরণ করে অক্ষয় চৌধুরী-বিহারীলালের ধারাতেই তিনি কবিতা লেখায় প্রথম আত্মনিয়োগ

করেন। সমকালীন প্রবীণ কবিদের মধ্যে অনেকের সঙ্গে এইখানেই তাঁর সাদৃশ্য। দেবেন্দ্রনাথ সেন, অক্ষয়কুমার বড়াল প্রভৃতি সে-যুগের প্রতিষ্ঠিত কবিরাও অনুরূপ লক্ষণের পরিচয় রেখে গেছেন। সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁদের কবিপ্রকৃতিগত বৈষম্যের নিদর্শনও আবার এই 'বেণু ও বীণা'তেই বর্তমান! দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন নিরবচ্ছিন্ন আত্মভাবে নিমগ্ন। বহির্জগতের বাস্তবতায় তাঁর তেমন ধ্যানভঙ্গ ঘটেনি! বিশ্বপ্রকৃতি ও মানবজীবনের সংখ্যাতহীন সৌন্দর্যের কল্পলোকে ধ্যানস্থ থেকে মাঝে মাঝে তিনি বহির্জগতের দিকে দৃষ্টিপাত করেছিলেন বটে,—তবে সে দৃষ্টিতে কল্পলোকের নিগূঢ় এবং অলোপ্য কী যেন রঞ্জনই ছিলো নিত্যবিদ্যমান! তাঁর গ্রন্থনামাবলীর মধ্যেও এই বৈশিষ্ট্যের চিহ্ন আছে। 'অশোক-গুচ্ছ', 'শেফালীগুচ্ছ', 'গোলাপগুচ্ছ', 'পারিজাত-গুচ্ছ' ইত্যাদি বিচিত্র পুষ্পগুচ্ছের লাবণ্য,—এবং সেই লাবণ্যের আবেশই ছিল তাঁর কবিদৃষ্টির প্রতীক!

নানা ঋতুর নানান্ সৌন্দর্য সম্পর্কে সত্যেন্দ্রনাথও অনেক কবিতা লিখেছেন। 'বেণু ও বীণা'র মধ্যেও বর্ষা-বসন্তের কবিতা আছে,—'কিশলয়ের জন্মকথা'য় কীট্সের সৌন্দর্যানুভূতির অনুকরণ আছে, কিন্তু কীট্সের গভীর মগ্নতার লক্ষণ নেই। সহজ প্রেম-প্রীতির বন্দনায় অক্ষয়কুমার বড়াল যেমন আত্মোৎসর্গ করতে পেরেছিলেন, সত্যেন্দ্রনাথের এ-পর্বের কবিতায় তেমন কোনো চিহ্ন নেই। বরং পূর্বগামী সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের মতন মনন-ধর্মের দিকেই তাঁর সহজ অনুরাগ দেখা গেছে।

সত্যেন্দ্রনাথের 'সবিতা'র সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথের 'সবিতা-সুদর্শন'-এর নামসাদৃশ্যই এঁদের সাদৃশ্যের একমাত্র ক্ষেত্র নয়। সুরেন্দ্রনাথের সহজাত আগ্রহ ছিল পাণ্ডিত্যের দিকে। Shakespeare, Tennyson, শ্রীমতী ব্রাউনিং, Calderon, প্রভৃতি বিভিন্ন লেখকের বিভিন্ন কাব্যাংশের সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথের অনেক লেখার নিকট-সাদৃশ্য দেখিয়ে মোহিতলাল মজুমদার এ-বিষয়ে তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ লিখে গেছেন। সুরেন্দ্রনাথের প্রভাব পরবর্তী কবিদের কাব্যেও নিশ্চিহ্ন নয়। তাঁর 'মহিলা' কাব্যের অনুকরণে দেবেন্দ্রনাথ সেন লিখেছিলেন 'নারীমঙ্গল'। মনন এবং কবিকল্পনার বেশ কিছু পার্থক্য থাকলেও অক্ষয়কুমার বড়ালের মধ্যেও সুরেন্দ্রনাথেরই প্রভাব পড়েছিল। সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যালোচনা প্রসঙ্গে এঁদের কাব্যের বিস্তৃত

বিশ্লেষণ এখানে অভিপ্রেত নয়। তবে, পূর্বগামী কবিদের মধ্যে সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথের সাদৃশ্যের কথা এই সূত্রে বিশেষভাবে স্মরণীয়।

সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর পূর্বগামী ও সমকালীন এই সব কবির অনুকরণের চেষ্টা করেছিলেন বটে, কিন্তু তিনি এঁদের মতো বিশিষ্ট কোনো ধ্যান-স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী হন নি। 'বেণু ও বীণা'তে তাঁর অনুকরণস্পৃহার পরিচয়ের কথা বলা হোলো। আরো পরের রচনায় বিভিন্ন স্তরপর্যায়ের মধ্য দিয়ে তাঁর অনুকরণসামর্থ্য এবং মৌলিকতার সাধনা, দুই-ই লক্ষ্য করা যাবে।

'বেণু ও বীণা'-র প্রায় এক বছর পরে প্রকাশিত হয় 'হোমশিখা' (১২ অক্টোবর, ১৯০৭)। এই বইখানির মোট আটটি কবিতার প্রথম লেখাটির কথা আগেই আলোচিত হয়েছে। পুস্তিকাকারে 'সবিতা' প্রথম প্রকাশিত হবার পরে 'হোমশিখার' প্রথম সংস্করণের প্রথম কবিতা হিসেবে সেটি পুনরায় ছাপা হয়েছিল। 'হোমশিখা'-র বাকি সাতটি কবিতার শিরোনাম 'সোম', 'সর্বংসহা', 'সমীর', 'সিন্ধু', 'স্বর্ণগর্ভ', 'সাগ্নিকের গান' এবং 'সাম্যসাম'। এই কবিতাগুলির ভাববিশ্ব হিসেবে যথাক্রমে কীট্স্ ও বেকন,—উপনিষদ্ ও মিল্টন,—শেলি,—বায়রন,—ভর্তৃহরি,—ঋগ্বেদ,—এবং রবার্ট্ বার্নস-এর বিভিন্ন উক্তি ছাপা হয়। এই রকম সদুক্তি-লাঞ্ছিত কবিতা প্রকাশের আয়োজন বাংলা কাব্যের উনিশ শতকের বহু-পরিচিত সাধারণ অভ্যাসগুলির মধ্যেই গণ্য। স্বরচিত কবিতার সঙ্গে এরকম উদ্ধৃতি ব্যবহার সত্যেন্দ্রনাথের পৃথক কোনা আঙ্গিক বা নিজস্ব কৌশলের চিহ্ন নয়। বাংলা সাহিত্যের নবীন-প্রবীণ অনেক কবিই নিজেদের রচনায় এ কৌশল বার-বার দেখিয়ে গেছেন।

'হোমশিখা'র এই সাতটি কবিতার সঙ্গে 'সবিতা' একই সূত্রে গ্রথিত হয়েছে প্রধানতঃ দুটি কারণে। প্রথমতঃ রূপগঠনের সাদৃশ্য,—দ্বিতীয়তঃ, বিষয়বস্তুর সমশ্রেণীভুক্তি। প্রথম প্রসঙ্গের আলোচনা প্রস্তুত অধ্যায়ের অভিপ্রেত নয়। এ-বইয়ের 'কলাবিধি'-অধ্যায়ে তাঁর কাব্যকলার বিভিন্ন বিশেষত্বের আলোচনার মধ্যে এ-প্রসঙ্গটিও জায়গা পেয়েছে। দ্বিতীয় দিকটির বিশ্লেষণ-সূত্রে দেখা যায় যে, 'সবিতা'তে তিনি যেমন সূর্য-বন্দনা করেছিলেন, 'সোম' কবিতায় তেমনি লিখেছিলেন চন্দ্র-বন্দনা,—'সর্বংসহা'-তে আছে ধরণীর বন্দনা,—'সমীরে' প্রাণবায়ুর প্রশস্তি,—'সিন্ধু'-তে সমুদ্রস্তব,—'স্বর্ণগর্ভে' ব্যোম্-কে বিশ্বাধার

রূপে কল্পনা করা হয়েছে,—'সাগ্নিকের গান'-এ অগ্নির তেজ ও দ্যুতির উদ্দেশে অন্তরের অভিবাদন জ্ঞাপন এবং 'স্বাস্থ্য-সাম'-এ বিশ্বের জনসাধারণের মধ্যে স্বাস্থ্যচর্চার আবশ্যিকতা সম্বন্ধে কবির উদ্দীপনাময়ী স্বীকৃতি আছে।

বিশ্বের বিভিন্ন নৈসর্গিক শক্তির উদ্দেশে স্তব রচনার দৃষ্টান্ত বৈদিক সাহিত্যের কাল থেকে আমাদের সাম্প্রতিক সীমা অবধি ভারতবর্ষের সুদীর্ঘ সাহিত্য-ধারার মধ্যে বহুবার বহুভাবে দেখা গেছে। সত্যেন্দ্রনাথের 'হোম-শিখা'র কবিতাগুলির আলোচনায় প্রাচীন পৌরাণিক আখ্যান অথবা উপনিষদের কাহিনী সম্পর্কে বাগ্‌বিস্তারের প্রয়োজন নেই। এই কবিতাগুলি যখন লেখা হয়, বাংলা দেশের তৎকালীন সাহিত্য-ক্ষেত্রের অন্য কয়েকটি ঘটনার কথাই এখানে বরং স্মরণ করা যেতে পারে।

১২৯৭-৯৮ সালে সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, চন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি লেখকরা ধর্ম, দর্শন, পুরাণ ইত্যাদি প্রসঙ্গে বিশেষ উৎসাহ বোধ করে প্রবন্ধ-নিবন্ধ রচনা করেছিলেন। হিন্দুধর্মের আচার ও আদর্শ সম্পর্কে সেই আলোচনায় রবীন্দ্রনাথও যোগ দিয়েছিলেন। মুখ্যতঃ আচারতত্ত্বের দিকে এইসব রচনার আগ্রহ থাকলেও আলোচনার ধারায় প্রাচীন বৈদিক সংস্কৃতির অন্যান্য দিকও ইতস্ততঃ অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে। সত্যেন্দ্রনাথের বাল্যকালেই এইসব তর্ক-বিতর্ক দেশের শিক্ষিত সাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল। সত্যেন্দ্রনাথ যখন গায়ত্রী-মন্ত্র স্মরণ করে 'সবিতা' কাব্যে সূর্যবন্দনা করেন, তখন যুগরুচির বিশেষ এক রকম আনুগত্যের দৃষ্টান্ত হিসেবেই পাঠকসমাজে তা গৃহীত হয়ে থাকা স্বাভাবিক। ইতিমধ্যে ১৩০৪ সালে (ইং ১৮৯৭) গ্রন্থাকারে রবীন্দ্রনাথের 'পঞ্চভূত' প্রকাশিত হয়।

প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সংস্কৃতির আদর্শ-সংঘাতের চেতনা 'সবিতা'-র বিভিন্ন চরণে বার-বার ধ্বনিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের তৎকালীন একখানি চিঠিতে অনুরূপ সংঘাতবোধের স্বীকৃতি আছে। ১৮৯৮ সালের ২৯এ জানুয়ারি তারিখে প্রমথ চৌধুরীর কাছে লেখা তাঁর এই চিঠি থেকে একটি মন্তব্য নিচে তুলে দেওয়া হোলো—

> আমার ভারতবর্ষীয় শান্ত প্রকৃতিকে য়ুরোপের চাঞ্চল্য সর্বদা আঘাত করছে—সেইজন্যে একদিকে বেদনা, আর একদিকে বৈরাগ্য। একদিকে কবিতা, আর একদিকে ফিলজফি।

রবীন্দ্রনাথের এই মনঃসংঘাতের সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথের মনোভাবের সমতা প্রমাণের জন্তেই যে উদ্ধৃতিটি এখানে ব্যবহার করা হোলো, তা নয়। রবীন্দ্র-নাথের মনে সে-সময়ে বিশেষ যে সংঘাতবোধ জেগেছিল, সত্যেন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের রচনায় তারই ক্ষীণ ঢেউ জেগেছিল মনে করা ভিত্তিহীন নয়। এই মন্তব্যের নজীর হিসেবেই এখানে এ-প্রসঙ্গের অবতারণা। 'হোমশিখা'-র প্রথম কবিতা 'সবিতা'র মধ্যে সেই সংঘাতচেতনা অস্বীকার করা যায় না।

এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'পঞ্চভূত' বইখানির মধ্যে 'ক্ষিতি', 'অপ্' (স্রোতস্বিনী), 'তেজ' (দীপ্তি), সমীর এবং ব্যোম্—এই পাঁচটি বিশ্ববিদিত ভূতের সভা বর্ণনা করলেন।

পারিপার্শ্বিক শিক্ষিত সমাজে একদিকে প্রাচীন পুরাণাদির চর্চা, অন্তদিকে রবীন্দ্রনাথের কলমে পঞ্চভূতের সাহিত্যরসসমৃদ্ধ বিশ্লেষণ—সেকালের এই বিশেষ যুগপরিবেশের প্রভাবে নবীন কবির পক্ষে একদিকে বৈদিক সাহিত্যরীতির অনুসরণ এবং অন্তদিকে আরো নিকট কালের চিত্তাকর্ষক রচনাবিশেষের ('পঞ্চভূত') অনুকরণ মোটেই অস্বাভাবিক ছিলনা। সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর 'হোমশিখা'তে সেই কাজই করেছিলেন।

সূর্য, চন্দ্র, ধরণী, বায়ু, সিন্ধু, ব্যোম্ ও অগ্নির উদ্দেশে কবিমানসের শ্রদ্ধার হোমশিখা—এই ছিল গ্রন্থনামটির স্পষ্টার্থ এবং নিহিতার্থ। 'সবিতা' সম্পর্কে এখানে আর-একটি কথার উল্লেখ দরকার। পুস্তিকাকারে প্রকাশের সময়ে 'সবিতা'র ক্রোড়পত্রে বেকন-এর 'Knowledge is power' উক্তিটি ছাপা হয়নি; 'হোমশিখা'র মধ্যে নতুন মুদ্রণে এই নতুন উদ্ধৃতিটি সংযোজন করা হয়েছিল।

এই কাব্যে সূর্য, চন্দ্র, বায়ু, অগ্নি প্রভৃতির বন্দনা দেখে কালিদাসের রঘুবংশের একটি উক্তি মনে পড়ে। সূর্যবংশোদ্ভূত রাজকুমার দিলীপের রূপগুণের বর্ণনাপ্রসঙ্গে কালিদাস লিখেছিলেন—

> তং বেধা বিদধে নূনং মহাভূত সমাধিনা।
> তথাহি সর্বে তস্যাসন্ পরার্থৈকফলা গুণাঃ॥ ১৩
>
> —রঘুবংশম্; ১।২৯

১৩। বিধাতা কর্তৃক পঞ্চমহাভূত নির্মাণের উপকরণ দ্বারা তিনি (দিলীপ) নির্মিত হয়েছিলেন,—সেই কারণে তাঁর গুণরাজি কেবল পরার্থে-ই নিয়োজিত ছিল।

'হোমশিখা'র কবি পঞ্চমহাভূতের প্রত্যেকটির সম্বন্ধে পৃথক পৃথক গাথা রচনা করেছেন। 'সর্বংসহা' (ক্ষিতির নামান্তর-কল্পনা), 'সিন্ধু' (অপ্), 'সবিতা' ও 'সাগ্নিকের গান' (তেজ), 'সমীর' (মরুৎ) এবং 'স্বর্ণগর্ভ' (ব্যোম্)—এই পাঁচটি মহাভূত সম্পর্কে তো বটেই,—তা ছাড়া চন্দ্র, সুরা এবং কবিকল্পনার প্রতীক 'সোম'-এর উদ্দেশেও একটি কবিতা রয়েছে। বিষয়ের আপাত-বিভিন্নতা সত্ত্বেও ব্যাপক এক সর্বসম্মিলনের উপলব্ধি-সূত্র দিয়ে কবি এখানে আটটি পৃথক পৃথক কবিতা এক সঙ্গে গ্রথিত করেছেন। 'সবিতা'-র উদ্দেশে শোনা গেল—

হে সবিতা জ্ঞানের কিরণ,—
আরো আলো—আরো আলো কর বিতরণ।

'সোম'-কে তিনি জানালেন—

প্রেম দিয়া পূর্ণ কর জ্ঞান,
কর সোম প্রাণের বিকাশ ;
জ্ঞান যদি হয় মুহ্যমান,
প্রেম দিয়া দিও হে আশ্বাস ;

সর্বংসহা ধরণীকে বললেন—

ত্রিশক্তিতে পূর্ণ কর প্রাণ,
কর মাতা জনম সফল,
দেবত্ব মানবে কর দান,
শুক্রে কর শরীর সবল,
জ্ঞানে পুষ্ট, প্রেমে তুষ্ট, সজীব সচল
শৌর্য্যে—কর প্রতিষ্ঠা সবার,
ত্রিপদ্ম-আসনে পুনর্বার !

উৎসাহের প্রতীক সমীরকে বললেন—

হে সমীর, হে অধীর, হে শান্ত মলয়,
কর মোরে তোমার সমান
মানব-মুকুল যেন আমার ভাবায়
ফুটে ওঠে লভি' নব প্রাণ।

আমার এ গানে পুনঃ
সকল বন্ধন যেন
ছিঁড়ে উড়ে বিশ্ব ছেড়ে যায়,—
বিরাট মানবজাতি মিলে পুনরায়।[১৪]

সিন্ধু-বন্দনায় অপ্‌ মহাভূতের বৃহৎ বিপুলতার উল্লেখ করে কবি সমুদ্রকে তাঁরই নিজের প্রত্যয়ীভূত, সর্বসম্মিলনসার্থক সত্যের জয় গান গাইতে বলে গেছেন—

দেশে দেশান্তরে মিল যুগে যুগান্তরে!
অন্তরের অনন্ত মিলন!
লোকে লোকান্তরে মিল গ্রহে গ্রহান্তরে!
গাহ সিন্ধু সঙ্গীত নূতন!
অচেত চেতনে মিল!
জীবনে মরণে মিল!
জন্মে জন্মান্তরে সম্মিলন!
তরঙ্গে তরঙ্গে সিন্ধু! করহ ঘোষণ!

স্বর্ণগর্ভ ব্যোমের প্রশস্তিসূত্রে বলা হোলো—

স্বর্ণগর্ভ! সাম্রাজ্যে তোমার
অন্তরীক্ষে অনন্ত মিলন।
দূরে প্রেম—আনন্দের ধার,—
চোখে চোখে, কিরণে কিরণ।
নাহি পরশের ক্লেদ,
নাহি গ্লানি, নাহি স্বেদ,
দৃষ্টি সুখে হৃষ্ট প্রাণ মন!
তুষ্ট চিতে অনন্তে ভ্রমণ!

এখানকার অনুসৃত স্তবক-বন্ধের সঙ্গে সংগতি বজায় রেখে কবিতাটির শেষ অংশে উপনিষদের 'মধুবাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ…' ইত্যাদি উক্তির বঙ্গানুবাদ যোগ করা হয়েছে—

১৪। 'সমীর'-এর সূচনায় Shelley-র Ode to the West Wind-এর উদ্ধৃতি আছে। কবিতাটিতে Shelley-র কথা ও সুরের প্রতিধ্বনি স্পষ্ট।

মধু মধু—বিশ্ব মধুময়।

মধুমান্ আনন্দ অক্ষয়।

'সাগ্নিকের গানে'—

জ্বল' অগ্নি ঘরে, ঘরে, অন্তরে অন্তরে,

কর প্রাণ পুঞ্জ তেজস্বান্

যাক্ তম, যাক্ ভেদজ্ঞান,

ঘৃণা, ভয়, পাপ, তাপ দর্প যাক দূরে।

'হোমশিখা'র শেষ কবিতা 'সাম্য-সাম'-এ বেগদৃপ্ত ছন্দের পুনরাবির্ভাব দেখা গেছে। বিষয়বস্তুর দিক থেকেও বৈদিক পরিমণ্ডল থেকে বেরিয়ে এসে এখানে পুনরায় লৌকিক সুখ-দুঃখের বাস্তবতায় পৌঁছোনো সম্ভব হয়েছে। উৎসাহে, উদ্দীপনায় এবং দৃঢ় বিশ্বাসে স্পন্দমান ছন্দে বঙ্গ-ভঙ্গ যুগের শিক্ষিত বাঙালীর আত্মকথা উচ্চারিত হোলো—

মানি না গির্জা, মঠ, মন্দির, কল্কি, পেগম্বর,

দেবতা মোদের সাম্য-দেবতা অন্তরে তাঁর ঘর

রাজা আমাদের বিশ্ব-মানব, তাঁহারি সেবার তরে,

জীবন মোদের গড়িয়া তুলেছি শত অতন্দ্র করে;

এ কবিতায় শুধু যে বাংলা দেশের নিকট কাল-পরিবেশের লক্ষণই ফুটেছিল, তা নয়। কবি জানিয়েছিলেন—

ধনের চাপে যে পাপের জন্ম একথা আমরা জানি

আবার—

জননীর জাতি দেবতার সাথী নারীরে বোলো না হেয়,

অর্ধজগতে কোরো না গো হীন জগতের মুখ চেয়ো।

স্নেহবলে নারী বক্ষ শোণিতে ক্ষীর করি' পারে দিতে

কে বলে ছোট সে পুরুষের কাছে—কোন্ মূঢ় অবনীতে?

*　　　*　　　*

গানের দেবতা, প্রাণের দেবতা, ধ্যানের দেবতা নারী

বনের পুষ্প, মনের ভক্তি সে কেবল তা'রি তা'রি।[১৫]

১৫। এই সব উদ্ধৃতির সঙ্গে নজরুল ইস্‌লামের 'সাম্যবাদী' পুস্তিকার কবিতাবলীর কথা ও সুরের সাদৃশ্য লক্ষণীয়।

'হোমশিখা'-র প্রসঙ্গ-পরিকল্পনার মূলে পঞ্চমহাভূত সম্পর্কে 'রঘুবংশের' পূর্বোক্ত প্রেরণা কতোদূর কাজ করেছে, সে-বিষয়ে চূড়ান্ত কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছোনো সম্ভব নয়; কারণ, সত্যেন্দ্রনাথ নিজে সে-বিষয়ে কোনো স্বীকৃতি রেখে যান নি। তবে, কালিদাসের 'পরার্থৈক ফলাগুণাঃ' উক্তিটির প্রতিধ্বনি 'হোমশিখা'-র পঞ্চমহাভূত সম্পর্কিত সব ক'টি কবিতার মধ্যেই যে নিঃসন্দেহে বিত্তমান, উদ্ধৃত অংশগুলির সাক্ষ্যের ওপর নির্ভর করে সে-বিষয়ে মন্তব্য প্রকাশের বাধা নেই।

'বিকাশ'-পর্বের শেষ দু'খানি বই 'তীর্থ-সলিল' (২০ সেপ্টেম্বর ১৯০৮) এবং 'তীর্থরেণু' (১৯, সেপ্টেম্বর ১৯১০) তাঁর অনুবাদ-কবিতার সংকলন। 'সাহিত্য', 'প্রবাসী', 'ভারতী' প্রভৃতি পত্রিকায় এই কবিতাগুলি যখন প্রথম ছাপা হয়, তখন থেকেই অনুবাদ-কবিতার পরিশ্রমী সাধক হিসেবে সত্যেন্দ্রনাথের খ্যাতি ছড়াতে থাকে। বাংলার কাব্যক্ষেত্রে অনুবাদ চর্চার রেওয়াজ তাঁর আগে থেকেই প্রচলিত ছিল। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তো এ-দিকে বিশেষ সজাগ এবং সক্রিয় ছিলেনই,—তা ছাড়া তাঁর পূর্বগামী ও অনুগামী বহু কবির প্রয়াসও স্মরণীয়। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আমলে 'ভারতী'র 'সম্পাদকের বৈঠকে' বিদেশের স্থায়ী ও সাময়িক উৎকৃষ্ট সহিত্য-কথার আলোচনা ছাপা হোতো। ঐ পত্রিকার 'কাব্যজগৎ' অংশে আশুতোষ চৌধুরী বিখ্যাত কবিদের সাধনা সম্বন্ধে আলোচনা করতেন। বিশ শতকের প্রথম দশকে সত্যেন্দ্রনাথ যখন এই বিভাগে প্রবেশ করেন, তখন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম সর্বশ্রুত। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের শেষ মৌলিক নাটক 'স্বপ্নময়ী' ছাপা হয় ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে (সত্যেন্দ্রনাথের জন্ম-বৎসর)। তারপর তিনি কয়েকখানি গীতিনাট্য লিখেছিলেন বটে, কিন্তু প্রধানতঃ নিযুক্ত ছিলেন বিভিন্ন অনুবাদ-প্রচেষ্টায়। তখনকার 'ভারতী' পত্রিকায় তাঁর বহু অনুবাদ-কবিতা ছাপা হয়েছে। 'তীর্থসলিল' ছাপা হবার প্রায় চার বছর আগে গ্রন্থাকারে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'ফরাসী প্রসূন' (১৩১১) প্রকাশিত হয়। বিভিন্ন পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে প্রাকৃত ও সংস্কৃত সাহিত্যেরও বহু রত্ন তিনি বাংলায় ভাবান্তরিত করে গেছেন।

সত্যেন্দ্রনাথের বর্ষীয়ান্ সমকালীন লেখকদের মধ্যে 'সাহিত্যের সাত

সমুদ্রের নাবিক' প্রিয়নাথ সেনের (১৮৫৪-১৯১৬) নামও এই সূত্রে স্মরণীয়। 'সাহিত্য' পত্রিকায় (পৌষ, ১৩০৭) তাঁর লেখা Fitzerald-এর ওমরখৈয়ামের অনুবাদ সে-সময়ে পাঠকসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

সে-কালের বাংলা সাহিত্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-প্রিয়নাথের মতন অনুবাদের পরিশ্রমী সাধকের সংখ্যা বেশি ছিল না। তবু মধুসূদন-হেম-নবীন-সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের (১৮৩৮-১৮৭৮) সময় থেকে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের আয়ুষ্কাল অবধি বাংলা কবিতার অনুবাদ-বিভাগের জরীপ করতে গেলে অনেক নামের মিছিলে তালিকার কলেবর-বৃদ্ধি ঘটা খুবই স্বাভাবিক।

তাঁর সমকালীন বর্ষীয়ান কবিদের মধ্যে বিভিন্ন প্রতীচ্য কাব্যের রূপ-রসের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার বড়াল, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ইত্যাদি; এঁরা আবার প্রত্যেকেই ছিলেন সংস্কৃত সাহিত্যের বিশেষ অনুরাগী। উনিশ শতকে কৃত্রিম-ক্লাসিক আদর্শের কাব্য-সাধকদের প্রবর্তনাতেই অনুবাদের দিকে বাঙালী কবিরা প্রথম ব্যাপক উৎসাহ বোধ করেন এবং বাংলা কবিতার ধারায় তখন থেকে আধুনিক কাল অবধি অনুবাদ-সমৃদ্ধ পৃথক একটি শাখা ক্রমশঃ পরিণতি লাভ করেছে।[১৬] দেশি-বিদেশি বহু বিচিত্র কাব্য-তীর্থের 'সলিল' আর 'রেণু' সংগ্রহ করে বাংলার পূর্বকালাগত অনুবাদ-কাব্যের ধারায় সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর 'তীর্থসলিল', 'তীর্থরেণু' প্রভৃতি অনুবাদ-সংকলন উপহার দিলেন। এই বই দু'খানির আলোচনায় ভিন্ন প্রসঙ্গে এগিয়ে যাবার আগে এখানে প্রিয়নাথ-জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথ

১৬। ১২৬৬ বঙ্গাব্দের 'সংবাদ প্রভাকরে' এই মন্তব্যটি পাওয়া গেছে :—'ইংরাজী কবিতার অনুবাদ বিষয়ে অভ্যাস রাখা অত্যন্ত আবশ্যক, যদিও প্রথমত তাহা কিঞ্চিৎ কঠিন হয় বটে কারণ অপরের মনের ভাব ও অভিপ্রায়ের দাসত্ব স্বীকার না করিলে উত্তম হয় না কিন্তু তাহাতে অভ্যাস জন্মিলে এবং তাহাতে কৃতকার্য হইতে পারিলে আহ্লাদের সীমা থাকে না। ইংরাজী উত্তমোত্তম কবিতা বঙ্গভাষায় অনুবাদ-করণে বিশেষরূপেই মনোযোগী হইবেন, তাহা কদাচ তাচ্ছল্য করিবেন না।'

১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে সরকারী উদ্যোগে Vernacular Literature Society প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সমাজটি মুখ্যতঃ বাংলা ভাষায় অনুবাদের প্রসার-সাধনে নিযুক্ত ছিল। ১৮৫১ সালে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের (১৮২২-১৮৯১) সম্পাদনায় এবং এই সমাজেরই উদ্যোগে 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' প্রকাশিত হয়। এই সময়েই (১৯শ শতকের মাঝামাঝি) কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাভারতের গদ্যানুবাদ প্রকাশ করেন। [পরপৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য]

ঠাকুরের নামও এক সূত্রে স্মরণীয়। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের রুচি গড়ে তোলার কাজে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্যক্তিত্বও যে বেশ কিছু পরিমাণে প্রেরণা জুগিয়েছিল, সে কথা দত্ত-কবি নিজেই স্বীকার করে গেছেন।[১৭]

সত্যেন্দ্রনাথ যখন প্রথম কবিতা লিখতে আরম্ভ করেন, তার কিছুকাল আগেই বাংলা কাব্যে সংস্কৃত ছন্দ ব্যবহারের দিকে কোনো কোনো কবির বিশেষ উৎসাহ দেখা গিয়েছিল। তাঁর অনুবাদ-কবিতাবলীর আলোচনাসূত্রে সে কথা স্মরণীয়। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভগবদ্গীতা এবং মেঘদূতের অনুবাদ দু'খানি এই সূত্রে মনে পড়ে। তাঁর অগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর দর্শন, গণিত, ভাষাতত্ত্ব, কাব্য ইত্যাদি নানা বিদ্যার সাধক ছিলেন। সেকালে সংস্কৃত ছন্দে বাংলা কবিতা লেখার সামর্থ্য দেখিয়ে তিনি বিশেষ প্রতিষ্ঠার অধিকারী হয়েছিলেন। বাংলা ১২৫৭ সালে লালমোহন গুহ এবং ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষের মেঘদূতের অনুবাদ প্রকাশিত হবার অল্পকাল পরে ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুবাদ ছাপা হয়। 'স্বপ্নপ্রয়াণ'-এর (১৮৭৫) প্রায় সমকালে ১২৭৬ সালের আশ্বিনের 'ভারতী'তে রবীন্দ্রনাথের বিলাত যাত্রার সময়ে নব্য বাঙালীর বিলাতযাত্রা প্রসঙ্গে দ্বিজেন্দ্রনাথ শিখরিণী ছন্দে উপহাসমূলক একটি কবিতা লিখেছিলেন। বাংলায় সংস্কৃত ছন্দ প্রয়োগের ধারায় দ্বিজেন্দ্রনাথের সে-রচনাটি ভোলবার নয়। সে-কালে সংস্কৃত কাব্যের নানান্ অনুবাদের সঙ্গে সঙ্গে বাংলায় সংস্কৃত ছন্দ অনুকরণেরও অনেক দৃষ্টান্ত দেখা গিয়েছিল।

সত্যেন্দ্রাথ দত্তের সমকালীন বর্ষীয়ান্ কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন তাঁর একটি কবিতায় বলদেব পালিত-কে শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন। ১২৭৭ সালে প্রকাশিত

বর্ধমানের মহারাজা মহাতাপচাঁদ-এর (১৮২০-৭৯) আনুকূল্যে প্রকাশিত রামায়ণ -মহাভারত প্রভৃতি সংস্কৃত কাব্যপুরাণের এবং 'হাতেমতাই', 'সেকেন্দরনামা', 'চাহার দরবেশ' প্রভৃতি উর্দু-ফার্সী উপাখ্যানের গদ্য-পদ্য অনুবাদও এই সময়ের উল্লেখযোগ্য সাহিত্য-প্রয়াসের মধ্যে গণ্য।

১৭। এই বইয়ের 'পরিশিষ্ট' অংশে ৺সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর দ্রষ্টব্য।

(৩০ ডিসেম্বর ১৮৭০) 'ললিত কবিতাবলী'র ভূমিকায় বলদেব পালিত লিখেছিলেন—

> এই কবিতাগুলি জগদ্বিখ্যাত কালিদাস জয়দেবাদি সংস্কৃত কবিদিগের মনোনীত ছন্দোবন্ধে বিরচিত। এগুলি সংস্কৃতচ্ছন্দের রীত্যনুসারে পাঠ করিতে হইবে; অর্থাৎ হ্রস্ব দীর্ঘের উপর বিশেষ মনোযোগ রাখিতে হইবে।

১২৭৯ সালে বলদেব পালিতের 'ভর্তৃহরিকাব্য' এবং ১২৮২ সালে তাঁর 'কর্ণার্জুনকাব্য' প্রকাশিত হয়। বাংলায় সংস্কৃত ছন্দ এবং সংস্কৃত কাব্যরস, যুগপৎ এই দুইয়েরই সঞ্চারণ-প্রয়াসের দৃষ্টান্ত হিসেবে উনিশ শতকের অষ্টম-নবম দশকে প্রকাশিত এই দু'খানি কাব্যের কথা বিশেষ মনোযোগ দাবি করে।

'তীর্থসলিল' এবং 'তীর্থরেণু', দু'খানি অনুবাদ-সংকলনেরই প্রকৃতি এক রকম। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সাহিত্য-'তীর্থের' পর্যটক সত্যেন্দ্রনাথ নিজের রুচি অনুসারে বিভিন্ন কাব্য-কাব্যাংশের অনুবাদ প্রকাশ করেছিলেন একই বিন্যাস-রীতির আদর্শ মনে রেখে! এখানে বিন্যাসের প্রসঙ্গটি বিশেষ ভাবে উত্থাপিত হবার হেতু আছে। 'তীর্থসলিলে' সংস্কৃত, চীনা, জাপানী, ফার্শী, আরবী প্রভৃতি প্রাচ্য ভাষার কবিতা এবং ইংলণ্ড, ফ্রান্স, পোল্যাণ্ড, জার্মাণী, ইটালী প্রভৃতি প্রতীচ্য ভূখণ্ডের কবিতা—দু'জাতেরই বহু বিভিন্ন অনুবাদ পাশাপাশি ছাপা হয়েছে। এমন কি, বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম্'ও অপেক্ষাকৃত আটপৌরে ভাষায় 'অনুবাদ' করা হয়েছে।[১৮] ১৩৫৬ সালে 'তীর্থসলিল'-এর যে চতুর্থ সংস্করণটি ছাপা হয়েছে, তাতেও কবিতা সাজাবার বিশেষ কোনো সুনিয়ম বা শৃঙ্খলা অনুসরণ করা হয়নি; কবির আয়ুষ্কালের মধ্যে ছাপা প্রথম সংস্করণেও এই একই রকম বিশৃঙ্খলা দেখা যায়। দেশের বিভিন্নতা অনুসারে,—অথবা, নির্বাচিত কবিদের আয়ুষ্কালের ক্রম অনুসারে,—কিংবা কবিতার প্রসঙ্গের পার্থক্য অনুসারে এই অনুবাদগুলি ঠিক ঠিক সাজিয়ে প্রকাশ করার দিকে সত্যেন্দ্রনাথের মন ছিল না। 'তীর্থরেণু'তেও বিন্যাসের এই একই রকম বিশৃঙ্খলা বর্তমান।

'তীর্থসলিল' পড়ে রবীন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, সারদাচরণ মিত্র, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি অনেকেই চিঠি লিখে তাঁকে উৎসাহিত করেছিলেন। সেই সব

১৮। 'জাতীয় সঙ্গীত' (ভারতবর্ষ)—'তীর্থসলিল' দ্রষ্টব্য।

চিঠির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথের চিঠি দু'খানির বিশেষ উল্লেখ অপরিহার্য। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—

> ...মূলের রস কোনোমতেই অনুবাদে ঠিকমত সঞ্চার করা যায় না, কিন্তু তোমার এই লেখাগুলি মূলকে বৃন্তস্বরূপ আশ্রয় করিয়া স্বকীয় রস-সৌন্দর্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে—আমার বিশ্বাস কাব্যানুবাদের বিশেষ গৌরবই তাই—তাহা একই কালে অনুবাদ এবং নূতন কাব্য।

'তীর্থরেণু' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অন্য এক মন্তব্যও এইসূত্রে স্মরণীয়। সত্যেন্দ্রনাথের অনুবাদ-দক্ষতা দ্বিতীয়বার স্বীকার করে তিনি লিখেছিলেন—

> তোমার এই অনুবাদগুলি যেন জন্মান্তর প্রাপ্তি—আত্মা এক দেহ হইতে অন্য দেহে সঞ্চারিত হইয়াছে—ইহা শিল্পকার্য নহে, ইহা সৃষ্টিকার্য।

বস্তুতঃ এইসব অনুবাদ-কবিতায় সর্বত্র মূলের সঙ্গে প্রত্যেক শব্দ ও চরণের সংগতি বজায় নেই। তবে বাংলা ভাষার বাক্-ভঙ্গি, বিশিষ্ট প্রয়োগ, বিশেষ-বিশেষ শব্দ-সংস্কার যথাসাধ্য বজায় রেখে তিনি অনুবাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন। বিষয়বস্তু বিচার করে দেখলে এই দু'খানি বইয়ে সংকলিত অনুবাদমালার বৈচিত্র্য মানতেই হয়। ঘুম-পাড়ানি গান,—জাতীয় সংগীত,—মেঘ, চাতক, কোকিল, দেবদারু প্রভৃতি প্রকৃতি-বিষয়ক কথা,—মালয়-মিশর-জাপান-গ্রীস-ভারত-য়িহুদীদেশ-আরব-পারস্য-কাফ্রিমুলুকের নারী-বন্দনার গান ইত্যাদি প্রসঙ্গের বৈচিত্র্য 'তীর্থসলিল'-এর পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মাউরি, জাপানী, আরবী, চীনা, হাব্‌শী, মারাঠী ইত্যাদি বিভিন্ন অঞ্চলের কাব্যলোকে কবির ভ্রমণের চিহ্ন যেমন 'তীর্থসলিলে', তেমনি 'তীর্থরেণু'তেও বর্তমান। 'তীর্থসলিল'-এর মাউরি ও জাপানী 'ঘুমপাড়ানি গান' 'তীর্থরেণু'-র কসাক্ ঘুমপাড়ানি গান এবং তামিল 'ঘুমভাঙার ছড়া'র সঙ্গে একত্র গ্রথিত হলেই বোধ হয়ে সংগত হোতো। তেমনি আবার 'মণিমঞ্জুষা'র (১৯১৫) 'কোনো নারীর প্রতি', 'সুন্দরীর প্রতি' ইত্যাদি কবিতা পূর্ববর্তী অনুবাদ-সংকলনের নারী-বিষয়ক কবিতার সঙ্গে,—এবং আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের 'ঘুম-পাড়ানি গান' আর মর্সেলিন ভালমোর-এর 'ঘুম-পাড়ানোর গল্প' পূর্বালোচিত সমবিষয়ক অনুবাদমালার সঙ্গে পাশাপাশি ছাপা হওয়া উচিত ছিল। অসময়ে হঠাৎ মৃত্যু না ঘটলে এই অনুবাদগুলি ('তীর্থসলিল', 'তীর্থরেণু', 'মণি-মঞ্জুষা') সুশৃঙ্খল আদর্শে সাজিয়ে নতুন সংস্করণ প্রকাশ করতে

তিনি নিজেই হয়তো উদ্যোগী হতেন! কিন্তু যে-কারণেই হোক্, বিন্যাসের তেমন কোনো শৃঙ্খলা এই তিনখানি অনুবাদ-সংগ্রহের একটিতেও দেখা যায় না।

'বেণু ও বীণা'য় তদ্ভব ও দেশি শব্দের প্রয়োগবাহুল্য-ঘটিত যে বিশেষ লক্ষণটি দেখা গিয়েছিল, 'হোমশিখা'য় সে লক্ষণ প্রায় অন্তর্হিত। তারপর 'তীর্থসলিল' এবং তীর্থরেণু'-র লেখাগুলিতে পুনরায় তদ্ভব ও দেশি শব্দের বিচিত্রতা দেখা দেয়। এই ক'খানি বইয়ে প্রকাশিত মৌলিক এবং অনুবাদ দু'জাতের সমস্ত কবিতা পাশাপাশি বিচার করলে দেখা যায় যে, ধ্বনিপ্রধান ছন্দের বাহনেই দেশি, বিদেশি ও তদ্ভব শব্দের বৈচিত্র্য ফুটেছিল বেশি পরিমাণে। দ্বিতীয়তঃ, প্রসঙ্গ যেখানে গভীর, গম্ভীর—অথবা, অনুবাদ-কবিতার ক্ষেত্রে প্রসঙ্গ যেখানে সংস্কৃত মূল থেকে আহরণ করা, সেখানেও দেশি, বিদেশি এবং স্বনির্মিত শব্দের প্রয়োগ অপেক্ষাকৃত এড়িয়ে চলা হয়েছে। 'তীর্থসলিল' ও 'তীর্থরেণু'র অনুবাদ-কবিতাবলী থেকে এই বিশেষত্বের দু'একটি নমুনা নিচে তুলে দেওয়া হোলো—

[১] এ গৃহে শান্তি করুক বিরাজ মন্ত্র-বচন-বলে,
পরম ঐক্যে থাকুক সকলে, ঘৃণা যাক দূরে চলে;
পুত্রে পিতায়, মাতা দুহিতায় বিরোধ হউক দূর
পত্নী পতির মধুর মিলন হোক্ আরো সুমধুর;
ভা'য়ে ভা'য়ে যদি দ্বন্দ্ব থাকে তা' হোক আজি অবসান,
ভগিনী যেন গো ভগিনীর প্রাণে বেদনা না করে দান,
নানা যন্ত্রের আওয়াজ মিলিয়া উঠুক একটি গান।

—অথর্ব বেদ (তীর্থসলিল)

[২] যত্নে রেখো এই ক্ষুদ্র মানব-সন্তানে,
ক্ষুদ্র,—তবু অন্তরে সে ধরে বিশ্বম্ভরে;
শিশুরা জন্মের আগে রশ্মিরাশিরূপে
চঞ্চল পুলকভরে ফিরে নীলাম্বরে।

আসে তারা আমাদের অজানার দেশে,
বিধাতা পাঠান শুধু দিন দুই তরে ;
শিশুর অস্পষ্টভাষে তাঁরি বাণী ফুটে,
ক্ষমার বারতা তাঁর শিশু-হাসে করে।

—মানব-সন্তান : ভিক্টর হুগো (তীর্থসলিল)

[৩] চোটোনা ভাই বরফ আজো নড়ছে নাকো দেখে,
হাত পা ভেঙে গিয়েচে তার পড়ে আকাশ থেকে !
সকল বাড়ীর দুয়ারে সে দিয়ে গেছে হানা,
জলে হাওয়ার ছোঁয়াছুরি, বাহির হওয়া মানা !

—শিশির বাগম (তীর্থরেণু)

[৪] দুয়োরাণীর দুলাল ! ওরে ! খেয়ে দেখে নে,
সদয় বিধির নানান্ নিধি দিয়েছে এনে !
দুয়োরাণীর দুখের বাছা ! ধূলাকাদাতে
বুকে হেঁটে বেড়াস যেন জন্ম-হাভাতে !

—দুয়ো দুয়ো (তীর্থরেণু)

ওপরের প্রথম দুটি দৃষ্টান্তের মধ্যে দেশি শব্দের প্রয়োগ বিরল। প্রথমটি সংস্কৃত মূল থেকে অনুবাদ ; দ্বিতীয়টিতে প্রসঙ্গের গাম্ভীর্য লক্ষণীয়। কিন্তু এই ব্যাপার যে সর্বত্র ঘটেছে, তা নয়। তানপ্রধান ছন্দের বাহনে 'বেণু ও বীণা'র মধ্যে 'মেসেড়ানি' অবাধ আশ্রয় পেয়েছে।[১৯] আবার, এও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে, তৃতীয় ও চতুর্থ উদ্ধৃতির অন্তর্গত 'চোটোনা', 'হানা', 'ছোঁয়াছুরি', 'হাভাতে' ইত্যাদি শব্দ তৎসম নয়। প্রসঙ্গের পার্থক্য অনুসারে ছন্দ এবং শব্দ দুই উপাদানই ভিন্ন ছাঁদের নিয়ন্ত্রণ মেনে নিয়েছে। কবিতার প্রসঙ্গভেদের সঙ্গে সঙ্গে ছন্দ-প্রকৃতি ও শব্দ-প্রকৃতির সম্বন্ধ নির্ণয়ের দিক থেকে আলোচ্য ব্যাপারটি উপেক্ষণীয় নয়। সেই কারণেই এখানে সত্যেন্দ্রনাথের শব্দ-ব্যবহারের এই বিশেষ দিকটির এই উল্লেখটুকু গ্রহণ হোলো।

'বিকাশ'-পর্বের পাঁচখানি বইয়ের সমস্ত কবিতার সামগ্রিক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে শব্দ, ছন্দ আর প্রসঙ্গ তিন বিভাগেই তাঁর আগ্রহ উত্তরোত্তর

১৯। অরণ্যে রোদন—'বেণু ও বীণা'

খ্যাতি ও বৈচিত্র্য লাভ করেছে। লেখার পরিমাণ বেড়েছে। কিন্তু তাঁদের অখণ্ড নিবিড়তা,—কবিকল্পনায় সূক্ষ্ম-গভীর মৌলিক কৃতিত্ব,—রসব্যাকুলতায় পরম আর্তি বা আনন্দ তখনো অনাগত।

ফুলের ফসল ১৯১১
কুহু ও কেকা ১৯১২
তুলির লিখন ১৯১৪
মণিমঞ্জুষা ১৯১৫
অভ্রআবীর ১৯১৬
হসন্তিকা ১৯১৭
বেলা শেষের গান ১৯২৩ } মৃত্যুর পরে প্রকাশিত
বিদায়-আরতি ১৯২৪

১৩১৮-১৯ সালে (ইং ১৯১১-১২) সত্যেন্দ্রনাথের লেখনীর আর বিরাম ছিল না। তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধুদের মধ্যে শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে সে-কথা জানিয়েছেন এবং এ বইয়ের অধ্যায়ান্তরে সে-প্রসঙ্গ স্মরণ করা হয়েছে।[২০] এই সময় থেকে শুরু করে কবির আয়ুকালের শেষ অবধি যে বিস্তার, সেই অংশটিকে তাঁর কবিত্ব-পরিণতির 'সমৃদ্ধি-পর্ব' নামে চিহ্নিত করে নিলে 'ফুলের ফসল'কেই এ-পর্বের প্রথম বই বলতে হয়।

এ-বইখানির মোট কবিতা-সংখ্যা ১১০। প্রথম কবিতা 'আমন্ত্রণী'তে অপ্সরীদের আহ্বান করে বলা হয়েছিল—

ফুলের ফসল লুটিয়ে যায়
অপ্সরীরা আয় গো আয়;
মৌমাছিরে বাহন করে
হাওয়ার আগে ছুটিয়ে আয়!

অধিকাংশ কবিতাতেই ফুল, কুঁড়ি, বসন্ত, ফাল্গুন ইত্যাদি ফুল-সম্পর্কিত অনুষঙ্গ কোনো-না-কোনো ভাবে উচ্চারিত হয়েছে। তা-ছাড়া 'গান' শিরোনামেও অনেকগুলি রচনা স্থান পেয়েছে। প্রকৃতির কুসুম-সমারোহের ভূমিকায় মানব-হৃদয়ের বর্ণ-ঐশ্বর্য-সৌরভের স্বীকৃতি এখানে সুস্পষ্ট। প্রেম সম্পর্কে তাঁর কবিতা অত্যন্ত বিরল, কিন্তু এ-বইয়ে সে-প্রসঙ্গেও একাধিক

২০। পৃষ্ঠা ৩৩ দ্রষ্টব্য।

কবিতা আছে। 'প্রেমাভিনয়', 'নীরবতার নিবিড়তা', 'চিত্ত-মুকুরে', 'উন্মনা', 'বিরহী', 'স্বপন', 'গোলাপ' 'পুরানো প্রেম', 'প্রেম-ভাগ্য,' প্রেমের প্রতিষ্ঠা' ইত্যাদি কবিতায় প্রেমের রহস্য-মাধুর্য-সংশয়-বেদনার রমণীয় অভিব্যক্তি ধ্বনিত হয়েছে। 'ফুলের ফসলে' একদিকে রবীন্দ্রনাথের কথা ও সুরের প্রভাব, অন্যদিকে দেবেন্দ্রনাথ সেনের পঞ্চেন্দ্রিয়ের পঞ্চপ্রদীপ-দ্যুতির [২১] কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য দেখা দিয়ে সত্যেন্দ্রনাথের কাব্য-প্রবাহের মধ্যে নতুন অধ্যায় সূচনা করেছে। 'সবিতা' থেকে শুরু করে ১৯১০ অবধি সমস্ত বইগুলির মধ্যেই চিন্তা-বিচার-বিশ্লেষণে অভিনিবিষ্ট কবিসত্তার আত্মপ্রকাশের প্রচেষ্টাই প্রধান। কিন্তু 'ফুলের ফসলে'র প্রকৃতি অন্যরকম। সৌন্দর্যমুগ্ধ কবির উল্লাস, আকুতি এবং মগ্নতা এ-বইয়ের কয়েকটি কবিতায় নিবিড় ব্যঞ্জনা সঞ্চার করেছে। 'হোমশিখা'র মতো বিভিন্ন বন্দনার পরিকল্পনা নেই,—'বেণু ও বীণা'র মতো বিভিন্ন প্রসঙ্গসূত্রেব মিশ্রণ নেই,—'সবিতা' বা 'সন্ধিক্ষণে'র মতো বিজ্ঞান-দর্শন-বাজনীতির মতামত পর্যবেক্ষণেরও প্রয়াস নেই এখানে। 'ফুলের ফসলে' দেখা গেল রূপসম্ভোগের অকৃত্রিম, অবাধ মগ্নতা! এই বইখানির নাম এবং গ্রন্থভুক্ত কবিতাবলীর প্রসঙ্গ-প্রযুক্তির সূত্র মনে রেখে পাশাপাশি দেবেন্দ্রনাথ সেনের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ফুলবালা' (প্রথম প্রকাশ ২৮ জুন, ১৮৮০), চতুর্থ গ্রন্থ 'অশোকগুচ্ছ' (১২ অক্টোবর ১৯০০) এবং আরো পরের 'শেফালীগুচ্ছ' (১৬ অক্টোবর, ১৯১২), 'পারিজাতগুচ্ছ' (২০ অক্টোবর, ১৯১২) ইত্যাদি লেখাগুলি তুলনা করে দেখলে তাঁর এই পর্বের লেখাতে দেবেন্দ্রনাথেরই বিশেষ প্রভাব চোখে পড়ে। 'ফুলবালা' বইখানিতে গোলাপ, কদম, রক্তজবা ইত্যাদি বহু বিচিত্র ফুলের প্রসঙ্গ ছড়িয়ে আছে। 'ফুলের ফসল' প্রকাশিত হবার অল্পকাল পরে দেবেন্দ্রনাথের 'অশোকগুচ্ছের' দ্বিতীয় সংস্করণ বের হয় (২৭এ মার্চ, ১৯১২)। ১৩২০-র শ্রাবণ সংখ্যার 'প্রবাসী' পত্রিকায় দেবেন্দ্রনাথের কবিতার সমালোচক সুখরঞ্জন রায় লিখেছিলেন—

> গত শারদীয়া পূজার অব্যবহিত পূর্বে কবি দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার এগারখানি কাব্যগ্রন্থ একসঙ্গে প্রকাশ করিয়া বাংলার পাঠকসমাজকে একেবারে বিস্মিত করিয়া দিয়াছেন।[২২]

২১। দেবেন্দ্রনাথ সম্পর্কে মোহিতলাল মজুমদার লিখেছেন:—'তিনি পঞ্চেন্দ্রিয়ের পঞ্চ-প্রদীপ জ্বালিয়া অনাবিলা প্রীতির মন্ত্রে সৌন্দর্য-লক্ষ্মীর আরাধনা করিয়াছেন।'

—আধুনিক বাংলা সাহিত্য

২২। প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩২০, পৃঃ ৩৩৭ দ্রষ্টব্য।

দেবেন্দ্রনাথের 'শেফালীগুচ্ছ', এবং 'পারিজাতগুচ্ছ' বই দু'খানিও প্রায় একই সময়ে ছাপা হয়। সেকালের বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে দেবেন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠা প্রথে এবং তাঁর কবিতার পঞ্চেন্দ্রিয়বিলাসের (sensuousness) স্বাতন্ত্র্যে সত্যেন্দ্রনাথ নিঃসন্দেহে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। দেবেন্দ্রনাথের 'গোলাপগুচ্ছ' (১৫ নভেম্বর, ১৯১২) বইখানিতে 'ফুলবালার' 'গোলাপ' কবিতাটি সে-সময়ে পুনর্মুদ্রিত হয়। সত্যেন্দ্রনাথের 'ফুলের ফসল'-এর 'গোলাপ'-এর সঙ্গে এই কবিতাটি মিলিয়ে দেখলে দু'টির আংশিক সাদৃশ্য সম্পর্কে সন্দেহ থাকে না। দেবেন্দ্রনাথের কবিতাটির চতুর্থ স্তবকে দেখা যায়—

কণ্টকে আবৃত তুই তাহাতে মানব
ডরে কি কখন ?
রুধির বহিয়ে যায় তথাপি অবাধে যায়
লভিতে রতন।
তোরে যবে করে পায়, সব দুঃখ ভুলে যায়
ফুরায় যাতন
গুণেরই সমাদর, হয় এ পৃথিবী পর
লো ফুল শোভন !

সত্যেন্দ্রনাথের কবিতাটির স্তবক-বন্ধ অপেক্ষাকৃত হ্রস্ব আয়তনের, তাঁর ভাষারীতিও ভিন্নধর্মী, কিন্তু তৎসত্ত্বেও নিচের ক'লাইনে দেবেন্দ্রনাথের প্রভাব সুস্পষ্ট।

মানুষের প্রেমে আজি সফল জীবন
দুঃখ আর নাহি এক রতি,
গরবী গোলাপ আমি ভুবন লোভন,—
কণ্টকের আমি পরিণতি !

ভিন্ন প্রসঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের 'অশোকগুচ্ছের' কথা আগেই বলা হয়েছে। সত্যেন্দ্রনাথের 'ফুলের ফসল' বইয়ের মধ্যে 'অশোক' নামেও একটি কবিতা আছে এবং কামিনী, কৃষ্ণকলি, শেফালি, বকুল, অপরাজিতা ইত্যাদি ফুলের বিষয়ে উভয়েই কবিতা লিখেছেন। অতিকথনের দোষে ইন্দ্রিয়ানুভূতির বর্ণনা দেবেন্দ্রনাথের লেখাতে বহু ক্ষেত্রে অবাঞ্ছিত তারল্য ঘটিয়েছে। মোহিতলাল মজুমদার তাঁর কাব্যে কীটসের সৌন্দর্যপিপাসা ও রূপদক্ষতার কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য

লক্ষ্য করেও এই দোষটিকে ভাবতান্ত্রিকতার অতিরেক রূপে অভিহিত করে লিখেছিলেন—

> দেবেন্দ্রনাথের সৌন্দর্যপিপাসা ততটা intellectual নয়, অতিমাত্রায় emotional—এ বিষয়ে তাঁহার কবিমানসের সহিত বিহারীলালের সাদৃশ্য আছে। উভয়েই নিজ নিজ ভাবস্বপ্নে বিভোর, বাহিরের প্রতি উদাসীন—"তপোবনে ধ্যানে থাকি এ নগর কোলাহলে"।২৩

কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথের 'ফুলের ফসল'-এর লেখাগুলিতে রূপতৃষ্ণার ব্যাকুলতা বস্তুজগতের সাক্ষাৎ ইন্দ্রিয়-পরিচয় ও পাঠক-সচেতন কবিমানসের সতর্ক প্রকাশ-প্রচেষ্টার সমবায়ে শিল্প-সংযমের শাসনে অপেক্ষাকৃত নিবিড়তা ও সংহতি লাভ করেছে। দৃষ্টান্ত হিসেবে এখানে এঁদের দুজনের সমবিষয়ক পৃথক দুটি কবিতার উল্লেখ করা যাক। 'অপরাজিতা' কবিতায় ('শেফালীগুচ্ছ') দেবেন্দ্রনাথ আটটি স্তবকে অপরাজিতার রূপ-গুণের কথা লিখেছেন। কবিকল্পনার উচ্ছ্বাসে অপরাজিতা হয়ে উঠেছে 'জবার ভগিনী',—'হাস্যময়ী দুর্গার চরণে' সে ফুল 'সুশোভিনী',—শুধু তাই নয়, কবি লিখেছেন, 'বৈকুণ্ঠে ফোট রে তুমি বিষ্ণুর সকাশে,—তুমি বিষ্ণুপ্রিয়া',—আবার, 'তব তরু-মূলে ফুল, তান্ত্রিকের হয় পূজা-সমাধান'। এই রকম আরো নানা সম্পর্কের বর্ণনা এই কবিতাটির ইতস্ততঃ বিদ্যমান। অন্য পক্ষে, সত্যেন্দ্রনাথের 'অপরাজিতা' ক্ষুদ্রায়তন, নিবিড় এবং স্নিগ্ধতর। অল্প কয়েকটি কথার গুণে অপরাজিতার খ্যাতিহীনতার উল্লেখ এখানে কবিতা হয়ে উঠেছে। 'বকুল' সম্পর্কে এঁদের দু'জনের পৃথক দুটি কবিতা দৃষ্টি ও কলাগত অনুরূপ পার্থক্যের নিদর্শন। নিবিড় ইন্দ্রিয়সুখময় আবেগের আন্তরিকতা এবং কবির প্রজ্ঞাদৃষ্টির অব্যাহত স্বচ্ছতা 'ফুলের ফসল'-এর অনেকগুলি কবিতায় সত্যেন্দ্রনাথের শক্তির পরিচয় রেখে গেছে; কল্পনার মাদকতা সে-সব ক্ষেত্রে শিল্পসৃষ্টির প্রতিবন্ধক হয়ে ওঠেনি, বরং কবিমানসের বিভোরতা বাঙ্ময় হয়ে সত্যিই রসোত্তীর্ণ হয়েছে।

'ফুলের ফসল'-এর কয়েকটি কবিতায় রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট সুর ও ভঙ্গির সাদৃশ্য বর্তমান। নিচে এ-রকম কয়েকটি দৃষ্টান্ত তুলে দেওয়া হোলো—

> আমি আপনি সরমে মরমে মরিয়া যাই যে,
> নিতি আপনার ছবি নিরখি' মুকুর মাঝারে,

২৩। 'আধুনিক বাংলা সাহিত্য' : মোহিতলাল মজুমদার।

আমি কেমন করিয়া বাহিরিব ভাবি তাই যে,
হায় দেখা দিব আমি কেমনে আমার রাজারে।

—কুণ্ঠিতা

মন যারে চেনে নয়ন চিনায়
সেই সে আমার পরাণ-বঁধু;
পাত্রে পাত্রে নাই সুধা, হায়।
পুষ্পে পুষ্পে নাহিক মধু।
নয়নে নয়নে নাহি উল্লাস
সকল তারায় নাহিক শোভা;
অধরে অধরে নাহিক তিয়াস,
তরুণ জনের পরাণ-লোভা।

—মনের চেনা

এত কাছে থেকে হায় তবু এত দূর।
নয়নে নয়ন রেখে পরাণ বিধুর
কাছে আসি ভালোবেসে,—
নিশাসে নিশাস মেশে,
নাগাল না পাই তবু পরাণ-বঁধুর।

—চির সুদূর

একটি জোড়া চোখের দিঠি ফিরত না,
দেখতে পেলেই ফিরে ফিরে চাইত;
আজকে আমি তাহার লাগি উন্মনা
আজকে সে আর নাইত' কোথাও নাইত'!
দেখিনি তার সকাল বেলায় মন্দিরে,
বৈকালে সে ঝর্না-তলায় যায় নি।
খুঁজেছি সব শৈল-পথের সন্ধি রে
তবুও তার দেখা কোথাও পাইনি।

—উন্মনা

আয় সখী, তোরে শিখাই আদরে
ভালবাসাবাসি খেলা!

কাছাকাছি এসে অকারণে হেসে
শেষে ভালবেসে খেলা !
না চাহিতে-পাওয়া ধন সে, স্বজনি,
ভালবাসা তার নাম,
যে তারে জেনেছে, হৃদয়ে টেনেছে
নাহি তার বিশ্রাম !

—প্রেমাভিনয়

ভুলব ভেবে ভুল করেছি,
ভোলা অত সহজ নয় ;
অনেক দিনের অনেক দুখের
ভালবাসা অনেক সয় !
পরশখানি বুকের কাছে
এখনো হায় জড়িয়ে আছে,
ছড়িয়ে আছে সবার মাঝে
জড়িয়ে আছে জগৎময় !

—পুরানো প্রেম

এইসব উদ্ধৃতির মধ্যে রবীন্দ্র-কাব্যে ব্যবহৃত বহু শব্দ, চিত্র, ছন্দ ও ভঙ্গির বিচিত্র সাদৃশ্য বর্তমান। তা' ছাড়া, রবীন্দ্রনাথের প্রিয় প্রতীক (symbol) ও চিত্রকল্প (image) প্রয়োগের অনুসারিতাও এখানে সুস্পষ্ট। সোনার হরিণ ('স্বর্ণমৃগ'), রাজা ('কুণ্ঠিতা'), ফুলহার ('বাসি ও তাজা'), বাঁশি, নদীর জোয়ার ইত্যাদি প্রতীকের উল্লেখ এই খণ্ড-কবিতাগুলির নানা জায়গায় ছড়িয়ে আছে। এইসব ফুলের প্রসঙ্গ পড়তে পড়তে রবীন্দ্রনাথের ছোটো একটি গানের প্রতিধ্বনি মনে আসে। তিনি লিখেছিলেন—

আমি ফুল তুলিতে এলেম বনে,
জানিনে কী ছিল মনে।
এ তো ফুল তোলা নয়, বুঝিনে কী মনে হয়
জল ভরে যায় দু'নয়নে।

(—গীতবিতান : ৩১৭)

নানা ফুলের বর্ণবিলাস, আঘ্রাণ ও কারুমাধুর্য-গত উল্লাসের সঙ্গে সঙ্গে 'ফুলের ফসলে' কবি সত্যেন্দ্রনাথের গভীর রোম্যান্টিক স্বপ্নবেদনাও মাঝে মাঝে ধ্বনিত হয়েছে। 'ঘূর্ণি' কবিতায় তিনি লিখে গেছেন—

আজ চোখের আগে কেবল জাগে
মৌন দু'আঁখি!
পাতার রাশে পাতার বরণ
বলছে কী পাখী!
ওগো অকূল সাগর মথন করে
কি ধন জেগেছে!
ঘূর্ণি লেগেছে!

বহিঃপ্রকৃতির রূপলাবণ্যের সমারোহ থেকে দৃষ্টি প্রসৃত হয়ে মাঝে মাঝে গভীর অন্তর্মুখিতার প্রবণতা জেগেছে। উদ্ভাসিত হয়েছে তাঁর অন্তরের অখণ্ড ধ্যানলোক! খণ্ড বস্তুসত্যের সৌন্দর্য থেকে তিনি পেয়েছেন পূর্ণের সংকেত। এ-রকম কবিতা বিরল বটে, তবু একথাও স্বীকার্য যে, সুখ-দুঃখের বিচিত্র অভিজ্ঞতার ঐকান্তিক সমন্বয়বোধ ভাস্বর হয়ে উঠেছে 'ফুলের ফসল'-এর অল্প কয়েকটি গানে। এই রকম একটি গানের উদাহরণ নিচে তুলে দেওয়া হোলো—

হায় ভালবাসার আলয় সে যে
চির স্বপনে!
আমি বাঁধিতে তায় চেয়েছিলাম
জীবন-পণে!
সে সুখের বুকে কেঁদে উঠে
দুখের পায়ে পড়ল লুটে,
জ্যোৎস্না-রাতে এসে, মিশে
গেল তপনে!

এ-রকম অখণ্ডতার উপলব্ধি মাত্র অল্প কয়েকটি ক্ষেত্রেই চোখে পড়ে। প্রসন্ন আবেগের ক্ষণ-উদ্ভাসনের সঙ্গে সঙ্গে নৈরাশ্য ও বিচ্ছেদবোধের বেদনাও

এখানে বর্তমান। 'স্রোতের ফুল' কবিতাটি এই শেষোক্ত ব্যাপারের দৃষ্টান্ত। তাতে কবি লিখেছিলেন—

জীবন কুস্বপন—জনম ভুল!
চলেছি ভেসে ভেসে স্রোতের ফুল।
বুঝি মরণ সনে,—
মরিতে ক্ষণে ক্ষণে,
না পাই তল কিবা না পাই কূল!

দুঃখ এবং নৈরাশ্যের এ-রকম অল্লাধিক স্বীকৃতি সত্ত্বেও 'ফুলের ফসলে' অক্ষয়কুমার বড়ালের এবং রবীন্দ্রনাথের প্রথম যুগের দুঃখপ্রভাব উত্তীর্ণ হয়ে দেবেন্দ্রনাথ সেন-প্রদর্শিত নিসর্গ-পরিতৃপ্ত, সুখাবেশ-স্নিগ্ধ নতুন এক মনোধর্মেই যে সত্যেন্দ্রনাথ উদ্বুদ্ধ হলেন,—প্রকৃতির অম্লান প্রাণস্রোতের সঞ্জীবনী প্রভাবেই তিনি যে কিছুকালের জন্ত আত্মসমর্পণ করলেন, তার প্রমাণ আছে বইয়ের উপান্ত কবিতা 'প্রাণ-পুষ্প' এবং অন্ততঃ আর একটি কবিতা—'আবির্ভাব'-এর ছত্রে ছত্রে। 'আবির্ভাব'-এ তিনি লিখেছিলেন—

আমার প্রাণের কোমল গন্ধ
ভিজিয়ে দিল দিগ্‌দিগন্ত,
আভাস পেয়ে বিভাত বায়ু
বইল ভালোবেসে গো!
ভরা দিনের বাজল বাঁশি,
ভরা সুখের ফুটল হাসি;
ভোলা স্বপন সফল হ'ল
সোনার শরৎ-শেষে গো!
যে আলোকে কাঁদন হরে
শিউলি মরে—হেসে গো!

'প্রাণ-পুষ্প' কবিতাটির শেষ দিকে এই নবজাগ্রত কবিসত্তারই আনন্দানুভূতির স্বাক্ষর পড়েছে—

আমার পরাণ যেন হাসে,
ফুলেরি মতন অনায়াসে,

চাঁদের কিরণতলে,
বরষায় ধারা জলে,
শিশিরে কিবা সে মধুমাসে,
ফুলেরি মতন—অনায়াসে।
সব সঙ্কোচ শোক
কুণ্ঠা শিথিল হোক,
আপনারে মেলিয়া বাতাসে,
নবনীত নিরমল
খুলিয়া সকল দল
সার্থক হোক্ মধু বাসে ;—
ফুলেরি মতন অনায়াসে।

পঞ্চেন্দ্রিয়ের রূপসম্ভোগ, পূর্ণতার ক্ষণ-উদ্ভাসন, প্রকৃতির পুষ্পশোভার উপলব্ধি থেকে মানবজীবনের সুখ-দুঃখ-বিস্ময়-বিষাদের ধ্যান—'ফুলের ফসলে' একদিকে কবিমানসের এই সব বিচিত্র উপভোগ, অন্যদিকে শব্দপ্রয়োগের দিক থেকে এখানেও তদ্ভব, দেশি এবং বিদেশি তিন রকম শব্দেরই বহুলতা স্বীকার্য। 'মিহিন্', 'নিছনি' ('আমন্ত্রণী'),—'নেতিয়ে' ('হাস্নুহানা'),—'কসুর' ('একের অভাব'),—'মুড়ে' (মস্তক অর্থে,—'কিশোরী'),—'বলক' ('অবসান') 'ফালতো আদায়', 'ফুরতির কাউ' ('তৃণ-মঞ্জরী'),—'নোন্‌ছা', 'চাঁছি' ('কাঞ্চন ফুল') ইত্যাদি দেশি-বিদেশি-তদ্ভব শব্দের প্রয়োগ এই বইখানির সর্বত্র চোখে পড়ে। তা'ছাড়া হাইফেন-বন্ধনে শব্দ-সংযোগের পৌনঃপুনিক ঝোঁকও অনেক কবিতাতেই বিদ্যমান। 'আমি চির শুভ্র, আমি চির ধ্রুব চলৎ-লহর বুকে ('নীলপদ্ম')—পুলক-অঙ্কিত আমি জনমে জনমে' ('কেলি-কদম্ব') ইত্যাদি প্রয়োগ সত্যেন্দ্রনাথের এই বিশেষ অভ্যাসের দৃষ্টান্ত হিসেবে স্মরণীয়। অতিশয়ার্থে দ্বিরুক্তি ব্যবহার ('সুধা মিঠার মিঠা!'—সুধা), গুণবাচক বিশেষ্য-পদ গঠনের মৌলিক প্রয়াস ('পেয়ারা-ফুলের রেশ্‌মী মিঠাই'—বর্ষাবরণ) ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিশেষ একরকম ব্যাকরণানুভূতির নিদর্শন বিদ্যমান। কবিতার নামকরণে রবীন্দ্রনাথের, তথা সেই 'ভারতী' পর্বেরই বিশেষ রীতির সাদৃশ্য রয়েছে 'বাসি ও তাজা', 'মধু ও মদিরা'—এই দু'টি নামের মধ্যে[২৪]।

২৪। পৃঃ ৮৭ (ঙ) ধারাটি দ্রষ্টব্য।

অবশ্য এ-ধরনের নামের অভ্যাস আরো অন্যান্য কবির কথা মনে করিয়ে দেয়। তাঁরাও রবি-রশ্মিরই কবি! সত্যেন্দ্রনাথের 'ভগ্নহৃদয়', 'বর্ষ-বিদায়' প্রভৃতি কবিতার নামগুলিও রবীন্দ্রনাথের সমনামচিহ্নিত কাব্য ও কবিতার স্মারক।

মননাতিরেক ও হৃদয়বিরলতা, সাধারণভাবে সত্যেন্দ্র-কাব্যের এই দুই প্রধান লক্ষণের কথা মেনে নিয়ে সেই সঙ্গে একথাও স্বীকার করতে হয় যে, 'বেণু ও বীণা' থেকে শুরু করে তাঁর শেষ পর্বের রচনা অবধি সমান্তরাল এই দুটি প্রবণতারই প্রকাশ ঘটেছিল। রবীন্দ্র-কাব্যের অন্তর্মুখিতার প্রভাব তিনি সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। আবার বস্তুবর্ণননিষ্ঠ, শব্দ-ছন্দ-অলংকার-কারুকৃৎ নিজস্ব সত্তার বহির্মুখিতাও তিনি পরিহার করতে পারেন নি। 'ফুলের ফসলে', 'কুহু ও কেকা'তে এবং পরবর্তী অন্যান্য গ্রন্থেও এই দুই ধারার সমান্তরলতা স্পষ্ট। এক দিকে ক্লাসিক কাব্যরীতির সংযম, অন্যদিকে রোম্যাণ্টিক আগ্রহের কথঞ্চিৎ ব্যাকুলতা—এই দুই কবিধর্মের যৌগপদ্য এবং সেই সঙ্গে চিন্তাবিমুখ বিশুদ্ধ গীতিকবিতার অন্তরাবেগ 'ফুলের ফসল'-এর প্রায় সব কবিতাতেই অল্পবিস্তর চিহ্ন রেখে গেছে। তারই মধ্যে মাঝে মাঝে কবির চিন্তাবেগ তীব্র এবং নিবিড় এক নবকান্তির সমৃদ্ধিতে বিশেষ মহিমময় হয়েছে। 'তোড়া', 'ফুলের রাণী', 'কিশোরী', 'পুষ্পের নিবেদন' ইত্যাদি কবিতায় সেই বিশেষ সাফল্যেরই নিদর্শন বর্তমান।

পুরাণের আখ্যান বা চরিত্রকথা,—সমকালীন রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ঘটনাদির উল্লেখ বা বর্ণনা,—নীতিকথা, ইতিহাস-বন্দনা, ব্যঙ্গ-পরিহাসমূলক আলাপ ও বিতর্ক তাঁর এই বইখানিতে সম্পূর্ণ অদৃশ্য। এই সব প্রসঙ্গ পুনরায় দেখা দিয়েছিল 'কুহু ও কেকা'তে (১০ সেপ্টেম্বর-১৯১২)। 'সন্ধিক্ষণ' থেকে শেষ কবিতাবলী অবধি সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যসৃষ্টির ধারায় 'ফুলের ফসল' এ দিক দিয়েও বিশেষ স্মর্তব্য।

'কুহু ও কেকা'র কবিতা-সংখ্যা সর্বসমেত ১১০; প্রথম কবিতা 'দুই সুর' কবির অন্যান্য বইয়ের নাম-ব্যাখ্যানমূলক কবিতারই সমধর্মী রচনা। 'বেণু ও বীণা'র 'আরম্ভে',—'ফুলের ফসল'-এর 'আমন্ত্রণী',—'কুহু ও কেকা'র 'দুই সুর',—'তুলির লিখন'-এর নামহীন প্রথম কবিতা ('সপ্ত-লোকের সাত মহলে তুলির লেখা লিখছে কে?'...),—'অভ্র-আবীরের' উৎসর্গ-পত্রে 'হাতে

যা দিতেছি তুলি—এ শুধু রঙীন ধূলি/ছ'মুঠা ডালিম-কুঁড়ি অস্ত্র-আবীর'—' ইত্যাদি রচনায় যথাক্রমে প্রতিটি গ্রন্থের যাথার্থ্য বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। পৃথক পৃথক কবিতা-সংগ্রহের নাম ব্যাখ্যানের এই প্রচেষ্টা থেকে তাঁর কবিমানসের শৃঙ্খলাপ্রীতিরই পরিচয় পাওয়া যায়। 'কুহু ও কেকা'তে কবি প্রথমেই জানিয়েছেন যে, বসন্ত ঋতুতে কুহু-ধ্বনির মন্ত্রে বন্দী মুকুল মুক্তি লাভ করে থাকে, আর, নববর্ষার আবির্ভাবে কেকা-ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে কাননে কদম্বের সৌরভ ছড়িয়ে পড়ে।

বনের কুহু, বনের কেকা,—কুহক-ভরা যুগ্ম রাগ,
দেয় গো বাঁটি' নিখিল মাঝে আনন্দেরই যজ্ঞ ভাগ!
অনাদি সুধা,—অনাদি সোম,—হয় না কেহ বঞ্চিত;
অনাদি সাম, অনাদি ঋক্ পূর্ণ করে বিশ্ব-যাগ।

কবির অন্তরে প্রকৃতির এই কুহু ও কেকা-ধ্বনির মূর্ছনা থাকে নিত্যজাগর। বসন্তে-বর্ষায় কবি উপলব্ধি করেন বিশ্বপ্রকৃতির প্রাণোন্মেষ ও প্রাণপ্রাচুর্যের চিরন্তন রহস্য। সেই সূক্ষ্ম, গভীর উপলব্ধির প্রেরণাতেই কবিতার জন্ম হয়। কবির ধ্যানে-কল্পনায় ইন্দ্রিয়লব্ধ অভিজ্ঞতার বস্তুসীমা পরিব্যাপ্ত হয়ে নব নব রূপে-ঝংকারে কাব্যে মূর্ত হয়ে ওঠে।[২৫]

হৃদয়ে মুহু কোকিল কুহু ময়ূর কেকা রব করে,
গহন প্রাণ-কুহর মাঝে স্বপন-ঘেরা গহ্বরে।
ধেয়ানে দোঁহে আরতি করি' ফুটাবে মেঘে জ্যোৎসনা
স্থিরিতি সাথে পীরিতি, আজি মন্ত্র-মধু মন্থরে।

'দুই সুর' কবিতাটির এই সংকেত থেকে মনে হয় যে, কবি তাঁর এ-বইয়ের কোনো কোনো কবিতায় 'গহন প্রাণ-কুহর মাঝে স্বপন-ঘেরা গহ্বরে'-র মধ্যে

২৫। 'কুহু ও কেকা'র টীকায় (৩য় সংস্করণ, ১৩৪২) চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখে গেছেন:—'যেমন বাহ্যপ্রকৃতিতে কুহু ও কেকা আছে, তেমনই মানসলোকেও ঐরূপ আনন্দ-বিষাদের লীলাপর্যায় নিরন্তর চলিতেছে। বিশ্বব্যাপারের সমস্ত অনুভূতি কবি-মানসকে স্পর্শ করে, এবং পর্যায়ক্রমে হর্ষে ও বিষাদে অভিভূত করে।...

...কিন্তু মানস-মুকুল অতি সুকোমল, প্রকাশ-ভীরু। ফুটিয়া উঠিবার আগেই যাহা ঝরিয়া যাইতে চায়, তাহারই মালা গাঁথিতে চাহেন কবি।'

আনন্দময় অশরীরী ধ্যান-ধারণা প্রকাশেরও চেষ্টা করেছিলেন। কবিতাটির উপান্ত স্তবকে এ-বিষয়ে আরো স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে—

> ফুটিতে যাহা ঝরিয়া পড়ে,—গাঁথিবে তারে সঙ্গীতে
> কামনা মুখি কনক-যূথী স্থূলের চূড়া লঙ্ঘিতে।
> মানস-লীনা বাজে যে বীণা শিখিবে তারি মূর্ছনা,—
> প্রকাশ যার আকাশ-তটে অযুত শত ভঙ্গীতে।

সূক্ষ্ম, সূক্ষ্ম, অশরীরী ইন্দ্রিয়ানুভূতির বৈচিত্র্য প্রকাশের আগ্রহ দেখা গেল এখানকার অনেক কবিতায়। প্রথম কবিতার এই মর্মে যে ঘোষণাটি লক্ষ্য করা গেছে, দ্বিতীয় কবিতা 'জ্যোৎস্না-মদিরা' যেন তারই সমর্থন। 'ফুলের ফসল'-এর আগের কবিতায় এ-রকম প্রয়াস বা প্রেরণা প্রায় অনুপস্থিত। কবি কীট্‌স্ যেমন অতি সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়-চেতনার সামগ্রীকেও কবিতার বাহনে সার্থক ভাবে প্রকাশ করেছেন, 'ফুলের ফসল'-এর পরবর্তী কাব্যধারায় সত্যেন্দ্রনাথেরও সে-রকম সিদ্ধি মাঝে মাঝে চোখে পড়ে। 'কুহু ও কেকা'র কয়েকটি কবিতায় এ-রকম প্রয়োগ অল্পবিস্তর সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। আগেকার কবিতায় বিভিন্ন অভিজ্ঞতার স্থূল বস্তুসীমা অতিক্রান্তির লক্ষণ বিরল। কিন্তু সমৃদ্ধি-পর্বের রচনায় চক্ষু-কর্ণের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিশেছে কবিকল্পনা। অর্থাৎ কাব্য যে কেবল বর্ণনা বা ব্যাখ্যান নয়, অথবা, চিন্তা এবং বিতর্কের ছন্দোবদ্ধ বিবৃতি মাত্র নয়,—এ সত্যবোধ উত্তরোত্তর তাঁর আচরণের সমর্থন পেয়েছে। এক অনুভূতি থেকে দেখা দিয়েছে ভিন্ন অনুভূতির সাদৃশ্য,—এক বস্তু থেকে জেগেছে বিচিত্র বস্তু-ছায়ার সম্ভাবনা! 'জ্যোৎস্না-মদিরা'তে তিনি লিখেছিলেন—

> স্ফুরিত ফুলের উতলা গন্ধে
> গাহে অন্তর কত না ছন্দে,
> আলোকে ছায়ায় প্রেমে সুষমায়
> ভুবনে বুলায় মদির মায়া।

প্রসিদ্ধ সমালোচক উইলিয়ম হ্যাজলিট্ সুন্দরের এই বিচিত্র সম্পর্কের স্থাপন-ব্যাপারটিকেই উৎকৃষ্ট কাব্যের বিশিষ্ট প্রেরণা বলে স্বীকার করেছিলেন। বৈচিত্র্যের এবং ঐক্যের এই আনন্দময় স্বীকৃতির নাম কবিকল্পনা—এবং কবিকল্পনার আন্তরিকতা ব্যতিরেকে শ্রেষ্ঠ কাব্য যে অসম্ভব,—বস্তুজগতের অভিজ্ঞতা কবিমানসের সূক্ষ্মদৃষ্টির ফলে রহস্যময় অসীমের অশেষ, অসংখ্য রূপে-

গুণে-শক্তিতেই যে বিচিত্র হয়ে ওঠে,—কাব্যের অন্তর্নিহিত গূঢ় এই ভূমাধর্মও যথার্থ রসিকের হৃদয়াধিগম্য![২৬] 'কুহু ও কেকা'র আরো কয়েকটি কবিতায় ভূমাগ্রহী এই কবিকল্পনারই লীলা দেখা যায়। কিন্তু মহাশক্তিমান্ রবীন্দ্রনাথের প্রভাবের মধ্যে বাস করে সে যুগে অন্যান্য বাঙালী কবিরা যেমন আপন আপন কল্পনার স্বাতন্ত্র্য সর্বত্র অক্ষুণ্ণ রাখতে পারেন নি, সত্যেন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছিল। 'কুহু ও কেকা'র 'শীতান্তে' কবিতাটি রবীন্দ্র-প্রভাবের এই রকম উদাহরণ হিসেবে স্মরণীয়। শীত-ঋতুর অবসানে 'সবুজের নবোন্মেষ' লক্ষ্য করে বসন্ত-সমাগমে কবি জানিয়েছিলেন—

> মন তবু আজি কয় এ উৎসব কিছু নয়,
> আমি আর নহিক ইহার
> সকল হাসির মাঝে আমি দেখিতেছি রাজে
> আজি শুধু কঙ্কালের হার।

এই কবিতার পরের অংশে কবির এই দুঃখ-ভাবনার প্রভাবে দেখা দিয়েছিল বিশেষ এক 'তরী'-রূপের কল্পনা। তাঁর জীবনের তরী নদীর চরে সংলগ্ন হতে দেখে সত্যেন্দ্রনাথ যেমন করুণ, বেদনাদিগ্ধ দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিলেন, রবীন্দ্রনাথের 'খেয়া' (১৯০৬) বইখানির প্রথম কবিতা 'শেষ খেয়া'তেও সেই রকম অনুভূতিরই প্রকাশ ঘটেছিল।

বিচ্ছেদ ও মৃত্যুভাবনার উল্লেখ সত্যেন্দ্রনাথের আগের বইগুলিতেও মাঝে মাঝে লক্ষ্য করা গেছে। 'ফুলের ফসল'-এর উল্লাসময় স্বপ্নালুতার মধ্যেও অভাবের ব্যাকুলতা আছে ('একের অভাব'),—অবসানের বেদনা আছে ('অবসান'),—অস্থির প্রাণস্রোতের বিষয়ে বিষণ্ণ স্বীকৃতি আছে ('স্রোতের ফুল')। 'কুহু ও কেকা'র মধ্যে সত্তার এই অপসরণের বেদনা আরো ঘন-ঘন দেখা দিয়েছিল। 'সুদূরের যাত্রী'তে—

> আজ আমি তোমাদের জগৎ হইতে
> চলে যাই ভাই,

২৬। It is strictly the language of the imagination : and the imagination is that faculty which represents objects not as they are in themselves, but as they are moulded by other thoughts and feelings, into an infinite variety of shapes and combinations of power.

—Lectures on the English Poets (On Poetry in General) : William Hazlitt.

অনেকের চেনা মুখ কাল যদি খোঁজ
দেখিবে সে নাই।

শুধু তাই নয়, মৃত্যুর পরে বিশ্বব্যাপী সৌন্দর্যের সঙ্গে তিনি একাত্মতা লাভ করবেন, এই কামনা ধ্বনিত হয়েছে 'কুহু ও কেকার' 'আবার' কবিতায়—

যেদিন আবার ফুটবে মুকুল
সেদিন আমায় দেখতে পাবে ;
ফাগুন হাওয়া বইলে ব্যাকুল
থাকবে দূরে কোন্ হিসাবে !
আসব আমি স্বপন ভরে,
গভীর রাতে ভুবন পরে ;
হাসব আমি জ্যোৎস্না সাথে,
গাইব যখন কোকিল গাবে !

'কুহু কেকা'র এই বিচ্ছেদ-বেদনামূলক কবিতাগুলির আলোচনা-সূত্রে জীবনের এই পর্বে সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যুশোকের কথা স্মরণীয়। তাঁর ১৯১১-১২ সালের রচনাতেই প্রথম মৃত্যু-ভাবনার বহুলতা দেখা দেয়। সে-সময়ে কালীচরণ মিত্রের বালিকা-কন্যা পুষ্পমালার মৃত্যু হয়। সত্যেন্দ্রনাথের মনে এই মৃত্যুটি যে বিশেষ ছায়াপাত করেছিল, 'কুহু ও কেকা'র 'ছায়াচ্ছন্না', 'সৎকারান্তে' এবং 'ছিন্নমুকুল'—এই তিনটি কবিতাতেই তার প্রমাণ আছে। শেষের লেখাটিতে কবির স্নেহ-মমতার আন্তরিক আকুলতা অকৃত্রিম কারুণ্যে রঞ্জিত হয়েছে—

সব চেয়ে যে ছোটো পীঁড়িখানি
সেইখানি আর কেউ রাখে না পেতে,
ছোটো থালায় হয়নাকো ভাত-বাড়া,
জল ভরে না ছোট্ট গেলাসেতে ;
বাড়ির মধ্যে সব চেয়ে যে ছোটো
খাবার বেলায় কেউ ডাকে না তাকে,
সব চেয়ে যে শেষে এসেছিল
তারি খাওয়া ঘুচেছে সব আগে।

'কুহু ও কেকা'তে 'শ্মশান-শয্যায় আচার্য্য হরিনাথ দে' নামে আর-একটি

কবিতা আছে। কিন্তু 'ছিন্নমুকুল'-এর মধ্যে মৃত্যু-বিচ্ছেদের যে আন্তরিকতা ফুটেছিল, অন্যত্র অনুভূতির সে-রকম সহজ সারল্য নেই। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের স্বভাবসিদ্ধ তথ্য-সমারোহের চাপে সে-সব ক্ষেত্রে মৃত্যু-শোক যেন পর্যুদস্ত হয়েছে! আচার্য হরিনাথ দে-র চিতাগ্নির মধ্যে তিনি দেখেছিলেন—'যাচ্ছে পুড়ে নূতন ক'রে সেকেন্দ্রিয়ার গ্রন্থশালা।'

এই অনুভাবনাও কবিকল্পনার দান বটে! স্রষ্টার সৃজনী-কল্পনার বিশেষত্বের কথা কোলরিজ যে-ভাবে ব্যাখ্যা করে গেছেন, এখানে স্বতঃই সে প্রসঙ্গ মনে পড়ে। উচ্চ-কোটির কাব্যে দেখা যায় কল্পনার বিশেষ একরকম বহুগ্রাহিতা। কবিকর্মের গহনে সক্রিয় থাকে বিশ্লেষণ ও সমন্বয়ের পারস্পরিক স্বতঃস্ফূর্ততা। জীবনের বিশেষ কোনো অভিজ্ঞতার সূত্র ধরে কবি তাঁর কথা এবং চিত্র, ধ্বনি এবং ব্যঞ্জনা, সংকেত এবং জিজ্ঞাসা সঞ্চার করে থাকেন বটে, কিন্তু সমুদয় বিচিত্রতার লক্ষ্য হোলো ঐ বিশেষ অভিজ্ঞতাটিকেই বৃহৎ পরিধির মধ্যে স্থাপন করে সর্বাতিশায়ী, সর্বাত্মক এক গূঢ় ঐক্যবোধ উদ্রিক্ত করা! কবিকল্পনা শুধু শিথিল-সংযুক্ত স্মৃতিমালা নয়,—বিদ্যালব্ধ তথ্যপুঞ্জ নয়,—প্রমার্জিত সাদৃশ্যজ্ঞানও নয়! পশ্চিমের সাহিত্য-ব্যাখ্যাতারা যে Esemplastic Imagination-এর শ্রেয়ত্ব স্বীকার করেছেন,—কাব্যে বিচিত্র বস্তুজ্ঞানের মধ্যে সর্বাত্মক রসদৃষ্টি-ঘটিত সে-রকম ঐক্যোপলব্ধির সাক্ষাৎ পাওয়া যায় কেবল অল্প কয়েকটি ক্ষেত্রে। 'আচার্য্য হরিনাথ দে'র মৃত্যু উপলক্ষে তিনি যে ছোট কবিতাটি লিখেছিলেন, তাতে বেশ কিছু তথ্য আছে বটে, কিন্তু মৃত্যুর সত্যবোধ নেই,—মৃত্যুর বিশাল গভীর অন্ধকারের সঙ্গে কবির সত্যদৃষ্টির সমন্বয় ঘটেনি। অবশ্য, মৃত্যু-প্রসঙ্গে লেখা সমস্ত সার্থক কবিতার পক্ষেই যে এই জাতীয় ভূমাবোধ সর্বত্র স্বীকার্য, তা' নয়। ব্যক্তি-সম্পর্কের সুখ-দুঃখের কয়েকটি স্মৃতিকথা নিয়েও সার্থক কবিতার সম্ভাবনা স্বীকার্য। 'ছিন্ন মুকুল' কবিতাটিতে তাই ঘটেছিল। কিন্তু এখানে এই কথাই বিশেষ ভাবে স্মরণীয় যে, এই তথ্য-লোলুপতার তাড়নাতেই সত্যেন্দ্রনাথ রসের বদলে জ্ঞানের অভিমুখে অধিক আকৃষ্ট হয়েছিলেন। নিজের বস্তুবোধ-সীমিত স্মৃতিলোকে এবং জগতের বিভিন্ন গ্রন্থের জ্ঞানলোকে ভ্রমণ করেই তিনি যেন বেশি কালক্ষেপ করে গেছেন। হরিনাথ দের চিতাগ্নি দেখে তাঁর মনে পড়েছিল জগতের আরো কোনো কোনো পণ্ডিতের কথা,—বহু বিদ্যার বহু ধারক ও বাহকের প্রসঙ্গ! ফলে, কবিকল্পনা যেন অন্তর্হিত হয়েছিল।

দেখা দিয়েছিল বিদ্বান্ সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের তথ্যজ্ঞান, পাণ্ডিত্য, ইতিহাস-স্মৃতি! সৃজনী-কল্পনার শূন্যস্থান পূরণ করেছিল অবিমিশ্র তথ্যস্মৃতি। এই শেষোক্ত মনোধর্মকেই কোল্‌রিজ বলেছিলেন Fancy।[২১] 'কুহু ও কেকার' হরিনাথ দে-সম্পর্কিত কবিতাটি থেকে সত্যেন্দ্র-কাব্যের এই 'আকল্পনা' (fancy) লক্ষণের একটি দৃষ্টান্ত তুলে দেওয়া যেতে পারে—

> একটি চিতায় পুড়ছে আজি আচার্য আর পুড়ছে লামা,
> প্রোফেসার আর পুড়ছে ফুঙি, পুড়ছে শমস-উল্-উলামা।
> পুড়ছে ভট্ট সঙ্গে তারি মৌলবী সে যাচ্ছে পুড়ে,
> ত্রিশটি ভাষার বাসাটি হায় ভস্ম হ'য়ে যাচ্ছে উড়ে।
> একত্রে আজ পুড়ছে যেন কোকিল, 'কুকু', বুলবুলেতে,—
> দাবানলের একটি আঁচে নীড়ের পিঠে পক্ষ পেতে,
> পড়ছে ভেঙে চোখের উপর বর্তমানের বাবিল-চূড়া,
> দানেশমন্দী তাজ সে দেশের অকালে আজ হচ্ছে গুঁড়া।

মানুষের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যও যে নশ্বর,—অশেষ বিদ্যার অধিকারী যিনি, চিতাগ্নিতে তিনিও যে নিশ্চিহ্ন হয়ে যান,—সে কথা ভেবে অথবা সে দৃশ্য দেখে কবিমানসের গূঢ়স্রোতে সত্যিই গভীর কোনো আলোড়ন ঘটেনি। 'ত্রিশটি ভাষার বাসাটি হায় ভস্ম হয়ে যাচ্ছে উড়ে।'—এই উক্তির মধ্যে মৃত্যুর গাম্ভীর্য নেই। আছে শুধু পদ্যকারের প্রদক্ষতা (virtuosity of a versifier)। বিভিন্ন ভাষায় প্রচলিত, পণ্ডিত-বাচক বিভিন্ন শব্দ এই উদ্ধৃতির প্রথম স্তবকে পর পর সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে—আচার্য (সংস্কৃত), লামা (তিব্বতী), প্রোফেসার (য়ুরোপীয়), ফুঙি (বর্মী), শমস্-উল্-উলেমা (আরবী), ভট্ট (বৈদিক), মৌলবী (আরবী-ফার্শী)! টীকাকার চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'কোকিল-কুকু-বুলবুল'-অংশের ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, কোকিল ভারতীয় বাণীর প্রতীক, কুকু য়ুরোপীয় বাণীর প্রতীক, বুলবুলি পারস্যের বাণীর প্রতীক; আচার্য হরিনাথ দে-র মধ্যে

২১। 'It (Imagination) dissolves, diffuses, dissipates in order to recreate; or where this process is rendered impossible, yet still at all events it struggles to idealize and to unify. It is essentially vital, even as all objects (as objects) are essentially fixed and dead.

Fancy, on the contary, has no other counters to play with, but fixities and definities, The Fancy is indeed no other than a mode of memory emancipated from the order of time and space.'—Biographia Literaria.

দেখা গিয়েছিল এই তিন বিহঙ্গের সমাবেশ। সেমেটিক পুরাণে কীর্তিত বহু ভাষার উৎপত্তির হেতু বাবিল-চূড়ার (আরব দেশে ইউফ্রেটিস নদীর পূর্ব তীরে ব্যাবিলনে) মতো বহু ভাষায় অভিজ্ঞ এই পণ্ডিতের মৃত্যুতে পৌরাণিক বাবিল-চূড়া যেন পুনর্বার চূর্ণ হয়ে গেল! জ্ঞানীশিরোমণি ('দানেশমন্দী তাজ') হরিনাথ দে'র মৃত্যুতে কবির আসল শোকানুভূতি-কে উপেক্ষা করে এখানে দেখা দিয়েছে তথ্যজ্ঞানী পদ্যলেখকের বৃথা শব্দোল্লাস!

পিতামহ অক্ষয়কুমার দত্তের সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধদিনে লেখা '১৪ই জ্যৈষ্ঠ' কবিতাটিতেও মৃত্যুদিনের অর্ঘ্য-নিবেদন উপলক্ষে অক্ষয়কুমারের বহু কীর্তির তালিকা দিয়ে শেষ দুটি চরণে সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর নিজের মনোগঠনের পূর্বালোচিত বিশেষত্ব স্বীকার করেছিলেন—

হে আদর্শ জ্ঞানযোগী! হে জিজ্ঞাসু তব জিজ্ঞাসায়
উদ্বোধিত চিত্ত মোর;—গরুড় সে জ্ঞান-পিপাসায়।

অক্ষয়কুমার দত্তের এই আদর্শের অনুসাধক সত্যেন্দ্রনাথের আরো বহু কবিতায় তথ্য ও তত্ত্বের স্পৃহা যে রসধর্মের ওপর প্রতিপত্তি বিস্তার করেছিল, 'কুহু ও কেকা' থেকেই তার আরো দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে।

সূক্ষ্ম, কোমল ইন্দ্রিয়ানুভূতির কবিতা এবং বিচ্ছেদ-বেদনা-মৃত্যুবিষয়ক কবিতা,—এই দুই শ্রেণী ছাড়া 'কুহু ও কেকা'র তৃতীয় প্রসঙ্গ হোলো মহাজন-মহিমা। আচার্য হরিনাথ দে, অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ('সাগর-তর্পণ'), ঋষি টলষ্টয়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ('কবি-প্রশস্তি' ও 'অর্ঘ্য'), ভগিনী নিবেদিতা, রমেশচন্দ্র দত্ত ('দেশবন্ধু') ভারতবন্ধু উইলিয়ম ষ্টেড, ('বিশ্ববন্ধু') ইত্যাদি ব্যক্তির স্মৃতি-বন্দনামূলক অনেকগুলি রচনা এই বই-খানিতে সংকলিত হয়েছে। সত্যেন্দ্র-কাব্যের সামগ্রিক আলোচনায় পূর্ববর্তী 'বেণু ও বীণা'র 'মমতাজ' এবং 'হেমচন্দ্র',—উত্তরবর্তী 'অভ্র-আবীর'-এর 'কালীপ্রসন্ন সিংহ', 'রাজর্ষি রামমোহন', 'মহাকবি মধুসূদন', '৺দীনবন্ধু মিত্র', 'ডেভিড হেয়ার', 'আচার্য ত্রিবেদী', '৺গোখলে,' ইত্যাদি লেখাগুলি একই ধারার অন্তর্ভুক্ত হিসেবে স্মরণীয়। 'বেলাশেষের গান'-এ সংকলিত 'তিলক', 'কবি দেবেন্দ্র', 'কবি-পূজা' ও 'পরমায়' (রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে),—'বিদায়-আরতি'-তে প্রকাশিত 'বুদ্ধ-বরণ', 'গান্ধিজী' ইত্যাদি রচনাও এই একই ধারার ভিন্ন ভিন্ন উদাহরণ। 'কুহু ও কেকা'-তেই এই শাখাটির প্রথম অনুশীলন শুরু হয়েছিল।

উনিশ শতকে মধুসূদনের চতুর্দশপদী কবিতাবলীর মধ্যে কবি, শিল্পী ও অন্যান্য নেতৃ-বন্দনার দৃষ্টান্ত দেখা গিয়েছিল। তারপর, রবীন্দ্র-যুগের কবিদের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ সেন তাঁর পূর্ববর্তী এবং সমকালীন বহু কবির উদ্দেশে প্রীতি-শ্রদ্ধামূলক কবিতা লিখেছিলেন।[২৮] ঈশ্বর গুপ্ত থেকে শুরু করে বর্তমান শতকের সাম্প্রতিকতম কবি অবধি, অনেকের রচনাতেই কাব্য-প্রসঙ্গের এই বিশেষ শাখাটি অল্পবিস্তর অনুশীলিত হয়েছে। এই সব কবিতায় কবিদের বিশেষ এক সামাজিকতাবোধেরই প্রকাশ দেখা যায়। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত-ও তাঁর এই শ্রেণীর নানান্ কবিতায় অংশতঃ তাঁর এই সামাজিক দায়িত্বই পালন করেছেন। কিন্তু কয়েকটি ক্ষেত্রে নিরাবেগ কর্তব্যবোধের পরিবর্তে কবির ব্যক্তিসম্পর্ক-জনিত হৃদয়ানুরাগ বিচ্ছুরিত হয়েছে। অতএব, তাঁর এতৎপ্রাসঙ্গিক কবিতাবলীর উপশাখা-বিভাগের প্রচেষ্টায় দুটি পৃথক শ্রেণী-পরিকল্পনা অসংগত নয়। এক শ্রেণীর রচনায় কেবল উদ্দিষ্ট ব্যক্তির কীর্তিমালার সুনিপুণ উল্লেখ,—তথ্যবৈচিত্র্যের সমারোহ,—মুখ্যতঃ তালিকা এবং বর্ণনা। আর দ্বিতীয় শ্রেণীতে দেখা যায় কবির আপন অন্তরাভি-ব্যক্তির আগ্রহ—ব্যক্তিবিশেষকে উপলক্ষ করে কবিমানসের আত্মপ্রক্ষেপনের সৌন্দর্য। 'কুহু ও কেকা'র 'কবি-প্রশস্তি' শেষোক্ত শ্রেণীর! রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম শ্রদ্ধা-ভক্তির পরিচয় এই কবিতাটির ছত্রে ছত্রে ধ্বনিত হয়েছে। তবে, কবি-স্বভাবের দিক থেকে তাঁর যে বিন্যাবৈশিষ্ট্যের কথা আগে বলা হয়েছে, সে লক্ষণ এই লেখাটির মধ্যেও অপ্রকট নয়। দ্বিতীয় স্তবকে তিনি লিখেছিলেন—

> কমলে তুমি জাগালে প্রাতে, নিশীথে নিশিগন্ধা,
> পূর্ণা তিথি মিলালে আনি' রিক্তা মাঝে নন্দা![২৯]

তাঁর অনুরাগ আর আগ্রহের চাঞ্চল্য এ কবিতার ছন্দে, শব্দে, ঝংকারে বহুধা অভিব্যক্ত। অন্যত্র, তিনি ঋষি টলস্টয়ের সঙ্গে বুদ্ধদেবের সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছিলেন,—সাহিত্য-পরিষদে রমেশচন্দ্র দত্তের অভ্যর্থনা উপলক্ষ্যে

২৮। এই গ্রন্থের ৭৩-এর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

২৯। ফলিত জ্যোতিষে 'রিক্তা' হোলো চতুর্থী, নবমী, ও চতুর্দশী তিথি। 'নন্দা' মানে প্রতিপদ, ষষ্ঠী, একাদশী। 'রিক্তা মাঝে নন্দা' — চতুর্দশী ও প্রতিপদের মধ্যবর্তী পূর্ণিমা তিথি। 'কুহু ও কেকা'র 'লব্ধ-দুর্লভ' কবিতায় 'জীবনে এসেছ পূর্ণা! রিক্তা-তিথি-শেষে' তুলনীয়।

'দেশবন্ধু' কবিতায় লিখেছিলেন, 'বেদের সরস্বতী এসেছেন লইয়া বরণ-ডালা',—রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে লেখা 'কুহু ও কেকা'র আর একটি কবিতায় ('অর্ঘ্য') কৃত্তিবাস ও কবিকঙ্কণ-মুকুন্দরামের প্রসঙ্গ দিয়ে কথা আরম্ভ করে নবদ্বীপের মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের কথা স্মরণ করে অবশেষে বলা হয়েছিল—

তোমার যোগ্য কি দিব অর্ঘ্য ?
কোথা পাবো মোরা ভাবি গো তাই ;—
জনক রাজার মত কোথা পাব
হিরণ-শৃঙ্গ হাজার গাই !
ব্রহ্মবিদের তুমি বরেণ্য,—
কাব্য-লোকের লোচন রবি !
স্বর্গে বসিয়া আশীষিছে তোমা,
ব্রহ্মবাদিনী বাচক্নবী ।[৩০]

'নিবেদিতা'-য় স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যা Miss Margaret Nobles সম্পর্কে লেখা হয়েছিল—

প্রসূতি না হ'য়ে কোলে পেয়েছিল পুত্র যশোমতী ;
তেমনি তোমারে পেয়ে হৃষ্ট হয়েছিল বঙ্গ অতি,—
বিদেশিনী নিবেদিতা !

জ্যোতিষ ও গ্রহ-নক্ষত্র বিষয়ে তাঁর বিশেষ আগ্রহের পরিচয় আছে 'জ্যোতির্মণ্ডল' কবিতাটিতে। বাংলায় রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ, ইত্যাদি মনীষীর সমাবেশকেই তিনি বলেছেন 'জ্যোতির্মণ্ডল'। ইতিহাস, পুরাণ, জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং জ্যোতিষের বহু তথ্যানুষঙ্গ ছড়িয়ে আছে তাঁর বহু কবিতার বিভিন্ন অংশে। অন্তরাবেগ যেখানে তীব্র নয়, সেরকম ক্ষেত্রে কবি-মানসের বৈদগ্ধ্য প্রকাশিত হয়েছে ক্লাসিক শৃঙ্খলায়, এবং মাঝে মাঝে তথ্য-পরিবেষণে অতি-মনোযোগ বশতঃ এই শব্দসচেতন কবিও শব্দের প্রয়োগে অসতর্কতার দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন।[৩১] আবার, হৃদয়াবেগ উদ্দীপিত হবার

৩০। বাচক্নবী — গাগা।

৩১। পূর্বোদ্ধৃত 'অর্ঘ্য' কবিতায় ব্যবহৃত 'গাই' শব্দটা বিশেষ শ্রুতিপীড়ক।

সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সংযম এবং শৃঙ্খলা যেন বিচলিত হয়েছে। 'কবি-প্রশস্তি'-তে রোম্যান্টিক আবেগের প্রাবল্য গোপন থাকে নি। প্রথম স্তবকের দ্বিতীয় চরণে পর-পর তিনটি অনুজ্ঞা-বোধক ক্রিয়াপদের ব্যবহার এবং অন্যত্র শব্দ ও চরণাংশের পৌনঃপুনিক প্রয়োগ এইরকম আবেগ-প্রাবল্যেরই উদাহরণ। রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে এই রকম হৃদয়ানুভূতির জোরেই তিনি লিখেছিলেন—

> গভীর তব প্রাণের প্রীতি' বিপুল তব যত্ন.
> দিশারি! তুমি দেখাও দিশা, ডুবারি। তোলো রত্ন!
> যে তানে টলে শেষের ফণা
> পেয়েছ তুমি তাহারি কণা,—
> অমৃত এনে দিয়েছ শ্রেনে,—নহে সে নহে প্রত্ন।

শেষ নাগ এবং অমৃত সম্বন্ধে এই উল্লেখের মধ্যে এখানে পুরাণের ছায়া পড়েছে। তাঁর মেধা আর মননের এই প্রত্ননিষ্ঠা এখানে হৃদয়ের সানন্দ প্রগলভতার ছন্দে সু-বাহিত হয়েছে।

'কুহু ও কেকা'র চতুর্থ প্রসঙ্গ-শ্রেণীর মধ্যে স্বজাতিপ্রীতি ও দেশাত্মবোধক কবিতাগুলির উল্লেখ করা যায়। দীন-দরিদ্র-নিপীড়িত মানুষের প্রতি মমতা প্রকাশ এবং স্বদেশ ও স্বজনের কল্যাণকামনা তাঁর 'সন্ধিক্ষণ'-এ এবং পরের বইগুলিতেও বর্তমান। 'শূদ্র', 'মেথর', 'পথের স্মৃতি,' 'দুর্ভিক্ষে' 'হাহাকার', 'নফর কুণ্ডু', 'বন্দরে, 'ছেলের দল', 'আমরা', 'গান' ('মধুর চেয়েও আছে মধুর') ইত্যাদি রচনাতে এই ধারার চিহ্ন আছে। তথ্যবিপুলতার দিকে তাঁর যে আগ্রহ এই পর্বের অন্যান্য কবিতায় দেখা গেছে, আলোচ্য বিভাগেও তার অভাব নেই। এসব রচনাতেও তিনি যথাসম্ভব ইতিহাস-পুরাণাদির তথ্য পরিবেষণে বিরত থাকেন নি। 'আমরা' কবিতায় বাংলা ও বাঙালীর প্রশস্তিসূত্রে 'দশাননজয়ী রামচন্দ্রের প্রপিতামহের উল্লেখ ঘটেছে। শুধু তাই নয়,—বিজয়সিংহ, মগ মোগল, চাঁদপ্রতাপ, কপিল, অতীশ দীপঙ্কর, পক্ষধর মিশ্র, জয়দেব, বিটপাল, ধীমান, শ্রীচৈতন্য, বিবেকানন্দ,—'বরভূধরের ভিত্তি', শ্যাম কম্বোজের 'ওঙ্কার-ধাম' ইত্যাদি কর্তা ও কর্ম, সৃষ্টি ও স্রষ্টা মাত্র চৌষট্টি চরণের এই একটি কবিতার মধ্যেই স্বচ্ছন্দে তালিকাভুক্ত হয়েছে! সেকালের সাম্প্রতিক ঘটনা অবলম্বনে লেখা অনুরূপ দেশপ্রেম ও মানবিকতার কবিতার মধ্যে পূর্বোক্ত 'বন্দরে' ও 'ছেলের দল' স্মরণীয়। সে সময়ে (১৯১১-১২

সাল) বৈজ্ঞানিকী ও কারিগরী শিক্ষার জন্ত বাঙালী ছাত্রসম্প্রদায়ের মধ্যে য়ুরোপ-মার্কিন মুলুকে সমুদ্র-যাত্রার যে উৎসাহ ছড়িয়ে পড়েছিল, এই দুটি লেখাতেই সেই উৎসাহ-উদ্দীপনার বর্ণনা আছে। বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনের সময় থেকে দেশের যুব-সম্প্রদায়ের মধ্যে জ্ঞানার্জনে এবং কর্মকুশলতায়, সর্বপ্রকারে স্বাধীনতা অর্জনের আগ্রহ ছড়িয়ে পড়ে। সমুদ্রযাত্রার বিরুদ্ধে অভ্যস্ত সংস্কার উপেক্ষা করে শ্রীবৃদ্ধির শপথ নিয়ে জ্ঞানার্থী ছাত্রেরা গেলেন সমুদ্র-পারে। একদিকে, বিদেশের জ্ঞান আহরণের অঙ্গীকার, অন্তদিকে স্বদেশ ও স্বজাতির মর্যাদা রক্ষার কঠিন পণ,—বিদেশযাত্রী ছাত্রসম্প্রদায়ের এই মনোভাব স্মরণ করে সত্যেন্দ্রনাথ লিখলেন—

দেবযানীরে রাখব খুসী ব্রহ্মচর্য ছাড়ব না ;
আপনজনে ভুলব না রে পরের আদর কাড়ব না ;

পাঁজি পুঁথি রইল মাথায় জ্ঞানের বাড়া নেইক বল,
যৌবনের এই শুভক্ষণে বেরিয়ে পড় বন্ধুদল !
হিন্দু যখন সিন্ধুপারে করলে দখল যবদ্বীপ
কোথায় তখন ভট্টপল্লী কোথায় ছিলেন নবদ্বীপ ?

কোথায় ছিল জাতির তর্ক—অর্কফলার আন্দোলন—
যেদিন রুদ্র সমুদ্রেরে বিজয় দিল আলিঙ্গন ?
মেক্সিকোতে হ'ল যেদিন মঠপ্রতিষ্ঠা রাম-সীতার—
বিধান দিল কোন্ মনীষী ?—খোঁজ রাখে কি পুরাণ তার ?

উড়ুপ-যোগে দু'দিন আগে হিন্দু যেত সিন্ধুপার,
মিশর, পেরু, রোম, জাপানে ছুটত নিয়ে পণ্যভার ;
তাদের ধারা লুপ্ত হবে ? থাকবে শুধু পঞ্জিকা ?
ধানের আবাদ উঠিয়ে দিয়ে ফসল হ'ল গঞ্জিকা ?

'কুহু ও কেকা'র আর-এক শ্রেণীর কবিতায় বিশেষ ক'টি স্থান বা দৃশ্য-মহিমার কথা এবং প্রাকৃতিক শোভা-সৌন্দর্যের বর্ণনা রয়েছে। ঋতু-বর্ণনা বিষয়ের কবিতাগুলিও এই শ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত। 'মধুমাসে', 'পাখীর গান', 'গ্রীষ্মচিত্র', 'গ্রীষ্মের সুর', 'কনক-ধুতুরা', 'চাতকের কথা', 'ঝোড়ো হাওয়ায়', 'বর্ষা', 'প্রাবৃটের গান', 'ভাদ্র-শ্রী', 'কাশ-ফুল', 'জোনাকী',

'জবা', 'ভুঁই চাঁপা', 'গঙ্গার প্রতি', 'শোণ নদের প্রতি', 'বারাণসী', 'হিমালয়াষ্টক', 'কাঞ্চন-শৃঙ্গ', 'মেঘলোকে', 'চূড়ামণি', 'দার্জিলিংয়ের চিঠি', 'সিংহল', 'সিদ্ধিদাতা', 'ওঙ্কার-ধাম', 'পদ্মার প্রতি', 'পাগলা ঝোরা' ইত্যাদি কবিতাও এই একই শ্রেণীর মধ্যে গণ্য। প্রকৃতির রূপ অথবা মানুষের কীর্তি,—বিষয় যে অঞ্চল থেকেই নেওয়া হোক না কেন, কবির যে বিদ্যাবিলসন-স্বভাবের উল্লেখ আগেই করা হয়েছে, সে বৈশিষ্ট্য এ-অঞ্চলেও বিদ্যমান। প্রকৃতি-সম্পর্কিত কবিতায় প্রকৃতি সর্বত্র আপন রূপে-রসে সর্বধারিণী, শ্রীময়ী হয়ে ওঠেন নি; তার বদলে বরং সত্যেন্দ্রনাথের ইতিহাস-পুরাণের নানা জ্ঞানই দেখা দিয়েছে! ভারতচন্দ্রের 'গঙ্গাষ্টক' ও 'নাগাষ্টক' যেমন সংস্কৃত-প্রভাবিত রচনা, সত্যেন্দ্রনাথের 'হিমালয়াষ্টক'ও সেই রকম। 'বারাণসী'-তে তথ্যপ্রিয় কবির চোখে বারাণসীর দৃশ্য-শোভা নিমেষ মাত্র দেখা দিয়েই সহসা অন্তর্হিত হয়েছে। প্রথম স্তবকে যাত্রীদের বিস্ময়-কোলাহলের মধ্যে বারাণসী-দর্শনের সেই চকিত অভিজ্ঞতা আছে—

এ পারে সবুজ বজরার ক্ষেত, ও পারে পুণ্যপুরী,
দেবের টোপর দেউলে দেউলে কাঁপিছে কিরণ-ঝুরি;
শারদ দিনের কনক-আলোকে কিবা ছবি ঝলমল,—
অযুত যুগের পূজা-উপচার,—হেম-চম্পকদল!
আধ-চাঁদখানি রচনা করিয়া গঙ্গা রয়েছে মাঝে,
স্নেহ-সুশীতল হাওয়াটি লাগায় তপ্ত-দিনের কাজে।

কিন্তু এর পরের অংশে স্বল্পকালের এই দৃষ্টিসুখ আচ্ছন্ন হয়ে গেছে ইতিহাস এবং পুরাণের অবাঞ্ছিত তথ্য-প্রাচুর্যে। বহু-স্মৃতিধর কবি লিখেছেন—

অগ্নিহোত্রী মিলেছে হেথায় ব্রহ্মবিদের সাথে,
বেদের জ্যোৎস্না-নিশি মিশে গেছে উপনিষদের প্রাতে।
খ্যাত যাঁর নাম শাক্যমুনির জাতকে, গাথায় গানে।
এই সেই কাশী ব্রহ্মদত্ত রাজা ছিল এইখানে,
যাঁর রাজত্ব-সময়ে বুদ্ধ জন্মিল বারবার
ন্যায়-ধর্মের মর্যাদা প্রেমে করিতে সমুদ্ধার।

'শোণ নদের প্রতি'তেও কবিমানসের অনুরূপ স্মৃতিমালা দেখা গেছে। 'সিংহল' কবিতাটিতেও অনুরূপ ব্যাপার ঘটেছে। প্রথমত Scott-এর

Young Lochinvar-এর ছন্দের কথা উল্লেখ করে তিনি নিচে সেই ছন্দেরই আনুগত্যের কথা স্বীকার করেছেন। তারপর রামায়ণের লঙ্কা-মহিমার এবং জনশ্রুতি-কীর্তিত বাঙালী বিজয়সিংহের সিংহলাভিযানের গ্রন্থজ্ঞানলব্ধ, কুহেলি-কল্পিত যে ছবি তিনি এঁকেছেন, তাতে প্রত্যক্ষতার স্বাক্ষর নেই,—আছে ইতিহাস আর জনশ্রুতির সিঞ্চন!

> ওই বঙ্গের শেষ কীর্তির দেশ সৌরভময় ধাম!
> কাঠ্ শক্কর যার বল্কল-বাস, সিংহল যার নাম।
> যার মন্দির সব গম্ভীর, তার বিস্তার ক্রোশ দেড়;
> যার পুষ্কর-মেঘ পুষ্করণীর দশ ক্রোশ ঠিক বেড়।

—এই সুরম্য বর্ণনার মধ্যে 'কাঠ্ শক্কর যার বল্কল বাস'-অংশটি ধ্বনি-মুখ্য, রসবিমুখ নিষ্ফল এক চাতুর্যের দৃষ্টান্ত মাত্র![৩২] এও তাঁর কবি-স্বভাবের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। পাণ্ডিত্যবিলাস, নিরর্থক ধ্বনি-সর্বস্বতার দোষ, উৎকেন্দ্রিক কল্পনার দৌরাত্ম্য—এ সবই হলো যৌবনের দোষ। সত্যেন্দ্রনাথের কবিতায় যৌবনের দোষ এবং গুণ দুই-ই বিদ্যমান—এবং 'কুহু ও কেকা'-তেই তাঁর এই স্বভাবটি প্রথম স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হোলো। সুইনবার্নের কবিতায় ঠিক এই রকম দোষ-গুণ লক্ষ্য করে ম্যাথু আর্নল্ড, টেনিসন, ব্রাউনিং, কার্লাইল প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য-সাধকরা একবাক্যে সে-কাব্যের নিন্দা করেছিলেন। সুইনবার্ন সম্পর্কে ব্যবহৃত রবার্ট ব্রাউনিঙের 'a fuzz of words' উক্তিটি সত্যেন্দ্রনাথের বহু রচনা সম্পর্কে স্বতঃই মনে পড়ে। সমালোচক Lucas তাঁর কাব্যবিচার প্রসঙ্গে যৌবনের দোষ-গুণের উল্লেখ করে দোষের যে তালিকা দিয়েছেন, সত্যেন্দ্রনাথের কবিতা বিশ্লেষণে ঠিক অনুরূপ ত্রুটি-বিচ্যুতি-স্খলন-পতনের দৃষ্টান্ত চোখে পড়ে। তাঁর কাব্যসৃষ্টির বহু ক্ষেত্রে উৎকট শব্দের দৌরাত্ম্য এবং ছন্দের অতি-চাতুর্য হয়েছে রসের বিঘ্ন। ক্লাসিক কাব্যাদর্শের দিকে তাঁর আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও যৌবনসুলভ অবিবেচনা, হঠকারিতা এবং রসধ্যানহীন গ্রন্থপাঠ-প্রাচুর্যের ফলে কবিকর্মের যজ্ঞায়োজনের মধ্যে অবান্তর, লক্ষ্যহীন শব্দ, চিত্র ও পুরাণোল্লেখের নির্মম

৩২। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রণীত 'কুহু ও কেকা'র টীকায় 'কাঠ শক্কর যার বল্কল বাস'-অংশের ব্যাখ্যা :—'Ceylon moss নামে এক প্রকার শেওলা সমুদ্রকূলে জন্মে, সুস্বাদু বলিয়া লোক খায় এবং রীতি বা উপাস-গাছের ছাল সিংহলের আদিম অসভ্য জাতি বেদ্দারা পরিধান করে।'

অসুর প্রবেশ করেছে। 'ওঙ্কার-ধাম', 'শোণ নদের প্রতি', ইত্যাদি কবিতাতেও তাঁর অধ্যয়নবৈচিত্র্যের পরিচয় আছে। 'ওঙ্কার-ধাম' মানে কম্বোজ দেশের অঙ্কোর-ভট মন্দির।[৩৩] 'ওঙ্কার-ধাম সম্বন্ধে' চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন—

> 'সংস্কৃত নগর শব্দ কম্বোজ-ভাষায় উচ্চারিত হয় অনগর, তাহা হইতে অন্‌গর, অঙ্গর, অঙ্কোর শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে।
>
> ভট মানে মন্দির। অতএব অঙ্কোর-ভট মানে নগর-মন্দির। যখন ভাষাতত্ত্বের বিশেষ প্রসার হয় নাই, সেই সময়ে কবি সত্যেন্দ্রনাথ অঙ্কোর-ভট শব্দটিকে ওঙ্কার-ধামের অপভ্রংশ মনে করিয়াছিলেন।'

'শোণ নদের প্রতি' সম্পর্কে চারুচন্দ্র লিখে গেছেন—

> শোণ নদ অমরকণ্টক পর্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া পাটনার নিকটে গঙ্গার সঙ্গে সম্মিলিত হইয়াছে। অমরকোটে শোণ নদের নাম 'হিরণ্যবাহু'।
>
> যেহেতু এই নদের নাম হিরণ্যবাহু, সেই হেতু কবি কল্পনা করিতেছেন যেন কাহার বাহু বিস্তৃত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে এবং তাহাতে যে তরঙ্গভঙ্গ হইতেছে তাহা যেন সেই বাহুর স্ফুরণ।...

'শোণ নদের প্রতি'-র ছ'টি মাত্র চরণে প্রাচীন পাটলিপুত্র, গ্রীস, চন্দ্রগুপ্ত, ধর্মাশোক, গুরুগোবিন্দ ইত্যাদি বহু বিষয়ের উল্লেখ একত্র সম্মিলিত হয়েছে—

> প্রাচীন পাটলিপুত্র—পোষ্য প্রতিপাল্য সে তোমার,—
> মৌর্যমণি চন্দ্রগুপ্ত গ্রীকরাণী অঙ্কে দিল যার,—
> মৌর্যবংশ স্থাপয়িতা ; যে বংশের প্রতাপে মলিন
> সূর্যবংশ।—ধর্মাশোক যাহারে পালিত বহুদিন
> জগতের শ্রেষ্ঠ রাজা। ওগো শোণ! তোমারি শোণিতে
> পুষ্ট সে গোবিন্দসিংহ ;—গুরু নামে খ্যাত অবনীতে।

৩৩। 'So with his poetry—its essential faults and excellences are alike those of youth......His work has indeed the typical defects of youth—want of experience and judgement, of proportion and, restraint. It strives and cries; at times it screeches. Having few ideas, it grows monotonous: having little knowledge of the heart, it lacks compassion. Brilliant and hard, it reflects the light of life with a glare like polished brass; with all its music, it is often brass to the ear; it is sometimes in its taste, brass also to the tongue. There is about Swinburne a touch of the musical infant-prodigy.'—Ten Victorian Poets by F. L. Lucas (1940), p. 171.

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও স্থানমহিমামূলক এই সব কবিতায় একদিকে যেমন কবির ইতিহাস-পুরাণাদির পাণ্ডিত্যের চিহ্ন বর্তমান, অন্যদিকে এগুলিতে আবার বহুশ্রুত কয়েকটি বিদেশি শব্দের নিপুণ প্রতিশব্দীকরণের দৃষ্টান্ত রয়েছে। 'পাগলা-ঝোরা'-র 'বাকল ঝাঁঝি' (পুরোনো গাছের ছায়ায় জাত lichens) এবং 'বিনিসূতার রাস্নামালা' (পরগাছা ; orchid-এর সংস্কৃত নাম রাস্না ; পরগাছার লম্বা ছড়া ছড়া ফুল যেন বিনি-সূতার মালা)—'হিমালয়াষ্টকে'র 'মৃদু-পর্ণিকা' (fern), অর্বুদ (আবের ন্যায় পিণ্ডাকৃতি শিলাখণ্ড), 'ভৃগু' (পর্বতশিখর), 'নাগবেণী' (ফণী-মনসা) প্রভৃতি শব্দ 'কুহু ও কেকা'-তেই প্রথম ব্যবহৃত হয়। নতুন নতুন শব্দ প্রয়োগের দিকে একদিকে যেমন এই রকম আগ্রহ প্রকাশিত হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকাচার সম্বন্ধে.তাঁর অভিজ্ঞতার পরিচয়ও এই বইয়েতেই বিদ্যমান। যেমন—

[১] গুড়-চালেতে মিলিয়ে কারা ছিটায় গায়ে জলের ছাটে ?

—ভাদ্র শ্রী

['বিবাহের সময় তুক করিবার জন্য বরের গায়ে গুড়-মাখা চাউল ছিটাইয়া মারা হয়।'—চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের টীকা]

(২) প্রথম হাসির পান সুপারি কে দিল ওর মুখে ?

—প্রথম হাসি

['প্রাচীন কালে কাহাকেও কোন কর্মে প্রথম নিয়োগ করিতে হইলে তাহাকে পান-সুপারি দিয়া বরণ করা হইত। তাহা হইতে পান-সুপারি প্রথম নিয়োগের চিহ্ন হইয়াছে।'—ঐ]

[৩] সেই যে চটি—দেশী চটি—বুকের বাড়া ধন,
খুঁজব তারে, আন্‌ব তারে, এই আমাদের পণ ;
সোনার পিঁড়েয় রাখব তারে, থাকব প্রতীক্ষায়
আনন্দহীন বঙ্গভূমির বিপুল নন্দিগাঁয়।
রাখব তারে স্বদেশ-প্রীতির নূতন ভিতের পর
নজর কারো লাগবে নাকো, অটুট হবে ঘর।

—সাগর-তর্পণ

['নূতন বাড়ি নির্মাণ করিবার সময় কুলোকের কুদৃষ্টি প্রতিরোধের জন্য ছেঁড়া জুতো, মুড়ো ঝাঁটা ও ভাঙ্গা ঝুড়ি টাঙ্গাইয়া দেওয়া হয়। বিদ্যাসাগর-মহাশয় স্বদেশ-প্রীতির যে আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহা যাহাতে অটুট থাকে তাহার জন্য বিদ্যাসাগর-মহাশয়ের চটিজুতার মাহাত্ম্য সকলের মনে ঝুলাইয়া রাখিতে হইবে।'—ঐ]

[৪] চেতন-জড়ে না হয় হবে পাগড়ী-বিনিময় ;

—ঝোড়ো হাওয়ায়

['প্রাচীন ভারতের রীতি ছিল মাথায় পাগড়ী বদল করিয়া দুই ব্যক্তি পরস্পরের সহিত অচ্ছেদ্য বন্ধুত্ব স্থাপন করিত। টডের রাজস্থানে পাগড়ী বদলের অনেক দৃষ্টান্ত আছে। খাঁ দৌড়ান খাঁ ছিলেন মহারাজা জয়সিংহের 'পাগড়ী বদল ভাই'।—ঐ]

'কাঁটা-ঝাঁপ,' 'নাগপঞ্চমী', 'ফুল-সাজি', 'পাল্কীর গান' প্রভৃতি কবিতাতেও দেশীয় আচার-অনুষ্ঠান সম্পর্কে কবির বিশেষ আগ্রহের পরিচয় আছে।

রবীন্দ্রনাথের অনুসরণে লেখা 'বেণু ও বীণা'র 'মমতা ও ক্ষমতা', আকাশ-প্রদীপ' প্রভৃতি কাব্যকণিকার সঙ্গে 'কুহু ও কেকা'র 'শূন্যের পূর্ণতা'র কিছু সাদৃশ্য আছে। কিন্তু রবীন্দ্র-প্রভাবের উজ্জ্বলতর দৃষ্টান্তগুলির মধ্যে 'কুহু ও কেকা'র অন্য কয়েকটি কবিতাই বেশি স্মরণীয়। 'শীতান্তে' কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথের 'খেয়া'র ক্ষীণ ছায়া পড়েছে। সে কবিতাটিতে তো বটেই,— তা'ছাড়া 'লব্ধ-দুর্লভ, 'প্রিয়-প্রদক্ষিণ, 'তুমি ও আমি', 'মধুমাসে', 'অবগুণ্ঠিতা', 'অকারণ' ইত্যাদিতেও রবীন্দ্রনাথের মনন ও কল্পনার বিভিন্ন সাদৃশ্যচিহ্ন বর্তমান। প্রথম তিনটি কবিতা থেকে পর্যায়ক্রমে এ-রকম সাদৃশ্যের কয়েকটি নিদর্শন দেখা যেতে পারে—

'লব্ধদুর্লভ' কবিতাটির শেষ দুই স্তবকে বলা হয়েছিল—

স্বপ্নে ছিলে স্বর্গে ছিলে মগ্ন পারিজাতে,
অতনু আভাস ছিলে, ছিলে কল্পনাতে ;
আজ একেবারে
মর্তে এলে মূর্তি ধরে আমারি দুয়ারে !
মুগ্ধ মোরে করেছ গো মুগ্ধ চোখে চাহি'—
ধুয়ে মুছে দেছ গ্লানি, তাই সখী গাহি
বন্দনা তোমারি,
তব প্রেমে মণিহার পরেছে ভিখারী।

রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী'-র (প্রথম প্রকাশ : ১৮৯৪) 'মানস-সুন্দরী', এবং 'চিত্রা'র (প্রথম প্রকাশ : ১৮৯৬) 'প্রেমের অভিষেক', এই দুটি লেখার

মূল ভাব থেকেই তাঁর 'লব্ধ-দুর্লভে'র ধ্যান! 'একখানি মধুর মুরতি'র ধ্যানে রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন—

সেই তুমি
মূর্তিতে কি দিবে ধরা? এই মর্ত্যভূমি
পরশ করিবে রাঙা চরণের তলে?
অন্তরে বাহিরে বিশ্বে শূন্যে জলে স্থলে
সর্ব ঠাঁই হতে সর্বময়ী আপনারে
করিয়া হরণ—ধরণীর একধারে
ধরিবে কি একখানি মধুর মুরতি?

বিশ্বসৌন্দর্যের মধ্যে মানস-সুন্দরীর এই পরমা ব্যাপ্তি 'সোনার তরী', চিত্রা' প্রভৃতি বইগুলির নানা কবিতায় ধ্বনিত হয়েছে। জীবন-দেবতার প্রেমমহিমা স্মরণ করে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'প্রেমের অভিষেক' কবিতায় লিখেছিলেন—

নিত্য মোরে আছে ঢাকি
মন তব অভিনব লাবণ্য বসনে।
তব স্পর্শ তব প্রেম রেখেছি যতনে,
তব সুধাকণ্ঠবাণী, তোমার চুম্বন
তোমার আঁখির দৃষ্টি, সর্ব দেহমন
পূর্ণ করি;

সত্যেন্দ্রনাথের 'লব্ধ-দুর্লভ' তেমনি তাঁরই আপন 'বাঞ্ছিত নিধি! সাধনার ধন!' 'মলিন ধূলির কোলে' গ্লানিহীন জ্যোৎস্নার মতো তাঁর আবির্ভাব! তিনি কবির নিঃসঙ্গতা দূর করেন,—তিনি 'সহজ গৌরবে' কবিচিত্তে অধিষ্ঠিতা হন। তাঁর অমৃত-স্পর্শে কবির মনে জাগে সর্বাত্মক আত্মীয়তার সুধানুভূতি (সপ্তম স্তবক স্মরণীয়); কবি অনুভব করেন, 'মানসী দিয়েছে দেখা মানুষের দেশে' (নবম স্তবক)! শুধু তাই নয়,—'তব প্রেমে মণিহার পরেছে ভিখারী'! রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'প্রেমের অভিষেক'-এ কতকটা এই কথাই লিখেছিলেন—

তুমি মোরে করেছ সম্রাট। তুমি মোরে
পরায়েছ গৌরব-মুকুট।

সত্যেন্দ্রনাথের এই 'লব্ধ-দুর্লভ' কবিতাটিতে বিশ্বপ্রকৃতির সৌন্দর্য এক নারী-মূর্তির রূপক আশ্রয় করে গভীর ধ্যানের সামগ্রী হয়ে উঠেছে। সেই

ধ্যানে ধ্যানস্থ হয়ে তাঁর মনে হয়েছিল যে, মর্তের সৌন্দর্য ইন্দ্রিয়ের অধিগম্য বটে, কিন্তু তা' অনির্বচনীয় অরূপেরই সংকেত! রূপের সঙ্গে অরূপের, ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে অতীন্দ্রিয়ের এই অঙ্গাঙ্গিসম্মেলনের উপলব্ধি সত্যেন্দ্রনাথের তথ্য-পাণ্ডিত্য-সংবাদ-ভূয়িষ্ঠ কাব্যপ্রবাহের মধ্যে পৃথক একটি দ্বীপের মতো বিরাজমান। এই সূক্ষ্ম-গভীর অনুভূতির রাজ্য তাঁর নিজস্ব স্বভাবের এলাকা-ভুক্ত নয়। এখানকার ভাষাতেও সত্যেন্দ্রীয় শব্দ-বিশিষ্টতার চিহ্ন নেই। এখানকার গভীর ভাবের বাহক হয়েছে সে যুগের রবীন্দ্র-কাব্যের ব্যঞ্জনাময় তৎসম শব্দ,—সাধু ক্রিয়াপদ,—'আনন্দ', 'অমৃত,' 'মাধুরী,' 'নীড়', 'সহজ' (সহজ গৌরবে), 'নিস্ফল সন্ধান', 'স্বপ্ন', 'স্বর্গ', 'আভাস', 'কল্পনা' ইত্যাদি রবীন্দ্রনাথেরই ব্যবহৃত বহুশ্রুত শব্দমালা। অথচ 'কুহু ও কেকা'র অন্যান্য প্রসঙ্গের কবিতায় সত্যেন্দ্রনাথের অন্যতর শব্দরুচির নিদর্শন ছড়িয়ে আছে। 'নোল' ('তুমি ও আমি'), 'রুখু' ('কাশফুল'), 'আদুল', 'পাটা', 'হাটুরে', 'চাঁছি', 'হাতের পোঁছা', 'মাথায় পুঁটে', 'পোড়ো ভিটের পোতা', 'ফ্যানসা ভাত' (পাল্কীর গান), 'খাটো, 'দিল' ('মুগ্ধা'), 'সেঁাতা' (ভুঁই চাঁপা) ইত্যাদি অজস্র এবং সুপরিচিত সত্যেন্দ্রীয় শব্দের কোনো চিহ্ন নেই এই কবিতায়।

'প্রিয়-প্রদক্ষিণ' :

'প্রিয়ার ও তনু অতনু সে কোন্ দেবতার মন্দির'—প্রেমের শারীর আকর্ষণের মধ্যেই জন্ম-জন্মান্তরের স্মৃতির পুনরুজ্জীবন,—'কত জনমের মূর্ছনা তাতে মূর্ছিত কত স্মৃতি'—এই হোলো 'প্রিয়-প্রদক্ষিণ' কবিতাটির মূল ভাব। শব্দ-প্রয়োগের অন্যধর্মিতা সত্ত্বেও এ-কবিতায় রবীন্দ্রনাথের 'তোমারেই যেন ভালবাসিয়াছি শতরূপে শতবার' ('অনন্ত প্রেম'),—এই প্রসিদ্ধ উক্তির ক্ষীণ প্রতিধ্বনি অনুভব করা যায়।

'তুমি ও আমি' :

> তুমি ও আমি—আমরা দোঁহে যুক্ত ছিলাম আলিঙ্গনে
> ফুল-জনমে ;—ছিলাম যখন পাপড়ি-ঘেরা সিংহাসনে ;
> আমার ছিল সোনার রেণু, স্নিগ্ধ মধু তোমার হাসে,
> তুমি ছিলে মধ্য-কেশর আমি তোমার ছিলাম পাশে।

একই পুষ্পদেহে নারী ও পুরুষের এই সম্মেলন-কল্পনা থেকে অতঃপর

কবির অন্তরে জেগেছিল বিরহ-মিলনের গূঢ় তত্ত্বোপলব্ধি। তিনি অনুভব করেছিলেন যে, অখণ্ড 'এক' থেকেই ঘটেছে বিভেদ,—'দীর্ঘ দিনের তপস্যাতে কায়েমী হলো ছাড়াছাড়ি।' কিন্তু ঐকান্তিক বিচ্ছেদই শেষ নয়—

তফাৎ হয়ে নেইক তৃপ্তি, ছুঁ'টাই হয়ে দুখ মেনেছি,
লাভের মধ্যে, হায় গো বিধি, হারিয়ে পাওয়ার স্বাদ জেনেছি।

উত্তরকালে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের 'বিচিত্রিতা'র (প্রথম প্রকাশ ; ১৯৩৩ 'পুষ্প' কবিতাটির সঙ্গে এই লেখাটির চিত্র-কল্পনার সাদৃশ্য আছে। আবার, রবীন্দ্রনাথের 'কল্পনা'র (১৯০০) 'প্রকাশ' কবিতার ('এত যে গোপন মনের মিলন ভুবনে ভুবনে আছে') বিষয়বস্তুর সঙ্গে পুরোপুরি সাদৃশ্য না থাকলেও সেই একই ধ্যানদৃষ্টি অনুসরণের লক্ষণ সত্যেন্দ্রনাথের আলোচ্য কবিতায় সুস্পষ্ট। তবে, শব্দ-ব্যবহারের দিক থেকে 'প্রিয়-প্রদক্ষিণ-এর মতো এটিও অনেকাংশে রবীন্দ্রপ্রভাবমুক্ত রচনা।

'কুহু ও কেকা'র 'সিংহল' কবিতাটির প্রসঙ্গে 'Young Lochinvar'-এর ছন্দ অনুসরণের কথা বলা হয়েছে। সেই সঙ্গে এও স্মরণীয় যে 'গ্রীষ্ম-চিত্র' কবিতায় দেখা দিয়েছিল 'বেদী-বিমধ্যক ছন্দ'। ষোল চরণের এই রচনাটির প্রথম থেকে চতুর্থ এবং নবম থেকে দ্বাদশ চরণ অপেক্ষাকৃত বেশি মাত্রার ; পঞ্চম থেকে অষ্টম এবং ত্রয়োদশ থেকে চতুর্দশ চরণের মাত্রাপরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম থাকায় ছাপা কবিতাটির চেহারা মনে হয় কতকটা যজ্ঞবেদীর মতো স্থূল-শার্ণ। তাই 'বেদী বিমধ্যক' নামটি অসংগত নয়। 'পাল্কীর গান'-এ পাল্কীর নৃত্যগতির এবং পাল্কী-বেহারার অস্ফুট হুমকি তালের সার্থক অভিব্যক্তি ফুটেছে। 'গ্রীষ্মের সুর'-এ তিনি ভিক্টর হুগোর একটি কবিতার ছন্দ অনুসরণ করেছেন। 'রিক্তা'য় দেখা গেল মালিনী ছন্দের প্রয়োগ। 'যক্ষের নিবেদন'-এ মন্দাক্রান্তা এবং 'তখন ও এখন'-এর মধ্যে রুচিরা ছন্দের নমুনা আছে।

গ্রন্থাকারে 'তুলির লিখন' (২২ আগষ্ট ১৯১৪) যদিও 'কুহু ও কেকা'র পরে ছাপা হয়, তবু, এ বইয়ের কবিতাগুলির আসল রচনাকাল বাংলা ১৩১৬ সালের বর্ষাকাল। অর্থাৎ ১৯০৯ সালের অনুবাদ-কবিতাগুলির সমসাময়িক প্রয়াস হিসেবে এ লেখাগুলি সত্যেন্দ্রনাথের 'বিকাশ'

পর্বেরই পরিসীমাভুক্ত। ভূমিকায় তিনি লিখেছিলেন—'এই কবিতাগুলি ১৩১৬ সালের বর্ষাকালে রচিত। সম্প্রতি একটু আধটু পরিবর্তন করিয়াছি। এগুলি একাত্মিকা পদ বা একোক্তি গাথা'। রচনাকালের এই ব্যবধান সত্ত্বেও সমৃদ্ধি-পর্বের অন্যান্য রচনার সঙ্গে 'তুলির লিখন' এর শিল্প-সামর্থ্যের সাদৃশ্য সুস্পষ্ট। বইখানির প্রথম নামহীন কবিতায় 'তুলির লিখন' নামের অর্থসংকেত দেওয়া হয়েছে—

তোমার দীপের শিখায় হল
জীবন আমার প্রদীপ্ত,
তাইতো জাগে সৃজন প্রয়াস
তাইতো শিল্পী অতৃপ্ত ;
তাই সে আঁকে, তাই সে মোছে,
মনের ঝোঁকে বারম্বার,
শূন্য পটের পুণ্য পাপের
'সুষমা-মায়া' চমৎকার !
আদরা করে যাচ্ছ তুমি
ভরছি মোরা রং দিয়ে,
তুলির লেখা ধন্য হলো
আনন্দরূপ বন্দিয়ে ॥

সংস্কৃত পুরাণ, বৌদ্ধ কাহিনী ও ভারতীয় উপজাতিদের মধ্যে প্রচলিত আখ্যান অবলম্বনে সর্বসমেত সতেরোটি কবিতায় 'তুলির লিখন'-এর কবি সৃষ্টি-কর্তার সৌন্দর্য-সৃষ্টির মহিমা বর্ণনা করেছেন। প্রথম কবিতা 'বিদ্যুৎপর্ণা'তে স্বর্গমর্ত্যের আনন্দ-সম্মেলনের কথা আছে—

স্বরগে মরতে নিতি
করি মোরা যুক্ত,
দিই প্রীতি, গাই গীতি
চির-নির্মুক্ত।

দিগ্‌দিগন্তব্যাপী আকাশের বিদ্যুৎ-স্ফুরণের মধ্যে তিনি লক্ষ্য করেছেন যৌবনের উজ্জ্বল প্রাণশক্তি। বিদ্যুৎপর্ণার স্বগতোক্তিতে সেই কথাই ব্যক্ত হয়েছে—

ফুটে উঠি হাসি সম
খড়্গের ঝলকে,
মোরা করি মনোরম
মৃত্যুর পলকে।

এই চিরযৌবনের সঞ্জীবনী মাধুর্যের মধ্যে কবি অনুভব করেছেন অনির্বচনীয় অসীমের স্পর্শ। দুর্লভের সন্ধানী 'যুবন হিয়া'কে বিদ্যুৎপর্ণা দেয় 'নব নব প্রেরণা—

ভাবুকের ভালে রাখি
পরশ অদৃশ্য,
মেলে সে নূতন আঁখি
হেরে নব বিশ্ব!
মনের মানস-রসে
নব ভব নিঃশ্বসে
নব আলো পড়ে খসে
মরণ-অধৃষ্য।

দ্বিতীয় কবিতা 'সূর্য-সারথি'তে বিনতা-নন্দন অরুণের পৌরাণিক কাহিনী স্মরণ করে অরুণের মুখে কবি দিয়েছেন আশা ও নৈরাশ্যের মিশ্রবাণী! জননী বিনতাকে আহ্বান করে অরুণ বলেছেন—

আছে এক মহাসত্ত্ব এখনো
তোমার পক্ষতলে
অকালে যেন মা তারে আর তুমি
জাগায়ো না নিষ্ফলে;
তোমার দাস্য ঘুচায়ে ধন্য
হক সে অবনীতলে।

* * *

পঙ্গু আমি মা! ভায়ের শৌর্য
ভাবিয়া আমার সুখ,
আমি দিয়ে যাই আশার বারতা
কানে তোর উৎসুক,

আলোর আভাসে দেখে যাই তোর
ক্ষণ-উজ্জ্বল মুখ।

'আলোকের রথে সারথি'র পদ গ্রহণের ঠিক আগের মুহূর্তে বহু দুঃখভারাবনতা জননীকে সূর্য-সারথি অরুণ বলেছেন—

বিদায় জননী! যাই মা! বিদায়!
শীতে বড় পাই ক্লেশ,
পূরিবে কামনা পুণ্যবতী গো
নাই সংশয়-লেশ,
রবি-রথে বসি দেখিব একদা
মা তোর দুখের শেষ।

তৃতীয় কবিতা 'শোভিকা'র প্রসঙ্গ-পরিচয়টুকু সুপরিস্ফুট হয়েছে 'শোভিকা'র আত্মকথায়—

মথুরাপুরীর শ্রেষ্ঠ গায়িকা
মধুপার মেয়ে নন্দা আমি,
দরীগৃহে রাজ-রঙ্গ-ভবনে
গানে গানে গানে পোহাই যামী।
করি অভিনয় রাজ-রঞ্জনে
আমি গো শোভিকা নগর-শোভা,
রাজার প্রজার নয়নের মণি
হাজার হাজার হৃদয়-লোভা!

শঙ্খ-ধবল গৃহে দাসী নিপুণিকা-চতুরিকার সেবায় চৌষট্টি কলানিপুণা শোভিকার দিন কেটে যায় 'শ্লথ আলস্যে আরামে'! তবু তাঁর মনে শান্তি নেই। তাঁর হৃদয়ের গহনে গভীর আনন্দ-বেদনাময় কী যেন এক স্মৃতির গুঞ্জন শোনা যায়—

বিস্মৃত কোন্ সুদূর স্বপন
ছায়ার মতন ঘনায়ে আসে,
অ-ধর সে কোন্ সুদূর চাঁদের
সুষমা গোপন পরাণে ভাসে;

পঙ্কিল এই জীবন সায়রে
পঙ্কজ কোথা ওঠে গো ফুটে,
সৌরভ তার কাঁদিয়া ফিরিছে
ব্যথিত আমার পরাণ-পুটে।

'শোভিকা'র মর্মবেদনার কারণ এই: পুরুষ-ভূমিকায় অভিনয় করে রঙ্গালয় থেকে বেরিয়ে আসবার সময়ে এক রাত্রে পথের দীপালোকে অধ্যয়নরত দরিদ্র কিশোর এক বিদ্যার্থীকে দেখে এবং তার তপস্যায় মুগ্ধ হয়ে তৈল-প্রদীপের মূল্যস্বরূপ তিনি তাকে দুটি স্বর্ণমুদ্রা দিয়েছিলেন। প্রতি মাসে সেখানে উপস্থিত হয়ে সেই ছাত্রটিকে তিনি 'পূজার অর্ঘ্য' দিতেন। হঠাৎ একদিন সেই বিদ্যার্থীকে আর দেখা গেল না। সেই অবস্থায় ধনী, রূপবতী, 'আলাপ-নিপুণা', অভিজাত-সঙ্গিনী শোভিকা ভগ্নহৃদয়ে বলেছেন—

মনের গোপন চৈত্য রচিয়া
রেখেছি যে নিধি স্বপন মাঝে,—
সেই মোর বল সেই সম্বল
আমার আঁধার আলোকি' রাজে।

ভোগ-লালসার স্বর্ণপাশে বন্দিনী শোভিকাকে দীন-দরিদ্র সেই বিদ্যার্থী দিয়ে গেছেন অনাস্বাদিতপূর্ব উপলব্ধি—

মন যাহা চায় হায় গো সে ধন
বাহু যদি ঘেরে রাহুর মত
আধা পথে মন ফেরে বাধা পেয়ে
মনের যে লেহা হয় সে গত।

দেবতার ভোগ কুক্কুরে খায়
উপোষী দেবতা হয় বিমুখী,
ভোগের পরশ নাশে ভালবাসা
পাণ্ডু অরুচি দ্যায় গো উঁকি।

অনার্য-কন্যা কুৎসীর মাতৃত্ববোধের প্রবল আকুতি ('অনার্যা') এবং বারাঙ্গনা শোভিকার ভোগলেশহীন স্নেহ-মমতার আকাঙ্ক্ষা নারীহৃদয়ের একই চিরন্তনী স্পৃহার দুই ভিন্ন অভিব্যক্তি। আর্য-অনার্যের সংঘর্ষের ভয়াবহ

পরিবেশে প্রবল অনার্য-নেতা দ্রুহুর ভগিনী কুৎসীর সন্তান-বিয়োগ ঘটেছিল। পুত্রশোকাতুরা কুৎসীর ক্ষতিপূরণ করলেন অদৃশ্য বিধাতা।

> শোধ নিতে এর পণ করিল দ্রুহু আমার ভাই ;
> আমার হিয়া শান্ত না হয়, সান্ত্বনা না পাই।
> দিন দু'দিনে হঠাৎ দ্রুহু—নেই কোনো কথা
> ফুটফুটে এক দামাল ছেলে আনলো একদা।
> লুট্ করে সেই সোনার নিধি আর্য-পত্তনে
> স'পলে আমার শূন্য কোলে প্রফুল্ল মনে।

সেই শিশু মাত্র চোদ্দ বছর বয়সে দ্রুহুর সঙ্গে আর্য-পত্তন লুট করবার অভিযানে বেরিয়ে একদিন 'জ্ঞাতির হাতে জাতির বাণে' মৃত্যু বরণ করলো। এই অভিজ্ঞতা থেকেই কুৎসীর নারীহৃদয়ে অঙ্কুরিত হোলো নতুন উপলব্ধি—

> পরের ছেলে ঘরে এসে দখল করে কোল
> বাধিয়ে গেছে পাহাড়-দেশে বিষম গণ্ডগোল।
> ঘুচিয়ে গেছে আমার মনে ঘরের পরের ভেদ
> কাঁদিয়ে শেষে পালিয়ে গেছে এই সে আমার খেদ ।

'দুর্ভাগা' কবিতায় কল্যাণময়ী নারীহৃদয়ের ব্যর্থতা এবং স্নেহ-মমতার ঐকান্তিক পিপাসার আর একটি দিক ফুটে উঠেছে। স্বামীর অনাদরে দুঃখিনী নারী স্বামীর চিত্তজয়ের অভিপ্রায়ে 'গুণী' সন্ন্যাসীর কাছে চাইলেন বশীকরণের ঔষধ। দ্রব্যগুণে অনুরাগহীন পতি হলেন ব্যাধিগ্রস্ত।

> মগজ গেল নষ্ট হয়ে, বুদ্ধি হল ক্ষীণ,
> রইল হয়ে জব-স্থবির, অধীন গতিহীন।

তাঁর মৃত্যুর পরে অনাথা নারী 'জগৎ-স্বামী' ভগবানের করুণা ভিক্ষা করেছেন।

সভ্য, সমাজের সুশান্ত, সুশৃঙ্খল গার্হস্থ্য পরিবেশের মধ্যে স্নেহময়ী সতীর সহমরণের মহিমার কথা বলা হয়েছে 'সতী' কবিতায়। আবার পরমেশ্বর 'বিঠোবা'র পরমসঙ্গলোলুপা দেবদাসীর নিষ্কলুষ ধ্যানের আবেশ-ব্যাকুলতার মধ্যে পুরোহিতের কামান্ধ অভিসারের নির্মম শাসন-কাহিনীর বর্ণনা দেখা গেল 'তুলির লিখন'-এর 'দেবদাসী' কবিতায়। দর্পিণী দেবদাসী তাঁর ধ্যান-

মূর্ছা থেকে জেগে উঠে যখন দেখলেন যে, রাত্রে দেবতার ছদ্মবেশে ভণ্ড পুরোহিত তাঁকে আলিঙ্গন করেছেন, তখন—

কেশ মুড়াবার অস্ত্রটা ছিল
টানিয়া বাহির করিনু তারে,
হানিনু বক্ষে, হানিনু কণ্ঠে,
কোপায়ে কাটিনু ভণ্ডটারে।

'তুলির লিখন'-এর প্রথম এবং শেষ দুটি রচনা ছাড়া অন্য সব ক'টিতেই এইরকম কাহিনী বর্ণনার প্রয়াস দেখা যায়। উৎসর্গপত্রে লেখা আছে—'গল্পচ্ছলে গদ্য-কবিতার রচয়িতা প্রিয় বন্ধু শ্রীযুক্ত মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় করকমলেষু'। এ-বইয়ে তিনি 'গদ্য-কবিতা' লেখেন নি বটে, কিন্তু গল্প বলেছেন। প্রথম কবিতা 'বিদ্যুৎপর্ণা'তে গল্প নেই, কাব্যের প্রেরণা বা কবির কল্পনাশক্তির একটি রূপকমাত্র ফুটেছে। বইয়ের শেষে 'শেষ' কবিতাটিতে আছে সমস্ত সৃষ্টির সর্বময় পূর্ণতার ইঙ্গিত। কবি দেখেছেন, পরিবর্তনের অশেষ ধারা মিশেছে পূর্ণতায়! সেই পূর্ণতার বোধ থেকে তিনি পেয়েছেন অনির্বচনীয় সেই অশেষের সাক্ষাৎ, যার বাণী হোলো—

আমারি অধিকারে
ভারে ভারে
অবিরল
জমিছে জগতের
ফসলের
শেষ ফল।

জগতের রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দের বিচিত্রতা তাঁর মনে জাগিয়েছে মৃত্যুহীন অস্তিত্বের প্রত্যয়। এই বিশ্বাসের জোরেই তিনি লিখেছেন—

বারেক ফুটে উঠে
গেছে টুটে
যত ফুল
হল সে হল জমা
সে সুষমা
নহে ধূল্।

হারানো সব গান
সব প্রাণ
আছে গো
আমারি ফণাতলে
দলে দলে
রাজে গো ;

এই লেখাটির ধ্বনি এবং অর্থের অনুষঙ্গসূত্রে ১৩১৭ সালে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি'র ১৪৭ সংখ্যক কবিতাটির কথা মনে পড়ে—

জীবনে যত পূজা
হল না সারা,
জানি হে জানি তাও
হয়নি হারা।

রচনাকালের বিচারে 'তীর্থসলিল' এবং 'তীর্থরেণু'র অনুবাদ-কবিতাবলীর সমকালীন হলেও 'তুলির লিখন'-এ সত্যেন্দ্রনাথের পরিণত কল্পনাশক্তির নিদর্শন বিদ্যমান। বিশেষতঃ 'বিদ্যুৎপর্ণা' আর 'শেষ' কবিতা দুটিতে বিশুদ্ধ গীতিকবিতার ভাবমগ্নতা লক্ষ্য করা যায়। এ-বইয়ে পূর্ববর্তী 'হোমশিখা'-র গাম্ভীর্য নেই বটে, কিন্তু সমপ্রাসঙ্গিক বিভিন্ন কবিতার একত্র গ্রন্থনের সেই পুরোনো রীতি এখানেও অনুসৃত হয়েছে। অপর পক্ষে, তদ্ভব ও দেশি শব্দের প্রাচুর্য 'তুলির লিখন'-এ যে অনুপাতে দেখা দিয়েছে, 'বিকাশ-পর্বের' মৌলিক কবিতাবলীর মধ্যে সাধারণতঃ সেরকম ঘটেনি। বরং 'সমৃদ্ধি-পর্বের' 'অভ্র-আবীর', 'বেলা-শেষের গান', 'বিদায়-আরতি' প্রভৃতি কাব্যমালায় এই লক্ষণেরই সাদৃশ্য বর্তমান।

তুলির লিখন' আর 'অভ্র-আবীর'-এর মাঝামাঝি সময়ে প্রকাশিত হয় তাঁর তৃতীয় অনুবাদ-সংগ্রহ 'মণিমঞ্জুষা' (২৮ সেপ্টেম্বর, ১৯১৫) ; তারপর ১৩২২ সালের বাসন্তী পূর্ণিমায় ছাপা হয় 'অভ্র-আবীর' (১৬ই মার্চ ১৯১৬)। ভূমিকায় তিনি জানিয়েছিলেন, 'অভ্র-আবীর'-এর দেবতা বাক্, ছন্দ শতরূপা সরস্বতী, ভাষা সন্ধ্যাভাষা।' সর্বসমেত ৯৪টি রচনার এই সংগ্রহের প্রথম কবিতা 'সরস্বতী'-তে এবং শেষ কবিতা 'মহা-সরস্বতী'-তে দেখা গেল 'মন-গহনের

শ্বেত-হরিণী মহাশ্বেতা সরস্বতী'-র বন্দনা। অতএব, বাগ্‌দেবীর বন্দনা এবং বিভিন্ন ছন্দের প্রয়োগ, এ দু'টি বিষয়েই 'অভ্র-আবীর'-এর কবির মনোযোগ দেখে ভূমিকার উদ্ধৃত অংশের প্রথম দু'টি ঘোষণার সমর্থন পাওয়া গেল। কিন্তু 'সন্ধ্যাভাষা' কেন? 'সন্ধ্যাভাষা' শব্দটির প্রয়োগ ঘটেছিল বিশেষ কারণে। কবির সরস্বতী হলেন 'মন্-গহনের' দেবী। তিনি লিখে গেছেন—

সন্ত-গলা বরফে ফুল ফুটিয়ে হঠাৎ লাখে লাখে
চেতন-লোকের মগ্ন-তটে জাগে তোমার প্রসাদ জাগে…

বস্তু-জগতের ব্যবহারিকতা থেকে তাঁর দৃষ্টি ছড়িয়ে পড়েছিল মনোগহনের প্রচ্ছন্ন আলো-আঁধারিতে। 'হোমশিখা'র কবি ঐতিহ্য রক্ষার তাগিদে পঞ্চ-মহাভূতের মহিমা বর্ণনা করেছিলেন; আর, 'অভ্র-আবীর'-এর কবি মানুষ এবং বিশ্বপ্রকৃতির গূঢ় সম্পর্ক উপলব্ধি করে রূপ-রসের বিচিত্র উল্লাস দেখিয়ে গেছেন। বলা বাহুল্য, অন্তর্মুখিতা এ কাব্যের সর্বত্র চোখে পড়ে না—অন্তর্মুখিতা সত্যেন্দ্রনাথের স্বভাবও নয়,—কিন্তু 'তুলির লিখন'-এর প্রথম এবং শেষ কবিতায় যেমন কবিকল্পনার অপেক্ষাকৃত স্বাধীনতা দেখা গেছে, 'অভ্র-আবীরে'ও তেমনি বস্তুর বস্তুসীমা থেকে কবির দৃষ্টি এগিয়ে গেছে সীমাতীতের দিকে! 'তুলির লিখন'-এ সৌন্দর্য-সচেতন কবি লিখেছিলেন—

সপ্ত লোকের সাত মহলে
তুলির লেখা লিখ্‌ছ কে?
দাও গো মোরে অযুত আঁখি
কুলায় না যে দুই চোখে।

'অভ্র-আবীরে' সৌন্দর্যমুগ্ধ কবিমানসের অন্তোপলব্ধির উল্লাসে প্রকৃতি ও শিল্পিচিত্তের ব্যবধানহীন সমধর্মিতার সত্য উদ্ভাসিত হয়েছে। ফাল্গুনের অশোক-বকুল-কোকিলের শোভাযাত্রা দেখে কবির 'মানস-মরাল জাগ্‌ল আবার উঠল অগাধ হিল্লোলি।' 'চিত্রা'য় (১৩০২) রবীন্দ্রনাথ যেমন বাগ্দেবীকে জানিয়েছিলেন—

দেবী, অনেক ভক্ত এসেছে তোমার চরণতলে
অনেক অর্ঘ্য আনি',
আমি অভাগ্য এনেছি বহিয়া অশ্রুজলে
ব্যর্থ সাধনখানি। [সাধনা]

—'অভ্র-আবীরের দ্বিতীয় কবিতা 'অঞ্জলি'তে সত্যেন্দ্রনাথও তেমনি জানিয়েছিলেন—

অনেক তোমার ভক্ত আছে অনেক হোমার বাল্মীকি
হোম্‌রা-চোম্‌রা নই আমি, তুই মোর পানে হায় চাইবি কি ?

বার বার নিজের রচনার দৈন্য স্মরণ করে তিনি পুনরায় বলেছিলেন—

সাজতে ভালবাসিস যে তুই ভিতর-প্রাণের ভাব নিয়ে
সকল-সঁপা ক্ষেপার এ গান—চাস্‌নে কি তুই আপনি এ ?

এবং কবিতার শেষ স্তবকে—

এই নে আমার অঞ্জলি গো এই নে আমার অঞ্জলি,
বীণায় যে গান ধরেছিলাম হয়তো এ তার শেষ কলি ;
'আবির্' 'আবির্' মন্ত্র-রাবে
কর গো সফল আবির্ভাবে
অশ্রু-হাসির অভ্র-আবীর আঁখির আলোয় উজ্জ্বলি'।[৩৩]

'ভিতর-প্রাণের ভাব' সম্বন্ধে তাঁর আগ্রহ এ-বইয়ের অনেক কবিতাতেই আভাসে-ইঙ্গিতে ধরা দিয়েছে। মনের অনতিদৃশ্য এই ভাব-গহনের অভিব্যক্তি যে বিশেষ ভাষারীতির সাহায্যে প্রকাশনীয়, সে তো প্রতিদিনের ব্যবহারিক জগতের স্পষ্ট, সুবোধ্য, অভ্যস্ত মনোভঙ্গির ফল নয়! সে ভাষা কবিতার ভাষা! ইঙ্গিত, কারুকার্য, ব্যঞ্জনাধর্মী কবিতার ভাষাকেই তিনি বলেছিলেন 'সন্ধ্যাভাষা।' 'অভ্র-আবীরে' কবিমানসের সুগভীর কোনো রূপকাভিব্যক্তি বা প্রতীক-ব্যঞ্জনা না থাকলেও বিশ্বপ্রকৃতির রূপলাবণ্য সম্পর্কিত গভীর অনুভূতির চিহ্ন বিদ্যমান ; এবং সেই অনুভূতির প্রভাবেই শব্দ-ছন্দ-অলংকারের সমারোহ এখানে অপেক্ষাকৃত স্নিগ্ধ ও সরস হয়ে উঠেছে। 'ফুলের ফসলে' রূপ-পিপাসার যে ব্যাকুলতা দেখা গিয়েছিল,[৩৪] তারই অনুরূপ

৩৩। আবিঃ—প্রকাশ ; রাব—রব, শব্দ। "আবির্...মন্ত্ররাবে"—অর্থাৎ, 'প্রকাশিত হও', 'প্রকাশিত হও'—এই মন্ত্রধ্বনি সহযোগে। তুলনীয় :—বৈদিক 'আবিরাবির্মএধিঃ' রবীন্দ্রনাথের প্রিয় বৈদিক উক্তিগুলির অন্যতম।

৩৪। তুলনীয়—'পিয়াও মোরে রূপের সুধা'...[গান] : 'কেন নয়ন হয় গো মগন মঞ্জুল মুখে! কেন হৃদয় ভিখারী হয় রূপের সমুখে'—[গান] ; 'সীস্ মহলের রূপসী দলের ঘোমটা আজিকে খোলা! মাথার উপরে তক্ তক্ করে আকাশের পরকোলা ?'—[শতদল] ; 'দেখা হল ঘুম নগরীর রাজকুমারীর সঙ্গে'—[ফুলের রাণী] ইত্যাদি।

আবেগের দৃষ্টান্ত আছে এ-বইয়ের একাধিক কবিতায়। জ্যোৎস্নারাত্রির মেঘ (চকোরের গান), আষাঢ়ের মেঘান্ধকার (আষাঢ়ের গান), বর্ষা-ঋতুর ইল্‌শেগুঁড়ি বৃষ্টি (ইল্‌শেগুঁড়ি) রূপপিপাসু কবির অন্তরে জাগিয়ে গেছে পরম ব্যাকুলতা। ইন্দ্রিয়ানুভূতির সুখাবেশে তিনি অনুভব করেছেন আত্ম-প্রকাশের ইচ্ছা। ভিন্ন ভিন্ন উপমা, পৃথক পৃথক চিত্র,—সূক্ষ্ম এক-একটি লক্ষ্যভেদের জন্য কবিকল্পনার অশেষ প্রয়াস এবং বিচিত্র সন্ধান 'অভ্র-আবীর'-এর নানা কবিতায় নানান্ ছত্রে বার বার দেখা দিয়েছে। জ্যোৎস্না-প্লাবিত আকাশে তিনি একবার দেখেছেন 'শ্যামল মেঘের পদ্মপাতা,' —আবার সেই আকাশকেই মনে হয়েছে মস্‌লিনের বিস্তার,—মসৃণ শৈবালময় জলস্রোত ('চকোরের গান')! নাগকেশরের সুবর্ণ-পরাগে সূর্যের চুম্বন কল্পনা করবার ঠিক পরমুহূর্তেই পূর্বকল্পনা পরিত্যক্ত হয়েছে,—নাগ-কেশর হয়ে উঠেছে শঙ্খনাগের সোনার চূড়া! ইল্‌শেগুঁড়ি বৃষ্টিধারা দেখে সাদৃশ্যসূত্রে কবির মনে উঁকি দিয়ে গেছে কতো যে কল্পনা, কতো যে রূপানুষঙ্গ! ইন্দ্রিয়জ্ঞানের সঙ্গে মিলেছে কল্পনালব্ধ ভাবরূপ—ইলিশ মাছের ডিম, কেয়াফুলের ঘুণ, পরীর ঘুড়ি, ঝুমরো চুলে মুক্তো-ফলন, পরীর কানের দুল, ঝুরো কদম ফুল, ঘুম-বাগানের ফুল! দেখা দিয়েছে অশেষ উপমান! 'ফুলের ফসল'-এ রূপোল্লাসের মধ্যেও কিছু দার্শনিকতার প্রয়াস ছিল বটে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও প্রধানতঃ রূপের প্রতি আন্তরিক আগ্রহই সে-কাব্যের বৈশিষ্ট্য। 'অভ্র-আবীর'-এর নিসর্গ-কবিতাগুলিতেও সেই অন্য-নিরপেক্ষ সৌন্দর্যনিষ্ঠাই প্রধান। দৃষ্টি, শ্রুতি, ঘ্রাণ ইত্যাদি সর্বেন্দ্রিয়ের সজাগ, সুতীক্ষ্ণ সহযোগিতা যেমন কীট্‌সের কাব্যে নিরন্তর আত্মপ্রকাশ করেছে, সত্যেন্দ্রনাথের 'সমৃদ্ধি'-পর্বের প্রকৃতি-সম্পর্কিত কবিতাগুলিতেও তেমনি সর্বেন্দ্রিয়তীক্ষ্ণতার লক্ষণ বিরল নয়। তবে পার্থক্য এই যে, শ্রুতিচেতনার দাবিই তিনি অধিক পরিমাণে স্বীকার করেছেন। তা'তে রসের ধারা মাঝে মাঝে ব্যাহত হয়েছে,—সার্থকতার লক্ষ্যও কোনো কোনো ক্ষেত্রে খুবই দূরে সরে গেছে,—তবু তাঁর অভ্যাস বদলায়নি। তবে, 'অভ্র-আবীর-এর অল্প কটি রচনা সম্বন্ধেই এ অভিযোগ বিবেচ্য।

শব্দের কেবলমাত্র শ্রুতিগুণের দিকেই যে তাঁর আগ্রহ ছিলো, আলোচ্য প্রসঙ্গের কয়েকটি কবিতার সাক্ষ্যের ওপর নির্ভর করে সে-কথা যুক্তিসহ মনে

হয় না। বরং নতুন যে-কোনো শব্দের দিকেই তাঁর চিরস্থায়ী পক্ষপাতের বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। 'অভ্র-আবীর'-এ প্রকৃতি-সম্পর্কিত কবিতাগুলির অন্যতম 'ইন্দ্রজাল' লেখাটিতে এই বিশেষত্ব লক্ষ্যণীয়। মেঘ-ঝড়-বর্ষণের ছবি আঁকতে বসে বিশ্বস্রষ্টার ইন্দ্রজাল-সামর্থ্যের প্রসঙ্গ উঠেছে। যাদুকর তাঁর যাদুবিদ্যার বলে শূন্যে যেন পুরী পত্তন করেছেন, এই কল্পনা সুকৌশলে রূপায়িত হয়েছে। কিন্তু তথ্যোৎসাহী কবির মনে পুরী পত্তনের প্রসঙ্গ থেকে গড়-নির্মাণের প্রসঙ্গ এসেছে, গড়-নির্মাণের কথা মনে উদিত হবার সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিয়েছে বারুদ, টোটা ইত্যাদি যুদ্ধোপকরণের সমাবেশ,—'মোরচা বন্দী মেঘ-গঞ্জীনে ঝলসিছে মুহু জলুসী টোটা!' এই ভাবে শব্দের নেশা এবং কল্পনার চারুত্ব পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠার ফলে অল্পপ্রচলিত শব্দের আধিক্যে অভিপ্রেত ভাব-রূপ গৌণ হয়ে গেছে। শব্দস্পৃহাই যেন তাঁর প্রধান প্রেরণা হয়ে দাঁড়িয়েছে—

আড়-বাড় আর ঘাঁটি মুহড়ায়
'হাঁকার' বাজায় দামামা কাড়া,
হের দেখ কার বিপুল বাহিনী
হামার হয়েছে পাইতে ছাড়া!

তারপর—

বখেড়িয়া উনপঞ্চাশ হাওয়া
ক্ষেত রোখে আর বখেড়া করে
তোড়ে তোড়াদার বন্দুকে আর
লব্‌লবি টেনে ধোঁয়ায় ভরে!

মনে হয়, 'অভ্র-আবীরে' সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর নিজের সামর্থ্যের কতকটা যথার্থ পরিমিতির পরেই লিখেছিলেন—

চিত্ত-সাগর মথন-করা চিন্তা-মণি-মুক্তো নেই;
অকূলেরি কূল আঁকড়ি
কুড়াই ঝিনুক, শামুক, কড়ি... (অঞ্জলি)

একদিকে 'ভিতর-প্রাণের ভাব' প্রকাশের আকাংক্ষা, অন্যদিকে শিল্পের সার্থকতার পক্ষে যা প্রতিকূল,—এমন সব শব্দের, ছন্দের 'শামুক-কড়ির'

উৎপাত,—পরস্পরবিরোধী এই দুই লক্ষণের যৌগপদ্য কাটিয়ে ওঠার অব্যাহত সামর্থ্য 'অভ্র-আবীরে'ও অনাগত। তাঁর কবি-জীবনের প্রথম পর্ব থেকেই প্রকৃতির রূপোল্লাসের সুরটি ধ্বনিত হয়ে এসেছে; আর, পারিপার্শ্বিক মনুষ্যজগতের সাহিত্য-বিজ্ঞান-রাষ্ট্র-ধর্ম-সমাজ-সভ্যতার নানা কথার পৃথক আর-একটি ধারা এগিয়েছে সমান্তরাল ভাবে। 'সবিতা', 'সন্ধিক্ষণ', 'বেণু ও বীণা' থেকে শুরু করে 'কুহু ও কেকা'র সময় অবধি সমাজ-সচেতন কবির সমাজচিন্তার বহু অভিব্যক্তি দেখা গেছে। 'ফুলের ফসল' এ-দিকে সম্পূর্ণ উদাসীন না হলেও জীবনের কঠোর বস্তুসত্যের মর্মান্তিক তিক্ততার কথা এ-কাব্যে অনুপস্থিত। 'জীবন কুস্বপন—জনম ভুল'!—'ফুলের ফসলে' এ-রকম নৈরাশ্যের স্বীকৃতি বিরল[৩৫]; এবং বেদনা এখানে বাস্তব অবরোধ লঙ্ঘনেরই পিপাসা! ব্যর্থতা এখানে প্রাপ্তির সোপান,—বন্ধন কেবল মুক্তির ইশারা!

'অভ্র-আবীর'-এর 'জাতির পাঁতি', 'নির্জলা একাদশী', 'ইজ্জতের জন্য' প্রভৃতি কবিতায় এই শ্রেণীর আগেকার লেখাগুলির মতন তথ্যাতিরেক এক পীড়াকর বিশেষত্ব। 'জগৎ জুড়িয়া এক জাতি আছে সে জাতির নাম মানুষ জাতি'—এই আদর্শ মন্তব্যটি ছন্দে প্রচার করতে বসে তিনি 'বামুন, শূদ্র, বৃহৎ, ক্ষুদ্র' ইত্যাদি বহুতর ভেদের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন,—উৎসাহের সঙ্গে শুনিয়েছেন, 'নিখিল জগৎ ব্রহ্মময়'! বহু জন্মের, বহু জীবনের 'নির্মোক' ছেড়ে-ছেড়ে আমরা চলেছি দুর্গম পথে! শাক্যমুনি এশিয়া থেকে ক্ষুদ্র ভেদবুদ্ধির বাধা নির্মূল করেছিলেন,—'নাপিতের মেয়ে মুরার দুলাল চন্দ্রগুপ্ত' ছিলেন রাষ্ট্রপতি,—'গোয়ালার ভাতে পুষ্ট যে কানু সকল রথীর সেরা সে রথী'! এই বিচিত্র তথ্যের তালিকায় ভিড় বাড়িয়েছে কৈবর্তের মহিমা,—গুহক চাঁড়াল, বলাই হাড়ী, রুইদাস মুচি, সুদীন কসাই, মগধের রাজা ডোম্‌নি রায়ের কাহিনী! বহু নাম, এবং বহু ঘটনার ভিড় ঘটিয়ে মূল আবেগটিকে সমাচ্ছন্ন করে অবশেষে কবি বলেছেন—

জাতির পাঁতির দিন চলে যায়
সাথী জানি আজ নিখিল জনে…।

সে-যুগে প্রবাসী ভারতীয়দের অবস্থা উন্নয়নের জন্য গান্ধীর নেতৃত্বে

৩৫। 'স্রোতের ফুল' দ্রষ্টব্য।

আফ্রিকায় যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল, 'ইজ্জতের জন্য' কবিতাটির প্রেরণা জুগিয়েছিল সে-কালের সেই ঐতিহাসিক ঘটনা। আফ্রিকায় বর্ণভেদের দুর্নীতি কৃষ্ণকায় ভারতীয়দের জীবনে মর্মান্তিক অশান্তি ছড়িয়েছিল। সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন আমাদের সেই যন্ত্রণাদায়ক লাঞ্ছনার কবি-সাংবাদিক। 'অন্নে তুষ্ট' ভারতীয় শ্রমিক 'খনির কাজে আখের চাষে' যতোদিন বিনা প্রতিবাদে ধনী শ্বেতাঙ্গের পীড়ন সহ্য করেছে, ততোদিন মালিকরা শান্ত ছিলেন। কিন্তু ঘটনাচক্রে মনুষ্যত্বের অধিকার সম্বন্ধে তারা সচেতন হোলো। তখন—

অমনি গেল সুরু হয়ে নূতন নূতন আইন জারি—
"ভারতবাসী কৃষ্ণ অতি" "ভারতবাসী দুষ্ট ভারি,"
"অসাব্যস্ত বিবাহ তার, পত্নী তাহার পত্নী নয়,
কারণ বহুনারীর ভর্তা দুশ্চরিত্র সুনিশ্চয়।"
খনির তলে খাটুক কুলি, অবসরে চিবোক চানা,
কিন্তু কুলির আফ্রিকাতে কন্যা জায়া আনতে মানা।

এই অত্যাচারে জর্জর প্রবাসী ভারতবাসীর দুঃখমোচনের জন্যেই সাহায্যের প্রয়োজন হোলো। চারণ কবি সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর আলোচ্য কবিতায় এই সাহায্য-ভিক্ষার আবেদন প্রচারের কর্তব্যটুকু বিস্মৃত হন নি। দেশের ও দশের সম্বন্ধে প্রশংসনীয় কর্তব্যবোধের তাগিদেই তিনি লিখেছিলেন—

ইজ্জতে হাত পড়লে জাতির 'জোৎ' বেচে সে রাখতে হবে—
সাহায্য দাও সাহায্য দাও সাহায্য আজ দাও গো সবে!

তথ্যের গুরুভারে, বর্ণনার আতিশয্যে, মূল প্রসঙ্গের সূত্রে নানা অনুষঙ্গ যোজনার অভ্যাসে তাঁর এই বর্ণনমূলক, সামাজিকতানিষ্ঠ কবিতাগুলি কিছু পরিমাণে উৎকেন্দ্রিক অথবা শিথিলবন্ধ বর্ণনাড়ম্বরে পর্যবসিত হয়েছে। কেবল দুঃখ-কষ্ট-অপমান-বিরক্তির কাহিনী বর্ণনাতেই যে এ-রকম ঘটেছে, তা নয়। 'অভ্র-আবীর'-এর প্রসিদ্ধ কবিতা 'গঙ্গাহৃদি বঙ্গভূমি'র বিষয়বস্তু হোলো বাংলাদেশের বিচিত্র সৌন্দর্য আর কীর্তিকলাপের সুখস্মৃতি। এখানকার সুদীর্ঘ তালিকায় পর্যায়ক্রমে দেখা দিয়েছে পদ্ম, কেয়া, সমুদ্র, হিমাচল,— বঙ্গমাতার অন্নদা-গৌরী-লক্ষ্মী-শিবানী-করালী-শার্দুলবাহিনী-অভয়া-ভীমা রূপ, — ভাঁটফুল-বকুল-নাগকেশর, — অশথ-ছাতিম, — শালিখ-চাতক-কোয়েল-

মাছরাঙা,—গঙ্গা-সুবর্ণরেখা-ব্রহ্মপুত্র-তিস্তা! সৌন্দর্যের নানা দৃষ্টান্তের সঙ্গে সঙ্গে তিনি স্মরণ করেছেন বাঙালীর বিচিত্র কীর্তির বিভিন্ন প্রসঙ্গ। 'কহ্লণ' ও 'রাজতরঙ্গিণী'র চকিত উল্লেখ,—ত্রেতাযুগের রামচন্দ্রের সঙ্গে সিংহল-বিজয়ী বাঙালী বীরের তুলনাসূচক ত্বরিত সংকেত,—ইচ্ছামতী-অজয়-পদ্মা-মেঘনা-ভৈরব-দামোদর প্রভৃতি নদ-নদীর মহিমা,—চাঁদসদাগর ও শ্রীমন্তের খ্যাতির কাহিনী,—এই অজস্র কথা-প্রবাহের ঝোঁকে 'গঙ্গাহৃদি বঙ্গ-ভূমি'র রূপ যেন ঝাপ্‌শা হয়ে গেছে! মুখ্য হয়ে উঠেছে বাংলার কীর্তি-খ্যাতি-শোভা-সৌন্দর্যের ছন্দোবদ্ধ বিবরণ। এইভাবে বাংলার ফুল-পাখি-নদী-মানুষের বিচিত্র তথ্য পরিবেষণের উৎসাহের মধ্যেও তিনি কবিতার শিরোনামটির ঔচিত্য প্রমাণের দায়িত্ব বিস্মৃত হন নি। পুরাকাল থেকে বর্তমান কাল অবধি দীর্ঘ প্রবাহের মধ্যে—হিমাচল ও সমুদ্র-সীমিত বিশাল বাংলা দেশের নানা ভাবরূপের ধারাবর্ণনার উদ্দেশ্য বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে কবিতার শিরোনামে। বঙ্গভূমি হলেন 'গঙ্গাহৃদি'! শব্দবিদ্ কবি ব্যাখ্যা করেছেন—

> 'গম্' ধাতু তোর দেহের ধাতু গঙ্গাহৃদি নামটি গো,
> গতির ভুখে চলিস রুখে, বাংলা! সোনার তুই মৃগ।
> গঙ্গা শুধুই গমন-ধারা তাই সে হৃদে আঁকড়েছিস্,—
> বুকের সকল শিকড় দিয়ে গতির ধারা পাকড়েছিস্।

তাঁর স্বভাবগত এই রূপ-বিস্মারী তথ্যস্পৃহাতিরেকের ফলে এইসব রচনায় শব্দ ও ছন্দের আড়ম্বরে, ঘটনা ও কাহিনীর অমিত প্রাচুর্যে কবিতার রসসত্তা অবশ্যই ম্লান হয়ে গেছে। বর্ণনার লঘু, ত্বরিত, মত্ততাই তাঁর অন্তর্মুখিতার বাধা। বিশেষতঃ, বর্ণনাপ্রধান কবিতাগুলি সম্পর্কেই একথা প্রযোজ্য। 'স্বাগত' কবিতাটিতেও তাই হয়েছে। কলকাতায় সাহিত্য-সম্মিলন উপলক্ষে সমাগত সাহিত্য-সাধকদের অভিবাদন জানাতে গিয়ে তিনি মহানগরীর অতীত-বর্তমান কীর্তিকলাপের দীর্ঘ এক তালিকা দিয়েছেন। হিন্দুর কালী, মুসলমানের মৌলা আলি,—রামপ্রসাদ, পরমহংস, কেশব সেন, কালীচরণ, বিবেকানন্দ, রামমোহন, বিদ্যাসাগর, অক্ষয় দত্ত, জগদীশচন্দ্র, রমেশ দত্ত,—'কালা পল্টন, গোরা কোম্পানী'—গৌড়, সপ্তগ্রাম—'নবজীবন'—'সাধনা'—ইত্যাদি প্রসঙ্গের অবাধ মিছিল এগিয়েছে মসৃণ ধারায়। এরই নাম তথ্যজ্ঞানের অতিবিলাস

এই তথ্যবিলাসের অত্যাচারে শব্দের সূক্ষ্ম আবেদন অন্তর্হিত হয়েছে, ছন্দের রসাভিমুখিতা উপেক্ষিত হয়েছে,—'আঁকড়েছিস'-এর সঙ্গে অনুপ্রাস বজায় রেখে তিনি লিখেছেন 'পাকড়েছিস'! শব্দের সংগ্রহাধিকারের সঙ্গে শব্দের যথার্থ স্বাদোপলব্ধির বিচক্ষণা যুক্ত হতে পারেনি। 'অভ্র-আবীরে' সংকলিত এই শ্রেণীর অন্যান্য কবিতার মধ্যে 'মৃত্যু-স্বয়ম্বর' এবং 'পুরীর চিঠি'ও ধর্তব্য। এই তিনটি রচনাই প্রথম ছাপা হয় ১৩২০-র 'প্রবাসী' পত্রিকায় ৩৬। নোবেল-পুরস্কার প্রাপ্তির খবর শুনে রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে লেখা 'আভ্যুদয়িক'ও সমকালবর্তী। 'কুহু ও কেকা'-তে সংকলিত 'বিশ্ববন্ধু' এর অল্প পূর্ববর্তী রচনা; 'সাগর-তর্পণ' আরো আগেকার লেখা। 'অভ্র-আবীর'-এর 'সমুদ্রাষ্টক'ও ১৩২০-র 'প্রবাসী'তেই প্রথম ছাপা হয়। 'কুহু ও কেকা'র 'দার্জিলিঙের চিঠি'তে তাঁর দার্জিলিঙ-প্রবাসের (১৩১৮) বর্ণনা আছে এবং এটিও সমশ্রেণীর রচনা।

'সমৃদ্ধি'-পর্বের পূর্ণ পরিসরের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথের এই বিশেষ রুচির কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। এ-বইয়ের 'কবর-ই নূরজাহান', 'তাজ', 'স্বর্গদ্বারে' প্রভৃতি রচনায় প্রধানতঃ তিনি তাঁর এতৎপ্রাসঙ্গিক ইতিহাসজ্ঞানই প্রচার করেছেন,—এইসব শিল্পসামগ্রীর অথবা দৃশ্যবস্তুর গভীরতর আবেদন তেমন গ্রাহ্যই করেন নি। অথচ, রূপোল্লাসের প্রবণতা তাঁর যে আদৌ ছিল না, তা নয়। এ বিষয়ে এ-বইয়ের পূর্বাংশে যা বলা হয়েছে; সেই সঙ্গে 'অভ্র-আবীর'-এর 'পূর্ণিমা রাত্রে সমুদ্রের প্রতি', 'অন্ধকারে সমুদ্রের প্রতি', 'লাল পরী', 'নীল পরী', 'জর্দা পরী', 'চিত্রশরৎ' ইত্যাদি এবং 'কুঙ্কুম-পঞ্চাশৎ' ও 'কাজরী-পঞ্চাশৎ'-এর কোনো কোনো অংশ স্মরণীয়। 'আবির্ভাব'-এ তিনি লিখেছিলেন—

> আমার এই পরাণ-পাথার মথন করে
> ওগো কে জেগেছে! কে উঠেছে!

৩৬। ইজ্জতের জন্য—পৌষ, ১৩২০; আভ্যুদয়িক—পৌষ, ১৩২০; সমুদ্রাষ্টক—ভাদ্র, ১৩২০; মৃত্যু-স্বয়ম্বর—চৈত্র, ১৩২০; বিশ্ববন্ধু—জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৯; দার্জিলিঙের চিঠি—আশ্বিন, ১৩১৮. পুরীর চিঠি—কার্তিক, ১৩২০; সাগর-তর্পণ—শ্রাবণ, ১৩১৮। (—'প্রবাসী' দ্রষ্টব্য)

'চিন্তামণি'-তেও এই রকম ব্যাকুলতা ফুটেছিল—

(আমি) ধন্য হলাম! ধন্য হলাম!
হলাম ধনী!
(আমি) বলছি তোমার দুঃখকে আর দুখ না গণি!

কিন্তু 'অভ্র-আবীরে' এইসব অনুভূতির স্থায়িত্ব ঘটেনি। এক-একটি পুরো রচনার সম্পূর্ণ বিস্তারের মধ্যে এক-একটি ভাবের গভীর আবেশ পরিব্যাপ্ত হতে দেননি তিনি। এই সূত্রে আরো একটি কথা মনে পড়ে। রবীন্দ্রনাথের কবিতা এবং গানের নানা ভগ্নাংশ ছড়িয়ে আছে তাঁর লেখার বিভিন্ন ক্ষেত্রে। 'উৎসর্গ', 'গীতিমাল্য', 'গীতাঞ্জলি' (প্রথম প্রকাশ ১৯১৪) প্রভৃতি রবীন্দ্র-রচনাবলীর কথা ও সুরের প্রভাব তাই তাঁর মধ্যে সহজেই চোখে পড়ে।

তথ্যপ্রধান ও রূপোল্লাসপ্রধান,—এই দু'জাতের পাশাপাশি 'অভ্র-আবীর'-এর গীতিধর্মী, অন্তরানুভূতিপ্রধান তৃতীয় শ্রেণীর রচনার মধ্যে রবীন্দ্র-প্রভাবিত ছোটো ছোটো গানগুলি তো বটেই, তাছাড়া 'বৈকালী' নামের স্তবকগুলিও বিশেষ স্মরণীয়। রবীন্দ্রনাথের 'বৈকালী' (১৩৩৩ সালের আষাঢ়-কার্তিক 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত) সত্যেন্দ্রনাথের এই রচনাগুলির পরে লেখা হয়। 'কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের মৃত্যুতে' লেখা তান্‌কা-সপ্তক-এর রূপকল্প (pattern) সত্যেন্দ্রনাথের পূর্বোক্ত 'বৈকালী'রই অনুরূপ। ১৩২০-র আষাঢ়ের 'প্রবাসী'তে 'ইন্দ্রজাল', 'ডেভিড হেয়ার', 'রাত্রিবর্ণনা' এবং 'তান্‌কা সপ্তক'—এই চারটি কবিতাই ছাপা হয়েছিল। শেষের দুটিতে প্রযুক্তিগত অভিনবত্বের দিকে কবির আগ্রহ সুস্পষ্ট। 'রাত্রিবর্ণনা'য় 'মিত্র-অমিত্রাক্ষর ছন্দ এবং 'স্বভাবাতিশয়োক্তি অলংকার' ব্যবহারের কথা তিনি নিজেই বলে গেছেন। 'তান্‌কা' সম্পর্কে তাঁর গদ্য-নিবন্ধটি ছাপা হয় ১৩১৮-র বৈশাখের 'প্রবাসী'তে।[৩৭] এই প্রবন্ধে জাপানী 'তান্‌কা'র

৩৭। এই প্রবন্ধটির নাম 'মিকাডোর নূতন খাতা'। জাপানের এই 'তানকা'-কবিতার পরিচয় বিবৃত হয়েছে এই ভাবে :— 'নববর্ষে কবিতার দরবারে প্রথম সম্রাটের স্বরচিত একটি কবিতা নিপুণ পাঠকের দ্বারা তিনবার পঠিত হয়; তাহার পর সাম্রাজ্ঞীর কবিতা—তাহাও তিনবার পড়া নিয়ম। তাহার পর খ্যাতনামা কবিদের রচনা ও সর্বশেষে সাধারণের শ্রেষ্ঠ দশটি রচনা মিকাডোর নির্দেশ মত গুণানুসারে একবার করিয়া পঠিত হয়। যে কবিতাগুলি পঠিত হয়, তাহার সকলগুলিই ক্রমশঃ গীত হইয়া সভা ভঙ্গ করা হয়।

আকৃতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করে,—পরে দ্বিজেন্দ্রলালের মৃত্যু বর্ণনা উপলক্ষে এ-কাব্যরূপ তিনি নিজেই ব্যবহার করেছিলেন। আকৃতি-সাদৃশ্যে 'অভ্র-আবীর'-এর 'বৈকালী' ও 'তান্‌কা-সপ্তক' সমধর্মী বটে, কিন্তু জাপানী 'তান্‌কা'র ভাবগত নিবিড়তা শেষেরটিতে অনুপস্থিত,—প্রথমটিতে বিদ্যমান। 'তান্‌কা-সপ্তকে' দ্বিজেন্দ্রলাল সম্পর্কে সত্যেন্দ্রনাথের সামাজিক কর্তব্য-বোধের প্রকাশই যেন প্রধান মনে হয়।

সে ছিল মূর্ত
হাস্যের অবতার,
প্রতি মুহূর্ত
ধ্বনিত হাসিতে তার।
হরষের পারাবার!
ত্র্যম্বক প্রভু
তারে দিয়েছিল হাসি,
হাসি তার কভু
জমাট তুষার-রাশি।
সে পুন "মন্দ্র" ভাষী!

—এই বর্ণনায় অকৃত্রিম হৃদয়ানুভূতি নেই, অন্তরের আবেগ নেই,—আছে শুধু সাধু কর্তব্যের স্বীকৃতি, পরলোকগত দ্বিজেন্দ্রলালের ক্ষীণ স্তুতি। 'বৈকালী'র প্রকৃতি কিন্তু অন্যরকম। সর্বসমেত পঁচিশ স্তবকের এই কবিতার প্রথম স্তবকেই তিনি লিখেছিলেন—

অকূল আকাশে
অগাধ আলোক হাসে,
আমারি নয়নে
সন্ধ্যা ঘনায়ে আসে!
পরাণ ভরিছে ত্রাসে।

এই সমস্ত কবিতা পাঁচ পংক্তির অধিক দীর্ঘ হইবার নিয়ম নাই; য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা ইহাকে জাপানী সনেট নামে অভিহিত করিয়া থাকেন; জাপানী ভাষায় এইগুলিকে "তান্‌কা" বলে। তান্‌কার পাঁচ পংক্তিতে সাধারণতঃ একত্রিশটি মাত্রা থাকে।

'...জাপানী কবিতা জাপানী শিল্পের মত অনুভবের সামগ্রী; ইহা ইঙ্গিতে অনেকখানি বলে, ফুটিয়া বলে অল্পই।'

'তুলির লিখন'-এর ভূমিকায় এবং 'কুহু ও কেকা'র দু'একটি কবিতায় সত্যেন্দ্রনাথের চোখের অসুখের উল্লেখ দেখা গেছে।[৩৮] 'কুহু ও কেকা'র 'সফল অশ্রু', 'প্রার্থনা', 'আকিঞ্চন' প্রভৃতি কবিতাতে কবি-মনের অধ্যাত্মবোধ রূপ পেয়েছে। শারীরিক অসুস্থতা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আসন্ন মৃত্যুর ছায়া ঘনীভূত হচ্ছিলো তাঁর মনে। সে সময়ের নানা সাময়িক পত্রে রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি' প্রভৃতির অধ্যাত্মভাবময় নানা কবিতা ছাপা হচ্ছিলো। দুর্বল, ব্যাকুল, মৃত্যুছায়া-তাড়িত ব্যক্তিগত জীবনের অসহায়-বোধের প্রেরণায় রবীন্দ্রভক্ত কবি 'বৈকালী'র প্রথম স্তবকেই তাঁর চোখের অন্ধকারের কথা স্মরণ করেছিলেন। দ্বিতীয় স্তবকে তিনি বলে গেছেন—

নিষ্প্রভ আঁখি
নিখিলে নিরখে কালি
মন রে আমার
সাজা তুই বৈকালী,—
সন্ধ্যামণির ডালি।

তৃতীয় স্তবকে—

দিনে দু'পহরে
সৃষ্টি যেতেছে মুছি;
দৃষ্টির সাথে
অশ্রু কি যায় ঘুচি'?
হায় গো কাহারে পুছি।

উনিশের স্তবকে সমর্পণের সুর আরো স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল—

আঁখি নিয়ে যদি
ফুটাও মনের আঁখি
তাই হোক ওগো
কিছুই রেখনা বাকি;
উদ্বেল চিত্তে ডাকি।

৩৮। 'কুহু ও কেকা'র 'ভিক্ষা'-কবিতাটিতে 'চোখে যখন দেখতে না পাই ভালো,—দুচোখ যখন চোখের জলে ভরে' উক্তিটি কেবল মনশ্চক্ষুরই স্মারক নয়, চর্মচক্ষুর ক্ষীণ শক্তির ইঙ্গিত এবং তাঁর শারীরিক অসুস্থতার মর্মপীড়ার চিহ্নও এতে লক্ষ্য করা যায়।

বাইশের স্তবকে আবার বলেছিলেন—

চোখের বদলে
পাব চক্ষের মণি
দৃষ্টি চিরন্তনী।

সত্যেন্দ্রনাথের অনুভূতিপ্রধান কবিতাগুলির এই বিশেষ লক্ষণটি সুপরিস্ফুট হয়েছে 'অভ্র-আবীর'-এর 'বৈকালী'তে। 'কুহু ও কেকা' থেকেই নিজের দৃষ্টিক্ষীণতা সম্বন্ধে তাঁর অনুশোচনা শুরু হয়েছে। 'অভ্র-আবীরে' তারই তুল্যানুভূতি। 'বেলা শেষের গান'-এ এবং 'বিদায়-আরতি'-তে সংকলিত শেষ পর্বের কবিতাগুচ্ছে এই চেতনার বিশেষ চিহ্ন নেই। 'কুহু ও কেকা' এবং 'অভ্র-আবীর' বই দু'খানির অধ্যাত্মভাব-প্রধান অনেক লেখাতেই কোনো-না-কোনো ভাবে চোখের প্রসঙ্গ দেখা দিয়েছিল।[৭৯]

রবীন্দ্রনাথের 'বৈকালী' কবিতাগুচ্ছের প্রকৃতি যদিও অন্যরকম, তবু তাঁর এই গ্রন্থ-নামটি 'অভ্র-আবীর'-এর পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সে কথা আগেই বলা হয়েছে। তা'ছাড়া তাঁর এ-'বইয়ের 'রূপনারায়ণ'-এর পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথের অন্তিম কবিতাগুলির অন্যতম 'রূপ-নারানের কূলে' (রচনাকাল: ১৩ মে, ১৯৪১) বিশেষ ভাবে মনে পড়তে পারে। রবীন্দ্র-মানসের কোনো এক মগ্ন লোকে সত্যেন্দ্রনাথের এই 'রূপনারায়ণ' কবিতাটির ভাব-স্পন্দন সঞ্চিত থাকা অসম্ভব নয়। রূপনারায়ণ নামের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ যে ব্যঞ্জনা অনুভব করেছিলেন, দীর্ঘকাল পরে গুরু রবীন্দ্রনাথ হয়তো তাকেই দিয়েছিলেন ভিন্ন পরিণতি,—রূপনারায়ণের সেই পূর্বদৃষ্ট রূপ থেকেই হয়তো রবীন্দ্রনাথের রূপক-কবিতার নিবিড়তর রসধ্বনি জেগে উঠেছিল।

রূপ-নারানের কূলে জেগে উঠে মৃত্যুশয্যাশায়ী রবীন্দ্রনাথ 'রক্তের অক্ষরে' আপনারই রূপ দেখেছিলেন। তাঁর সে-উপলব্ধিটি এই রকম—

৭৯। 'কুহু ও কেকা'র 'দুর্দিনে', 'অভয়', 'সংশয়', 'সফল অশ্রু', 'প্রার্থনা', 'ভিক্ষা' 'আকিঞ্চন', নিশান্তে',—'অভ্র-আবীর'-এর, 'হায়—তোমার আমি কেউ নহি গো', 'আহা কই গো ধ্রুব অভয় শরণ' ইত্যাদি গান ও 'বৈকালী', 'হেলাফুল' ইত্যাদি কবিতা তুলনীয়। এইসব রচনায় সর্বত্র তাঁর দৃষ্টিহ্রাসের উল্লেখ বা অনুশোচনা মুখ্য নয়,—তবে, বার বার তিনি 'আঁখি', 'নয়ন', 'চক্ষু', 'অন্ধ', 'অশ্রু', ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করে গেছেন।

চিনিলাম আপনারে
আঘাতে আঘাতে
বেদনায় বেদনায় ;
সত্য যে কঠিন,
কঠিনেরে ভালোবাসিলাম,
সে কখনো করে না বঞ্চনা।
আমৃত্যুর দুঃখের তপস্যা এ-জীবন,
সত্যের দারুণ মূল্য লাভ করিবারে,
মৃত্যুতে সকল দেনা শোধ করে দিতে।

সত্যেন্দ্রনাথের কবিতায় বেদনা, যন্ত্রণা বা রক্তাক্কর-মৃত্যুর উল্লেখ নেই। তিনি দেখেছিলেন প্রশান্তি ও বিস্তার,—অনুভব করেছিলেন অতলস্পর্শ ভাব,—রূপনারায়ণ তাঁর 'আত্মার সতীর্থ' হয়ে উঠেছিল!

· কে তোমারে দিল নাম? কোন্ গুণী? রূপনারায়ণ!
কে দেখিল দিব্য চোখে নীর-শায়ী রূপ-দেবতায়?
সে কোন্ বিস্মৃত কবি? পরশিল একটি কথায়
ভাবের অতলস্পর্শ, অর্পিল প্রাণের রসায়ন
গোত্রহীন নীরধারে?

বিস্মৃত কবির দেওয়া 'রূপনারায়ণ' নামটির মধ্যে তিনি পেয়েছিলেন কান্ত সমুদ্রের, শান্ত দেবতার উপলব্ধি!

আকাশের ছবি বুকে,—তুমি যেন আকাশেরি আধা
মহাশান্তি মহাব্যাপ্তি আত্মার সতীর্থ তুমি বুঝি!

'অভ্র-আবীরের' মধ্যে মনীষীমঙ্গল, নিসর্গবন্দনা এবং রূপোল্লাসের দিক ছাড়া ব্যঙ্গ-কৌতুক ও পরিহাস-বিদ্রূপের অস্ফুট, অনতিব্যক্ত আর-একটি ধারার ঈষৎ প্রকাশ দেখা যায় 'বিশ্রাম-ঘাটে', '৺বৃন্দাবনে', 'ঊর্দ্ধ্ববাহুর প্রেম', 'বনমানুষের হাড়'—এই চারটি কবিতায়; প্রথম দুটিতে অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট ভাবে, শেষের দু'টিতে তির্যক ভাবে। প্রসঙ্গবৈচিত্র্যের দিক থেকে 'অভ্র-আবীর'-এর এই চারটি দিকই মুখ্য।

যে বছর 'অভ্র-আবীর' প্রথম ছাপা হয়, তার পরের বছর,—১৩২৩ সালের ভাদ্র-আশ্বিনের 'ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলনে' ডক্টর নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের 'ভাষার

আকার ও বিচার' নামে একটি প্রবন্ধ ছাপা হয়। পৌষ সংখ্যার 'ভারতী'-তে সেই লেখাটির প্রশংসা বেরিয়েছিল। বাংলায় ব্যাপক-ভাবে সাহিত্য ও ভাষা-সংক্রান্ত আলোচনা তার কিছু আগেই শুরু হয়েছিল। নবকুমার কবিরত্ন 'মাতৃভাষা কি পেত্নীভাষা' নামে প্রবন্ধ লিখেছিলেন ঐ বছরের 'ভারতী'-তে। 'অভিভাষণ না অতিভাষণ' নামে তাঁর আর একটি লেখা ছাপা হয় 'ভারতীর' ভাদ্র সংখ্যায়। তাতেও বাংলা ভাষার সাহিত্যগ্রাহ্য শব্দসম্ভারের বিষয়ে তর্ক-বিতর্ক ছিল। আশ্বিনের 'ভারতী'-তে নবকুমার লিখেছিলেন 'অতি পাণ্ডিত্যের উপদ্রব'। কার্তিকের 'ভারতী'-তে ছাপা হয় প্রমথ চৌধুরীর আলোচনা—'বঙ্কিমচন্দ্রের লিপি রীতি বনাম সবুজ পত্র'। এই লেখাটির কিছু আগে বেরিয়েছিল বিজয়চন্দ্র মজুমদারের প্রবন্ধ। 'ভারতী'র পৌষ সংখ্যায় নবকুমার পুনরায় লিখেছিলেন—'যুগোত্তর সাহিত্য'। বাংলা-সাহিত্যের শব্দকথা, রীতিবৈচিত্র্য, আদর্শ ও বস্তুচিন্তার সংঘাত ইত্যাদি বিষয় সে সময়ে ছোটো-বড়ো অনেক বাঙালী সাহিত্যিকেরই বিশেষ চিন্তার সামগ্রী ছিল। তখনকার অনেক প্রবন্ধেই এসব কথা বার-বার আলোচিত হয়েছে। ১৩২৩ সালের বৈশাখ সংখ্যার 'ভারতী'-তে 'ভারতী'র চল্লিশ বছরের ইতিহাস উপলক্ষ্য করে রবীন্দ্রনাথ 'তখন ও এখন' নামে তাঁর প্রসিদ্ধ প্রবন্ধটি লিখেছিলেন। সেই প্রবন্ধে সমকালীন বাঙালী সাহিত্য-সমালোচকদের একটি আদর্শ দেখিয়ে দেওয়া হয়েছিল। প্রথমতঃ তিনি জানিয়েছিলেন যে, বাংলা সাহিত্য তখনো 'পাকা বয়সের সাহিত্য' হয়ে ওঠে নি; দ্বিতীয়তঃ সমালোচনার আদর্শ সম্বন্ধে তিনি বলেছিলেন—

> এইজন্য আমার মতে বাংলা সাহিত্যে কঠোর সমালোচনার দিন আসে নাই। যে লেখা ভালো বলিতে পারিব না তাহার সম্বন্ধে চুপ করিয়া যাইতে হইবে।

রবীন্দ্রনাথের এই লেখাটির প্রায় এক বছর আগে ১৩২২-এর আষাঢ় সংখ্যার 'নারায়ণ' পত্রিকায় যতীন্দ্রমোহন সিংহ বীরবলী ভাষার বিরুদ্ধে আলোচনা করেন। ঐ মাসের 'সবুজপত্রে' প্রমথ চৌধুরী তার জবাব দেন 'ভাষার কথা' প্রবন্ধে। যতীন্দ্রমোহন সিংহের সাহিত্য-রুচিগত বিশেষ মর্জি সম্বন্ধে কটাক্ষ করে প্রমথ চৌধুরী লিখেছিলেন—

> তাঁর প্রবন্ধ পড়ে আমার শুধু এই মনে হয় যে, মানুষের বোঝবার ক্ষমতার সীমা আছে, কিন্তু তার না বোঝবার ক্ষমতা অসীম।৪০

৪০। 'সবুজ পত্র'—আষাঢ়, ১৩২২; পৃঃ ২০১ দ্রষ্টব্য।

এই উক্তি থেকে সেকালের সমকালীন সাহিত্য-সমালোচনার ঝাঁজটুকু অনুমান করা কঠিন নয়। সম্ভবতঃ এই রকম উক্তি-প্রত্যুক্তি দেখেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'তখন ও এখন' প্রবন্ধের উপসংহারে লিখেছিলেন—

> অন্য ক্ষেত্রের কথা বলিতে পারি না কিন্তু সাহিত্য-সমালোচনার ক্ষেত্রে এই উপদেশটি অমূল্য :—
>
> সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ ন ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ং
> প্রিয়ঞ্চ নানৃতং ব্রূয়াৎ এষ ধর্মঃ সনাতনঃ ॥

১৩২২-এর 'সবুজপত্রে' 'ঘরে বাইরে' ছাপা হচ্ছিলো। এই বইখানিকে উপলক্ষ্য করে তদানীন্তন সাহিত্যানুরাগী সমাজে Ibsenism সম্বন্ধে বহু বাদানুবাদ দেখা দেয়। অন্যদিকে 'নারায়ণ' পত্রিকায় চিত্তরঞ্জন দাস 'বাংলার গীতিকবিতা' প্রবন্ধে চণ্ডীদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিদের এবং প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা গীতিকাব্যের প্রশংসা করছিলেন। সেইসূত্রে রবীন্দ্রনাথের রীতি এবং আদর্শ সম্পর্কে তাঁর উৎসাহমান্দ্য বুদ্ধিমান পাঠকের চোখ এড়িয়ে যেতে পারে নি। আবার ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আরো কেউ কেউ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের কথা থেকে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের প্রসঙ্গে গিয়ে পৌঁছেছিলেন।[৪১] প্রমথ চৌধুরী ১৩২২ সালের 'সবুজ পত্রে' সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রের কথা তুলে বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা সম্বন্ধে বীরবলী কটাক্ষ নিক্ষেপ করেছিলেন—

> দুর্গেশনন্দিনী প্রভৃতি বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম বয়সের কাব্যসকল ইঙ্গ-গৌড়ীয় রীতিতে এবং সীতারাম প্রভৃতি তাঁর কাব্যসকল বৈদর্ভী রীতিতে রচিত। দুর্গেশনন্দিনীর গদ্য বিভক্তিহীন সংস্কৃত ভাষায় লিখিত আর সীতারামের গদ্য মাতৃভাষায় লিখিত।[৪২]

এই লেখাটির অল্প আগেই তাঁর 'বর্তমান বঙ্গসাহিত্য' ছাপা হয়েছিল। সাহিত্য-আলোচনার এই ব্যাপক উৎসাহের মধ্যে বাস করার ফলে সে-কালে নবকুমার কবিরত্নের কলমের আর বিরাম ছিল না। ক্রমশঃ সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর গদ্য-প্রবন্ধগুলির যেমন সংখ্যা বাড়ছিল, তেমনি পদ্যে তিনি ব্যক্তি, সমাজ ও প্রতিষ্ঠানাদির বিষয়ে ব্যঙ্গ-সমালোচনা লিখছিলেন। ১৩২৩ সালের

৪১। 'ভারতবর্ষ'—চৈত্র, ১৩২৩ : সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য—ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

৪২। 'সবুজ পত্র'—অগ্রহায়ণ, ১৩২২ : অলঙ্কারের সূত্রপাত—প্রমথ চৌধুরী ; পৃঃ ৫০৫।

কার্তিকের 'ভারতী'তেই এরকম দুটি পদ্য রচনা ছাপা হয়েছিল—'শ্রীশ্রীবস্তুতন্ত্র-সারঃ' এবং 'সিগার সংগীত'। তারপর মাঘের 'ভারতী'তে ছাপা হোলো 'কেরাণীস্থানের জাতীয় সংগীত'। নবকুমার কবিরত্নের কলম থেকে কয়েক বছরের মধ্যেই এই রকম অনেকগুলি পদ্য নিঃসৃত হোলো। সেই লেখাগুলিই গ্রন্থাকারে দেখা দিলো 'হসন্তিকা'-র মধ্যে (জানুয়ারি ১৯১৭, পৌষ পার্বণ, ১৩২৩)। এই বইখানির মোট পঁয়ত্রিশটি কবিতার মধ্যে ১৩২০-র আষাঢ় সংখ্যার 'প্রবাসী'-তে প্রথম প্রকাশিত 'রাত্রি-বর্ণনা'ও জায়গা পেয়েছে। অতএব নবকুমার কবিরত্নের নামে প্রকাশিত এই লেখাগুলির রচনাকাল যে মাত্র ১৩২২-২৩ সালের সীমাবন্দী নয়, সে কথা সুস্পষ্ট। এই সংকলনের পরে নবকুমারের আর কোনো পদ্যরচনা যে ছাপা হয়নি, তাও নয়। ১৩২৬ সালের চৈত্র-সংখ্যার 'ভারতী'তে তাঁর 'বিকর্ণ কি ঘণ্টাকর্ণ' বেরিয়েছিল।[৬৩] ১৩২২-২৩ সালের কিছু আগেও যেমন, কিছু পরেও তেমনি, এই ধরনের পদ্য-রচনায় তিনি একই ভাবে নিযুক্ত ছিলেন।

'হসন্তিকা' উৎসর্গ করা হয় 'সরল-সাহিত্য-সংরচনায় সুকৌশলী, সাহিত্য-বস্তুর বিচার বিচক্ষণায় সু-কৌঁসুলী', 'সবুজপত্রের' সম্পাদক প্রমথ চৌধুরীর নামে। নবকুমার কবিরত্নের কবিতার বইয়ের ভূমিকা লেখেন তাঁরই 'অত্যাগ-সহন বন্ধু, অভিন্ন হৃদয়' সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। ছদ্মনামের সঙ্গে আসল নামের অধিকারীর সম্পর্কটি সুকৌশলে বুঝিয়ে দিয়ে সমকালীন বাংলা সাহিত্য-সমালোচনার পূর্বোক্ত বাদানুবাদ ও অধিকার-অনধিকার সম্পর্কিত ব্যাপক চিন্তদাহের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছিল এই ছন্দোবদ্ধ কৌতুকধর্মী ভূমিকারই এক অংশে—

> কসে লিখুক সেরেস্তাদার সাহিত্যের টীকা ;
> কানুন-গোয়েরা কাব্য-কাননে চরুক।

এখানকার উৎসর্গের ভাষায় বীরবলী শ্লেষ-যমকের প্রভাব স্পষ্ট। 'হসন্তিকা'র মধ্যে বীরবলের রচনারীতি যে বিশেষ ছায়া ফেলেছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। বীরবল ভারতচন্দ্রেরও ভক্ত ছিলেন,—ফরাসী পরিহাস-রীতির দিকেও তাঁর আগ্রহ ছিল। নিজের রীতির কথা বলতে গিয়ে তিনি

৬৩। 'বিদায় আরতি' দ্রষ্টব্য।

'কৃষ্ণনাগরিক' বিশেষণটি ব্যবহার করে গেছেন।[৪৪] দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের হাসির গানের তিনি ছিলেন বিশেষ ভক্ত। কৃষ্ণনগরের কথা প্রসঙ্গে তিনি নিজেই লিখে গেছেন—

> আমার লেখার ভিতর যদি বাক্‌চাতুরী থাকে ত তার জন্ত আমি কৃষ্ণনগরের কাছে ঋণী।...সেকালের যারা ছোকরা ছিল, তাদের মধ্যে দু'জন লেখক বলে স্বীকৃত হয়েছেন,—দ্বিজেন্দ্রলাল আর আমি। আমরা দুজনেই কৃষ্ণনাগরিক। আমাদের দু'জনেরই লেখায় আর যে গুণের অভাব থাক্—রসিকতার অভাব নেই।

সত্যেন্দ্রনাথের নবকুমার-স্বাক্ষরিত পদ্যরচনাবলীতে প্রমথ চৌধুরী এবং দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, উভয়েরই প্রভাব পড়েছে। সাহিত্যের এই অঞ্চলের যশঃপ্রার্থীরা সে যুগে প্রধানতঃ দ্বিজেন্দ্রলালের হাস্যপরিহাস-খ্যাতির আদর্শেই কম-বেশি আকৃষ্ট হতেন। কান্তকবি রজনীকান্ত সেনও দ্বিজেন্দ্রলালের অনুকরণ করে গেছেন। পণ্ডিত, রসিক এবং বুদ্ধিনিষ্ঠ লেখক হিসেবে সে সময়ে প্রমথ চৌধুরী বিশেষ প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর কুটুম্বিতার সম্পর্ক তো ছিলই, তা'ছাড়া দ্বিজেন্দ্রলাল এবং রবীন্দ্রনাথ, উভয়েরই অনুরাগী কৃতবিদ্য সাহিত্য-রসিক হিসেবে লোকেন পালিতের মতো তাঁরও প্রতিষ্ঠা ছিল। প্রমথ চৌধুরীর দ্বিজেন্দ্রপ্রীতির প্রভাব পড়েছিল সত্যেন্দ্রনাথের নবকুমারী'-রচনায়। 'অভ্র-আবীরে' প্রকাশিত 'সবুজ পাতার গান' ১৩২১-সালের 'সবুজ পত্রে'র বৈশাখ সংখ্যায় প্রথম যখন ছাপা হয়, তখন প্রমথ চৌধুরী এই কবিতাটির শেষ চরণে ব্যবহৃত 'যৌবনে দাও রাজটীকা'-অংশের ভাব নিয়ে তাঁর প্রসিদ্ধ একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। প্রমথ চৌধুরীর ভক্ত সত্যেন্দ্রনাথ যে প্রমথ চৌধুরীর প্রিয় কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'আষাঢ়ে', 'মন্দ্র', 'আলেখ্য' ও 'হাসির গান'-এর প্রভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। 'তানুকা-সপ্তক'-এর মধ্যে তিনি 'মন্দ্র'নামটি বিশেষভাবে উল্লেখ করেছিলেন এবং দ্বিজেন্দ্রলালের শিল্পিসত্তার নির্ভরযোগ্য পরিচয় দিয়েছিলেন অল্প কয়েকটি কথায়—

> ফেনিল হাস্য
> সাগরের মতো তার;

৪৪। আত্মকথা—প্রমথ চৌধুরী ; পৃঃ ১৭-১৮ দ্রষ্টব্য।

বিলাস, লাস্য,
হুঙ্কার, হাহাকার
মিলে মিশে একাকার !

নবকুমারের গদ্যে নয় বটে, কিন্তু পদ্যে নিঃসন্দেহে দ্বিজেন্দ্রলালের প্রভাবের চিহ্ন আছে। দ্বিজেন্দ্রলালের মতন তিনিও ছিলেন স্পষ্টবাদিতার ভক্ত এবং অত্যধিক নমনীয়তার বিরোধী। বাংলা কবিতার ভাষায় গতিশক্তির কৌশল দেখিয়ে,—যথেচ্ছ ছন্দ সৃষ্টির অভিনবত্বের বৈশিষ্ট্যে,—এবং সর্বোপরি চেষ্টাহীন সৌন্দর্যের সঙ্গে স্বাভাবিক সবলতার যোগ ঘটিয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল বিশেষ কৃতিত্বের অধিকারী হয়েছিলেন। 'মন্দ্রের' সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথই এ-কথা প্রথম সুন্দর ভাবে স্বীকার করে দ্বিজেন্দ্র-কাব্যে (বিশেষতঃ 'মন্দ্র' সম্পর্কে) পৌরুষ-ধর্মের প্রাধান্য স্বীকার করেছিলেন।[৪৫] নবকুমার দ্বিজেন্দ্রলালের প্রথম দুটি গুণের অংশীদার ছিলেন। 'হসন্তিকা'-য় শেষেরটি কিঞ্চিৎ মাত্র প্রকাশিত। দ্বিজেন্দ্রলালের রবীন্দ্র-স্বীকৃত এই গুণগুলির দিকে নবকুমারের আন্তরিক টান ছিল,—'হসন্তিকা' সে বিষয়ে নিশ্চিত প্রমাণ। 'আষাঢে'-র কবি লিখে-ছিলেন, 'বাঙ্গালী-মহিমা', 'কেরানি', 'ভট্টপল্লীতে সভা', 'ডিপুটি-কাহিনী', 'রাজা নবকৃষ্ণ রায়ের সমস্যা', 'নসীরাম পালের বক্তৃতা' ইত্যাদি বাঙালীর প্রাত্যহিক জীবনের খণ্ড-খণ্ড দৃশ্য আর তার স্বভাববৈশিষ্ট্যের কৌতুকপ্রদ কবিতা। 'হাসির গানে'-র 'ইরাণ দেশের কাজী'-কে অতি সাবলীল কৌতুকের সুরে বলতে শোনা গেছে—

আমরা সবাই দেখেছি ইমাম বিচার করিয়া সূক্ষ্ম—
ইমাম সবাই বুদ্ধিমান, আর পার্শী সবাই মূর্খ,
পার্শীর তবে হইল রদ—ব্যতীত কুলী ও কেরানি পদ,
হাকিম হাকিম হইবে সবাই হোসেন হাসেন হাজী।
দাদাভাই হোক জিজিভাই হোক কারসেট্‌জী কি মেটা—
আজ থেকে তবে ঠিক হ'য়ে গেল—সবাই সমান বেটা,
তবে, যে বেটা বলিবে, "হাঁ হাঁ তা হোক", সে বেটা কতক ভদ্রলোক,
আর, যে বেটা বলিবে, "তা না না না না না", সে বেটা বেজায় পাজী।

জাতীয়তা ও আত্মমর্যাদাবোধের সেই প্রবল উদ্দীপনার যুগে বিদেশী সরকারের চোখে যাঁরা কেবল 'কুলী ও কেরানি পদের' জন্য নির্দিষ্ট ছিলেন, দ্বিজেন্দ্রলাল

৪৫। 'বঙ্গদর্শন', কার্তিক, ১৩০৯।

তাঁদের দুঃখকে সরস হাস্যচ্ছটায় মহিমান্বিত করেছেন,—কাজীর বিচারের নির্বোধ অসংগতিকে প্রয়াসহীন ব্যঙ্গবাণে সর্বসাধারণের উপহাসের সামগ্রী করেছেন। সত্যেন্দ্রনাথের 'হসন্তিকা'-র 'ছুঁচো-বাজীর দর্শক' কবিতাটির বিষয়বস্তু ঠিক এই-ই নয় বটে, কিন্তু সুরটি সদৃশ। নবকুমার লিখেছিলেন—

মজা দেখি আমরা তফাৎ হ'তে
গুটিয়ে কোঁচা চুটিয়ে বেদম
লুটিয়ে হাসি নানান্ মতে!

দৈবে যদি কভু নিজের কোঁচা
পোড়ায় ছুঁচা চুপে বল্‌ব 'ওঁচা'
নইলে মোরা কেবল করব তারিফ
(মিলে) হাকিম-হুকিম-কোটাল-কাজী
কোড়ে চাষা ঘাটের মাঝি
বলব সবাই "বাঃ বা! বা! জী!"
পণ্ডিত-পিয়ন সমান রাজী!

তদানীন্তন বাঙালী-জীবনের,—তথা ভারতীয়-জীবনের দুঃখ-দুর্বলতা উদ্‌ঘাটনের পরিহাস-রঞ্জিত লক্ষ্য এবং দায়িত্ব নিয়েই নবকুমার তাঁর কলম ধরেছিলেন এবং এই বিভাগে দ্বিজেন্দ্রলালকেই তিনি গুরু বলে স্বীকার করেছিলেন। তাঁর এই গ্রন্থ-নামটির ব্যাখ্যা আছে নিচের ক'টি চরণে—

হসন্তিকা-য় আগুন পোহায় কাশ্মীরী,
ঝাঁঝরা-ফুটো ঢাক্‌নিটা তার, বুকের ভিতর রাঙা আঙার,
ফুটোয় ফুটোয় হাসির ছটা—ভায় আঁধারের বুক চিরি,'
আঁচ লাগে গায়—আরাম তবু—ছেলে বুড়োয় রয় ঘিরি।

বইয়ের শেষ কবিতা 'হসন্তিকা'তে তিনি বলে গেছেন—

'বন্ধু, ঘনিয়ে বস শীতের রাতে
হসন্তিকার পাশে,
'জলদ্-বহুচ্ছিদ্র' যাহার
দাঁতের মতন হাসে।

হসন্তিকা—আঙারধানী—
চান্‌কে তোলে মন,
আঁচ লাগিলেও আরাম আছে
মজলিসীরা কন।

কাশ্মীরে শীত-নিবারণের জন্যে বুকের কাছে অগ্নিপাত্র রাখার রেওয়াজ আছে। সেই অগ্নিপাত্রের নাম হসন্তিকা। দুঃখ-দুর্দশার হিম-তাড়না থেকে আত্মরক্ষার জন্যেই কবি তাঁর দেশবাসীকে 'হসন্তিকার আঙারধানী' এই অগ্নিপাত্র দিয়েছিলেন। সাহিত্য, সমাজ, রাষ্ট্র, অথবা ধর্ম কোনো প্রদেশের কথাই এতে বাদ যায় নি। জীবনের নানান্ অসংগতির দিকে 'হসন্তিকা'র কবি তাঁর হাস্যবাণ উদ্যত রেখেছিলেন।

সেকালের বাংলা সাহিত্যে দেশীয় ভাব, প্রথা, আচার এবং আদর্শের আনুগত্যের নামে রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর অনুসরণকারী লেখকদের ভাবাদর্শ ও রীতিবৈগুণ্য (?) সম্পর্কে যাঁরা অভিযোগ করতেন, তাঁদের জবাব দিয়েছিলেন নবকুমার। 'হসন্তিকা'র 'কদলী-কুসুম'-এর কয়েক চরণ সেই সূত্রে বিশেষ স্মরণীয়—

রসনার তোলে করি সৌন্দর্য বিচার,
(ও গো) সমালোচকের দল! প্রসীদ এবার।

"অন্ধ অনুকারী" যত বঙ্গ কবিবর,
(আহা) তাই হয় নাই মোচা তোমার আদর।

উদয় হয়েছে চাঁই এবে অকস্মাৎ,
(জোরে) চেঁচায়ে যে ক'রে দিতে পারে বাজীমাৎ।

স্বভাব-কবি সে নহে—স্বভাব-ক্রিটিক্,
(ঠিক) টিক্‌টিকি সম সদা করে টিক্‌টিক্।

নিয়েছে সে তোর দিক 'উপেক্ষিতা' বলি'
(মরি) তোমারে মাথায় করি' ফিরে গলি গলি
হামেশা ফুকারি' ফিরে হামবড়া-চাঁই,
(বলে) 'হাম্বা' রবের বাড়া রব আর নাই!

সাহিত্যে বস্তুবাদের আদর্শ প্রচার করাই যাঁদের প্রধান সাধনার বিষয় ছিল, তাঁদের লক্ষ্য করে নবকুমার লিখেছিলেন 'শ্রীশ্রীবস্তুতন্ত্রসার'—

(তাথ) কাব্য লেখ বস্তুতন্ত্র বাঁচিবে যত্তপি।
(ওগো) ফুল ছেড়ে কণ্ঠে গেঁথে পর ফুলকপি।
(বস্তু) তন্ত্র মতে গোলাপ চামেলি চাঁপা ওঁচা!
(আহা) ফুল বটে ফুলকপি আর ওই মোচা॥
(ছিছি) অবস্তু আতর কেন মাখ বাছাধন!
(হাঁ হাঁ) গন্ধ চাই? শিরে ধর শ্রীগন্ধমাদন॥

এর প্রায় কুড়ি বছর আগে প্রকাশিত দ্বিজেন্দ্রলালের 'হাসির গান'-এর সঙ্গে তুলনা করে দেখলে মনে হয় সত্যেন্দ্রনাথ যেন দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নেমেছিলেন। কবিতায় দুর্বোধ্য ভাবমগ্নতার বিরুদ্ধে কলম ধরে পূর্বগামী দ্বিজেন্দ্রলাল সেকালে লিখেছিলেন—

আমি একটা উচ্চ কবি, এমনই ধারা উচ্চ,—
শেলি, ভিক্টর-হিউগো, মাইকেল আমার কাছে তুচ্ছ।
আমি নিশ্চয় কোনোরূপে স্বর্গ থেকে চস্‌কে
পড়েছি এ বঙ্গভূমে বিধাতার হাত ফস্‌কে!
আমি লিখছি যে সব কাব্য মানবজাতির জন্যে,
নিজেই বুঝি না তার অর্থ, বুঝবে কি তা অন্যে!
আমি যা লিখেছি এবং আজকাল যা সব লিখছি;
সে সব থেকে মাঝে মাঝে আমিই অনেক শিখ্‌ছি।[৪৬]

সত্যেন্দ্রনাথের 'শ্রীশ্রীবস্তুতন্ত্রসার' অবশ্য ঠিক দ্বিজেন্দ্রলালের পাল্টা জবাব নয়। চিত্তরঞ্জন দাসের 'নারায়ণ' পত্রিকায় 'বাংলার গীতিকবিতা' নামে যে লেখাটি ছাপা হয়েছিল, বরং সেই লেখাটিরই কোনো কোনো অংশে নবকুমারের কলমের খোঁচা লেগেছে।[৪৭]

সমাজের দোষ-ত্রুটি-অন্ধতা-দৌর্বল্যের বিরুদ্ধে দ্বিজেন্দ্রলাল 'আষাঢ়ে' এবং 'হাসির গান' বই দু'খানিতে তো বটেই, তা ছাড়া অন্যত্রও অনেক লেখা লিখেছেন। সত্যেন্দ্রনাথের নবকুমারী পদ্যাবলীর মধ্যে 'আদর্শ বিয়ের কবিতা', 'মদিরা-মঙ্গল', 'কেরানি-স্থানের জাতীয় সঙ্গীত' ইত্যাদি রচনা এই

৪৬। কবি—'হাসির গান'; 'হাসির গানে'র প্রথম সংস্করণ ছাপা হয় ১৩০৭ বঙ্গাব্দে।
৪৭। 'নারায়ণ', মাঘ ১৩২৩ দ্রষ্টব্য।

একই প্রসঙ্গ-বিভাগের অন্তর্ভুক্ত এবং এই তিনটিই নিঃসন্দেহে দ্বিজেন্দ্রলালের স্মারক। বিবাহ ও দাম্পত্য বিষয়ে দ্বিজেন্দ্রলালের বহু রচনার মধ্যে 'স্ত্রীর উমেদার', 'প্রণয়ের ইতিহাস' (হাসির গান),—'অদল বদল', 'বৃদ্ধা কুমারী কাহিনী' ('আষাঢ়ে') প্রভৃতি লেখাগুলি ছিলো সকলের প্রিয়। বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ,—বিবাহের প্রতীক্ষা, মাধুর্য, তিক্ততা, নৈরাশ্য,—পুরুষের বিবাহ-কৃতিত্ব, নারীর বিবাহভাগ্য ইত্যাদি নানা প্রসঙ্গের সরস কল্পনাময় এই বিবাহকাব্যের সাক্ষাৎ প্রভাবের লক্ষণ দেখা যায় নবকুমারের 'আদর্শ বিয়ের কবিতা-'য়। নবকুমার অবশ্য এই বিষয়টির এতো বিভিন্ন দিক দেখেন নি। তিনি লিখে গেছেন—

(তুমি) মোটা হও, তাজা হও, হও ভাজা ঘিয়ে,
(তুমি) রাজা হও প্রজা হও করে নাও বিয়ে।

বিয়ে কর কচি খোকা হামা দিয়ে দিয়ে
বিয়ে কর দাঁত-পড়া দন্ত বাঁধিয়ে॥

(যত) পাকা চুল বিল্‌কুল কলপে কাঁচিয়ে
(আশী) বছরে করহ বিয়ে কাশিয়ে হাঁচিয়ে॥

(ওগো) বিয়ে কর বিয়ে কর কর অহরহ
(হোক) নাৎনী নাথ্‌নী আর পতি—পতিমহ॥

অতঃপর যথাক্রমে তিনি প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় পক্ষের সরস বর্ণনা দিয়েছেন। দ্বিতীয় পক্ষের গুণগানের মধ্যে শোনা গেল—

(ওগো) শাস্ত্রে কি বলে জানো কি তা প্রিয়ে
বলিব কি তাহা আজ?
(নিয়ে) যেতে যম-ঘরে দ্বিতীয়-পক্ষ
দ্বিতীয় পক্ষিরাজ!

তৃতীয়-পক্ষের দুর্দশা আরো ঘোরতর, সন্দেহ নেই—

(দুই) পক্ষ গেছে খ'সে গো যার—
ডানা-আ-কাটা—এসেছে সে!
(তার) ভর্সা কি আর? ভাস্যি কি আর?—
কপা-আল্-কাটা—এসেছে সে!

(আহা) মড়াকে প্রেমে যে মড়ার
বেজা-আর আঠা—এসেছে সে !

এই রচনার প্রায় পুরো দু'দশক আগে দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর 'Reformed Hindoos'-এর মধ্যে লিখেছিলেন—

About female education,
ও female emancipation,
আর infant marriage, আর widow remarriage
আমাদের খুব enlightened views ;
কিন্তু views মতে কাজ করি if you think,
তা'হলে you are an awful goose.

দ্বিজেন্দ্রলালের সামাজিক ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের কবিতাগুলির প্রভাব তো বটেই,—তাছাড়া তাঁর হাসির গানের প্রসঙ্গ, রুচি এবং রীতি,—এই তিন বিশেষত্বরই আনুগত্য দেখা যায় নবকুমারের লেখাতে। দ্বিজেন্দ্রলাল লিখেছিলেন 'দশ-অবতার' ; নবকুমার লিখেছেন 'দশা-বেতর স্তোত্র' ! পূর্বগামী কবির লেখাটি সংহত, সাবলীল, সুস্পষ্ট ; অনুবর্তী নবকুমারের লেখাটিতে প্রসঙ্গ একই, কিন্তু প্রয়াস উৎকট না হলেও অনায়াস আনন্দের প্রতিকূল। দৃষ্টান্ত হিসেবে 'দশা-বেতর স্তোত্রের' অষ্টম ও নবম স্তবক স্মরণীয়। যথাক্রমে কৃষ্ণ ও বুদ্ধ-অবতারের ইঙ্গিতই এই বিশেষ দুটি স্তবকের অভিপ্রেত ; কিন্তু, অতিকথনের দোষে কবির লক্ষ্য এখানে ঝাপ্‌সা হয়ে গেছে।

সেকালের শিক্ষিত বাঙালীর ধর্মচর্চা সম্বন্ধেও দ্বিজেন্দ্রলালের পরিহাসবাণ কুণ্ঠিত ছিল না। ভণ্ডামি, আচারসর্বস্বতা, মূর্খতার লালনে অহমিকার আস্ফালন—এইসব ক্ষীণদর্শিতার বিরুদ্ধে তিনি যেমন কলম ধরেছিলেন, তেমনি আবার পাশ্চাত্ত্য হাবভাবের অন্ধ অনুকরণের রুচি-বিকারও তাঁর লেখায় বারংবার তিরস্কৃত হয়েছে। 'হিন্দু'-কবিতাটিতে তিনি লিখেছিলেন—

এবার হয়েছি হিন্দু, করুণাসিন্ধু গোবিন্দজীকে ভজি হে।
এখন করি দিবারাতি দুপুরে ডাকাতি
(শ্যাম) প্রেম-সুধারসে মজি হে।
আর মুরগী খাই না, কেন না পাই না !...

* * *

আহা ! কি মধুর টিকি, আর্য ঋষি কি
(এই) বানিয়ে ছিলেনই কল গো।
সে যে আপনার ঘাড়ে আপনিই বাড়ে
(অথচ)—চতুর্বর্গ ফল গো।...

নবকুমারের 'হসন্তিকা'র প্রথম কবিতার নাম—'শ্রীশ্রীটিকিমঙ্গল'। 'মুল গায়েন' পালা শুরু করেছেন এই বলে—

ভো ভোঃ কারণ-সলিলে কুঁকুড়িসুঁকুড়ি
ডিম্বে যেমন হংস,
আহা ছিল চইতন-চুটুকি আদিতে
টিকি হয় যার বংশ !

দ্বিজেন্দ্রলালের 'তা সে হবে কেন', 'এমন ধর্ম নাই', 'গীতার-আবিষ্কার', 'বদ্‌লে গেল মতটা', 'চণ্ডীচরণ' প্রভৃতি কবিতার উজ্জ্বল হাস্যচ্ছটা নবকুমারের 'শ্রীশ্রীটিকিমঙ্গলের' প্রেরণা উৎসাহিত করেছিল। 'মঙ্গল' আখ্যায় শুধু টিকিমঙ্গল লিখেই তিনি ক্ষান্ত হন নি। 'মদিরা-মঙ্গল' নামে তাঁর আর একটি কবিতা আছে। দ্বিজেন্দ্রলালের 'বঙ্গ আমার জননী আমার' গানের সুরে লেখা সত্যেন্দ্রনাথের 'মদিরা-মঙ্গল'-এর প্রথম স্তবকটি এই রকম—

মদ্য আমার ! পানীয় আমার !
সরাব আমার ! আমার Peg !
কেন কোম্পানী নজর দিল গো !
কেন হল এই Duty Plague ?
কেন গো তোমার বাজার চড়িল ?
কেন গো ললাটে উদিল মেঘ ?
চৌদ্দ ভুবনে ভক্ত যাহার
ডাকে উচ্চ "আমার Peg !"
(কোরাস) কিসের দুঃখ কিসের চিন্তা
কিসের Duty কিসের মেঘ ?
Buy যদি নাই করে গো সবাই
Steal, Borrow কিবা করিবে Beg !

লেখাটির শিরোনামের নিচে বন্ধনীর মধ্যে এই মন্তব্য চোখে পড়ে—"লালপানির উপর অকস্মাৎ করবৃদ্ধি উপলক্ষে ভুক্তভোগীর খেদোক্তি"।

হাসির গানের কবি দ্বিজেন্দ্রলাল 'মত্তপ' নামে একটি কবিতা লিখেছিলেন। তবে সে রচনাটির আয়তন হ্রস্ব এবং তার প্রকৃতিও ভিন্ন! সত্যেন্দ্রনাথের লেখাটিতে বরং দ্বিজেন্দ্রলালের 'সুরা'-র কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে। 'সুরা'-ও হ্রস্ব আয়তনের রচনা। 'সুরা'র বক্তব্য হোলো—

> আহা, হৃদিরূপ এই বাক্স খুলিতে সুরাই একটি চাবি ;
> আর, বোতল খুলিলে খুলিবে হৃদয়—তা অবশ্যম্ভাবী রে !
> কোন থাকিবেনা ভেদ পাত্রাপাত্র, হিতাহিতবোধ—সেটা ;
> আর, শিকল ছিঁড়িয়া বেরিয়া পড়িবে কাম ক্রোধ দুই বেটা রে।

'হসন্তিকা'-র 'মদিরা-মঙ্গল' যেমন 'বঙ্গ আমার জননী আমার'-গানের ব্যঙ্গানুকৃতি (parody), 'সর্বশী' তেমনি রবীন্দ্রনাথের 'উর্বশী'-র ('চিত্রা') সুরে বাঁধা! জগদ্বন্ধু ভদ্রের ছুচ্ছুন্দরী-বধকাব্য (১ম সর্গ) [১২৭৫] থেকে আধুনিক বাংলা কবিতার প্যারডি-শাখার ক্রমানুশীলন শুরু হয়। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভারত উদ্ধার' (১৮৭৭) এই সূত্রে উল্লেখযোগ্য। বর্তমান শতকে সত্যেন্দ্রনাথ যখন এই শ্রেণীর কবিতায় মন দেন, সে-সময়ে আরো কেউ কেউ এ-কাজে হাত দিয়েছিলেন।

বিজয়চন্দ্র মজুমদার, রজনীকান্ত সেন, প্রমথ চৌধুরী, প্রমথনাথ রায়চৌধুরী, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি অল্পবিস্তর খ্যাতনামা অনেক কবিই সে যুগে রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলালের যুগ্মপ্রভাবে কিছু কিছু আকৃষ্ট হয়েছিলেন। সূক্ষ্ম, গভীর হৃদয়াবেগের দিকেই ছিলো রবীন্দ্র-কাব্যের বিশেষ ব্যাপক আকর্ষণ; লঘু ললিত স্ফূর্তি এবং রঙ্গ-ব্যঙ্গের দিকে ছিলো দ্বিজেন্দ্রলালের নেতৃত্ব। ভারতচন্দ্র ও দাশরথি রায়ের শ্লেষ-যমকের প্রতাপ কতকটা দ্বিজেন্দ্রলালের এইসব কবিতার মধ্যস্থতায়, এবং কিছু পরিমাণে প্রমথ চৌধুরীর বীরবলী গদ্যের গুণে অনুকরণকারী লেখকদের মজ্জায় প্রবেশ করেছিল।

রাষ্ট্র-অধিকারে বঞ্চিত স্ত্রী-জাতির দুঃখ-দুর্দশার কথা সে যুগে গদ্যে-পদ্যে নানাভাবে আলোচিত হয়েছে। পরিহাসহীন, গম্ভীর কবিতায় সত্যেন্দ্রনাথ নিজেও তদানীন্তন কোনো কোনো ঘটনা উপলক্ষ্য করে নারীর দুঃখমোচনের আবেদন প্রচার করেছিলেন। আবার 'সাফ্রাজেঠ-কৃত শ্যামাবিষয়', 'দোরোখা

একাদশী', 'পাতিল প্রমাদ'[৪৮] প্রভৃতি রঙ্গ-তীক্ষ্ণ লেখাগুলিও তাঁরই কলম থেকে নিঃসৃত হয়েছে। পূর্বগামী কবি দ্বিজেন্দ্রলালও এ-বিষয়ে নির্বাক ছিলেন না। 'তা সে হবে কেন' কবিতাটিতে সংশয়হীন স্পষ্টতার সঙ্গে তাঁর মন্তব্য উচ্চারিত হয়েছিল—

তোমরা চিরকালটা নারীগণে রাখবে পাঁচিল ঘিরে ?
—তা সে হবে কেন ?
তোমরা গহনা ঘুষ দিয়ে বশে রাখবে রমণীরে ?
—তা সে হবে কেন !
তোমরা চাও যে তারা বদ্ধ থাকুক, এখন যেমন আছে,
রান্নাঘরের ধোঁয়ায় এবং আঁস্তাকুড়ের কাছে ;
এবং তোমরা নিজে যাবে থিয়েটারে, নাচে ?
—তা সে হবে কেন !

'হসন্তিকা'-য় শ্যামা-কে আহ্বান করে নবকুমার জানিয়েছিলেন—

(ওগো) সিঙ্গি-চড়া ধিঙ্গি তুমি
পৌরাণিকী Suffragette !
(চোখে দেখছ নাকি তোমার লাগি'
মুরুব্বিদের মাথা হেঁট ?
(এখন) ইন্দ্র ফোঁসে "অন্দরে যাক্,—
সয় না মেয়ের মর্দানি !"
(আর) চন্দ্র ঘোষেন নারীর কেন্দ্রে
দেখাক্ নারী কার্দানি।..."

নবকুমার-ছদ্মনামে সত্যেন্দ্রনাথ গদ্য-পদ্য দুই-ই লিখেছিলেন। এখানে মুখ্যতঃ 'হসন্তিকা'র কথাই আলোচনা করা হোলো। তাঁর মৃত্যুর পরে প্রকাশিত 'বেলা শেষের গান' ও 'বিদায়-আরতি'—এই দুখানি বইয়েতেও নবকুমারের কিছু লেখা ছাপা হয়েছে। রীতি ও প্রসঙ্গ-প্রকৃতির বিচারে 'বেলা শেষের গান-এর' 'কাগজের হাতী', 'নাপ্তি-পীরিতি কথা', 'বেতালের প্রশ্ন'

৪৮। দোরোখা একাদশী—প্রথম প্রকাশ : 'প্রবাসী', আশ্বিন ১৩২৪ ; 'বিদায় আরতি'।
পাতিল প্রমাদ—'বিদায়-আরতি'।
সাফ্রাজেট-কৃত শ্যামাবিষয়—'হসন্তিকা'।

এবং 'বিদায়-আরতি'-র 'ঘোরোখো একাদশী', 'বিকর্ণ কি মর্কাকর্ণ', 'পাভিল-প্রবাদ', 'নরম-গরম-সংবাদ' ইত্যাদি লেখাগুলি 'হসন্তিকা'-র সগোত্র।

১৩২৩ সালের পরে,—অর্থাৎ 'অভ্র-আবীর' এবং 'হসন্তিকা' ছাপা হবার পরের কবিতাগুলিতে নতুন কোনো সম্ভাবনার প্রতিশ্রুতি নেই। ক্রমশঃ, তাঁর আগের লেখারই যেন পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। তথ্যের বর্ণনা,—প্রকৃতি এবং মানুষের কথা,—কচিৎ নবকুমারী পরিহাসের স্ফুরণ—এই অভ্যস্ত সামর্থ্যেরই নানাবিধ চর্চা চোখে পড়ে। ছন্দের দিকেও সমৃদ্ধি-পর্বের এই শেষ স্তরে পৌঁছে আর নতুনতর কোনো বৈচিত্র্যের আয়োজন দেখা যায় না। প্রকৃতি-বন্দনার দু'একটি কবিতা এই স্তরেও লেখা হয়েছিল বটে, কিন্তু 'ফুলের ফসল'-এর গীতি-নিবিড় প্রাচুর্যের দিনগুলি এখন অতীতের অতিক্রান্ত অধ্যায়। তাঁর মৃত্যুর পরে প্রকাশিত 'বেলা শেষের গান', 'বিদায়-আরতি' এবং 'শিশু-কবিতা'র অনেক লেখা ১৩২৩ সালের মধ্যেই বিভিন্ন সাময়িক পত্রে ছাপা হয়েছিল।[৪৯]

বাংলা বর্ণমালার প্রকৃত উচ্চারণের সঙ্গে লিখিত হরফের অসংগতি সম্পর্কে 'হসন্তিকা'র 'হরফ-রিপাব্লিক' লেখাটির পাশাপাশি ১৩২৩ সালে ছাপা নবকুমার কবিরত্নের 'স্বপ্নদর্শন' (বানান বিষয়ক) প্রবন্ধটি মনে পড়া স্বাভাবিক। এই কবিতা ও প্রবন্ধের মূলে ছিল সে সময়কার ব্যাপক বানান-চিন্তা।[৫০] ১৩২২ সালের চৈত্র সংখ্যায় 'প্রবাসী'তে বীরেশ্বর সেন বাংলা বানান সম্বন্ধে যে আলোচনা করেন, ১৩২৩-এর বৈশাখের কাগজে রবীন্দ্রনাথ তার জবাব লিখেছিলেন। সেই লেখাটির নাম 'বাংলা বানান'। জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় অজরনাথ ঘোষের 'ভাষার প্রকৃতি' নামে এ বিষয়ে আরো একটি লেখা ছাপা হয়। বিধুশেখর শাস্ত্রী, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং আরো অনেকে এই সময়ে বাংলা বানান-সমস্যার আলোচনা করেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বাংলা

৪৯। 'বেলা শেষের গান'-এর 'প্রণাম' (ভারতী, বৈশাখ, ১৩২৩)' 'অর্ঘ্যপঞ্চক' (প্রবাসী, বৈশাখ, ১৩২৩), 'দিল্লী-নামা' (প্রবাসী, ভাদ্র, ১৩২২) ইত্যাদি।

'বিদায়-আরতি'র 'জাক্‌রানিস্থান' (ভারতী, আশ্বিন, ১৩২৩), 'সেবাসাম' (প্রবাসী, চৈত্র ১৩২১), মহানামন্ ('প্রবাসী, পৌষ, ১৩২৩), 'দূরের পাল্লা' ('প্রবাসী', কার্তিক, ১৩২৩), 'গান', 'গুণী-দরবার', 'পরমায়' (তিনটিই 'প্রবাসী' জ্যৈষ্ঠ ১৩২২)।

৫০। 'প্রবাসী', শ্রাবণ, ১৩২৩ দ্রষ্টব্য।

'হরফ রিপাব্লিক' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩২৩ সালের কার্তিকের 'প্রবাসী'তে।

বানান' প্রবন্ধে 'ঙ' ও 'ঙ্গ'—এই দু'টি বর্ণের গোলমালের নিরসন করেছিলেন উপযুক্ত একটি ত্রিপদীর সাহায্যে। তিনি লিখেছিলেন—

> ঝিঙা না ভাজিয়া ভাজিলে ঝিঙ্গা
>
> ছন্দ তখনি ফুঁকিবে শিঙ্গা ॥

তারপর, সত্যেন্দ্রনাথ 'হরফ-রিপাব্লিকে' লিখলেন—

> কদর যোদের বোঝ যদি দেখাব কুদরৎ,
>
> কত কথায় করছি বিরাজ তিলে তৈলবৎ।
>
> এই না বলে 'ঙ' 'ঞ' শিঙায় দিল ফুঁ
>
> কাণ্ড দেখে অবাক,—কেউ আর বলে না হাঁ হুঁ।

নবকুমারের 'স্বপ্নদর্শন' (বানান বিষয়ক) তাঁর 'ছন্দ-সরস্বতী'-রীতিরই স্মারক। 'ছন্দ-সরস্বতী' ছাপা হয় ১৩২৫-এর 'ভারতী'তে। আত্মচিন্তামগ্ন স্বপ্নাবেশের মধ্যে তিনি যেন দেবী সরস্বতীর দর্শন পেয়েছেন, এই ভঙ্গি সৃষ্টি করে এই লেখাটিতে তিনি বাংলা ছন্দ বিষয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন। ছন্দ-সরস্বতীর 'ডিঙ্গা'য় উঠে কবি শুনেছিলেন দেবীর মন্তব্য—

> —তুমি আমার মকরাঙ্গী ডিঙ্গা দেখে, বোধ হয়, আমায় মকরবাহিনী গঙ্গা ঠাউরেছ। আমি গঙ্গা নই, আমি ছন্দ-সরস্বতী। আজ প্রায় হাজার বছর ধরে এমনি করে এই ডিঙ্গায় চড়ে গৌড়-বাংলার নদীতে নদীতে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

তাঁর বানান সম্পর্কিত স্বপ্নাবেশও একই রকম। কল্পনায় শিপ্রা নদীর তীরে পৌঁছে উজ্জয়িনীর শকুন্তলার কণ্ঠস্বর শুনতে শুনতে স্বপ্নাবিষ্ট কবি উপস্থিত হলেন বররুচির বৃক্ষবাটিকায়। আগন্তুক বাংলা দেশের একজন কবি, এই খবর পেয়ে বররুচি বাংলা বানান সম্বন্ধে আলোচনা শুরু করেন। কথা-প্রসঙ্গে তিনি এই কথা জানান যে—

> —আমি শুধুই কবি, কাজেই স্বভাবের দোষে প্রকৃতি এবং প্রাকৃতের ভক্ত। প্রাকৃতের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তার ভক্ত হয়ে পড়েছি, আর তার রসবোধে অন্যের সুবিধা হবে বলে প্রাকৃতের ব্যাকরণও রচনা করা গেছে।৫১

ভাষা, ছন্দ, সাহিত্যাদর্শ ইত্যাদি বিষয়ে নবকুমারের ছোটো বড়ো আরো কয়েকটি রচনার উল্লেখ এর আগেই করা হয়েছে। বাংলার নিজস্ব ছন্দ, শব্দ, এমন কি বানানের বিশিষ্টতার আলোচনায় তিনি ছিলেন বিশেষ আগ্রহশীল।

৫১। 'প্রবাসী', শ্রাবণ, ১৩২৩; পৃঃ ৪০২ দ্রষ্টব্য।

১৩২৩ সালের মধ্যেই এই সব ভাবনা নবকুমারের কলমে ভর করেছিল এবং তার পরে আরো কয়েক বছর এই প্রয়াস চলেছিল। অর্থাৎ সত্যেন্দ্রনাথের কবি-প্রকৃতি এবং তাঁর কাব্যরূপ ও কাব্যচিন্তার সমৃদ্ধিকালের মধ্যে ১৩১৭-১৮ থেকে ১৩২২-২৩ সাল পর্যন্ত পাঁচ বছরের যে অনুবিভাগটি পাওয়া যায়, সেই সময়টিকেই তাঁর ভাবনা-সাধনার তুঙ্গপর্ব বলা উচিত। 'অভ্র-আবীর' ও 'হসন্তিকা'—এই দু'খানিই তাঁর জীবিতাবস্থায় প্রকাশিত শেষ কাব্যগ্রন্থ। বাংলা কবিতায় দেশীয় বিশেষত্ব যথাসাধ্য অব্যাহত রেখে প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্য সব রকম কাব্যপ্রবাহের সংযোগ বরণ করে নেবার বিশেষ প্রস্তুতি ও সাধনাই ছিলো তাঁর জীবনের সাধনা। অনুবাদ-চর্চার মধ্যেও তাঁর এই সাধনাই ব্যক্ত হয়েছে।

১৩২৩-এর পরে প্রকাশিত লেখাগুলির মধ্যে কবিসত্তার এই বিচিত্র অভিমুখিতার সব দিকগুলিরই অল্পবিস্তর অভিব্যক্তি ঘটেছিল বটে, কিন্তু তাতে নতুন আর কোনো প্রয়াস নেই। প্রকৃতি-সম্পর্কিত যে কবিতাগুলি তিনি এই সময়ের মধ্যে লিখেছিলেন, সেগুলির সঙ্গে উত্তরকালের 'একটি চামেলীর প্রতি' ('প্রবাসী', মাঘ ১৩২৭), 'সিঙ্গলে সূর্যোদয়' ('প্রবাসী', পৌষ ১৩২৬), 'ঝর্নার গান' ('ভারতী' পৌষ, ১৩২৬) 'ঝর্না' ('ঝর্না' আষাঢ়, ১৩২৯), 'ময়ূর-মাতন' ('ভারতী' ভাদ্র, ১৩২৭), 'ভোয়াই', ('ভারতী' আশ্বিন, ১৩২৭), 'সাঁঝাই' ('প্রবাসী' কার্তিক, ১৩২৭), 'যুক্তবেণী' ('প্রবাসী' মাঘ, ১৩২৭) প্রভৃতি লেখাগুলি তুলনা করলে দেখা যায় যে, এই অনুপর্বে 'ফুলের ফসল'-এর ভাবব্যঞ্জনা অন্তর্হিত হয়েছিল। প্রথম চারটি লেখা ছাপা হয় 'বিদায়-আরতি'তে, শেষের চারটি 'বেলা-শেষের গান'-এ। তথ্যবর্ণনা, শব্দকৌশল, ছন্দ-মাধুর্য, রঙ্গব্যঙ্গ—'বেলাশেষের গান' ও 'বিদায়-আরতি'-র লেখাগুলিতে মুখ্যতঃ এই চার লক্ষণই দেখা যায়।

'বেলাশেষের গান'-এ (১৯শে অক্টোবর ১৯২৩) সংকলিত কবিতাবলীর মোট সংখ্যা পঁয়তাল্লিশ। 'বিদায়-আরতি'-তে (২ মার্চ ১৯২৪) সর্বসমেত বাহান্নটি কবিতা ছাপা হয়। 'অভ্র-আবীর'-এর পরে, অর্থাৎ ১৩২২ সালের বাসন্তী পূর্ণিমা (১৬ই মার্চ ১৯১৬) থেকে শুরু করে তাঁর মৃত্যুকাল অবধি যতো কবিতা তিনি লিখেছিলেন, 'হসন্তিকা', 'বেলাশেষের গান' এবং 'বিদায় আরতি'-র মধ্যে সেগুলি যে নিঃশেষে সংগৃহীত হয়েছে, তা নয়। এই

বইগুলির বাইরে আরো কবিতা ছড়িয়ে আছে বিভিন্ন পত্রিকায়। তবে, উল্লেখযোগ্য লেখাগুলি প্রায় সবই গ্রন্থভুক্ত হয়েছে এবং শেষের দু'খানি বইয়ে ১৩২১-২২ সালের লেখাও জায়গা পেয়েছে।

'বেলাশেষের গান' এবং 'বিদায়-আরতি'র কবিতাগুলি একত্র আলোচিত হওয়াই সমীচীন। কারণ, সবগুলিই হলো সমৃদ্ধি-পর্বের শেষ দিকের রচনা। প্রসঙ্গের বিভিন্নতা অনুসারে দু'খানি বইয়ের মোট সাতানব্বইটি কবিতা এই ক'টি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়:—(১) প্রকৃতি সম্পর্কিত, (২) পৌরাণিক কাহিনী-মূলক, (৩) দেশের সমকালীন রাজনীতি, সমাজ ও ধর্ম প্রাসঙ্গিক, (৪) রবীন্দ্রনাথ এবং অন্যান্য কবি ও প্রসিদ্ধ ব্যক্তির মহিমার স্বীকৃতি (৫) দুর্ভিক্ষ, বন্যা ইত্যাদি দুর্যোগ বিষয়ে, (৬) বুদ্ধদেবের ধর্ম ও জীবন সম্পর্কিত, (৭) বিবিধ।

১৯১৫-তে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কাশ্মীর-যাত্রার অল্পকাল পরেই ১৯১৬-সালে ছাপা হয় 'অভ্র-আবীর'। সেই বইটির শেষ দিকে 'জাফরানের ফুল' কবিতায় তিনি লিখে গেছেন—

> তবু হর্ষে আপন হারা মঞ্জু-মধুর
> ও যে নিশ্বাসে সিক্ত অনঙ্গ-বধূর,
> তারি গন্ধে আনন্দে বিমুগ্ধ মদির
> ও যে কস্তূরী কাশ্মীর-স্বর্ণমৃগীর !

'হসন্তিকা'র 'কাশ্মীরী কীর্তন' ও 'কাশ্মীরী ভাষা' কবিতা দু'টিতে আছে কাশ্মীর-প্রসঙ্গ। 'বিদায় আরতি'তে কাশ্মীরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সম্বন্ধে কবিতা আছে। জাফরানিস্থানের সৌন্দর্য বর্ণনায় কবির আন্তরিক উৎসাহ দেখা গেছে। শেষ কয়েক ছত্রে তিনি লিখে গেছেন—

> বরফি-কাটা ক্ষেতের পরে জাফরানের ফুল ফুটল রে;
> শিশির-জলে ঘুম-জড়ানো চোখের ঘুম কি টুটল রে।
> নীল-লোহিতের বিভূতি ওই লেগেছে আজ আস্‌মানে;
> লেগেছে যোস্‌মিনীর ফুলে, আর লেগেছে মোর প্রাণে,
> নীলের কোলে সোনার কেশর, নীল সুখেতে স্পন্দমান;
> নীল পাহাড়ের ফুলদানিতে প্রফুল্ল জাফ্‌রানিস্থান।

'জাফরানিস্থান'-এর এই রূপৈশ্বর্য বর্ণনার সঙ্গে 'সিঙ্গলে সূর্যোদয়'-এর

ছবিটি মিলিয়ে দেখা যেতে পারে। সেখানেও এই একই রকম অনুভূতি,—দুটি কবিতার মধ্যেই দৃশ্য-বর্ণ-ধ্বনির একই রকম বিলাস-বিলসন। সিঙ্কলে সূর্যোদয় দেখে তিনি বলেছিলেন—

প্রবাল-বাঁধা ঘাটের পারে তরল পদ্মরাগের নিলয় চিরে—
কে জাগে ? উদ্ভিন্ন করে কমল-যোনির জন্ম-কমলটিরে !
কে জাগেরে অরুণ-রাগে ব্যগ্র আঁখির পুরিয়ে বাঞ্ছা যত—
বাঘের চোখের আলোয় ঘেরা বরণমালা দুলিয়ে লক্ষ শত।
একি পুলক ! দ্যুলোক-ভরা ! আলিঙ্গিছে হর্ষে অনিবার
আমার চোখের চমৎকারে তোমার আলোর চির-চমৎকার !
রোমে রোমে হর্ষ জাগে, জগৎ ওঠে গেয়ে,
চির-আলোর সাগর দোলে চোখের আলোর সঙ্গটুকুন পেয়ে।

১৩২৩-সালের আশ্বিন সংখ্যার 'ভারতী'তে 'জাফরানিস্থান' ছাপা হয়েছিল। 'সিঙ্কলে সূর্যোদয়' তার পরবর্তী রচনা। এটি প্রথম ছাপা হয় ১৩২৫ সালের পৌষ সংখ্যার 'প্রবাসী'-তে। ইন্দ্রিয়-চেতনার উল্লাস এই দুটি লেখাতেই সুস্পষ্ট। দু'টিতেই শব্দের বিচিত্রতা এবং দৃশ্য ও উপকরণের ঐশ্বর্য আছে। তবে, ভাবের সঙ্গে ধ্বনির যথাযথ সংগতির অভাব 'সিঙ্কলে সূর্য্যোদয়'-এর মধ্যে কিছু বেশি চোখে পড়ে।

সীমার সমাধ আকাশ অগাধ ডিম্ব হেন বিশ্ব-ভুবন ঘিরে
সুপ্তি ঘেরা জন্ম-কোষে ভ্রূণ গরুড় পোষে হিমাদ্রিরে।
হারিয়ে গেছে হাওয়ার চলা, নিশাস ফেলা ফুরিয়ে গেছে যেন…

এই বর্ণনায় ধ্বনির রম্যতা ভাবের স্তব্ধতাকে লঙ্ঘন করে গেছে! 'হাওয়ার চলা' বন্ধ হয়ে যাওয়ার নিস্পন্দতা কবি সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করতে পারেন নি। ধ্বনিচারুত্বের দিকে তাঁর আগ্রহের বাড়াবাড়ি ঘটেছে।

এ অবশ্য সত্যেন্দ্রনাথের স্বভাব। আগের যুগের লেখাতেও তাঁর এই প্রকৃতি এবং এ-রকম অভ্যাস ধরা পড়েছে। তবু, ব্যতিক্রমও আছে। 'অভ্র-আবীর'-এর 'মহানদী', 'অন্ধকার সমুদ্রের প্রতি' ইত্যাদি প্রকৃতি-সম্পর্কিত কবিতাগুলিতে তিনি গীতিকবিতার ভাবসংহতির দিকে উদাসীন ছিলেন না। সে-সব ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অপেক্ষাকৃত সংযতবাক্। যেখানেই তথ্য-তালিকার দিকে তিনি বেশি ঝুঁকেছেন, সেখানেই রস উপেক্ষিত হয়েছে।

এই বই দু'খানির সমস্ত প্রসঙ্গের আলোচনা অনাবশ্যক। নতুন প্রসঙ্গগুলির মধ্যে বুদ্ধদেবের ধর্ম ও জীবন সম্বন্ধে যে লেখাগুলি ছাপা হয়েছে, সেইগুলির কথাই বিশেষ বিবেচ্য। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রভৃতি পণ্ডিতজনের তৎকালীন নানা লেখায় বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতির কথা প্রচারিত হয়। বিজয়চন্দ্র মজুমদার থেরী-গাথা প্রভৃতির অনুবাদ করেন। সত্যেন্দ্রনাথের 'বেলা-শেষের গান'-এ প্রকাশিত 'বুদ্ধপূর্ণিমা' ছাপা হয় ১৩২৬ সালের 'ভারতী'র আষাঢ় সংখ্যায়,—'বুদ্ধ-বরণ' ছাপা হয় ১৩২১ সালের 'প্রবাসী'র মাঘ-সংখ্যায়। দু'টিই বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠান উপলক্ষে রচিত। রবীন্দ্রনাথের বুদ্ধানুরাগও সে-যুগে রবীন্দ্র-ভক্ত কবি-সাহিত্যিকদের এ-দিকে অল্পবিস্তর আকর্ষণ করেছিল। 'প্রবাসী'র যে-সংখ্যায় 'বুদ্ধবরণ' কবিতাটি ছাপা হয়, সেই সংখ্যাতেই নলিনীকান্ত ভট্টশালীর 'বজ্রতারা' প্রবন্ধটি বেরিয়েছিল। তার আগের সংখ্যায় পৌষের 'প্রবাসী'তে 'বিবিধ প্রসঙ্গ'-এর মধ্যে সে-কালের যে অনুষ্ঠানটির বর্ণনা আছে তার প্রাসঙ্গিক অংশ নিচে পাদটীকায় ছাপা হোলো।[৫২]

রবীন্দ্রনাথ, কৃত্তিবাস এবং তিলক সম্বন্ধে লেখা এই সময়ের কবিতাগুলিও বিশেষ বিশেষ ঘটনার স্মারক। ফুলিয়ায় কৃত্তিবাসের স্মৃতি-অনুষ্ঠান (১৩২২, ২১-এ চৈত্র) সে সময়ের সাহিত্য-চিন্তার একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। স্মৃতিস্তম্ভের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। কাশিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায় প্রভৃতি ছিলেন কৃত্তিবাস সম্বন্ধে বিশেষ উৎসাহী। 'তিলক' কবিতাটি তিলকের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে লেখা হয়। রাষ্ট্র অথবা সমাজ প্রসঙ্গের লেখাগুলির মতো এগুলিও বহির্জগতের ঘটনার প্রতিক্রিয়া। এসব ক্ষেত্রে কবির অন্তরের তাগিদ অপেক্ষাকৃত কম। 'বাঙ্গালী পল্টনের গান' ('প্রবাসী', ভাদ্র ১৩২৪),

---

৫২। "বৌদ্ধ ইতিহাস হইতে জানা যায়, বুদ্ধদেবের অস্থিখণ্ড আটটি স্থানে প্রোথিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে কৃষ্ণানদীর নিকটবর্তী ভট্টিপ্রোলু নামক গ্রামের ভগ্নাবশেষ হইতে স্ফটিকনির্মিত আধারে রক্ষিত তাঁহার একটি অস্থি পাওয়া যায়। উহা সম্প্রতি বড়লাট বঙ্গের গবর্নরের মারফৎ মহাবোধি সভাকে অর্পণ করেন। মহাবোধি সভা উহাকে কলিকাতায় গোলদীঘির পূর্বদিকে নির্মিত শ্রীধর্মরাজিক চৈত্য-বিহারে রক্ষা করিয়াছেন। গবর্নরের নিকট হইতে বুদ্ধদেবের দেহাবশেষ গ্রহণ ও তাহা বিহারে রক্ষণ উপলক্ষে খুব ঘটা ও জনতা হইয়াছিল। মহাবোধি সভার প্রতিনিধিরূপে শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বুদ্ধাস্থি গবর্নরের হস্ত হইতে গ্রহণ করেন।" —'প্রবাসী' পৌষ, ১৩২১ পৃঃ ২৭৭।

'ফরিয়াদ' ('প্রবাসী', ফাল্গুন ১৩২৭), 'তিলক' ('ভারতী', ভাদ্র ১৩২৭), 'কোনো ধর্মধ্বজের প্রতি' ('প্রবাসী', ফাল্গুন ১৩২৭), 'চরকার গান' ('প্রবাসী', চৈত্র, ১৩২৭), 'সেবা-সাম' ('প্রবাসী' চৈত্র ১৩২১—'বঙ্গীয় হিতসাধনমণ্ডলীর প্রারম্ভিক সভায় পঠিত')—এ সবই হোলো সাম্প্রতিকতার চিহ্নবাহী। রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন উপলক্ষে 'গুণী দরবার' (নামান্তর 'আমরা'), 'গান' ('এসেছে সে এসেছে') এবং 'পরমান্ন'—এই তিনটি ১৩২২ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার 'প্রবাসী'তে ছাপা হয়।

বহির্জগতের ঘটনা বা উপলক্ষ-প্রভাব থেকে আত্মময়তা রক্ষার দৃষ্টান্ত যে এই সময়ের লেখার মধ্যে আদৌ ছিলো না, তা নয়। তাঁর মৃত্যুর কাছাকাছি সময়ে 'ভারতী'র আষাঢ় ও শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশিত 'কে' (আষাঢ়, ১৩২৯), 'জৈষ্ঠী মধু' (ঐ), 'ঝর্না' ('ভারতী'তে পুনর্মুদ্রিত, শ্রাবণ ১৩২৯) এবং আরো কয়েকটি লেখা এই সূত্রে স্মরণীয়। তবে, ভাবপ্রধান রচনার তুলনায় বস্তুপ্রধান রচনার আধিক্যই এই পর্বের বিশেষ লক্ষণ। নবকুমারের 'অ' ('হসন্তিকা' দ্রষ্টব্য : 'প্রবাসী' বৈশাখ ১৩২২)[৫৩],—তারও আগে সত্যেন্দ্রনাথের স্ব-নামে প্রকাশিত 'মৃত্যু-স্বয়ম্বর' ('অভ্র-আবীর' দ্রষ্টব্য) এবং এই শ্রেণীর অন্যান্য লেখায় তাঁর মনে যে-ভাবে প্রেরণা জেগেছিল, 'বেলা শেষের গান' এবং 'বিদায়-আরতি'র বেশির ভাগ কবিতাতে সেই-রকমই হয়েছে।

তাঁর কবি-জীবনের উন্মেষ-পর্বের প্রবীণ বন্ধু সুরেশচন্দ্র সমাজপতি এই সময়ে (১৩২৭ সালের ১৭ই পৌষ) দেহত্যাগ করেন। সেই বছরের অগ্রহায়ণে বিদায় নিয়েছিলেন তাঁর প্রিয় কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন। ঐ বছর ৩১-এ জুলাই লোকমান্য তিলকের মৃত্যু হয়। রাষ্ট্র-ক্ষেত্রের আর-এক অধিনায়ক গোপালকৃষ্ণ গোখলেও মারা গেলেন। তার অল্পকাল আগে (ইংরেজি ১৯১৮ সালে) গেছেন কবি অক্ষয়কুমার বড়াল এবং ভাওয়ালের গোবিন্দ দাস। ১৯১৯ সালে গেলেন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। নিকট ও দূর বেষ্টনীর প্রিয়

৫৩। ১৩২১ সালের শেষ দিকে বর্ধমানে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনের অধিবেশনে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ছিলেন মূল সভাপতি। তিনি 'চুটকি'-লেখার অসারত্ব সম্বন্ধে ইঙ্গিত করেন। ১৩২২ সালের বৈশাখ সংখ্যায় 'প্রবাসী'-তে শাস্ত্রী মহাশয়ের মন্তব্যের সঙ্গে 'প্রবাসী'-সম্পাদকের মতানৈক্য প্রচারিত হয়। ঐ সংখ্যাতেই নবকুমারের 'অ' ছাপা হয়। 'চুটকি' সম্বন্ধে প্রমথ চৌধুরী প্রভৃতি খ্যাতনামা বহু লেখক আলোচনা করেছেন।

নামগুলির ওপর একে একে মৃত্যুর হাত পড়ছিল। 'তিলক', 'গোখলে', 'কবি দেবেন্দ্র' শিরোনামে কবিতা লিখে সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর হৃদয়াবেগ ও কর্তব্য-বোধ দুই-ই প্রকাশ করেছিলেন। নিজের দৃষ্টিশক্তির দুর্বলতা মাঝে মাঝে তাঁকে আসন্ন অন্ধকারের আভাস দিয়ে গেছে বটে, কিন্তু মৃত্যুর পদধ্বনি তিনি সত্যিই শুনতে পান্ নি! ১৩২৯ সালের আষাঢ় সংখ্যার 'ভারতী'তে 'কে' নামে তাঁর যে-কবিতাটি ছাপা হয়েছিল, তাতে মৃত্যুহীন সুন্দরেরই বন্দনা আছে। 'চির-চেনায় চমক নিয়ে চির-চমৎকার' যে সত্য ও সত্তার আবির্ভাব তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, তার নাম মৃত্যু নয়,—সে ছিল সংশয়াতীত আনন্দ!

> আনন্দে তোর নিত্য-বোধন, পূজা শিরীষ-ফুলে,
> আরতি তোর আঁখির জ্যোতি দিয়ে,
> রিক্তা তুমি সন্ধ্যা-মেঘের রক্ত-নদীর কূলে,
> পূর্ণা তুমি প্রাণের পুটে প্রিয়ে।
> পারিজাতের পাপ্‌ড়ি তুমি ইন্দ্রেরি উদ্যানে,
> রাঙা তুমি একশো হোমের ধূমে,
> তপ্ত সোনার মূর্তি তুমি নিদাঘ-দিনের ধ্যানে,
> স্ফূর্তি তোমার পদ্মরাগের ঘুমে।

সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যু ঘটেছিল অকস্মাৎ। কিন্তু মৃত্যু তাঁর সৃজনী-দৃষ্টির নবোদ্ভূত কোনো সম্ভাবনাকে অকস্মাৎ ছিন্ন করেছিল বলা চলে না। তাঁর সামর্থ্যের পূর্ণতায় পৌঁছে তিনি যখন নিজের কলাকৌশল ও অর্জিত জীবনাভিজ্ঞতার পুনঃপ্রয়োগে এবং পুনর্বর্ণনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন, সেই মনঃসায়াহ্নেই সহসা তাঁর কাব্যপ্রবাহের অবসান ঘটে গেছে।

কলাবিধি

যা আমরা দেখছি শুনছি জানছি তার সঙ্গে যখন অনির্বচনীয়ের যোগ হয় তখন তাকেই আমরা বলি রস—অর্থাৎ। সে-জিনিষটাকে অনুভব করা যায়, ব্যাখ্যা করা যায় না। সকলেই জানেন এই রসই হচ্চে কাব্যের বিষয়।...

...কাব্যের প্রধান উপকরণ হোলো কথা। সে তো সুরের মতো স্বপ্রকাশ নয়। কথা অর্থকে জানাচ্চে। অতএব কাব্যে এই অর্থকে নিয়ে কারবার করতেই হবে। তাই গোড়ায় দরকার এই অর্থটা যেন রসমূলক হয়। অর্থাৎ সেটা এমন কিছু হয় যা স্বতই আমাদের মনে স্পন্দন সঞ্চার করে, যাকে আমরা বলি আবেগ।

...কথাকে বেগ দিয়ে আমাদের চিত্তের সামগ্রী করে তোলবার জন্যে ছন্দের দরকার। এই ছন্দের বাহন যোগে কথা কেবল যে দ্রুত আমাদের চিত্তে প্রবেশ করে তা নয়, তার স্পন্দনে নিজের স্পন্দন যোগ করে দেয়।...

...কাব্যরচনা একটা বিস্ময়ের ব্যাপার। তার বিষয়টা কবির মনে বাঁধা কিন্তু কাব্যের লক্ষ্য হচ্চে বিষয়কে অতিক্রম করা; সেই বিষয়ের চেয়ে বেশিটুকুই হচ্চে অনির্বচনীয়। ছন্দের গতি কথার মধ্য থেকে সেই অনির্বচনীয়কে জাগিয়ে তোলে।

—[রবীন্দ্রনাথের 'ছন্দের অর্থ' (১৩২৪) থেকে সংগৃহীত]

*   *   *

In the order of thought in art, the glory the eternal honour is that charlatanism shall find no entrance; herein lies the inviolableness of that noble portion of man's being.

—St. Beuve.

*   *   *

Charlatanism is always for confusing or obliterating the distinction between excellent and inferior.

—M. Arnold.

[এই দুটি ইংরেজি উদ্ধৃতি ১৩২৩ সালের পৌষ সংখ্যার 'ভারতী'-তে ছাপা 'যুগোত্তর সাহিত্য'-প্রবন্ধে সত্যেন্দ্রনাথ কর্তৃক ব্যবহৃত হয়]

আমাদের এই বর্তমান শতকের প্রথম পঁচিশ বছরের মধ্যে রবীন্দ্র-প্রভাবের বহু-চিহ্নময় বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে গীতিকবিতাই ছিলো প্রধান আকর্ষণ। সত্যেন্দ্রনাথ প্রধানতঃ গীতিকবিতাই লিখে গেছেন। গীতিকবিতার প্রধান

বিশেষত্ব দুটি ; প্রথমতঃ, মন্ময়তা বা আত্মমুখিতা (subjectivity) ; দ্বিতীয়তঃ, ভাবনা, অনুভূতি অথবা সংঘটনের অবিমিশ্র একাত্মকতা ('some single thought, feeling or situation') ।

সাহিত্যের অন্যান্য ক্ষেত্রের মতন এ-ক্ষেত্রেও কথা বা শব্দই হোলো প্রধান উপকরণ। কবিরা কথা সাজিয়ে সাজিয়ে কবিতা সৃষ্টি করেন। "বাক্ এবং অবাক্-এর একান্ত মিলনেই কাব্য।"

শব্দ, ছন্দ এবং চিত্রকল্প-রূপায়ণ,—কাব্যসৃষ্টির সর্বজনমান্য এই তিনটি বিভাগ অবলম্বন করেই সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যকলার বিশ্লেষণে এগুনো যেতে পারে। মৌলিক কবিতার ক্ষেত্রে কবির শিল্পরীতি তাঁর অভিজ্ঞতার অনুসারী হয়ে থাকে ; কিন্তু অনুবাদ-কবিতায় অনুবাদককে মূল লেখকের শব্দ-ছন্দ-চিত্রকল্পের আনুগত্য স্বীকার করতে হয়। সত্যেন্দ্রনাথ বিশেষভাবে অনুবাদক কবি হিসেবে প্রসিদ্ধ, আবার রবীন্দ্র-যুগের রবীন্দ্রানুসারী কবিদের মধ্যে বিশেষভাবে ছন্দ-সাধক হিসেবেও তিনি খ্যাতিমান্। তাঁর নিজস্ব কাব্যকলার আলোচনায় প্রধানতঃ তাঁর মৌলিক কবিতাগুলির কথাই বিবেচ্য। তবে, এও স্বীকার্য যে অনুবাদ-সামর্থ্যের মধ্যেও বিশেষ কলা-নৈপুণ্যের পরিচয় থাকতে পারে। অনুবাদককে আগে মূলের যথার্থ স্বাদ পেতে হয়,—তারপর এক ভাষার রসাভিজ্ঞতাকে তিনি অন্য ভাষায় নতুন ভাবে ধ্বনিত করে তোলেন।

অনুবাদ যে ভাষা থেকে করতে হবে, সেই ভাষার সাহিত্য-সম্পদ উপভোগ করবার সামর্থ্য যাঁর নেই, তাঁর পক্ষে সেই ভাষা থেকে অনুবাদ করবার প্রয়াস বৃথা। মূল ভাষার শব্দার্থ, বাগ্বিধি, সংগীতধর্ম ইত্যাদি সম্বন্ধে অনুবাদককে বিশেষ অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হয়। তারপর মূল রচনায় বিশেষ কবির বিশেষ যে মনোভঙ্গিটি ব্যক্ত হয়েছে, সেটিকে সার্বভৌম মানব-চিত্তাধিকারের অনুকূল করে তোলবার দক্ষতা দরকার। অর্থাৎ অনুবাদকের দায়িত্ব শুধু বুদ্ধিগ্রাহ্য, সুস্পষ্ট অর্থ সরবরাহ করেই শেষ হয় না, সেই অর্থটিকে রসের সামগ্রী করে তোলা চাই। রবীন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রভৃতি সত্যেন্দ্রনাথের সমকালীন প্রবীণ অনুবাদকের হাতে অনুবাদ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রসানুকূল হয়েছে। প্রিয়ংবদা দেবী, নিখিলনাথ রায়, শরৎচন্দ্র ঘোষাল, গুরুচন্দ্র ভট্টাচার্য প্রভৃতি সত্যেন্দ্র-সমসাময়িক ব্যক্তিরা সংস্কৃত সাহিত্যের অনুবাদ-দায়িত্ব গ্রহণ করে এই লক্ষ্যেই দৃষ্টি রেখেছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ বন্ধু চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কবি

প্রিয়ংবদা দেবীও এই সূত্রে স্মরণীয়। পণ্ডিত গণপতি শাস্ত্রী দাক্ষিণাত্যে ভাসের নাটক আবিষ্কার করবার পরে ত্রিবাঙ্কুর থেকে সেগুলি যখন ছাপা হোলো, তখন বাঙালি লেখকরা সেই লেখাগুলির বঙ্গানুবাদে আত্মনিয়োগ করেন। নিখিলনাথ রায়ের 'কবিকথা'র প্রথম ভাগে কালিদাস ও ভবভূতির এবং দ্বিতীয় ভাগে ভাসের অনুবাদ ছাপা হয়। গুরুচন্দ্র এবং নিখিলনাথ, উভয়েই গদ্যানুবাদ করেছিলেন, কিন্তু প্রিয়ংবদা এবং চারুচন্দ্র মূলের রস অক্ষুণ্ণ রাখবার যথাসাধ্য চেষ্টা করে গদ্যে-পদ্যে মূলের অনুসরণ করেন। সে যুগে অনুবাদের দিকে ব্যাপক আগ্রহ লক্ষ্য করা গিয়েছিল। পূর্বোক্ত ক'জনের পরে এই ধারায় কান্তিচন্দ্র ঘোষ, নরেন্দ্র দেব, হেমেন্দ্রলাল রায়, প্যারীমোহন সেনগুপ্ত, নজরুল ইস্‌লাম এবং আরো অনেকের নাম মনে পড়ে। কিন্তু বহু লেখকের নামের তালিকায় এই আলোচনার কলেবর বৃদ্ধি না করে মুখ্যতঃ সত্যেন্দ্রনাথের অনুবাদ-রুচির কথাই এখানে বিবেচ্য। তিনি অনুবাদে আত্মনিয়োগ করেছিলেন প্রধানতঃ দুটি কারণে। বাংলা সাহিত্যের অনুবাদ-বিভাগের দৈন্য মোচন করা ছিলো তাঁর প্রথম অভিপ্রায়, দ্বিতীয়তঃ ছন্দের অভিনবত্ব অনুসন্ধানের দিকেও তাঁর সহজাত আগ্রহ ছিল। সূক্ষ্ম রূপ অথবা গভীর রসের দিকে তিনি ততোটা সজাগ ছিলেন না। সে যুগে বাংলায় সংস্কৃত-ছন্দ ব্যবহারের দিকে যেমন একাধিক কবির প্রয়াস দেখা যায়, বিদেশি কবিতার রূপ ও গঠনের কৌশল সম্পর্কেও তেমনি ব্যাপক অনুসন্ধিৎসা লক্ষ্য করা যায়। ১৮৭৯ থেকে ১৮৯৫ সালের মধ্যে বিজয়চন্দ্র মজুমদার সংস্কৃত ছন্দে বাংলা কবিতা লেখবার শিক্ষানবীশী করেছিলেন। তাঁর 'যুগপূজা' ও 'ফুলশর' বই দু'খানিতে এই প্রয়াসের পরিচয় আছে। দ্বিজেন্দ্রলালের 'আর্য গাথা'-র (১৮৮২) 'পিউ'-অংশে সংকলিত কবিতাগুলি পাশ্চাত্ত্য কবিতা এবং গানের রূপ এবং রীতি অনুকরণের দৃষ্টান্ত। Scotch Song-অংশের প্রথম লেখাটি থেকেই একটু নমুনা তুলে দেখা যেতে পারে—

Auld Lang Syne

পুরাণ প্রেমকো নহি যাও ভুঁইয়া হো,
পুরাণ প্রেমকো আওর যো দিন গিয়া হো ;
হো যো দিন গিয়া প্যারে সে দিন গিয়া হো
ভয়ে পেয়ালা লিয়ে যো দিন গিয়া হো।

বলা বাহুল্য এ-পদার্থ বাংলা নয়! এখানে বাংলা হরপে ছাপা হিন্দি ঢঙের কয়েকটি উক্তির মধ্য দিয়ে স্কটল্যাণ্ডের গ্রাম্য সুরটি ধরবার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু পার্বত্য স্কটল্যাণ্ডের জনপ্রিয় গান 'My heart's in the highland' দ্বিজেন্দ্রলালের বাংলায় নব কলেবর পেয়েছে—

মোরা' হৃদয় ভেসে যায় রে দেশে,
হৃদয় হেথা নাই ;
মোর, হৃদয় ভেসে যায় রে দেশে
মৃগপিছু ধাই ;—

'We're a noddin' ভাষান্তরিত হওয়ার ফলে মূলের রস অন্ততঃ কিছু পরিমাণে বাংলা সাহিত্যের পাঠকের অধিগম্য হয়েছে—

মোরা, বড়ই খুসী খুস্ খুস্ খুসী,
মোরা, বড়ই খুসী আছি এখন ভাই—
আয়, ভাল আছিস্ প্রতিবেশী? একলা আছিস্ কি রে?
দেখ্'সে মোরা কত সুখী হেম এয়েছে ফিরে।
কবে-এ-এ সে গিয়েছিল পরাণ ছিল ভার,
বিদায় দিনু কেঁদে, ভেবে দেখ্‌ব কি তায় আর।
এখন বড়ই খুসী খুস্ খুস্ খুসী
এখন বড়ই খুসী আছি মোরা ভাই।

প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্ত্য নানা সাহিত্যের গন্ধ-পদ্য নানা সম্পদ আহরণের চেষ্টা উনিশ শতকের একটি বিশেষ ঘটনা। বাংলা সাহিত্যের গত দেড়শো বছরের ধারায় অনুবাদ-শাখার প্রকৃতি অপরিবর্তিত থাকেনি। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের দিকে দেশের শিক্ষিত জনসাধারণের মন উত্তরোত্তর বেশি আকৃষ্ট হয়েছে এবং পশ্চিমের গন্ধ-পদ্যের অনুবাদও ক্রমশঃ বাড়তির দিকে এগিয়েছে। সে তুলনায় বাংলায় প্রাচ্য সাহিত্যের অনুবাদই বরং কম হয়েছে। সত্যেন্দ্রনাথের আগে এ-কাজে যাঁরা নিযুক্ত ছিলেন, তাঁদের লেখাতেও যে প্রাচ্য সাহিত্যের অনুবাদ খুব বেশি পরিমাণে পাওয়া যায়, তা নয়। তবে তুলনা করে দেখলে পূর্বযুগের রুচি বা আগ্রহের ভিন্নতা চোখে পড়ে! সত্যেন্দ্রনাথের সমকালীন কবিদের মধ্যে যথার্থ কবি-হৃদয় নিয়ে এ-কাজে নেমেছিলেন অল্প কয়েকজন মাত্র। বরদাচরণ মিত্র, নবীনচন্দ্র দাস, বিজয়চন্দ্র মজুমদার প্রভৃতির হাতে সংস্কৃতের অনুবাদ কিছুদূর এগিয়েছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ছিলেন এ

অঞ্চলের অক্লান্ত কর্মী। প্রিয়নাথ সেন রুবাইয়ের মিল বজায় রেখে ওমর খৈয়ামের অনুবাদে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন ('সাহিত্য' পৌষ, ১৩০৭)। সে-কালের এই অনুবাদ-রুচির মধ্যেই সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর কাব্য-সাধনা শুরু করেছিলেন এবং দ্বিজেন্দ্রলালের ভাষারীতির দিকে তাঁর বেশ আগ্রহ ছিল। বিশেষতঃ গ্রাম্য অথবা আঞ্চলিক ভাষায় লেখা দেশি বা বিদেশি কবিতার দিকেই তাঁর আগ্রহ ছিল বেশি। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা কবিতা তিনি যে কতো আগ্রহ নিয়ে পড়েছিলেন, তার পরিচয় আছে 'ছন্দ সরস্বতী'তে, নবকুমার স্বাক্ষরিত তাঁর 'স্বপ্নদর্শন-বানান বিষয়ক' গদ্য-নিবন্ধে এবং আরো কোনো কোনো লেখায়। অনুবাদের ক্ষেত্রেও আঞ্চলিকতার দিকে তাঁর বিশেষ স্পৃহার নজীর আছে। ফ্রান্সের 'প্রভেন্স' অঞ্চলের কবি আল্‌তো ফ্রেদেরিক মিস্ত্রাল তাঁর Mireio বইখানি লিখে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি নোবেল পুরস্কার পান। ১৩২১ সালের আষাঢ় সংখ্যার 'প্রবাসী'তে তাঁর কথা প্রসঙ্গে লেখা হয়েছিল—

> 'মিস্ত্রাল শুধু নিজেরই রচনা দ্বারা প্রভেন্সাল ভাষাকে সমৃদ্ধ করিয়াই ক্ষান্ত রহিলেন না; তিনি অতীত কালের বহু বিস্মৃত প্রবাদ, প্রবচন, গল্প, কাহিনী, রূপকথা, ছড়া সংগ্রহ করিতে লাগিলেন'…

এই আলোচনার ঠিক এক বছর পরে ১৩২২ সালের আষাঢ়ের 'প্রবাসী'তে সত্যেন্দ্রনাথের লেখা মিস্ত্রালের কয়েকটি কবিতার অনুবাদ ছাপা হয়। সেই অনুবাদের সঙ্গে ১৩২১-এর আষাঢ় সংখ্যার এই লেখাটির উল্লেখ করে কবি মিস্ত্রালের 'প্রাদেশিক ভাষার বিশেষ আকর্ষণে'র কথা অনুবাদক নিজেও কিছু লিখেছিলেন। 'তীর্থরেণু'র 'শিকারীর গান', মেক্সিকোর 'নৃত্য-গীতিকা', মুণ্ডারি 'মন যারে চায়',—একটি ফরাসী গাথার অনুকরণে লেখা 'মল্লদেব', আইস্‌ল্যাণ্ডের 'রণচণ্ডীর গান' ইত্যাদ অনুবাদ ও ভাবানুবাদগুলি এই সূত্রে স্মরণীয়। তাঁর অন্য দুখানি অনুবাদ-সংগ্রহেও এই ব্যাপারের বহু নজীর আছে। অতএব তাঁর অনুবাদ-সাধনার ধারায় এই বিশেষ রুচির নিয়ন্ত্রণ লক্ষ্য করা গেল।

শব্দের খুঁটিনাটি অর্থ-বৈচিত্র্যের দিকে তখনকার সাহিত্য-সাধকদের মধ্যে অনেকেই বিশেষ আগ্রহ বোধ করতেন। সত্যেন্দ্রনাথের বন্ধু চারুচন্দ্র কবিকঙ্কণ-মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল সম্পাদনা-সূত্রে বহু অপরিচিত,

গ্রাম্য এবং দেশীয় শব্দ সম্বন্ধে আগ্রহান্বিত হন এবং 'প্রবাসী'র 'বেতালের বৈঠকে' এ-বিষয়ে প্রশ্ন এবং আলোচনাও ছাপা হয়েছিল। যোগেশচন্দ্র রায়ের 'শব্দকোষ' প্রকাশিত হলে এঁরা অনেকেই সে-বিষয়ে অল্পবিস্তর আলোচনা করেন। কতকটা এই কারণেও শব্দ-সচেতন, শব্দাধিকারে আগ্রহী সত্যেন্দ্রনাথ বিদেশী, আঞ্চলিক, এবং প্রাদেশিক কবিতার দিকে ঝুঁকে-ছিলেন। মাউরি, হাব্‌সী, চীনা, জাপানী, মারাঠী, মুণ্ডারি ইত্যাদি নানা ভাষার প্রাদেশিক কবিতা এবং কাব্যরূপের স্বাদ নিতে-নিতে তিনি নিজের কবিসত্তার পরিণততর সামর্থ্য অর্জন করেছিলেন। ঋগ্বেদ, অথর্ববেদ, মার্কণ্ডেয় চণ্ডী,—কবীর, নামদেব, থেরী অম্বপালী,—কাফ্রী, ফরাসী, আইস্‌ল্যাণ্ডীয়, মিশরীয় কাব্য,—জীপ্‌সী শ্লোক,—বিভিন্ন দেশের ঘুমপাড়ানি গান, যুদ্ধের গান,—বিচিত্র শিরোনামে এই রকম অশেষবিধ প্রসঙ্গ ছড়িয়ে আছে তাঁর অনুবাদ-মালায়।

প্রধানতঃ ইংরেজি অনুবাদের অনুবাদ অথবা বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার অনুবাদ-ই তাঁর এই ক'খানি বইয়ের অনেকটা জায়গা দখল করেছে বটে, তবে অন্যান্য ভাষা থেকে সরাসরি বাংলা অনুবাদের দৃষ্টান্তও বিরল নয়। 'বিদেশিনী', 'জাগরণী', 'পেয়ালার প্রেম' 'তাজের প্রথম প্রশস্তি' (মণিমঞ্জুষা) প্রভৃতি লেখাগুলি সরাসরি মূলের অনুবাদ। 'গরু ও জরু' লেখা হয় মূল ফরাসীর অনুসরণে। এ-রকম আরো দৃষ্টান্ত আছে।

এইসব লেখায় বহু পরিমাণে অন্য ভাষার শব্দ ব্যবহার করে কিংবা অন্যের অনুকরণ করে পাঠককে তিনি অবাক করে দিতে চান নি। তিনি চেয়ে-ছিলেন বাংলা সাহিত্যের অনুবাদ-বিভাগের আয়তন বাড়াতে। তাঁর মৃত্যুর পরে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩২৯ সালের 'প্রবাসী'তে যে-প্রবন্ধটি লিখেছিলেন, তাতে তাঁর এই বিশেষ আগ্রহের কথাই বলা হয়েছিল। অনু-বাদের সঙ্গে সঙ্গে দেশি-বিদেশি নানা কবিতার রূপকল্প (pattern), শব্দভঙ্গি,—ছড়া-গাথা-গান প্রভৃতি কাব্যপ্রকারের (types of verse) অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে নিজের স্বাধীন ও মৌলিক কবিতার রূপকৌশলের জন্যে তিনি আদর্শ এবং উপকরণ সংগ্রহ করেছিলেন। তাঁর লেখার মধ্যে শব্দ এবং ছন্দের যে সুবিপুল আয়োজন দেখা যায়, অন্ততঃ কিছু পরিমাণে সে ছিল তাঁর অনুবাদ-চর্চারই ফল। অনুবাদের সূত্রে পাওয়া এই ঔৎসুক্য ও উপলব্ধি তাঁর

স্বাধীন রচনার ওপর প্রভাব ছড়িয়েছিল। সে যুগের সাহিত্য-সাধকদের মধ্যে শব্দের বিশেষ বিশেষ ধ্বনি, অর্থ এবং ভঙ্গি সম্বন্ধে ব্যাপক আগ্রহের কথা আগেই বলা হয়েছে। এ-বিষয়ে আরো অনেক স্মরণীয় ঘটনার মধ্যে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর 'শব্দ-তত্ত্ব' (১৩২৪) বইখানির কথা ধর্তব্য। রামেন্দ্রসুন্দর 'সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায়' বাংলা ভাষার ব্যাকরণ, শব্দতত্ত্ব এবং বাংলা বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সম্পর্কে আলোচনা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ আলোচনা করেন বাংলা ধ্বন্যাত্মক শব্দের। সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণের 'ভবভূতি' প্রবন্ধে শব্দতত্ত্বের প্রসঙ্গ ছিল। এ-রকম বহু প্রবন্ধ-নিবন্ধ সে-সময়ের নানা পত্র-পত্রিকার মধ্যে ছড়িয়ে আছে। রামেন্দ্রসুন্দর তাঁর 'শব্দ-কথা'য় বাংলা ব্যঞ্জন-বর্ণের ধ্বনিগুলি পৃথক পৃথক শ্রেণীতে সাজিয়ে লিখেছিলেন—

> দেখিয়াছি যে প্রত্যেক ধ্বনির একটা নৈসর্গিক তৎপরতা আছে—এই তৎপরতা প্রত্যেক ধ্বনির উৎপাদক বস্তুর স্বাভাবিক গুণে প্রতিষ্ঠিত।

বিশেষ-বিশেষ ধ্বনিস্বভাবের মধ্যে 'কাঠিন্য, তারল্য, কোমলতা, শূন্যগর্ভতা প্রভৃতি এক একটা বস্তুধর্মের সম্পর্ক' লক্ষ্য করে রামেন্দ্রসুন্দর যখন বাংলায় প্রবন্ধ লিখেছিলেন, সেই সময়ে Henry Bradley-র সদ্য-প্রকাশিত 'The Making of English' গ্রন্থে এই মন্তব্যটি ছাপা হয়েছিল—

> The sound of a word may suggest 'symbolically' a particular kind of movement or a particular shape of an object. ১

রামেন্দ্রসুন্দর এ-মন্তব্য স্মরণ করেছিলেন। প্রায় একই সময়ে,—১৩২৩ সালের শ্রাবণ সংখ্যার 'ভারতী'তে বিজয়চন্দ্র মজুমদার 'সংস্কৃত ভূত ও দেশী পেত্নী' নামে যে প্রবন্ধ লেখেন, তাতে 'কুড়ারামী' (vulgar) ও 'দিগ্‌গজী' (pedantic), এই দুই রীতিভেদের কথা বলা হয়েছিল। তাই নবকুমার কবিরত্ন লিখেছিলেন—'মাতৃভাষা কি পেত্নীভাষা'? এই প্রবন্ধটিতে তিনি অবশ্য শব্দের কোমলতা, তারল্য, শূন্যগর্ভতা ইত্যাদি অর্থ-স্বভাবের আলোচনা করেন নি,—শব্দের ধ্বনি-স্বভাবের প্রকৃতি-ভেদ সম্বন্ধে দু'একটি মন্তব্য জানিয়েছিলেন। সংস্কৃত এবং বিভিন্ন প্রাদেশিক ভারতীয়-ভাষার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটেছিল এই প্রবন্ধ লেখার বেশ কিছু আগে। সেই পূর্বার্জিত অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে এই প্রবন্ধে তিনি জানালেন—

> সংস্কৃতের তদ্ভব ও তৎসম শব্দগুলি লেখবার বেলায় মাছি-মারা কেরানির মত

১। প্রকাশকাল—১৯১৬ খ্রীঃ।

নকল করা হচ্ছে অথচ বলবার বেলা বাংলার বাগ্‌দেবতা বাঙালীর ছেলের বাগ্‌যন্ত্রকে যেমনটি করেছেন ঠিক তারই বশে চলতে হচ্ছে।…

…বাংলায় এমন স্বর নেই যা হসন্ত অর্থাৎ ব্যঞ্জনরূপে ব্যবহার না হয়েছে। কৃত্তিবাস থেকে, এমন কি শূন্যপুরাণ থেকে আরম্ভ করে আজ পর্য্যন্ত এমন লেখক কেউ হননি যিনি বাংলা স্বরের বর্ণসঙ্কর মূর্তি না দেখিয়েছেন।…

…সংস্কৃত-ভাঙ্গা এতোগুলো প্রাদেশিক ভাষায় (সিন্ধী, কাশ্মীরী, মৈথিলী, দ্রাবিড় প্রভৃতি) যে এই বর্ণসংকরের পশার বেড়েছে, বিদেশী হলেও পণ্ডিত গ্রিয়ার্স‌ন তা জানেন কিন্তু আমাদের পুনকে পাণিনি বা হবু-বোপদেবেরা সে খবর রাখেন বলে বোধ হয় না।

আবার, ১৩২৩ সালের পৌষ সংখ্যার 'ভারতী'তে যুগোত্তর, যুগন্ধর, যুগোদ্ধারণ, যুগানুগ, যুগোচ্ছিষ্ট, যুগোঞ্ছ—এই সব নামের পর্যায়ক্রমে সাহিত্যের গুণভেদের বিশ্লেষণসূত্রে তিনি 'যুগোদ্ধারণ সাহিত্যে'র দৃষ্টান্ত দিয়েছিলেন এইভাবে—'পৃথিবীর সমস্ত যুদ্ধ-সংগীত ও জাতীয় সংগীত এই কোঠাতেই পড়ে।'

তাঁর 'তীর্থসলিল', 'তীর্থরেণু' এবং মণিমঞ্জুষা'-তে যুদ্ধ ও জাতীয় সংগীতের প্রাচুর্য লক্ষ্য করা গেছে। নবকুমারের 'জবান-পঁচিশী'-তে ('হসন্তিকা') কৌতুকরসের সূত্রে তাঁর কৌতুকময় বহুভাষিতা প্রকাশিত হয়েছে।

সত্যেন্দ্রনাথের মৌলিক কবিতাবলীর শব্দ, ছন্দ, চিত্ররূপ সম্বন্ধে আলোচনা করতে হলে,—অর্থাৎ, তাঁর কাব্যকলা সম্বন্ধে বিশ্লেষণমূলক তথ্যান্বেষণে উদ্যত হলে তাঁর অনুবাদ-কবিতাবলীর প্রসঙ্গের বৈচিত্র্য এবং অনুবাদের মূল অংশগুলির ভাষাগত বিভিন্নতার বিষয়ে সচেতন থাকা দরকার। অনুবাদের মধ্যে স্রষ্টার মৌলিক কৌশলের বিশেষ স্বাধীনতা নেই, সে কথা আগেই বলা হয়েছে। কিন্তু অনুবাদের দায়িত্ব নিয়ে শিল্পী যখন বিভিন্ন শিল্পরূপের সাক্ষাৎ পান, তখন কাজ চলতে থাকে তাঁর সংবেদনশীল অন্তর্লোকে। সত্যেন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। নানা দেশের নানা কবিতার রূপের বৈচিত্র্য দেখে তিনি নানা কলাকৌশলের নমুনা রেখে গেছেন। অক্ষয়কুমার বড়াল, দেবেন্দ্রনাথ সেন, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, বিজয়চন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি কবিরা অনুবাদ-চর্চার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য কবির অল্প-বিস্তর প্রভাব আত্মসাৎ করেছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। প্রভেদ এই যে, সত্যেন্দ্রনাথ ভাবের প্রভাবে বিশেষ আকৃষ্ট হন নি,—প্রধানতঃ শব্দ-ছন্দ-ভঙ্গির জগতেই তিনি সাগ্রহ পরিভ্রমণের নজীর রেখে গেছেন।

সাহিত্যের 'হারামণি' সন্ধানের চেষ্টা সে-যুগে ছোটো-বড়ো অনেক কবির মধ্যেই দেখা গিয়েছিল। প্রবাসী'র 'হারামণি' বিভাগটি এই সূত্রে স্মরণীয়। রবীন্দ্রনাথ, ক্ষিতিমোহন সেন এবং আরো কেউ কেউ প্রাচীন ও উপেক্ষিত দেশীয় সাহিত্যের দিকে দৃষ্টি দিয়েছিলেন। দেশ-বিদেশের বিচিত্র সাহিত্য পাঠের অবকাশ, আগ্রহ, এবং সামর্থ্য ছিল সত্যেন্দ্রনাথের। গল্প, পদ্য, নাটক—এই তিন রকম লেখা থেকেই তিনি অনুবাদ করে গেছেন।[২]

ভারতচন্দ্র লিখেছিলেন, 'যে হোক সে হোক ভাষা কাব্য রস লয়ে'। কবিতার ভাষা,—অর্থাৎ শব্দ ও পদসমষ্টি যেখান থেকেই আহরণ করা হোক্ না কেন, রসের গুণেই তা কাব্যে পরিণত হয়। রসই কবিতার লক্ষ্য। সত্যেন্দ্রনাথ এবং তাঁর সহযোগী, সমকালীন বাঙালী কবিরা একথা বিস্মৃত হন নি। ১৩২৩ সালের অগ্রহায়ণের 'নারায়ণ' পত্রিকায় নলিনীকান্ত গুপ্ত বাংলা সাহিত্যে সাধু ভাষায় স্বপক্ষে যে প্রবন্ধটি লিখেছিলেন, ঐ সালের মাঘ সংখ্যার 'ভারতী'-তে প্রমথ চৌধুরী 'সাহিত্যের ভাষা'-প্রবন্ধে তার জবাব দেন এবং সংস্কৃত অলংকার-শাস্ত্রের কথা তুলে তিনি সেখানে নিজের এই চিন্তা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছিলেন যে—

> কথার যে শুধু শব্দ আছে তাই নয়, রূপ, রস, তেজ, এমন কি গন্ধও আছে। কবি কথার এই পঞ্চগুণেরই সন্ধান রাখেন। এবং আমার বিশ্বাস এই, কবির মধ্যে শব্দগুণই সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট। কারণ ধ্বনিগত আনন্দ কেবল স্থূল ইন্দ্রিয়জ সুখ। সংস্কৃত কথার শব্দাঢ্যতাই আমাদের (অর্থাৎ বাঙালি সাহিত্যিকদের) বিপদ ঘটায়। শাস্ত্রে বলে গৌড়ীয়েরা সেই শব্দের পক্ষপাতী যা শ্রোত্ররসায়ন।[৩]

২। ক। 'জন্মদুঃখী' (২০ জুলাই, ১৯১২; নরওয়ের ঔপন্যাসিক Jonas Lie রচিত Livsslaven-এর অনুবাদ),

খ। 'রঙ্গমল্লী' (৫ ফেব্রুয়ারি ১৯১৩ ; Stephen Philips প্রভৃতি লেখকের নাট্য রচনার অনুবাদ),

গ। 'রাজা' : 'প্রবাসী' আশ্বিন ১৩২২ (P. H. Pearse-এর আইরিশ নাটিকার অনুবাদ)—ইত্যাদি।

৩। 'ভারতী' মাঘ, ১৩২৩, পৃঃ ১০৭৫। বন্ধনীচিহ্নভুক্ত অংশ বর্তমান লেখকের।

এই লেখাটির শেষ দিকে জ্ঞানদাস ও ভারতচন্দ্রের রচনার অংশ তুলে প্রমথ চৌধুরী বলেছিলেন যে, ঐ দুই কবি সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করেছিলেন বটে, কিন্তু বাংলার আপন সুরটি তাতে ব্যাহত হয়নি। তাঁর প্রবন্ধের এই অংশ থেকে তাঁর আর-একটি মন্তব্য এখানে উদ্ধৃত হোলো—

> সকল ভাষারই একটা নিজস্ব সুর আছে। সে সুরের প্রতি কান রেখে আমাদের সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করতে হবে—যাতে আমাদের রচনা আগাগোড়া বেসুরো না হয়ে যায়। কোন্ কথা কোন্ সুরে বসবে আর কোন্ কথা বসবে না—তা দেখানো অসম্ভব; কেন না কানই তার একমাত্র বিচারক।

জ্ঞানদাস ও ভারতচন্দ্রের কানের সামর্থ্য স্বীকার করে মধুসূদনের মেঘনাদ-বধ কাব্যের শব্দাড়ম্বর সম্পর্কে তিনি লিখেছিলেন—

> অপর পক্ষে মেঘনাদবধের আওয়াজ প্রথম লাইন থেকে শেষ লাইন পর্যন্ত ভরাট ও বিরাট হলেও সে আরাব বঙ্গ-সরস্বতীর বীণার নয়—গড়ের বাদ্যির।

সত্যেন্দ্রনাথের কবিতার শব্দসম্ভার সম্বন্ধে আলোচনার সূচনায় সে যুগের শব্দ-চিন্তার আরো একটি কথা উল্লেখ করা দরকার। ১৩২৩ সালের ফাল্গুন সংখ্যার 'উপাসনা' পত্রিকায় সাধু ও চলিত ভাষা সম্পর্কে তৎকালীন তর্ক-বিতর্কের সূত্র ধরে সম্পাদক মন্তব্য করেছিলেন যে, abstract ভাব প্রকাশের জন্য সাধুভাষা বিশেষ উপযোগী,—concrete ভাব প্রকাশের পক্ষে চল্‌তি ভাষা অনুচিত নয়। এরই উদাহরণ দেখাতে গিয়ে তিনি 'ভয়ের ভীষণ রক্ত রাগে খেলার আগুন যখন লাগে', এই ছবি সম্পর্কে লিখেছিলেন—

> বাস্তব ছবির পশ্চাতে প্রকৃতির সৃষ্টির যে ইঙ্গিত রহিয়াছে তাহা চল্‌তি ভাষার অযোগ্যতা হেতু প্রকাশিত হয় নাই।

চৈত্র-সংখ্যার 'ভারতী'তে অজিতকুমার চক্রবর্তী এই অভিযোগ খণ্ডনের চেষ্টা করে উপসংহারে লিখলেন—

> প্রকৃতির খেলার মধ্যে মাধুর্যও যেমন আছে, শক্তিও তেমনি আছে; সৌন্দর্যও যেমন আছে, রুদ্রতাও তেমনি আছে—এই ভাবটি প্রকাশের জন্য কবি খেলার symbol এবং আগুনের symbol দুটি উপযুক্ত বাস্তব symbol কেই ধরিয়াছেন। সাধু ও চল্‌তি ভাষার সাক্ষ্য তো অনিবার্য দেখা গেল;

এখানে symbol-এরও সাঙ্কর্য ঘটিয়াছে বলিয়া বর্ণধর্মরক্ষার পক্ষপাতী সম্পাদকের বোধ হয় আপত্তির কারণ হইয়াছে।৪

একদিকে সংস্কৃত, অন্যদিকে তদ্ভব ও দেশি শব্দের প্রসঙ্গেই এই ধরনের আলাপ-আলোচনা সে যুগের নানা পত্রিকায় লেখক ও সম্পাদকের মনোযোগের বিষয় হয়ে উঠেছিল। এই আলোচনার প্রধান কেন্দ্র ছিল 'সবুজ পত্র'। কবিতার শব্দসম্ভার সম্বন্ধে প্রমথ চৌধুরী এবং অজিতকুমার চক্রবর্তী,—এঁদের দু'জনের উদ্ধৃত মন্তব্য থেকেই মূল সংকেতটি লক্ষ্য করা গেল। কবির রসচেতনাই তাঁর শব্দ নির্বাচনের নিয়ন্তা। এ বিষয়ে কোনো পক্ষেরই মতানৈক্য ছিল না এবং তা থাকবারও কথা নয়।

তদ্ভব ও দেশি শব্দের দিকে সত্যেন্দ্রনাথের কিছু বেশি আগ্রহ ছিল, সে কথা আগে বলা হয়েছে। তাঁর এই আগ্রহের হেতু সম্পর্কে তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় যে কথা বলেছেন, তা' থেকে এই আর একটি দিক মাত্র মনে হওয়া স্বাভাবিক যে তাঁর শব্দস্পৃহা তাঁর জ্ঞান-স্পৃহারই অন্তর্ভুক্ত ছিল।৫ কিন্তু আসল কথা তা নয়,—শব্দ তাঁর কাছে শুধু যে বিচিত্র জ্ঞানরাজ্যের একটি প্রদেশ হিসেবেই গণ্য ছিলো, তা' নয়। শব্দ ও ছন্দের কলাকৌশলে যে কবি সিদ্ধি লাভ করেন, তাঁর কবিতা স্বতঃই রসোত্তীর্ণ হয়ে ওঠে,—এই ছিল তাঁর বিশ্বাস। পল্ ভার্লেনের 'নব্য অলঙ্কার' কবিতাটি ('তীর্থরেণু') হয়তো এই কারণেই তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। কবিতার শব্দ, ছন্দ ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর নিজের ব্যক্তিগত প্রত্যয়ের সঙ্গে কবিতার বিভিন্ন উপকরণের গুরু-লঘু ভেদ সম্বন্ধে পল্ ভার্লেনের এই কবিতাটির অন্তর্নিহিত স্বীকৃতির সাদৃশ্য আছে। 'তীর্থরেণু'-র এই অনুবাদে

৪। 'ভারতী' চৈত্র ১৩২৩ ; পৃঃ ১২৮৩।

৫। নানা দেশের কবিত্বরস বিশেষ ভাবে সম্ভোগ করবার সুবিধা হবে বলে' তিনি নানা দেশের ভাষা শেখবার চেষ্টা করতেন। তাঁর প্রগাঢ় জ্ঞান তাঁর রচনায় প্রকাশ পেত ; এক একটা কবিতা ইতিহাস বা পুরাণের বিশ্বকোষ হয়ে উঠ্‌ত। সত্যেন্দ্র যে বিষয়ে কবিতা লিখ্‌তেন সে বিষয়ের হাটহদ্দ জেনে লিখতেন। কাজরী, গরবা সম্বন্ধে কবিতা লিখবেন বলে' তিনি চেষ্টা করে ঐসব সুরের গান শুনেছিলেন ; ফুলের কবিতা লিখ্‌তে বহু ফুলের নাম সংগ্রহ করেছিলেন ; মেঘঘটাকে যুদ্ধ আয়োজনের রূপক দেবার জন্যে তিনি বহু পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করেছিলেন। আমি তাঁকে বলতাম—"এসব শব্দের মানে কেউ বুঝবে না।" সত্যেন্দ্র বলতেন—"না বোঝে খোঁজ করে বুঝবে।"—'প্রবাসী', শ্রাবণ, ১৩২৯ ; পৃঃ ৫৮৯।

পল ভার্লেনের এতৎসম্পর্কিত ধারণা তিনি বাঙালি পাঠকের জন্য পরিবেশন করে গেছেন—

ললিত শব্দের লীলা সকলের আগে কবিতায় ;
পয়ার সে বর্জনীয়, বরণীয় ছন্দে বিচিত্রতা ;
নিশ্চয় নির্ণয় নাই, গ'লে যেন মিলিবে হাওয়ায় ;
ভারে যাহা কাটে শুধু, রবে না এমন কোনো কথা।
যথা অর্থ সংজ্ঞা খুঁজে উদ্‌ভ্রান্ত না হয় যেন চিত ;
নাই ক্ষতি নির্ভুল শব্দটি যদি নাই পাওয়া যায় ;
ব্যক্ত আর অব্যক্তের যুক্তবেণী মদির সংগীত !
তার মত প্রিয় আর নাহি কিছু নাহি এ ধরায়।

সকলের আগে চাই 'ললিত শব্দের লীলা',—ছন্দে চাই বিচিত্রতা ; এই ছিলো সত্যেন্দ্রনাথের বিশ্বাস। পল্ ভার্লেনের এই অনুবাদের পঞ্চম স্তবকে বলা হয়েছে—

নিষ্ঠুর বিদ্রূপ আর অশুচি বাচাল পরিহাস,—
পরিহার কর তুই প্রাণঘাতী ছুরির মতন ;

ষষ্ঠ ও সপ্তম স্তবকে শব্দ ও বাগ্‌ভঙ্গি-বিলাসের অতিরেক সম্পর্কে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। পল্ ভার্লেনের এই ভাবানুবাদের অষ্টম স্তবকে আর একবার শব্দ-প্রসঙ্গের উল্লেখ আছে—'শব্দের ললিত লীলা,—সমাদর সর্বযুগে তার।' সত্যেন্দ্রনাথ যদি পল ভার্লেনকে কিছু পরিমাণেও অনুসরণ করে থাকেন, তাহলে সে এই সূত্রেই। শব্দ সম্পর্কে তিনি অভিধানকর্তা এবং বৈয়াকরণের মতোই বিশেষ আগ্রহ পোষণ করতেন।[৬] তবে পল্

৬। সত্যেন্দ্র একেবারে কলকাতার মধ্যে চির-আবদ্ধ থাকলেও বাংলা দেশের অন্তরের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগ ও পরিচয় ছিল ; তিনি এত অপভ্রংশ গ্রাম্য দেশজ প্রভাষার শব্দ জানতেন যে তাঁর জ্ঞান ও পর্যবেক্ষণ দেখে আশ্চর্য হয়ে যেতে হত। বহু শব্দ জানা ছিল বলে' ও কবিতার মিল করা খুব অভ্যাস ছিল বলে সত্যেন্দ্র কথা নিয়ে ওলট-পালট করে বা এক কথা বিভিন্ন ভাবে প্রয়োগ করে শব্দক্রীড়া (pun) করতে বিশেষ দক্ষ ছিলেন।...শব্দচর্চার জন্য তিনি মজ্‌লিসী রসিকতায় সিদ্ধবাক্ ছিলেন। আর একটি ফল হয়েছিল তিনি ভাষাতত্ত্ব শব্দতত্ত্ব ব্যাকরণতত্ত্বের বহু নূতন মৌলিক নিয়ম আবিষ্কার করেছিলেন ; আমি তাঁকে প্রায়ই সেগুলি লিখে ফেল্‌তে অনুরোধ করতাম, বল্‌তাম—Grimm's Law-এর মতন 'সত্য-নিয়ম' সকলের কাছে সমাদৃত হবে।—"প্রবাসী', শ্রাবণ, ১৩২৯ ; পৃঃ ৫৮৯।

ভার্লেনের এই অনুবাদে ষষ্ঠ ও সপ্তম স্তবকের যে নিষেধবাণী সত্যেন্দ্রনাথ নিজেই লিখেছিলেন, তাঁর নিজের কবিতায় সে শাসনের চিহ্ন বিরল! বরং পল্ ভার্লেনের অন্য নির্দেশটিই তিনি পালন করেছিলেন। অর্থাৎ অনুবাদেই তিনি তাঁর কবিকর্মের চরিতার্থতা খুঁজেছিলেন। কাব্যকলার প্রধান এই দুই উপকরণে তাঁর নিজের সামর্থ্য ও দৈন্য সম্পর্কে তিনি নিজে যে বিশেষ সচেতন ছিলেন, পল্ ভার্লেনের আলোচ্য এই কবিতাটির বিষয়ে তাঁর আগ্রহ থেকেই তার আভাস পাওয়া যায়—

কবিতার কুঞ্জগৃহে বাগ্মিতা প্রবেশ যদি করে,—
বাগ্মিতার গ্রীবা ধরি' মোচড় লাগায়ো ভাল মতে ;
অনুশীলনের লাগি সাধু শ্লোক এনো ভাষান্তরে,—
সে কাজ বরঞ্চ ভাল ;—কবিতারে মাঠে মারা হ'তে।
বাণীর লাঞ্ছনা, হায়, বর্ণনা করিতে কেবা পারে,—
অনধিকারীর হাতে কি দুর্দশা, বিড়ম্বনা কত!
হীরা, জিরা, মিলাইয়া শিকল সে গেঁথেচে পয়ারে,
নির্জীব, বৈচিত্র্যহীন ;—অর্বাচীন অনার্যের মত।

পল্ ভার্লেনের প্রসঙ্গে কালক্ষেপের কারণ আছে। ১৩২৫ সালের কার্তিক সংখ্যার 'প্রবাসী'-তে অজিতকুমার চক্রবর্তী লিখেছিলেন—

> ফরাসী কবি পল্ ভ্যার্লেন সম্বন্ধে যেমন বলা হয় যে, "he paints with sound", তিনি ধ্বনির দ্বারা চিত্র আঁকেন, কবি সত্যেন্দ্র সম্বন্ধেও সেই কথা বলা যাইতে পারে।[৭]

অজিতকুমারের এই মন্তব্যটিতে এ বিষয়ে পূর্ণ সত্যের উদ্ঘাটন নেই,— এ হোলো সত্যাভাস মাত্র। পল্ ভার্লেনের সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথের কবিকর্মের সাদৃশ্যকল্পনা পুরোপুরি ভিত্তিহীন নয়। "ধ্বনির দ্বারা চিত্র" রচনার প্রয়াস তাঁর কাব্য-প্রবাহের প্রায় সকল স্তরেই অল্পবিস্তর চোখে পড়ে। কিন্তু এ বিষয়ে অজিতকুমার যেভাবে তাঁর সিদ্ধি ও সাফল্যের কথা স্বীকার করেছেন, সেভাবে রায় দেওয়া বিবেচনার কাজ নয়। প্রয়াস আর সাফল্য এক কথা নয়। শব্দ সম্পর্কে আগ্রহ পোষণ করেন না, এমন কবি কোথাও কোনো

৭। 'প্রবাসী' কার্তিক, ১৩২৫ ; পৃঃ ৫১ (আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে পাশ্চাত্য সাহিত্যের সম্বন্ধ—অজিতকুমার চক্রবর্তী)।

কালে ছিলেন কি না সন্দেহ। কিন্তু শব্দের ব্যবহারে অনেক রকম অসতর্কতা ঘটতে পারে। মম্মট ভট্টের 'কাব্যপ্রকাশে' শব্দগত দোষের যে দীর্ঘ তালিকা দেওয়া হয়েছে, তাতে 'শ্রুতিকটুতা', 'চ্যুতসংস্কার', 'অপ্রযুক্তত্ব', অসমর্থত্ব', 'নিহতার্থত্ব', 'অনুচিতার্থত্ব', 'নিরর্থকত্ব', 'অবাচকতা', 'অশ্লীলতা', 'সন্দিগ্ধতা', 'অপ্রতীতত্ব', 'গ্রাম্যতা', 'নেয়ার্থতা', 'ক্লিষ্টতা', 'বিধেয়াবিমর্ষ', 'বিরুদ্ধমতি-কারিতা'—এতোগুলি নাম পাওয়া যাচ্ছে। সত্যেন্দ্র-কাব্যের শব্দপ্রয়োগ বিষয়ে আলোচনার সময়ে শব্দদোষের এই বিভিন্নতা সম্বন্ধে সচেতন থাকা দরকার। 'সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যপ্রবাহ' নামে যে অধ্যায়টি আগের অংশে অতিক্রম করে আসা গেছে, সেখানে বিশেষতঃ 'কুহু ও কেকা'র প্রসঙ্গে তাঁর শব্দগত বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে। তাঁর কবিতা ও কাব্যরূপের প্রকৃতি নির্ণয়ের প্রচেষ্টায় শব্দদোষ সম্পর্কে বৈয়াকরণের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণরীতি পুরোপুরি অনুসরণ করা অপরিহার্য নয়। অবাচকতার (শব্দের ভ্রান্ত প্রয়োগ) দোষ তাঁর রচনায় আদৌ চোখে পড়েনি; 'সন্দিগ্ধতা' রবীন্দ্রনাথের কবিতাতেও বর্তমান (তুলনীয়—'বন্দীরা গাহে না গান'—'শাজাহান'; 'বলাকা')। অপ্রতীতত্ব-দোষ ('যৎ কেবলে শাস্ত্রে প্রসিদ্ধম্'—মম্মট)—অর্থাৎ অল্পশ্রুত পারিভাষিক শব্দ প্রয়োগের দৃষ্টান্ত সত্যেন্দ্র-কাব্যে একেবারে যে না ঘটেছে, এমন নয়। আবার, অপ্রযুক্তত্ব (অর্থাৎ শাস্ত্রসিদ্ধ হলেও যে শব্দ কবির অনাদৃত সে রকম প্রয়োগ) বহুবার ঘটেছে।

শব্দের বিষয়ে এখানে এই অনুসন্ধিৎসার মূল কারণটি মনে রাখা দরকার। কবিতা ও কাব্যরূপের আলোচনায় শব্দ-কথাই মূলকথা নয়। শব্দ চয়নের মাধ্যমে তাঁর কবিপ্রকৃতির বিশেষ কোন্ প্রবণতা আত্মপ্রকাশ করেছে,—কী-রকম শব্দ তাঁর কাছে ভালো লাগতো,—ধ্বনিমান শব্দের দিকে তাঁর অন্তরের টান বেশি ছিল, না-কি, অর্থবান শব্দের দিকে তাঁর মনন-স্বভাবের ঝোঁক বেশি ছিল, এই তথ্যগুলিই বিশেষ বিবেচ্য। তারপর একথাও স্মর্তব্য যে, গীতিকবিতায় পৃথক পৃথক শব্দের তুলনায় শব্দবন্ধের (phrase) নৈপুণ্য বেশি দরকার। সর্বোপরি এ কথা সর্বস্বীকৃত সত্য যে, শব্দ কাব্য-দেহের একটি উপকরণ মাত্র। উপকরণের আলোচনা বেশি বাড়িয়ে সম্পূর্ণ সৃষ্টির সত্যকে আচ্ছন্ন করলে যা ঘটে, কাব্যালোচনায় তারই নাম অসংগতি।

সত্যেন্দ্রনাথের শব্দপ্রয়োগের বিশ্লেষণে প্রধানতঃ দুটি প্রবণতা চোখে পড়ে। কানের দাবি মেনে নিয়ে কোনো কোনো ক্ষেত্রে তিনি ছন্দের খাতিরে অথবা ধ্বনিস্পন্দনের মোহে শব্দপ্রয়োগের বাড়াবাড়ি করেছেন। এই রকম শব্দ-দোষের নাম দেওয়া যাক 'ধ্বন্যতিরেক'। অবশ্য 'ধ্বন্যতিরেক' শব্দটিই যেন সঙ্কীর্ণতা-দোষের দৃষ্টান্ত মনে হয়। কিন্তু বাংলায় 'শব্দাতিরেক' বললেও এ-দোষ দূর করা যায় না। সংস্কৃত রসশাস্ত্রে 'ধ্বনি' বা 'ব্যঞ্জ' বললে শব্দের যে ব্যঞ্জনার্থ বোঝায়, এখানে সে অর্থ অভিপ্রেত নয়। এখানে শব্দের শ্রুতিসংবেদনের প্রতি অতিলোলুপতা অর্থেই ধ্বন্যতিরেক কথাটি গৃহীত হোলো এবং এই আলোচনার পরবর্তী অংশে এই অর্থেই সে শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

দ্বিতীয় বিশেষত্ব এই যে, রূপ বর্ণনার অত্যধিক খেয়ালে অঙ্গ-সংস্থানের খুঁটিনাটি নানা বিষয়ে তিনি খুবই বেশি দৃষ্টি দিতে অভ্যস্ত ছিলেন। একে শিল্পীর দৃষ্টি বলা চলে না। এ যেন বিদ্বানের শ্যেন-দৃষ্টি! সৃষ্টি নয়,—নির্মিতির দিকেই তিনি যেন এইসব ক্ষেত্রে বেশি আগ্রহ পোষণ করেছেন। ফলে, পণ্ডিতের পাণ্ডিত্য শিল্পের শাসন মানতে বিমুখ হয়েছে। এই অভিনিবেশের ফলে শব্দের সহায়তায় যে চিত্র গড়ে ওঠে, তাতে রসের চেয়ে জ্ঞানের প্রতাপ বেশি দেখা দেয়। এ অবস্থায় কাব্যানুরাগ যেন বিদ্যানুরাগের বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়। শব্দের এই রকম বাড়াবাড়ির নাম দেওয়া যেতে পারে 'চিত্রা তিরেক' এবং বর্তমান অধ্যায়ে এই অর্থেই এই শব্দটি একাধিক বার ব্যবহার করা হয়েছে।

সত্যেন্দ্রনাথের শব্দবৈশিষ্ট্যের প্রধান দুটি শ্রেণীবিভাগ এই দুই লক্ষণেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ ছাড়া মম্মট-কথিত 'নেয়ার্থতা', 'চ্যুতসংস্কার' ইত্যাদি-অর্থগত বা বৈয়াকরণিক শব্দদোষগুলি মনে রেখে সত্যেন্দ্র-কাব্যের শব্দ-প্রকৃতির তৃতীয় একটি শাখা এখানে আলোচিত হোলো। শব্দের প্রচলিত বিধির পরিবর্তে নিজের মৌলিক ব্যাকরণের অনুসৃতি,—শাস্ত্রসিদ্ধ, অল্পপরিচিত শব্দের প্রয়োগ,—যে অর্থ প্রকাশে বিশেষ কোনো শব্দের বিশেষ সামর্থ্য নেই, সেই অর্থেই সেই শব্দের ব্যবহার,—নতুন পদ গঠনের খেয়াল—এই সব বিভিন্ন ব্যাপারের সাধারণ নাম দেওয়া যেতে পারে 'বৃথা-উদ্‌ভাবন'।

সত্যেন্দ্র-কাব্যের শব্দরীতি সম্পর্কে এই তিনটি শ্রেণীর কথা বিশেষ ভাবে

স্মরণীয়। কিন্তু শব্দের দোষই যে তাঁর প্রধান বিশেষত্ব,—বলা বাহুল্য, এমন ধারণাও অভিপ্রেত নয়। বাংলার প্রসিদ্ধ কবিদের মধ্যে ভারতচন্দ্র, মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গে শব্দাগ্রহী সত্যেন্দ্রনাথেরও স্বকীয় অধিকার এবং সামর্থ্যের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার্য।

কাব্যসৃষ্টির বহু উপকরণের মধ্যে শব্দও এক উপকরণ, একথা আগেই বলা হয়েছে। কবির অনুভূতি (সে অনুভূতিতে চক্ষু-কর্ণ প্রভৃতি পঞ্চেন্দ্রিয়ের মধ্যে যারই প্রাধান্য থাকে থাকুক) তাতে প্রাণ সঞ্চার করে সার্থকতা ঘটায়। সার্থক কবিতার সর্বাঙ্গে সেই অনুভূতির স্বাক্ষর থাকে। অর্থাৎ শব্দ-নির্বাচনের অনুভূতি, স্তবক-বন্ধের বোধ, শব্দ-সমষ্টির স্পন্দনের চেতনা—কবির অন্তরে এগুলি পৃথক পৃথক বস্তু-ভাবে বিচ্ছিন্ন থাকে না। এক অখণ্ড প্রেরণায় শব্দ ও শব্দসমষ্টি,—অর্থ, সংগীত, রূপ,—সব কিছু একই পাকে, অভিন্ন অনুভূতির উত্তাপে উৎপন্ন হয়। অতএব কোনো ভালো কবিতাতেই শব্দের চমৎকারিত্ব পৃথক ভাবে দৃশ্য নয়। পূর্ণ রচনাটির স্বাদের মধ্যেই সকল শব্দের সর্বস্বাদের সুসমন্বয় বিধেয়। সুতরাং কবিতার শব্দগত বিশেষত্বের বিশ্লেষণে উদ্যত হবার আগে সম্পূর্ণ একটি রচনার সঙ্গে সেই রচনায় ব্যবহৃত শব্দ আগে সম্পূর্ণ একটি রচনার সঙ্গে সেই রচনায় ব্যবহৃত শব্দমালার অঙ্গাঙ্গিসম্পর্কের কথা বিশেষভাবে স্মরণীয়। যেসব কবিতা রসোত্তীর্ণ সৃষ্টি হিসেবে রসিকের স্বীকৃতি লাভ করে, সেই শ্রেণীর পক্ষেই এ অভিমত গ্রাহ্য। অপর পক্ষে, চলনসই, গণভোগ্য, দীর্ঘজীবী পদ্যে চিত্রাতিরেক কিংবা ধ্বন্যতিরেক—এই দু'রকম কিংবা দু'য়ের যে-কোনো এক রকমের কিংবা উভয়ের মিশ্র আতিশয্য বা সংঘর্ষের দৃষ্টান্ত বিরল নয়। সত্যেন্দ্রনাথের শব্দসম্ভার যুগপৎ এই দুই সত্যেরই স্মারক। বহুপঠনশীল, শ্রমনিষ্ঠ বিদ্বানের শব্দৈষণা এবং স্পর্শকাতর কবিমানসের শব্দানুভূতি—পরস্পরের পরিপূরক এই দুই প্রবণতাই তাঁর মজ্জায় প্রবেশ করেছিল। কিন্তু তার ফলে উভয়ের সমন্বয় যেমন ঘটেছে, বিরোধের লক্ষণও তেমনি ফুটেছে। শব্দের ধ্বনি-স্পন্দন, অভিনবত্ব এবং অর্থচাতুর্য—এই তিন টানে আকৃষ্ট হয়ে অনুভূতির শাসন তিনি বহু ক্ষেত্রে উপেক্ষা করেছেন। ভাব থেকে রূপের দিকে না এগিয়ে, পূর্বপরিকল্পিত রূপের ছাঁচে তিনি ভাবকে ধরবার চেষ্টা করেছেন। কোথাও বা প্রসঙ্গটিকে বিশেষ কোনো স্থাপত্যে-ভাস্কর্যে চিত্তাকর্ষক করে তোলবার

বাড়াবাড়ি করেছেন এবং বিশেষতঃ এইসব ক্ষেত্রেই তাঁর কবিতার পাঠক তাঁর শব্দের ঐশ্বর্য, আড়ম্বর, চাতুর্য, বিচিত্রতা সম্পর্কে সচেতন হতে বাধ্য হন। তৎসম, তদ্ভব, দেশি, বিদেশি—বাংলায় ব্যবহৃত সব রকম শব্দই তিনি ব্যবহার করেছেন। 'ঠুন্‌কো', 'ফাঁকর', 'ভিরকুটি' ('অরুন্ধতী'—বেলা শেষের গান);—'নজ্‌গজে', 'আচম্‌কা' ('কাগজের হাতী'—ঐ),—'স্তুতা' ('ভারতের আরতি'—ঐ);—'ফর্দা মেঘের ফানুস ফেঁসে ফস্‌কে ফাঁক থেকে' ('চন্দ্রমল্লিকা'—শিশু-কবিতা),—'আঁচলের এলানীতে বাঁচা দুরাশা' ('বকফুল'—ঐ),—('জোয়ানী', 'ধোয়ানী', 'পয়দা', 'বে-ফয়দা',—'স্তিমিত প্রদীপে তৈল টোপায় মণি-ময়ূরের চঞ্চু দিয়া' ('সর্বদমন'—বিদায়-আরতি), —'তরলিত চন্দ্রিকা' 'চুমা-চুমকী', 'গিরি-দরী-বিহারিণী হরিণীর লাস্যে', 'ভরা ঘট এস নিয়ে ভরসায় ভর্ণা' ('ঝর্না'—বিদায়-আরতি),—'তন্দ্রার হন্দোর একলার দোক্‌লা! চরকাই একজাই পয়সার টোক্‌লা' ('চরকার গান'—ঐ),—'বিকাশ' পর্বে তো বটেই, তাছাড়া তাঁর কবিত্বের 'সমৃদ্ধি' পর্বেও তদ্ভব, ধ্বন্যাত্মক, তৎসম, দেশি, বিদেশি বহু বিচিত্র শব্দের ভিড় সর্বত্র চোখে পড়ে। উদ্ধৃত দৃষ্টান্তগুলি তাঁর পরিণত রচনা থেকেই যথেচ্ছভাবে সংগৃহীত হোলো। 'সূচনা' পর্বের লেখা থেকেও অনুরূপ আরো শব্দ তুলে দেখানো যেতে পারে। 'বেণু ও বীণা'র প্রথম কবিতায় 'মর্ম তলের মর্মরময়ী ভাষা,' 'অধ্রুব' কবিতায় 'খটের ধারে বাতাসে দুল্‌ দুল্‌', 'মন্দি'-তে 'সোঙরিয়া' এবং 'শিশুহীন পুরী'-তে 'লাল নীল ক্ষুদে জাড়ে আঁখি মুদে' ইত্যাদি শব্দ ও শব্দসমষ্টির দেখা পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য, সব ক্ষেত্রে তিনি চিত্রণ-প্রেরণার তাগিদেই যে এই রকম বিচিত্র শব্দ প্রয়োগ করেছেন, তা নয়। কোথাও রঙের টানে, কোথাও বা অভিনবত্বের মোহে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনুপ্রাস বা অন্য কোনো রকম ধ্বনি-কৌশলের ঝোঁকে কবির অনুভূতির চাহিদা ছাপিয়ে, ভাবের সর্বসীমা উপেক্ষা করে, রসের শাসন লংঘন করে শব্দের ছলা-কলা-ধ্বনি-বর্ণের অতিভাষণ দেখা দিয়েছে! অবশ্য, সব ক্ষেত্রে নয়। ব্যতিক্রমও আছে। কিন্তু ব্যতিক্রমের কথা পরে আলোচ্য। প্রথমে দেখা যাক, তাঁর শব্দৌচিত্য-ত্রুটির এই তিন রকম দৃষ্টান্ত। তার আগে আর একটি কথা আছে।

ভাবের চেয়ে রূপকৌশলের আধিক্যই সত্যেন্দ্রনাথের কাব্য-প্রকৃতির বিশেষ লক্ষণ। বাংলা কবিতার ধারায় বিশেষ যে প্রভাবটি তিনি রেখে গেছেন

তাকে বলা যায় শব্দ ও ছন্দগত রূপচাতুরীর বাড়াবাড়ি। যে শব্দে বাঞ্ছিত রসের বিঘ্ন ঘটে, তাকেই বলা যায় অনুচিত শব্দ। রসের পক্ষে সংবেদন (sensation) বা মনন (intellection) দুয়ের কোনোটিই প্রতিকূল নয়। সংবেদনবাহীই হোক, আর মননলব্ধই হোক, সব রকম শব্দই কবিতায় জায়গা পেতে পারে; পঞ্চেন্দ্রিয়ের যে-কোনো প্রাপ্তিই কবি সানন্দে সশব্দে স্বীকার করতে পারেন;—পরিহার্য শুধু বিশেষ কোন একটি উপকরণের দিকে অতিরিক্ত অভিনিবেশ। যে-কোনো কবিতায় যে-কোনো কবি তাঁর অভিপ্রেত রসের অনুকূল যে-কোনো শব্দ ব্যবহার করতে পারেন। বর্ণাঢ্য বা বর্ণবৈচিত্র্যব্যঞ্জক শব্দ অথবা মননময় শব্দ অথবা কবির উদ্ভাবিত বা বৈদগ্ধ্যলব্ধ শব্দ—সবই ব্যবহার করা যেতে পারে; কিন্তু রসে উদাসীন, শব্দে-নিবিষ্টচিত্ত, শব্দকৈবল্যবাদীর মাত্রাজ্ঞানের অভাবই কবিতার চিরকালের অন্তরায়। এই কারণেই শব্দ প্রয়োগের ভালো-মন্দ বিচারের কষ্টিপাথর হোলো রসিক পাঠকের মন; কবিতার অন্যান্য উপকরণের মতো শব্দোপকরণও কাব্যরসিকের অধিগম্য। অভিধার্থ, লক্ষণার্থ, ব্যাকরণের বিধি,—প্রচলনের সীমা,—এসব স্বীকার করেও কোনো একটি শব্দ যেমন বিশেষ কোনো কবিতায় অসার্থক প্রতিপন্ন হতে পারে, এসব অল্পবিস্তর উপেক্ষা করেও তেমনি ভিন্ন ক্ষেত্রে তা আবার সার্থক রসসৃষ্টির অনুকূল হতে পারে। অতএব, সম্পূর্ণ কবিতার রস-সামর্থ্যের দিকে দৃষ্টি রেখে সত্যেন্দ্র-কাব্যের শব্দগত অনৌচিত্যের আলোচনায় যথাক্রমে 'চিত্রাতিরেক', ধ্বন্যতিরেক' ও 'বৃথা-উদ্‌ভাবন' এই তিন বিভাগের দৃষ্টান্ত দেওয়া হোলো। তাঁর পরিণত জীবনের রচনা থেকে, অর্থাৎ 'সমৃদ্ধি' পর্বের বিভিন্ন লেখা থেকেই নিচের সব ক'টি উদ্ধৃতি আহরণ করা হয়েছে—

চিত্রাতিরেক

[ক] আড়-বাড় আর ঘাঁটি মুহড়ায়
'হাঁকার' বাজায় দামামা কাড়া,
হের দেখ কার বিপুল বাহিনী
হামার হয়েছে পাইতে ছাড়া।

—ইন্দ্রজাল : 'অভ্র-আবীর

[খ] উঠছে সুধা, ফুটছে গরল ; যাচ্ছে যেন চেনা
আঢ়ক-হাতে লক্ষ্মী ! সাথে লক্ষ্মী-কড়ি ফেনা।

—পুরীর চিঠি : ঐ

[গ] পালান-ছোঁয়া শাঁওলা ঘাসে বাছুর গরু চরছে পালে,
নাড়িয়ে দু'কান তাড়িয়ে মাছি লোটন-ল্যাজের ছেপ্ কা-তালে,

*   *   *

পতর-আঁটা গতর নিয়ে চলছে গেতো বোঝাই-ভরা,—
মাঝাই বেলার গোড়েন্ সুরে গোড় দিয়েছে নেইক ত্বরা।

—আলোর পাথার : 'বিদায়-আরতি'

[ঘ] বিদ্যুতে বাঁধি তামার বেড়িতে
দস্তার দিয়ে হাতকড়ি,
বে-ঢপ্, বে-গোছ, বে-গোড় মাটিতে
প্রাসাদে দেউল দেব গড়ি,…

—রাজা-কারিগর : 'বেলা শেষের গান'

[ঙ] ঢেলে যায় রবি ধ্যানের সুরভি
গভীর এ মম মনে,—
অসেচ হরষ অমূর্ত রস
আলোর আলিঙ্গনে।

—লীলাকমল : 'ফুলের ফসল'

এই পাঁচটি উদ্ধৃতির প্রথমটিতে 'আড়-বাড়', 'হামার',—দ্বিতীয়টিতে, 'আঢ়ক',—তৃতীয়টিতে 'পালান-ছোঁয়া', 'ছেপ্ কা-তালে', 'পতর-আঁটা', ও 'গেতো',—চতুর্থ উদাহরণে 'বে-গোড়'—এবং পঞ্চমে 'অসেচ'—এই শব্দগুলি মোটেই বহু ব্যবহৃত বাংলা শব্দের মধ্যে গণ্য নয়। প্রথম তিনটি উদ্ধৃতিতে লেখকের বর্ণনার ঝোঁক মাত্রা ছাড়িয়ে যাওয়ার ফলে এরকম ঘটেছে। মেঘের ঘটা দেখে কবির মনে জেগেছে যুদ্ধ-বর্ণনার রূপক। সেই ঝোঁকে দেখা দিয়েছে 'আড়-বাড়' ও 'হামার' ; লক্ষ্মী-প্রতিমার রূপ সুপরিস্ফুট করতে গিয়ে তাঁর হাতে 'আঢ়ক' দিতে হয়েছে ; গরু-বাছুর যে মাঠে চরছে সেই মাঠের শ্যামল ঘাসের প্রাচুর্য ফুটিয়ে তোলবার জন্যে ঘাসের সঙ্গে 'পালান-ছোঁয়া' বিশেষণ বসাতে হয়েছে এবং মাছি তাড়াবার জন্যে গরুর 'লোটন-

ল্যাণ্ডের' আন্দোলন উল্লেখ করেই লেখকের চিত্রণাগ্রহ ক্ষান্ত হয়নি, সে আন্দোলনের 'ছেপ্‌কা-তাল'ও তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন। মালবাহী 'গেতো' চলছে, শুধু এইটুকু বলেই লেখক চুপ করতে পারেননি। সেই 'গেতো'র গতর যে 'পতর-আঁটা' তাও বলবার ইচ্ছা জেগেছে—তা' ছাড়া মাঝাই বেলার সুরের বিষয়ে পাঠকের মনে নিশ্চিততর ধারণা জাগিয়ে তোলবার জন্যেই 'গোড়েন সুর' শব্দ দুটি ব্যবহৃত হয়েছে। চতুর্থ উদাহরণে প্রাসাদাদি নির্মাণের পক্ষে অনুপযোগী ভূমির অনুপযোগিতা বোঝাতে গিয়ে লেখক বলেছেন 'বে-ঢপ, বে-গোছ, বে গোড়'। এই দৃষ্টান্তগুলির মধ্যে লেখকের যে বিশেষ প্রবণতাটি ধরা পড়েছে, তার নাম চিত্রণ-প্রবণতা। বর্ণন-প্রবণতা কথাটিও এ ক্ষেত্রে অনুপযুক্ত নয়,—বরং খুবই উপযোগী। কারণ, বে-ঢপ্‌', 'বে-গোছ' এই দুটি শব্দ ব্যবহার করেও তাঁর বর্ণনার সাধ মেটেনি ; উপরন্তু তিনি 'বে-গোড়' শব্দের প্রয়োজন বোধ করেছেন। এ থেকে বেশ বোঝা যায় যে, তিনি এ বিষয়ে পাঠকের দৃষ্টিগ্রাহ্য স্পষ্ট একটি ছবি আঁকতে চান,—কিন্তু রঙে নয়, রেখায় নয়,—গুণবাচক 'বে-গোড়' শব্দের সাহায্যে! 'গোড়েন সুর'ও চিত্র নয়,—বর্ণনা। তবু 'বর্ণনাতিরেক' কথাটি যে পরিত্যাগ করতে হোলো, তার কারণ এই যে, এই শব্দের অর্থের ব্যাপ্তি বহুবিস্তীর্ণ। 'স্বাগত', 'গঙ্গাহৃদি বঙ্গভূমি', 'আমরা' প্রভৃতি প্রসিদ্ধ কবিতাগুলিতেও সত্যেন্দ্রনাথ বহু জনের, বহু স্থানের, বহু ঘটনার তালিকা দিয়েছেন। 'জাফরানিস্থান'-এও বর্ণনার আগ্রহ কম দেখা যায়নি। 'সিঞ্চলে সূর্যোদয়' এবং 'দিল্লী-নামা' লেখা দু'টি ভিন্ন বিষয়ের রচনা বটে, তবু বর্ণনার আতিশয্য দুটিতেই বর্তমান। সত্যেন্দ্র-নাথের কবিতার পাঠক একাধিকভাবে অতিবর্ণনের পীড়ন ভোগ করতে বাধ্য হন। বর্ণনার ফলে কবিতার অনাবশ্যক কলেবর বৃদ্ধির নমুনা অথবা নানা চিত্রের বহুলতার দ্বারা বিশেষ কোনো চিত্রের প্রতি পাঠকের মনোযোগে বিঘ্ন ঘটাবার দৃষ্টান্ত তাঁর রচনার সকল স্তরেই পাওয়া যায়। 'বর্ণনাতিরেক' কথাটি এই বিশেষ দোষের পক্ষেই প্রযোজ্য। অপর পক্ষে, এখানে যে উদ্ধৃতিগুলি ব্যবহার করা হয়েছে, সেগুলিতে শব্দবাহুল্য ঘটেছে অন্য কারণে। একাধিক চিত্রের ত্বরিত প্রবাহ এখানকার বাধা নয়। নির্দিষ্ট এক-একটি ভাবকে স্পষ্ট করে তোলবার জন্যে কিংবা বিশেষ কোনো কোনো ছবিকে নিখুঁৎ বস্তুসাদৃশ্য দেবার জন্যেই তিনি অল্পপরিচিত, স্ব-উদ্ভাবিত নানান্‌ শব্দ প্রয়োগ করেছেন।

ওপরের উদ্ধৃতিমালার শেষেরটিতে 'হর্ষ' বা আনন্দের নিখুঁৎ, নিঃসংশয়, নির্দিষ্ট প্রকৃতি বোঝাতে গিয়ে তিনি 'অসেচ' কথাটি প্রয়োগ করেছেন।

কবিকর্মের মূলে সার্থক কল্পনাশক্তির (অর্থাৎ সৃজনীকল্পনার) অভাব ঘটলেই এ রকম শব্দগত অনৌচিত্য দেখা দিয়ে থাকে। অভীষ্ট রূপ-গুণ ফুটিয়ে তোলার উপযোগী নিখুঁৎ সংকেতময় শব্দ বা শব্দাবলী যখন তাঁর কলমে ধরা দেয়নি, এরকম ব্যাপার ঘটেছে তখনই।

ধ্বন্যতিরেক

[ক] রইলে দীপ্ত, রইলে দৃপ্ত করলে নিরোধ সব হানা
ধী-শ্রী-ছটার ছত্র মাথায় ছত্রবতী সুলতানা!

—কবর-ই নূরজাহান : 'অভ্র-আবীর'

[খ] (আজ) তোমার আমার মন মিলেছে
মনের মালঞ্চে।
কে জানে আজ দুনিয়া সমাজ
পড়শী পঞ্চে?

—কাজ্‌রী-পঞ্চাশৎ : 'অভ্র-আবীর'

[গ] পদে পদে বাড়ে শুধু হৃদয়ের লঙ্ঘন—
ময়দানে কাঁদে কচি গোপনের পয়দা,
সহরের বিষ ঢোকে পল্লীর ঘর ঘর—
লালসার লোল শিখা বাড়ে রে বে-কায়দা।

—চরকার আরতি : 'বেলা শেষের গান'

[ঘ] গোগর ঝাউয়ের গোকর্ণ-ছাঁদ শাখার তুষার সয়্‌তেছে,
শালের পশম ঝলমলিয়ে ছাগলগুলি চয়্‌তেছে,
শিস্‌ দিয়ে যায় রাখাল-ছেলে গুজর এবং গক্করে,
লাফিয়ে হঠাৎ হাসতে থাকে উছট্‌ খেয়ে টক্করে,

—জাফ্‌রানিস্থান : 'বিদায়-আরতি'

[ঙ] হায় ব্যথিত পাখী
তুমি ফির একাকী,
ওই নীল পাথারে
দাও নিবেদিয়া, রে!

—প্রেমের প্রতিষ্ঠা : 'ফুলের ফসল'

প্রথম উদ্ধৃতির 'ধী-শ্রী-ছটার',—দ্বিতীয়টিতে 'পড়শী পঞ্চে',—তৃতীয় ক্ষেত্রে 'পয়দা' ও বে-কয়দা',—চতুর্থটিতে 'সয়্তেছে' ও 'চয়্তেছে' ক্রিয়ারূপ এবং 'গুঞ্জর' ও 'গঞ্জরে'-র সঙ্গে 'উছট্' ও 'টক্করে' শব্দের মিল এবং পঞ্চম দৃষ্টান্তে 'পাথারে' শব্দের সঙ্গে 'নিবেদিয়া রে' অংশের যোজনা সর্বাংশে সুখকর হয়নি। ছন্দের খাতিরে 'ধী-শ্রী-ছটার' অংশটুকু 'ধী-স্-রিছটার' নয়তো 'ধি-শ্রি-ছটার' এই দু'য়ের যে-কোন একভাবে পড়া দরকার। যে ভাবেই পড়া যাক না কেন, ঐ শব্দসমষ্টির দিকে পাঠকের কান এবং কণ্ঠ বেশি সচেতন থাকার ফলে মনের প্রাপ্তিতে কিছু টানাটানি ঘটে। তেমনি 'মনের মালঞ্চে'-র ঝোঁক বজায় রাখতে গিয়ে 'পড়শী' শব্দের স্বাভাবিক 'পড়্শি'-উচ্চারণ ব্যাহত হয়; পড়তে হয়—'পড়-শি'। তারপর 'পঞ্চে' কথাটাই কেমন যেন বেখাপ্পা মনে হয়। অন্যান্য উদ্ধৃতির মধ্যেও অনুরূপ অতৃপ্তির দৃষ্টান্ত পাওয়া গেল। কেবল চতুর্থ (ঘ) নমুনাটি মোটামুটি মন্দ নয়।

সত্যেন্দ্র-কাব্যের শব্দগত অনৌচিত্যের বেশির ভাগ দৃষ্টান্তই মুখ্যতঃ এই অঞ্চলের আলোচ্য। প্রধানতঃ কানের টানেই তিনি রসের সংযম হারিয়েছিলেন। 'ফুলের ফসলে' আফিমের ফুল বলেছে—

গোলাপ কিসের গৌরব করে?
আমার কাছে সে ফিঁকে;
আমি যে রসের করেছি আধান
জীবন তাহে না টিঁকে।

ঐ একই বইয়ের 'হেমন্তে' কবিতাটিতে দেখা গেল—

কমল বনে নেই কমলা, চঞ্চরীকা চুপ!
বিজন আজি পদ্মদীঘি লক্ষ্মীছাড়ার রূপ!

এবং ঐ কবিতারই পরের অংশে কবি লিখেছেন 'ডাগরগুছি কনকরুচি কনক-চূড়া ধান'। 'ফিঁকে' শব্দের চন্দ্রবিন্দু আঞ্চলিকতা-দুষ্ট; তাছাড়া, ঐ 'ফিঁকে' এবং টিঁকে-র কষ্টক্লিষ্ট মিলটুকু বাদ দিলে 'আফিমের ফুলের' উদ্ধৃত অংশে কাব্যানুরাগীর পক্ষে বাঞ্ছনীয় আর কী-ই বা থাকে? তেমনি আবার হেমন্ত ঋতুতে কমল-বনে কমলার অভাব ঘোষণার সঙ্গে এক নিঃশ্বাসে ভ্রমরের মৌন-ভাবের খবর জানিয়ে দেবার অভিপ্রায়ও যথাযথ আবেগসমর্থিত নয়। 'চঞ্চরীকা'-র সঙ্গে 'চুপ'-এর অনুপ্রাসটুকুই তাঁকে সবলে টেনেছিল। সে

বিষয়ে কবি নিজেও সচেতন। বোধ হয়, সেই কারণেই পরের চরণে তিনি আগের চরণের ঘোষণাটি আরো সুবোধ্য করে পুনরায় বলে দিয়েছেন—'বিজন বনে পদ্মদীঘি লক্ষ্মীছাড়ার রূপ'। 'কনক-রুচি' শব্দের আগে 'ডাগরগুছি শব্দ বসিয়ে কবি তাঁর শ্রুতিচেতনার অনুরূপ লোলুপতা স্বীকার করেছেন। বিশেষতঃ এই শেষের দৃষ্টান্তটিতে 'চিত্রাতিরেক' ও 'ধ্বন্যতিরেক' দু'রকম ব্যাপারই ঘটেছে। হেমন্তের ধানের ছবি আঁকতে বসে কবি ধানের সোনা-রঙের উল্লেখ করলেন 'কনক-রুচি' শব্দের সাহায্যে; ধানের শীষের সুস্পষ্ট আয়তন বোঝা গেল 'ডাগরগুছি' শব্দের যোগে;—তারপর, তাঁর দৃষ্টি সেই একই দৃশ্যে পুনরায় সংবদ্ধ হওয়ার ফলে দেখা গেল 'কনকচূড়া ধান'! এখানে ছবিটি মনোরম, সন্দেহ নেই। কিন্তু যে-শিল্পীকে শব্দের সাহায্যে চিত্র রচনার দায় স্বীকার করতে হয়, তাঁকে শব্দের নানা দিকে দৃষ্টি রাখতে হয়। অভিধার্থ ছাড়া শব্দের আছে ধ্বনির দিক,—আছে সেই বিশেষ শব্দ সম্পর্কে পাঠকের কান এবং মন উভয়ের সমর্থন বা বাসনার সম্ভাবনা বিবেচনার প্রয়োজন,—তাছাড়া এও দেখা দরকার যে পাশাপাশি অন্যান্য যেসব শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, তাদের সঙ্গে বিশেষ শব্দটির সংগতি আছে কি নেই। আলোচ্য উদ্ধৃতিটির মধ্যে 'ডাগরগুছি' শব্দটি পাঠকের মনে যে রূপ জাগিয়ে তোলে, মনের মধ্যে সে রূপ থিতিয়ে যাবার আগেই 'কনক-রুচি' ও 'কনক-চূড়া',—ভিন্ন জাতের এই দুটি শব্দের অনতিব্যবহিত প্রয়োগে পূর্ববোধ দ্বিধাগ্রস্ত হয়।

শব্দের দিকে বেশি আগ্রহ ঘটার ফলেই এ-রকম ব্যাপার দেখা দেয়। কোনো একটি হৃদয়াবেগ (impulse) যথোচিত তীব্র না হওয়া অবধি কবির পক্ষে প্রতীক্ষা দরকার। তার অন্যথা হলে শব্দাধিকারবান কবি তাঁর সহজপটুত্বের গুণে শব্দের পরে শব্দ বসিয়ে, ছন্দ মিলিয়ে, শ্রুতিগ্রাহ্য পদ্য রচনা করতে পারেন, কিন্তু ভাবব্যঞ্জনাময় কবিতার সম্ভাবনা দূরেই থেকে যায়। সত্যেন্দ্রনাথের রচনায় এ রকম অঘটন অনেকবার ঘটেছে। এ দিক দিয়ে Swinburne-এর সঙ্গে তাঁর বিশেষ সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। Swinburne-এর মতন তিনিও কেবলমাত্র শব্দের প্রসাদেই মাঝে মাঝে চমৎকার কুহক সৃষ্টি করেছেন—

ও যে মৃত্যু-মন্দির চির প্রাণ-কণিকা
ধরে সৌরভে বিদ্যুৎ ও ফুল-কণিকা,
ও যে অপ্সরী লয় মরি' চিত্ত হরি,
রাণী জাফ্‌রানী সুন্দরী পুষ্প-পরী।

[জাফরানের ফুল—'অভ্র-আবীর']

কিংবা—

হরমুকুট! হরমুকুট
ভূ-স্বরগের সুমেরু-কূট
গগনে প্রায় ভিড়ায়ে কায়
করিতে চায় তারকা লুট!

[হরমুকুট গিরি : ঐ]

এইসব দৃষ্টান্তে শব্দের সংগীত-ই প্রধান আকর্ষণ। অপর পক্ষে, নিচের উদ্ধৃতিটিতে তাঁর অন্য সামর্থ্যেব পরিচয় বিদ্যমান। ছবি এবং ধ্বনি পরস্পরের সহযোগিতা স্বীকার করে চমৎকার এক 'খেয়ালে'র রূপ জাগিয়েছে—

এক যে আছে কুজ্ঝটিকার দেওয়াল-ঘেরা কেল্লা,—
মৌনমুখী সেথায় নাকি থাকে!
মন্ত্র প'ড়ে বাড়ায় কমায় জোনাক-পোকার জেল্লা,
মন্ত্র পড়ে চাঁদকে সে রোজ ডাকে!
তুঁত-পোকাতে তাঁত বুনে তার জান্‌লাতে দেয় পর্দা,
হুতোম প্যাচা প্রহর হাঁকে দ্বারে;
ঝর্নাগুলি পূর্ণ চাঁদের আলোয় হ'য়ে জর্দা
জলতরঙ্গ বাজ্‌না শোনায় তারে!

[ফুলের রাণী : 'ফুলের ফসল']

যথার্থ হৃদয়াবেগের উৎস থেকে যেখানেই একটি পুরো ছবি ধরা দিয়েছে,—অর্থাৎ রূপসৌন্দর্য বা ভাবসৌন্দর্যের আবেশ যেখানে অকৃত্রিম, সেখানে চিত্রেরও অতিরেক নেই, ধ্বনিরও আতিশয্য নেই,—এমন কি সত্যেন্দ্রীয় শব্দ-শোভাযাত্রাও এ-রকম কোনো কোনো ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অন্তর্হিত,—যেমন নিচের উদ্ধৃতিটিতে—

তারে আসতে দেখে ঘাটের পথে
শিউলি ঝরে লাখে লাখে,

জুঁয়ের বুকে নিবিড় সুখে
প্রজাপতি কাঁপ্‌তে থাকে!
জলের কোলে ঝোপের তলে
কাঁচপোকা রং আলোক জ্বলে,
লুব্ধ ক'রে মুগ্ধ ক'রে
বৌ-কথা-কও কেবল ডাকে;
আর হাল্‌কা বোঁটা ফুলের বুকে
প্রজাপতি কাঁপতে থাকে।

—কিশোরী : 'ফুলের ফসল'

তাঁর সমগ্র কবিতাবলীর পূর্ণ পরিসরের মধ্যে এই বিপরীত ও ভিন্ন লক্ষণের সমাবেশ বিচার করে তাঁর প্রকৃত সামর্থ্য নির্ণয় করা বিশেষ সতর্কতাসাধ্য কাজ। বাংলা সাহিত্যের একালের কোনো কোনো আলোচক তাঁর কবিতা সম্পর্কে যে লঘু অনুকম্পার ভাব পোষণ করেন, সে ভাব সংগত নয়। আবার যতীন্দ্রমোহন বাগচীর ভাষায় 'সচ্ছন্দ ছন্দরাজ' বলে তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে অভিবাদন জানিয়ে বিনা-বিচারে তাঁর সব কবিতা রসোত্তীর্ণ বলে স্বীকার করে নেওয়াও সুযুক্তি নয়। প্রকৃত বিচারের দায়িত্ব নিয়ে সত্যেন্দ্রনাথের যথার্থ রসোত্তীর্ণ লেখাগুলির একটি নির্ভরযোগ্য সংকলন ছাপা হওয়া দরকার। 'কাব্য-সঞ্চয়ন' ঠিক এ ধরনের সংকলন নয়। কেবল ধ্বনিগত সৌন্দর্য, স্পন্দন, অভিনবত্ব বা চমৎকারিত্বের দিকেই মুখ্যতঃ দৃষ্টি রেখে তিনি যে কবিতাগুলি লিখেছেন (যেমন 'পিয়ানোর গান,' 'ইল্‌শে গুঁড়ি,' 'পাল্কীর গান' ইত্যাদি), সেগুলিতে উচ্চারণগত ধ্বনির প্রাধান্য অপ্রত্যাশিত নয়; সুতরাং সে-সব রচনায় শ্রুতিগত ছলা-কলার খাতিরে পূর্বোক্ত অন্যান্য দিকের অল্পবিস্তর শৈথিল্য মেনে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু অন্য ক্ষেত্রে বিচারের পদ্ধতি পরিবর্তিত হওয়াই স্বাভাবিক। একটি দৃষ্টান্ত দিলে ব্যাপারটি আরো স্পষ্টভাবে বোঝা যাবে—

টুক্ টুক্ পদ্ম
লক্ষ্মীর সদ্ম
নয় তার দুই পার
আল্‌তার মূল্য।

টুক্ টুক্ টুক্ ঠোঁট
নয় শিউলীর বোঁট
টুক্ টুক্ টুকটুক
নয় বসরাই গুল।

—পিয়ানোর গানঃ 'অভ্র-আবীর'

বলা বাহুল্য, 'সদ্ম' কথাটা বাংলায় সচরাচর পাওয়া যায় না। অভিধান খুললে শব্দটির অর্থ দেখা যাবে 'আবাস' বা 'গৃহ'। হয়তো কবি বলতে পারতেন 'লক্ষ্মীর কক্ষ'। কিন্তু তাতেও বিষয়টি সুখকর হোতো না, কারণ, 'কক্ষ' শব্দটা ভাবের মর্যাদা বা ঔচিত্যে বাধা ঘটাতো,—তাছাড়া 'কক্ষ' শব্দের মানে—বগল, কোমর, গ্রহ-নক্ষত্রের পরিভ্রমণের পথ—এ সবও হতে পারে। কিন্তু 'পদ্ম' কথাটির শ্রুতিরূপ ঐ কথাটির সঙ্গে নিখুঁত ভাবে মিলেছে এবং 'সদ্ম' আর 'পদ্ম' যে ধ্বনিসাম্যের সৃষ্টি করেছে, তা 'কক্ষ' বা অন্য কোনো নিকট প্রতিশব্দেরই সাধ্য ছিল না। টুক্ টুক্ তুল্ তুল্ প্রভৃতি ধ্বন্যাত্মক শব্দ এখানে প্রত্যাশিত, স্বাভাবিক, স্বাধিকারে সমাগত। কিন্তু সব জায়গায় এরকম ঘটেনি। দৃষ্টির বিষয়কে শ্রুতির সৌকর্য দেবার অবাঞ্ছিত, অনুচিত প্রয়াসের ফলে ধ্বন্যতিরেক-গ্রস্ত শব্দের শরশয্যায় রসানুভূতির লোকান্তর প্রাপ্তি ঘটেছে, এমন দৃষ্টান্তও বিরল নয়। 'অভ্র-আবীর'-এর 'জর্দা-পরী' থেকে এই রকম একটু নমুনা তুলে দেওয়া হোলো—

রৌদ্রে এবং বিদ্যুতে তুই পাখ্‌না মেলে যাও কোথায়?
যাই কোথায়?—
হায় রে হায়
দরদ দিয়ে বুঝতে জরদ্ গরদ-গুটির দরদ্-দায়।'

এখানে শেষ চরণের দরদ্-জরদ্-গরদের ধাক্কায় অনুভূতির ভারসাম্য টলেছে,—ধ্বনির অসংযমে ভাবের ভাগ্যে দেখা দিয়েছে মহতী বিনষ্টি! এ কথা অতিশয়োক্তি নয়। কবি যে-হাতে প্রতিমা গড়তে বসেছেন, সেই হাতেই প্রতিমা ভেঙে ফেলেছেন। তাঁর নিজের কথাই তাঁর এই জাতের লেখাগুলির সার্থক সমালোচনা—'শব্দ ধুনিয়া ধাঁই ধাঁই, করে কায়দানী বিস্তর!'

বৃথা উদ্‌ভাবন

ভাষা, ভঙ্গি, ছন্দ—এইসব উপকরণের ওপর অতিরিক্ত দখল থাকা

সাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন কোনো কবির পক্ষে ভালো নয়। যে-কবি যখনই কলম ধরেন তখনই চলনসই কোনো একটি ভাব বা রূপ মোটামুটি চলনসই শব্দ, ছন্দ ইত্যাদির সহায়তায় কবিতার আকার নিতে থাকে, সে রকম কবির সাফল্য সংশয়াচ্ছন্ন। কারণ, কবিতা তো কেবল শব্দচাতুর্য নয়, কেবল ছন্দের স্বাচ্ছন্দ্যও নয়, কেবল ছন্দোবদ্ধ শব্দের শ্রুতিগ্রাহ্য স্পন্দনও নয়। কবির ইন্দ্রিয়চেতনা, কল্পনা, মনন, শব্দবোধ, ছন্দ-চেতনা,—তাঁর সংস্কার, তাঁর আত্মবোধ, তাঁর বিশ্বসম্পর্ক,—সব নিয়ে তাঁর সত্তার যে বিশিষ্ট অখণ্ডতা, সেই অখণ্ডের আন্দোলন থেকেই যথার্থ কবিতার জন্ম হয়ে থাকে। তাই প্রত্যেকটি কবিতাই কবির নতুন আত্ম-প্রক্ষেপণ; শব্দাদি উপকরণের মধ্য দিয়ে তাঁর পৃথক-পৃথক অভিজ্ঞতা যথোচিত মূর্তি ধারণ করে থাকে। রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দময় জগতের বিচিত্র স্বাদ তাঁর স্পর্শকাতর সত্তার স্বত্বাধিকারভুক্ত হয়। সেই স্পর্শকাতরতাই তাঁর শব্দ-ব্যবহারের নিয়ন্তা। বিষয়টি আরো সুবোধ্য করতে হলে বলা যায় যে, প্রকৃত কবির চেতনায় কোনো অভিজ্ঞতাই নীরব নয়, নিঃশব্দ নয়, ধ্বনিহীন নয়।

> ঝরকে ঝরকে ঝরিছে বকুল
> আঁচল আকাশে হতেছে আকুল
> উড়িয়া অলক ঢাকিছে পলক
> কবরী খসিয়া খুলিছে
> ওগো নির্জনে বকুল শাখায়
> দোলায় কে আজি দুলিছে।

এই দৃশ্যের রূপসৌন্দর্য এই কবিতার শব্দ ও ছন্দের ধ্বনিসৌন্দর্যের অবিচ্ছেদ্য সহচর। হৃদয়াবেগের যে বিশেষ অবস্থায় এই বিশেষ রূপ শব্দস্থ হয়েছে, তার অকৃত্রিম সত্যতা সম্বন্ধে রসিক পাঠকের মনে সংশয় জাগে না। অন্য অভিজ্ঞতার ধ্বনিরূপ হবে অন্য রকম। মনের অন্য কোনো লগ্নে কবিতার সরস্বতী আবার যখন কবির মনোযোগ দাবী করবেন, তখন পুনরায় ঠিক এই ভাষায় তাঁর মানরক্ষা করা যাবে না। তা হয় না। একই ভাষা, একই শব্দ, একই ভঙ্গির পুনরাবৃত্তির নাম মুদ্রাদোষ। অবশ্য, অনবধান মনও কবিতার বিষয় হতে পারে,—কিন্তু আপন অভিজ্ঞতা ও কবিধর্ম সম্পর্কে অনবধান কোনো কবির পক্ষে কখনোই বরণীয় নয়।

এই ঘরে আগে পাছে
বোবা কালা যত বস্তু আছে
দলবাঁধা এখানে সেখানে,
কিছু চোখে পড়ে কিছু পড়ে না মনের অবধানে।
পিতলের ফুলদানিটাকে
বহে নিয়ে টিপাইটা এক কোণে মুখ ঢেকে থাকে।

১৯৩৮ সালে লেখা 'জানা-অজানা' থেকে রবীন্দ্রনাথের এই যে কয়েক ছত্র এখানে তুলে দেওয়া হোলো, এতে দেখা যাচ্ছে চারদিকের অগোছালো ভাব। তিনি যেন বিশেষ একটি মর্জিকে ইশারায় কাছে ডেকেছেন,—বলেছেন, 'যেমন আছ তেমনি এসো, আর কোরো না সাজ'। ঘরের বোবা-কালা বহু বস্তুর কোনোটার দিকেই তখন আর তাঁর দৃষ্টির আসক্তি নেই।

ক্যাবিনেটে কী যে আছে কত,
না জানারি মতো
পর্দায় পড়েছে ঢাকা সার্সির দুখানা কাঁচ ভাঙা;
আজ চেয়ে অকস্মাৎ দেখা গেল পর্দাখানা রাঙা
চোখে পড়ে পড়েও না;

কিন্তু তাঁর কবিদৃষ্টি সত্যিই অনবহিত নয়! এক জায়গায় সংবদ্ধ রয়েছে সেই বিশেষ সকালবেলার বিশেষ এক সত্তার চেতনা—'জানা-অজানার মাঝে সরু এক চৈতন্যের সাঁকো'! শব্দে, ছন্দে, চিত্রকল্পে সেই সাঁকোটিকেই ধরবার চেষ্টা দেখা গেল। এখানে কবি তাঁর দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন; তাঁর উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনি অবহিত; বিষয়ের উপযোগী বাহনের আবশ্যিকতা সম্পর্কে তিনি উদাসীন নন। কবিতাটির শেষ দিকে পৌঁছে দেখা গেল—

আয়না ফ্রেমের তলে ছেলেবেলাকার ফোটোগ্রাফ
কে রেখেছে, ফিকে হয়ে গেছে তার ছাপ।
পাশাপাশি ছায়া আর ছবি।
মনে ভাবি আমি সেই রবি,
স্পষ্ট আর অস্পষ্টের উপাদানে ঠাসা
ঘরের মতন; ঝাপসা পুরানো ছেঁড়া ভাষা
আসবাবগুলো যেন আছে অন্যমনে।
সামনে রয়েছে কিছু, কিছু লুকিয়েছে কোণে কোণে।

যাহা ফেলিবার
ফেলে দিতে মনে নেই। ক্ষয় হয়ে আসে অর্থ তার
যাহা আছে জমে।

এলোমেলো নানা আসবাবে, প্রয়োজনীয়-অপ্রয়োজনীয় বিচিত্র বিস্রস্ত বস্তুভারে এই ছবিটি অনভিপ্রেত, অনতিদৃষ্ট, অসংগত কতকগুলি বিষয়ের তালিকামাত্র হয়নি,—কবির গভীর অভিপ্রায়ের সঙ্গে এই ছবি-ছন্দ-শব্দ-শব্দবন্ধের যোগ অবিচ্ছেদ্য। 'কার্পেট', 'ক্যাবিনেট', 'টিপাই', 'ফ্রেম', 'ভেস্কো'—এই সব শব্দ কবির মূল অভিপ্রায়ের অভিব্যক্তিতে কোনোরকম বিঘ্ন উৎপাদন করেনি। 'থাকে-থাকে' 'এলোমেলো', 'জাজিম', 'ঠাহর'—এরাও চেনা-মহলের চেনা-মানুষের মতো সহজে প্রবেশ করেছে। 'চোখবোজা অভ্যাসের পথ',—'জানা-অজানার মাঝে সরু এক চৈতন্যের সাঁকো',—"কার্পেটের ডিজাইনে' দেখা—

আগেকার দিন আর আজিকার দিন
পড়ে আছে হেথা হোথা এক সাথে সম্বন্ধবিহীন

—এইসব চিত্রকল্প এসেছে বসন্তের নির্বিঘ্ন অভ্যুদয়ের মতো। প্রয়াসের চিহ্ন নেই, প্রযত্নের বলিরেখা নেই, শ্রমের শ্রান্তি নেই, কর্মের ক্লান্তি নেই, সুন্দর, সহজ, সাবলীল এক সরসতার মধ্যে স্মৃতি-বিস্মৃতির নির্দ্বন্দ্ব নিষ্পত্তি ঘটে গেছে। এই প্রকাশ-ব্যাপারের অন্তরালে ভাবের সঙ্গে বচনের, প্রেরণার সঙ্গে প্রকাশের বোঝাপড়া ঘটে থাকলেও কবিতায় তার দাগ পড়েনি। কবির অন্তরের অভিপ্রায় শব্দ-ছন্দ-ভঙ্গির দেহ ধারণ করে যখন পাঠকের অধিকার ও আগ্রহের সীমানায় প্রবেশ করলো, তখন বাগর্থের হরগৌরী সম্মিলনই রইলো একমাত্র সত্য। উপকরণের নিঃশেষ সমর্পণের মধ্য দিয়ে পাওয়া গেল সৃষ্টি! সৃষ্টি কেবল উপকরণের যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ নয়,—সৃষ্টি হোলো উপকরণের অত্যয়,—সমগ্রের উদ্ভব! এ এক আত্যয়িক নতুনত্ব,—অর্থাৎ emergence!

সত্যেন্দ্রনাথের বহু কবিতার ব্যর্থতার প্রধান কারণ এই উপকরণের দিকে তাঁর আগ্রহের আতিশয্য। ছন্দে তাঁর ছিলো সহজপটুত্ব। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, ভাওয়ালের গোবিন্দ দাস এবং আরো কেউ কেউ সে সময়ে মৌখিক বাগ্‌ভঙ্গি ও আটপৌরে শব্দের দিকে নতুন লেখকদের সবলে আকর্ষণ করেছিলেন। সেই ধারায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ক্ষণিকায়' নিজের উজ্জ্বল স্বাক্ষর

রেখে গেলেন। সত্যেন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভা তখন বিকাশমুখী। তদ্ভব ও দেশি শব্দের দিকে স্বভাবতঃই তাঁর অনুরাগ দেখা দেয়। তা'ছাড়া বহু ভাষার বহু কবিতার অনুবাদসূত্রেও উত্তরোত্তর তাঁর শব্দাগ্রহের প্রসার ঘটেছে। অক্ষয়কুমার দত্ত এবং বিদ্যাসাগরের পণ্ডিতী বাংলাও তিনি সাগ্রহে পড়েছেন, আবার, চর্যাপদ থেকে ভারতচন্দ্র পর্যন্ত প্রায় হাজার বছরের বাংলা পদ্য-সাহিত্যেও তাঁর রুচিমান্দ্য ঘটেনি। ফলে, তৎসম, তদ্ভব, দেশি, বিদেশি,—বাংলায় প্রচলিত সব রকম শব্দই তাঁর করায়ত্ত ছিলো। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ প্রভৃতির শব্দালোচনা থেকে তাঁর এই আগ্রহ হয়তো আরো উদ্দীপনা পেয়েছিল। ধ্বন্যাত্মক শব্দের দিকে তাঁর ঝোঁক বাড়িয়েছিলেন ভারতচন্দ্র। অনুবাদের কাজে নেমে বার্নস্, মিস্ত্রাল প্রভৃতি লেখকের আদর্শ থেকে তিনি পেয়েছিলেন আঞ্চলিক প্রয়োগসিদ্ধ শব্দের প্রতি আগ্রহ। এইভাবে অতিরিক্ত শব্দচর্চার ফলে তাঁর কবিতায় মাঝে মাঝে এমন কিছু কিছু শব্দ প্রবেশ করেছে যেগুলির উদ্দেশ্য খুঁজতে গেলে না পাওয়া যায় ধ্বনিসৌকর্যের নিমিত্ততা, না পাওয়া যায় রূপবর্ণনার হেতুত্ব। রূপেও নয়, ধ্বনিতেও নয়, এমন কি মনোভঙ্গির বিশেষ কোনো অবস্থা প্রকাশের হেতু কল্পনা করেও যে এইসব শব্দের ঔচিত্য সমর্থিত হবে, তাও অসম্ভব। অভিধানে গৃহীত, লোকমুখে প্রচলিত পূর্বকালের অন্য কোনো কবির ব্যবহৃত এবং কবির নিজের উদ্‌ভাবিত, সব রকম শব্দই ক্ষেত্রবিশেষে বৃথা-উদ্‌ভাবিত মনে হতে পারে।

তবে, শব্দের ব্যবহারে কবির উদ্‌ভাবন-স্বভাবটি পুরোপুরি নিন্দনীয় নয়। অভিপ্রেত-রসের চাহিদা মেনে নিয়ে তাঁর কলমে যে-কোনো শব্দই দেখা দিতে পারে। সত্যেন্দ্রনাথ যখন লিখেছেন—

সন্তর্পণে কুতূহল-মনে
উঠে গাছে ন্যাথে সুর
ডগের হাঁড়লে বৃষ্টির জল
ভরা টইটুম্বুর!
ঝড়ে-পড়া তাতে পচে আমলকী
গাঁজনি অহর্নিশ,

পচে পাখীদের চঞ্চু-চ্যুত
নীবার ধানের শীষ !

—সুরার ইতিহাস : 'বেলা শেষের গান'

—তখন 'ডগী, 'টইটুম্বুর' প্রভৃতি কথায় কারও আপত্তি হবার কথা নয়। আবার রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে তিনি যখন লিখেছেন—

যুবন্ প্রাণের গাও আরতি,
যে প্রাণ বনে বনস্পতি,
নবীন সবনের ব্রতী ! জয় ! জয় !

কিংবা—

দিগ্বিজয়ীদিগের নেতা !
চিদ্-রসায়ন প্রচেতা ! জয় ! জয় !

অথবা

পাবনী বাগ্‌দেবীর কবি !
পাবীরবীর গায়ন রবি !

—শ্রদ্ধাহোম : ঐ

—তখন গানের সুরগত মহিমার খাতিরেই 'সবন', 'যুবন', 'চিদ্-রসায়ন', 'পাবীরবী'-র উপস্থিতি মেনে নিতে হয় বটে। তবে এও বৃথা-উদ্ভাবন নয়। এরা কেউই বৃথা নয়; এরা শুধু কটু, কঠিন, অপনির্বাচিত। কবির শ্রদ্ধার মনোভাব এখানে কয়েকটি অনতিপরিচিত, অভিধানলভ্য শব্দ আশ্রয় করে আত্মপ্রকাশ করেছে। খুঁজে দেখলে হয়তো যোগ্যতর প্রতিশব্দ পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু যোগ্য হোক্ অযোগ্য হোক্—কবিতার সঙ্গে এদের অর্থগত, ধ্বনিগত এক রকম যোগ অস্বীকার করা যায় না। 'সবন' কথাটার দিকে তাঁর যেন কিছু বেশি ঝোঁক ছিল। 'মন্যু' কথাটাও তাঁর প্রিয় শব্দ। অভিধানে দেখা গেল 'সবন' শব্দের পাঁচ রকম মানে হতে পারে:—যজ্ঞ, যজমান, সোমরস পান, চন্দ্র এবং প্রসব (জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাশ : পৃঃ ২০০৩)। 'অরুন্ধতী'-তে তিনি লিখেছিলেন—

হবে রাক্ষস সবনে ভস্ম
পাপের আবর্জনা।

অভিধানলভ্য এই তৎসম শব্দগুলির সংখ্যা কম নয়। এ ছাড়া তাঁর

মৌলিক বা নিজের প্রিয় শব্দের মধ্যে এইগুলির উল্লেখ করা যায়—'আঙ্‌রা ঝুরো' ('ঘুমতী নদী' : 'বিদায়-আরতি'), 'আয়সী' ('উড়ো-জাহাজ' : 'বেলা শেষের গান'), 'ওলোন ঝোলা' ('নষ্টোদ্ধার' : 'কুহু ও কেকা') 'ওপ্‌পাট' ('চরকার আরতি' : 'বেলা শেষের গান') 'ডাগরগুছি', ('হেমন্তে' : 'ফুলের ফসল'), 'গোখ্‌রী', 'ভিল্‌ভিলে হাঁস' ('পাতিল-প্রমাদ' : 'বিদায় আরতি'), দাব্‌ড়ি-ভোতা' (✓ গোখ্‌লে : 'অভ্র-আবীর'), 'বোকাটিয়া হাসি' ('কাশ্মীরী ভাষা' : 'হসন্তিকা') 'মাইল-মারী' ('জলচর-ক্লাবের জলসা রঙ্গ' : 'বিদায়-আরতি') এবং এই রকম আরো অনেক শব্দ। 'ধোয়ানী' 'জোয়ানী' ('চরকার আরতি' : 'বেলা শেষের গান') প্রভৃতি শব্দও এই শ্রেণীতে জায়গা পেতে পারে। সে যাই হোক, এসব শব্দকেও ঠিক বৃথা-উদ্‌ভাবিত শব্দ বলা চলে না। কোনো-না-কোনো অর্থ প্রকাশের যুক্তিসংগত প্রয়োজনেই এগুলি ব্যবহৃত হয়েছে।

অপর পক্ষে সেই শব্দকেই বৃথা-উদ্‌ভাবিত শব্দ বলা যাবে, যার প্রয়োগের মূলে না আছে ছন্দ-সৌষম্যের তাগিদ, না আছে বিশেষ কোনো মর্জি অথববা ভাব,—রূপ অথবা সংবাদ প্রকাশের অভিপ্রায়। অর্থাৎ কবিতার রস-সত্যের প্রয়োজনে নয়, বস্তু সত্যের সমর্থনে নয়, পাঠকের অপরিচিত অথচ কবির অভিপ্রেত বিশেষ কোনো তত্ত্বের বর্ণনা বা ব্যাখ্যানের উদ্দেশ্যেও নয়,—কেবল শব্দের নেশায়,—অসংযত, অনবহিত শিল্পিমানসের প্রশ্রয়ে যে শব্দ কবিতার কোনো এক স্থানে নিজের জায়গা দখল করে নেয় এবং অর্থ বা ভাবের বিঘ্ন ঘটিয়ে কেবল অনুসৃত ছন্দের মান বাঁচাবার ব্যর্থ চেষ্টায় যে শব্দ নিঃসংশয়ে শ্রুতিকটু হয়েও নির্বিচারে গৃহীত হয়, তাকেই বলা যেতে পারে বৃথা উদ্‌ভাবনের নমুনা।

বে-ঢপ্‌ বে-গোছ বে-গোড় মাটিতে
প্রাসাদ দেউল দেব গড়ি

এই অংশের কথা আগেই বলা হয়েছে। বাংলায় 'গোড়' কথাটি মূল বা শিকড় অর্থে এবং তা ছাড়া হিন্দি 'পা' অর্থেও ব্যবহার করা হয়। যে অর্থেই নেওয়া হোক না কেন, এখানে সে কথা অর্থহীন। আগের অংশের সঙ্গে ছন্দ বজায় রাখবার জন্যেই যে কবি ঐ শব্দটি ব্যবহার না করে পারেন নি, তাও বলা যায় না। তাঁর মতো একজন প্রসিদ্ধ ছন্দ-দক্ষ কবি

'বে-গোড়' শব্দের বদলে অনায়াসে অন্য কোনো শব্দ বসাতে পারতেন। কিন্তু তা না করে, নিজের ব্যবহৃত 'বে-চপ্' এবং 'বে-গোছ্' এই দুটি শব্দের ঝোঁক মেনে নিয়ে তিনি তৃতীয় শব্দটি বানিয়েছেন এবং ব্যবহার করেছেন। এই প্রয়োগের মূলে কবির মনে তেমন বিশেষ কোনো অর্থ প্রকাশের আগ্রহ ছিল না বলেই তা অর্থহীন হয়ে উঠেছে। ও-থেকে ধ্বনির প্রবাহে উল্লেখযোগ্য অভিনব কোনো চাতুর্যের লক্ষণ ফোটে নি। ফলে, বিশ্লেষকের চোখ আকর্ষণ করা ছাড়া ঐ শব্দটির আর কোনো কৃত্য নেই। প্রথমে মনে হয়, মাটিকে নানাভাবে বিশেষিত করে কবি সম্ভবতঃ বিশেষ মাটির বিশেষ প্রকৃতির পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিতে চান। ফলে বর্তমান আলোচনার প্রস্তাব অনুসারে ওটিকে প্রথমতঃ 'চিত্রাতিরেকের' নমুনা মনে করা যেতে পারে। তারপর ধ্বনির একটি বিশেষ প্রবাহ অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্যেই ওটি প্রয়োগ করা হয়েছে, একথা বিবেচনা করে: 'ধ্বন্যতিরেকে'র দৃষ্টান্ত ভাবাও অসংগত নয়। সব শেষে সব দিক বিবেচনা করে দেখা গেল যে, বিশেষ কোনো অর্থের জন্যেও নয়, ছন্দের অনিবার্য প্রয়োজনেও নয়,—'বে-গোড়' এসেছে কবির পূর্ব-উদ্ভাবিত দুটি শব্দের শব্দজাড্য (inertia of words) অনুসরণ করে। এরই নাম বৃথা-উদ্ভাবন। ছালিক্য ছন্দের অনুসরণে লেখা 'ভারতের আরতি' ('বেলা শেষের গান') কবিতাটিতে দেখা গেল—

আদ্যের গুরু অর্ধেক ধরার
মৃত্যুর ডেরায় মুক্তির করার!
চিন্ময়!…অতীত তন্দ্রার ত্বরার! জয়! জয়!

আরবী 'করার' শব্দ বাংলায় সাধারণতঃ 'কড়ার' রূপেই পরিচিত। ঐ শব্দের অভিধার্থ হোলো 'অঙ্গীকার' বা 'চুক্তি'। ভারতবর্ষের সংস্কৃতি মৃত্যুর মধ্য দিয়ে অমৃত সন্ধানের আদর্শ বরণ করেছিল,—এইরকম অর্থে 'মৃত্যুর ডেরায় মুক্তির করার' অংশটুকুর সার্থকতা স্বীকার্য। কিন্তু 'চিন্ময়!… অতীত তন্দ্রার ত্বরার'—এই অংশের অর্থ গ্রহণ করা সহজ নয়। অতীতে যখন অন্যান্য দেশ তন্দ্রাচ্ছন্ন ছিল, তখন, ভারতবর্ষের সংস্কৃতি সজাগ ছিল,—অতীতের তন্দ্রার মধ্যে ভারতবর্ষ ছিল চিন্ময়! হয়তো এই কথাটাতেই কবির লক্ষ্য ছিল। কিন্তু 'ত্বরার' শব্দের অন্বয় কার সঙ্গে? কোনোমতে এ কথার একটা কষ্টব্যাখ্যান দেওয়া যেতে পারে বটে,—কিন্তু ঐ শব্দটিকে রসিক পাঠকের সানন্দ স্বীকৃতি

দিয়ে বরণ করা অসম্ভব। এবং যদি বলা যায়—'ধরার' ও 'করার'-এর সঙ্গে অনুপ্রাস বজায় রাখবার জন্যই সত্যেন্দ্রনাথ ওখানে 'স্বরার' শব্দটি প্রয়োগ না করে পারেন নি, তাহলে শব্দসমৃদ্ধ সত্যেন্দ্রনাথের শব্দসামর্থ্যের প্রতি অবিচার করা হয়। বলা বাহুল্য, এ শব্দটি বৃথা-উদ্ভাবিত! 'শিরাজ-ই-হিন্দ' কবিতার শেষ দু'চরণে দেখা গেল—

আদ্‌রা শুধু আধটা দেখি ঘুমতি-নদীর তীর ঘুরে,
পূর্ণ ছাঁধার পৌর্ণমাসী,—আশায় তারি মন ঝুরে।

'আদ্‌রা' কথার মানে হোলো—আদল বা ক্ষীণ সাদৃশ্য। ঐ শব্দের সঙ্গে আবার 'আধটা' যোগ করবার অর্থগত আবশ্যিকতা যে আদৌ নেই, একথা কবিতার সমঝদার মাত্রেই স্বীকার করবেন। 'অর্ধেক ক্ষীণ সাদৃশ্য'—এ কথা নিরর্থক। বিশেষ কোনো ধ্বনিকৌশল দেখাবার জন্যেও ও-শব্দের প্রয়োগ ঘটেনি। অতএব এও বৃথা-উদ্ভাবিত শব্দের দৃষ্টান্ত। ঐ একই কবিতার আগের অংশে আছে—

শকুনগুলো ফুলছে ফলে তরুণ শবের বুক কুরে'
মুণ্ড-লগন মজ্জা-মেরুর কাবাব জোগায় কুকুরে।

কেবলমাত্র উচ্চারিত ধ্বনির গুণেই যিনি খুশি বোধ করে থাকেন, সমাসবদ্ধ 'মুণ্ডলগন' শব্দটি পেয়ে তিনিই কেবল তৃপ্তি লাভ করবেন। কিন্তু রসিক পাঠক দেখবেন রসভঙ্গের লক্ষণ। 'মুণ্ড-লগন' ও 'মজ্জা-মেরু' দুটি শব্দই অদ্ভুত, উৎকট ও বৃথা-উদ্ভাবিত। অবশ্য যাহোক্ কোনো একটা অর্থ খুঁজে দেখতে গেলে বিষয়টি এইভাবে ব্যাখ্যা করা অসম্ভব নয়—'মুণ্ডে লগ্ন মজ্জার ও মেরুদণ্ডের কাবাব কুকুরের ভোগের জন্যে জোগানো হয়'।

বলা বাহুল্য, কেবল ধ্বনির খাতিরে শব্দগত এই সব 'অপ্রযুক্ততা', 'অসমর্থত্ব', 'নেয়ার্থতা' ইত্যাদি দোষ তিনি সর্বত্র ঘটিয়েছিলেন বলে অনুমান করা ঠিক নয়। পুরো এক একটি চরণের, স্তবকের অথবা সম্পূর্ণ কোনো কোনো কবিতার ধ্বনিসৌষম্য বজায় রাখতে গিয়ে তিনি কোনো কোনো জায়গায় অদ্ভুত অদ্ভুত শব্দ ব্যবহার করেছেন এবং শব্দাভিনবত্বের দিকে তাঁর স্পৃহার বড়োই আতিশয্য ছিল। এই ছিদ্র দিয়েই বৃথা-উদ্ভাবন দোষটি প্রবেশ করেছে।

অতএব 'ধ্বন্যতিরেক' ও 'বৃথা-উদ্ভাবন'—এ দুটি দোষবিভাগ পরস্পরের ক্ষেত্রসীমা লংঘনে উদ্যত নয়। দুটি পৃথক ক্ষেত্র সূচনার জন্যেই

পৃথক 'দুটি নাম ব্যবহার করা হোলো। যেখানে অনাবশ্যক শব্দ প্রধানতঃ কানের খাতিরেই জায়গা পেয়েছে, সেইগুলিই ধ্বন্যতিরেকের নমুনা। আর, ধ্বনির অনিবার্য প্রয়োজন ছাড়া এবং অর্থের দিকেও কতকটা উদাসীন থেকে যে-সব শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, সেই সব ক্ষেত্রেই বৃথা-উদ্‌ভাবিত শব্দ দেখা যাচ্ছে। এই তিন শাখার মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথের শব্দগত যাবতীয় দোষের স্থান সংকুলান হয়। অনুপ্রাসের বাড়াবাড়ি ধ্বন্যতিরেকের অন্তর্ভুক্ত ; পাদপূরণের জন্যে অপশব্দের প্রয়োগ 'ধ্বন্যতিরেক' ও 'বৃথা-উদ্‌ভাবন' এই দু'য়ের কোনো একটির বিবেচ্য ; বর্ণনার ফলে শব্দের বাড়াবাড়ি 'চিত্রাতিরেকে'র সীমাভুক্ত।

সত্যেন্দ্রনাথের শব্দদোষ সম্বন্ধে এই বিস্তৃত আলোচনা দেখে প্রধানতঃ শব্দের অপপ্রয়োগের দিকেই তাঁর আগ্রহ ছিল বলে ধরে নেওয়া সংগত নয়। বরং প্রসঙ্গ অনুসারে শব্দের ঔচিত্য রক্ষার দিকেই তাঁর সজ্ঞান প্রচেষ্টা দেখা যায়। কৌতুক-ব্যঙ্গ-পরিহাস যেখানে মুখ্য প্রসঙ্গ, সেখানে তিনি বিষয়ানুগামী শব্দ ব্যবহার করেছেন। ভিন্ন প্রসঙ্গে ভিন্ন শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। নিচের দৃষ্টান্তগুলিতে এই রকম সুপ্রযুক্ত বহু শব্দের নমুনা দেখা যাবে—

(ক) ডিগ্‌বাজী খায় ছাপার হরফ
ডিক্স্‌নারী গেল তল,
রসের কুঞ্জে চাষ দিতে আসে
পদ্মাপারের দল !

* * *

যাদের কথার টানে সাড়া দেয়
ডিশিন নিশিন পাড়া,
তাদের সদনে তত্ত্ব শিখিব,
চল বড়ু কর তাড়া
পূর্বরাগের পাস্তা করিয়া,
পান্‌সে করিয়া নাড়ী,
নাপ্পি-পীরিতি সাধনার রীতি
বাখানে পদ্মাপারী !

—'নাপ্পি-পীরিতি কথা'

(খ) হিন্দুচূড়া নন্দকুমার—যে পরালে তাঁরেও ফাঁসি
গলায় দ'ড়ে রাম-ফাঁসুড়ে তারেও দেব অর্ঘ্যরাশি ?
তুড়ুঙে যার শান্‌লোনাকো, আন্‌তে হলো গিলোটিনে
মন্ত্র হতে বঙ্গভূমে, সেও বেঁধেছে বিপ্র-ঋণে ?

—'আখেরী'

(গ) ভাস্‌ছে বিল খাল্‌ ভাস্‌ছে বিল্‌কুল !
ঝাপ্‌সা ঝাপ্‌টায় হাসচে জুঁইফুল !
ধান্য শীষ তার করছে বিস্তার—
তলিয়ে বন্যায় জাগ্‌ছে জুল্‌জুল !

—'ছন্দ-হিন্দোল'

(ঘ) কার কথা কবেকার কার কানে দিলে আজ পৌঁছে !
আলুথালু হল চাঁদ ঢুলুঢুলু মৌজে !
জোনাকী সে জোছনায় মোহ পায় মুরছায়
পারুলী-পিয়াল-ফুলী কৌচে !
হাওয়া ডোবে বিহ্বলে কিরণের থির জলে
অবগাহি' বাদশাহী হৌজে !

—'কয়েকটি গান' : বেলা শেষের গান

(ঙ) এস তৃষ্ণার দেশে এস কলহাস্যে
গিরি-দরী-বিহারিণী হরিণীর লাস্যে,
ধূসরের ঊষরের কর তুমি অন্ত,
শ্যামলিয়া ও-পরশে কর গো শ্রীমন্ত ;
ভরা ঘট এস নিয়ে ভরসায় ভর্ণা ;
ঝর্ণা !

—'ঝর্ন'

(চ) হো হো, পাতিলের বিল করিতে বাতিল
উদয় হয়েছি আমরা হে
এই তামাটে ও মেটে ভুস্‌টে পাঁশুটে
কুচ্‌কুচে কালো আম্‌রা হে

ছি ছি ভিন্ন বর্ণে বিয়ে কভু হয় ?
বধির হও রে কর্ণ উঃ।
আরে বিয়ে হয়নাকো, বিয়ে হয়নাকো
নিকে হয় অসবর্ণ হুঁ !

—'পাতিল-প্রমাদ'

(ছ) মাজা আলোয় সাজন সাজে, বিজন গেহে মুগ্ধ চোখে,—
বাজন বাজে বুকের তালে, আয়নাতে মুখ দেখ্‌ছে ও কে !
আতর-ভরা চাওনি দিয়ে আপনাকে ও বরণ করে
চাঁপাই আলো সাত ঝরোকার ঝাঁপায় রে ওর চরণ পরে।

—'আলোর পাথার'

'ভর্ণা', সাজন', 'বাজন', 'চাঁপাই আলো' এবং নতুন ধরনের অন্যান্য যে সব শব্দ এই উদ্ধৃতিগুলিতে জায়গা পেয়েছে সেগুলির কোনটিই অপপ্রযুক্ত নয়। সত্যেন্দ্রনাথের শব্দ-সামর্থ্যের অজস্র দৃষ্টান্ত তুলে দেখানো মোটেই কষ্টকর কাজ নয়। কিন্তু অযথা পুঁথির কলেবর বাড়িয়ে লাভ নেই। অতএব অতঃপর ছন্দের প্রসঙ্গে এগিয়ে যাওয়া যাক।

ছন্দ

১৩২৫ সনের বৈশাখ সংখ্যার 'ভারতীতে'-তে 'ছন্দ-সরস্বতী' নামে যে প্রবন্ধটি ছাপা হয়, সত্যেন্দ্রনাথ তাতে লিখেছিলেন যে, বারো উৎরে তের বছরে পা দেওয়ার মাস-খানেকের মধ্যেই ছন্দ-সরস্বতী তাঁকে দেখা দিয়ে এই কথা বলেছিলেন—

> আমি গঙ্গা নই, আমি ছন্দ-সরস্বতী। আজ প্রায় হাজার বছর ধরে এমনি করে এই ডিঙ্গায় চড়ে গৌড়-বাংলার নদীতে নদীতে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

'ছন্দ-সরস্বতী' প্রবন্ধটি অপেক্ষাকৃত পরিণত বয়সের রচনা। বাংলা কবিতার প্রাচীন ও মধ্যযুগের দিকে বাল্যকাল থেকেই যে তাঁর দৃষ্টি ছিল, উদ্ধৃত উক্তি থেকে সে-কথা বোঝা যায়। ঐতিহ্য সম্বন্ধে তিনি বরাবর সচেতন ছিলেন। ছেলেবেলায় রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি বাংলা অনুবাদ-কাব্য শুনতে শুনতে,—পরে নিজে স্বাধীনভাবে পুরোনো আমলের নানা বাংলা কাব্য-কবিতা পড়তে-পড়তে ক্রমশঃ ছন্দের দিকে তাঁর সহজ আগ্রহ বেড়েছিল। প্রথম

সাক্ষাতের তিন বছর পরে ছন্দের দেবী পুনরায় তাঁকে দেখা দিলেন,—তখন তাঁর 'হৃতাশ্রী মূর্তি,—মঞ্জুমরাল বাহন—গঙ্গাযমুনা পদ্ধতি'। রবীন্দ্রনাথের বিষয়ে তিনি বললেন—

> বঙ্গ হৃদয় উন্মীলি যেন
> রক্ত কমল ফুটে!
> নিমেষে নিমেষে আলোকরশ্মি
> অধিক জাগিয়া উঠে!

তারপর রবীন্দ্রনাথের 'এ কী কৌতুক নিত্য নূতন ওগো কৌতুকময়ী'—কবিতার ছন্দ দেখে কবি উপলব্ধি করলেন—

> এতোদিন বাঙালী ছন্দ-বিত্তায় উড়ে আর আসামীর সামিল ছিল, এইবারে বিশিষ্টতা অর্জন করেছে।

আত্মজীবনীর এই অধ্যায়ের কথা-প্রসঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথ পুনরায় জানিয়েছিলেন—

> উচ্চারণের নিরিখ ক্রমাগতই বলছে যে পুরানো ছন্দ পুরানো কাপড়ের মতো ভগ্ন হয়েছে; ওতে আর লজ্জা নিবারণ হবে না।...
>
> পয়ার-ত্রিপদীর কাজ ফুরিয়েছে। ছন্দবিত্তায় বাঙালী আর পাঠশালের পোড়ো নয়, উঁচু ক্লাশে প্রোমোশান হয়েছে।...
>
> ছন্দ-ব্যবসায়ীরা এখন থেকে আর হসন্তের বাট তোলা, স্বরান্তের আশী তোলা এবং সংযুক্তাক্ষরের একশো তোলা—ছন্দেশ্বরীর টাটে বসে তিন রকম বাটখারায় মিশিয়ে, ইচ্ছামত ওজন দিয়ে—চুক্তি ভুক্তন্ করতে পারবেন না।

ছন্দের দেবী অতঃপর এই নমুনা দিয়েছেন—

> কলস ঘায়ে। উর্মি টুটে
> রশ্‌শি রাশি। চুর্নি উঠে

এখানে 'প্রতি পংক্তি-পর্বে' রয়েছে পাঁচ মাত্রা। দেবী বলেছেন, 'এ আমার পাঁচ-কড়াই পাঁইজোর'।

এই দ্বিতীয় দর্শনের পর তৃতীয় বার দেবীর দর্শন পাওয়া গেছে আরো পাঁচ বছর পরে। তখন তাঁর 'চিত্তশ্রী মূর্তি—মত্তময়ূর বাহন—ঝর্ণা-ঝামর পদ্ধতি'। তিনি 'বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর'-ছন্দের অধীশ্বরী। তারপর, চতুর্থ প্রকাশে দেখা গেল দেবীর 'দৃপ্তশ্রী'মূর্তি—গগন-গরুড় বাহন—বিমান-বহর পদ্ধতি'।

বাংলা ছন্দের 'ত্রয়ী' রীতি আয়ত্ত করে সত্যেন্দ্রনাথ গেলেন রবীন্দ্রনাথের কাছে। রবীন্দ্রনাথ বললেন—

> বাংলায় ছন্দবন্ধের অভাব নেই কিন্তু ছন্দস্পন্দ (rhythm) জিনিসটা তেমন ফুটতে পেলে না।

সত্যেন্দ্রনাথ ছন্দ-স্পন্দের দৃষ্টান্ত দিলেন—

পৌষ প্রখর শীতে জর্জর
ঝিল্লি-মুখর রাতি

রবীন্দ্রনাথ বললেন—

> বাংলা উচ্চারণের বিশেষত্ব বজায় রেখে সংস্কৃতের ছন্দস্পন্দ বাংলায় আনতে হবে। ...তুমি একবার চেষ্টা করে দেখ না। ...মন্দাক্রান্তা নিয়ে শুরু কর।

দেবী জানালেন—

> বাংলায় দীর্ঘস্বর নাই থাক। যুক্তাক্ষর তো আছে। ...যুক্তাক্ষরের পর্যায়-বিন্যাসের সাহায্যে সুনিয়ন্ত্রিত ধ্বনিবৈচিত্র্যের গতিক্রম প্রবর্তিত কর।

দীর্ঘস্বরের সাহায্যে আর অক্ষর-সংঘাতের বিন্যাসে এই ধ্বনিবৈচিত্র্য সৃষ্টির দিকেই সত্যেন্দ্রনাথের আগ্রহ সঞ্চারিত হোলো। ছন্দ-সরস্বতীর কাছে তিনি সংকেত পেলেন—'অর্ধোচ্চারিত বা আলগোছ অক্ষরের পর পূর্ণোচ্চারিত বা গোছালো অক্ষর বসালেই অক্ষর সংঘাত হয়।' এই সংকেত অনুসারে লেখা হোলো—

ভরপুর অশ্রুর । বেদনা ভারাতুর
মৌন কোন্ সুর । বাজায় মন
বক্ষের পঞ্জর । কাঁপিছে কলেবর
চক্ষে দুঃখের । নীলাঞ্জন।

মন্দাক্রান্তার পরে মালিনী,—তারপর যথাক্রমে পঞ্চচামর, অনুষ্টুপ, তোটক প্রভৃতি সংস্কৃত ছন্দের দিকে তাঁর দৃষ্টি ছড়িয়ে পড়লো। 'চীনের আলগ্-পাপড়ি (monosyllable) শব্দের ছন্দ' দেখা দিয়েছে। 'ছন্দ-সরস্বতী' প্রবন্ধের মধ্যে এই ছন্দের যে নমুনা আছে, সেটি এখানে তুলে দেখা যেতে পারে—

শিস্ কে ছায় গো আজ?
তার কি ভিন্ গাঁ ঘর?

দুখ সে তার কি পর ?
চাঁদ সে তার কি তাজ ?

পঞ্চম প্রকাশে দেবীর 'মঞ্জুশ্রী মূর্তি—বিদ্যুৎতাগ্রাম বাহন—বুলবুল গুলজার পদ্ধতি'। এখানে পুনরায় স্বরাঘাত-প্রধান ছন্দের নমুনা দেওয়া হয়েছে। তারপর 'পিয়ানোর গান' থেকে কিছু অংশ তুলে কবি জানিয়েছেন যে, হিন্দুস্থানী আলংকারিকেরা একে বলবেন শূদ্রজাতি ছন্দ, কারণ এ ছন্দ ব্যঞ্জনবহুল। আবার স্বরান্ত ব্রাহ্মণজাতি ছন্দেরও নমুনা জুড়ে দেওয়া হয়েছে—

ঘুমেরি মহলে বেশরে মোতিটি
নিশাসে নড়ে।
প্রেমী জেগে আছে মুখে চেয়ে, চোখে
পাতা না পড়ে।

প্রতি চরণের প্রথম দিকে স্বরবহুলত্বের নমুনা দেখিয়ে তিনি যাকে বলেছেন 'ব্রহ্মমূর্দ্ধা ছন্দ' সেটি এই রকম—

'তাজা তাজা আজি ফুল ফোটায়
এই আলোয় এই হাওয়ায়,
কচি কিশলয়ে কুঞ্জ ছায়
সব তরুণ আজ ধরায়!

'পিউ কাঁহা' ছন্দের নমুনা—

পান বিনা ঠোঁট রাঙা
চোখ কালো ভোমরা
রূপশালি ধান ভানা
রূপ দেখ তোমরা।

এর পর 'রুনুঝুনু' ছন্দ—

রুনুঝুনু বাজে কার বাজে মঞ্জীর
কাঁপে তার সেতারের স্নায়ু আর শির;
মৃদু গুঞ্জরে কুঞ্জে কে উন্মন,—
সাথী কার ব্যথা-ভার-ভরা যৌবন!

'বাংলা ছন্দের মূলসূত্রের' লেখক শ্রীযুক্ত অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় সত্যেন্দ্রনাথের ছন্দ-কীর্তির আলোচনাসূত্রে মন্তব্য করেছেন—

> রবীন্দ্রনাথের পরে আসিলেন "ছন্দের যাদুকর"—সত্যেন্দ্রনাথ। খুব অভিনব ও মৌলিক দান তিনি হয়ত করেন নাই, কিন্তু নানা কলাকৌশলে বাংলা ছন্দের মূলতত্ত্বগুলির বিচিত্র ব্যবহার করিয়া তিনি যেন ছন্দের ইন্দ্রজাল রচনা করিয়া গিয়াছেন।—পৃঃ ২১৬

মোহিতলাল মজুমদার সত্যেন্দ্রনাথের ছন্দগত অভিনবত্বের বিশেষ কথাটি অপেক্ষাকৃত স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন—

> সত্যেন্দ্রনাথ এই হসন্তযুক্ত অক্ষরকেই (যথা—তুম্, দেব্, সর্, নার্) গুরু এবং সকল স্বরান্ত বর্ণকে (যথা—তা, কে, কি, প, স) লঘু ধরিয়া বাংলা কবিতায় সংস্কৃতের অনুকরণে মাত্রাবৃত্ত ছন্দ রচনা করিতে চাহিয়াছিলেন। উহা ছড়ার ছন্দ নয় বটে; তথাপি, কথ্য বাংলা ভাষার উচ্চারণ বজায় রাখিয়াই—আমাদের কণ্ঠের হসন্তপ্রবণতাকে কাজে লাগাইয়া, তিনি এক নূতন ছন্দধ্বনি উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। ইহার ফলে, বাংলা কবিতায় যে অভিনব ধ্বনিবৈচিত্র্য ঘটিয়াছে, তাহা অতিশয় শ্রুতিসুখকর এবং শিল্প হিসাবে উপভোগ্যও বটে, কিন্তু সেই ছন্দ কৃত্রিম, তাহাতে খাঁটি কবিতা অপেক্ষা 'চিত্রকাব্য' রচনাই সম্ভব। কারণ, বাংলা বাক্যের উচ্চারণে, আদ্য ঝোঁককে কোন ক্রমেই আর কোথাও সরাইয়া লওয়া যায় না, এজন্য গুরু-লঘু স্বরসন্নিবেশকালে, সেই ঝোঁককে লঙ্ঘন করিয়া—ছন্দের আবশ্যকমত, যে কোন স্থানে স্বরবৃদ্ধির ব্যবস্থা করিলে, তাহাতে ছন্দের কারুকলা বা কৃত্রিম ধ্বনিচাতুর্যই প্রধান হইয়া উঠে—কাব্যপ্রেরণার আন্তরিকতা ক্ষুণ্ণ হয়। তথাপি, সত্যেন্দ্রনাথ বাঙালী কবির একটা বহুকালের আকাংক্ষা কতকটা সহজ উপায়ে মিটাইতে চাহিয়াছিলেন।[৮]

বস্তুতঃ কাব্যে ছন্দের অভিনবত্ব ঘটানো ভাবপ্রেরণাহীন ছন্দোবিচক্ষণার সাধ্য নয়। ছন্দের কান, শব্দের সমৃদ্ধি, বিভিন্ন ভাষার জ্ঞান,—সত্যেন্দ্রনাথের সবই ছিল, কিন্তু জীবনকে নতুন চোখে দেখবার, নতুন মনন-কল্পনা-চৈতন্যের মধ্যে ধারণ করবার প্রবল কোনো সামর্থ্য ছিলো না। ফলে, তাঁর সৃষ্টির মধ্যে ছন্দকে গভীর কাব্যের বাহন হিসেবে ততোটা দেখা যায় না—যতোটা দেখা যায় শ্রুতিনৈপুণ্যের দ্যোতক রূপে। শুধু কবিতাতেই নয়, বাংলা সাহিত্যের ব্যাপকতর ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব তখন ছিলো সর্বব্যাপী। মানুষের জীবনের প্রায় সকল প্রদেশে, মনের প্রায় সমস্ত ভাবস্তরে রবীন্দ্রনাথের লোকোত্তর সামর্থ্যের গ্রাহিকা শক্তি সে সময়ে পূর্ণভাবে সক্রিয় ছিল। আমাদের

৮। বাংলা কবিতার ছন্দ—মোহিতলাল মজুমদার (১৩৫২), পৃঃ ৫৮।

দেশে রাষ্ট্র, সমাজ, ধর্ম সকল ক্ষেত্রেই সে সময়ে যুগসন্ধি এসেছিল, সন্দেহ নেই। সেই সন্ধির সব কথা, সব ভাবনা, সব রূপই যেন একা রবীন্দ্রনাথ আত্মসাৎ করেছিলেন। সে অবস্থায় কবিতায় নতুনতরো কোনো ভাবাদর্শ ফুটিয়ে তোলা যেমন দুঃসাধ্য, ছন্দের কোনো রকম বিশেষ অভিনবত্ব ঘটিয়ে তোলাও ছিল তেমনি দুষ্কর। সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর বহু পঠন, বহু বিদ্যা, বিপুল আগ্রহ, নিপুণ কান এবং প্রচুর শব্দ-সংগ্রহের জোরে এ অঞ্চলে উল্লেখযোগ্য প্রয়াস দেখিয়েছিলেন। তাঁর মতো বেশি পরিমাণে না হলেও আরো কোনো কোনো কবি অল্পবিস্তর একই চেতনা এবং অনুরূপ প্রয়াসেরই নিদর্শন রেখে গেছেন। মোহিতলাল বলদেব পালিতের উল্লেখ করেছিলেন। তাছাড়া, সংস্কৃত ছন্দ অনুকরণে যাঁরা বিশেষ প্রয়াসী ছিলেন, তাঁদেরও কারো কারো নাম এই আলোচনার আগের অংশে উল্লেখ করা হয়েছে।

'ছন্দ-সরস্বতী'-তে সত্যেন্দ্রনাথ বাংলা ছন্দের 'ত্রয়ী'-বিভাগের উল্লেখ করেছিলেন। ১৩৪১ সালের বৈশাখ সংখ্যার 'উদয়ন' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের লেখা 'ছন্দের প্রকৃতি' প্রবন্ধে বাংলা ছন্দের এই তিন বিভাগের কথা আরো স্পষ্ট ভাবে বলা হয়েছিল—

> বাংলা ছন্দের তিনটি শাখা। একটি আছে পুঁথিগত কৃত্রিম ভাষাকে অবলম্বন ক'রে—সেই ভাষা বাংলার স্বাভাবিক ধ্বনিরূপকে স্বীকার করেনি। আর একটি সচল বাংলা ভাষাকে নিয়ে—এই ভাষা বাংলার হসন্ত ধ্বনিকে আপন বলে গ্রহণ করেছে। আর একটি শাখার উদ্‌গম হয়েছে সংস্কৃত ছন্দকে বাংলায় ভেঙে নিয়ে।

এ-কালে বাংলা ছন্দঃশাস্ত্রের আলোচনায় বৈজ্ঞানিক রীতি অনুসরণ করে সত্যেন্দ্রনাথের ছন্দ-প্রকৃতি সম্পর্কে শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন, অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়, দিলীপকুমার রায় এবং আরো কেউ কেউ মূল্যবান আলোচনা করেছেন। তানপ্রধান, ধ্বনিপ্রধান, শ্বাসাঘাতপ্রধান,—ছন্দের এই তিন বিভাগের কথা বহু জনের বহু প্রবন্ধে-নিবন্ধে আলোচিত হয়েছে। যুগ্মধ্বনির নিকষে বাংলা ছন্দের জাতি নির্ণয়ের পদ্ধতি প্রবর্তন করে শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন ছন্দ আলোচনার ধারায় নতুন পথ দেখিয়েছেন। শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায় এই পদ্ধতির প্রশংসাও করেছেন, আবার লিখেছেন যে যুগ্মধ্বনির ভিত্তিতে ছন্দোবিভাগের রীতি 'বৈজ্ঞানিক হলেও ধ্বনির য়ুনিট তিন রকম ধরাটা যে বৈজ্ঞানিক নয় এইটাই প্রবোধচন্দ্র ধরতে পারেন নি'। রবীন্দ্রনাথের এবং

দ্বিজেন্দ্রলালের নজীর তুলে দিলীপকুমার তাঁর 'ছান্দসিকী'র ভূমিকায় 'ছন্দ-সরস্বতী' থেকে একটি মন্তব্য উদ্ধার করে সিদ্ধান্ত করেছেন যে, পূর্বোক্ত দু'জনের মতো সত্যেন্দ্রনাথও 'কবিতার মাত্রাবিচারকেই একান্ত করে দেখতেন।' আবার শ্রীযুক্ত অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় তাঁর 'বাংলা ছন্দের মূলসূত্র' গ্রন্থে শ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দের প্রসঙ্গে লিখেছেন—

> কবি সত্যেন্দ্রনাথের প্রস্তাবিত মাত্রাপদ্ধতি গ্রহণ করা যায় না। তিনিও শেষ পর্যন্ত তাহা বুঝিয়া এই হিসাব বাদ দিয়াছিলেন, এবং সমসংখ্যক হ্রস্ব ও সমসংখ্যক যৌগিক অক্ষর দিয়া পর্ব রচনা করিয়া হিসাবের গোলমাল এড়াইয়াছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথের প্রস্তাবিত মাত্রা-পদ্ধতি যে গ্রহণযোগ্য নয়, তাহা অন্যভাবেও বোঝা যায়। শ্বাসাঘাতই যে এ ধরনের ছন্দে প্রধান তথ্য, তাহা তিনি ঠিক ধরিতে পারেন নাই। শ্বাসাঘাতের উপরেই এই ছন্দের সমস্ত লক্ষণ নির্ভর করে। বাংলায় মাত্রা-পদ্ধতি বাঁধা-ধরা বা পূর্ব-নির্দিষ্ট নহে; প্রত্যেক ক্ষেত্রে শব্দ-সংস্থান, শ্বাসাঘাত ইত্যাদি অনুসারে মাত্রা নির্ণীত হয়।[৯]

সত্যেন্দ্রনাথের কবিতা ও কাব্যরূপের আলোচনায় ছন্দঃশাস্ত্রের নানা মুনির নানা মতের উল্লেখ-আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। বরং এ শাস্ত্রে তাঁর ব্যুৎপত্তি বা বৈদগ্ধ্য তাঁর আন্তরিক কবিপ্রেরণার বশ্যতা স্বীকার করে নিয়ে যে-সব ক্ষেত্রে সার্থক কবিতার সম্ভাবনাকে সফল করেছে, সেই সব দৃষ্টান্তই পর্যালোচকের বিশেষ আলোচনার সামগ্রী। অর্থাৎ ছন্দের কলাকৌশলের ভারে কবির ভাব যেখানে চাপা পড়েনি, সেইখানেই কবির ছন্দ-ব্যুৎপত্তির প্রকৃত সার্থকতা, এই কথাটি মনে রেখে তাঁর ছন্দের বিশ্লেষণে হাত দেওয়া দরকার। Swinburne-এর মতো তাঁর কবিতাতেও দেখা যায় ছন্দের বৈচিত্র্য, স্তবক-চরণ-শব্দের সংগীত,—নানা প্রয়াস এবং বহু প্রযত্ন। Swinburne-এর স্তবক-বন্ধের নৈপুণ্য, 'ode'-এর সৌকর্য, অমিত্রাক্ষরে (blank verse) তাঁর দক্ষতা ইত্যাদি গুণের কথা কাব্যানুরাগী পর্যালোচকের সুপরিচিত। সত্যেন্দ্রনাথের কবিতায় অনুরূপ অনেক গুণের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। সংস্কৃত, হিন্দী, জাপানী, গুজরাটী—নানা ভাষার বিভিন্ন ছন্দের দিকে তাঁর ঝোঁক ছিল। বাঙালী কণ্ঠের হসন্তপ্রবণতার ভিত্তিতে নতুন ছন্দধ্বনি সৃষ্টির আগ্রহে তিনি সংস্কৃত ছন্দ আর বাংলা ছড়ার রাজ্যে এবং আরো অনেক ছন্দ-ক্ষেত্রে

৯। বাংলা ছন্দের মূলসূত্র, (১৯৪৬) পৃ: ১০৬।

পরিভ্রমণ করেছিলেন। ছন্দস্পন্দের (rhythm) দিকে তাঁর বিশেষ অনুরাগ ছিল। এ বিষয়ে তাঁর শাস্ত্রজ্ঞান এবং শ্রুতিসতর্কতা অবিসংবাদিত।

এ রকম ব্যুৎপত্তিতে সুফলের চেয়ে কুফলের সম্ভাবনাই বেশি। কবিতার রূপসৌকর্যের অতিচর্চার ফলে অনেক জায়গায় তাঁর কবিতা শুধু ভাব-ব্যঞ্জনাহীন ছন্দ-কসরতিতে পর্যবসিত হয়েছে। মনে হয়, ভাবের প্রয়োজন উপেক্ষা করে তিনি কেবল রূপের কৈবল্যেই লক্ষ্য স্থাপন করেছিলেন।

অন্তরের তাগিদ কম, অথচ ছন্দের পটুতা করায়ত্ত,—এ অবস্থায় যা ঘটা স্বাভাবিক, সত্যেন্দ্রনাথের কবিতার অনেক জায়গাতেই তাই ঘটেছে। এক রকম মনোভঙ্গির জন্যে তিনি অন্য রকম—অর্থাৎ অনুচিত ছন্দের বাহন নিয়োগ করেছেন। শুধু তাই নয়,—কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রেরণা ব্যতিরেকেও নিছক ছন্দের পটুত্বার ওপর নির্ভর করে তিনি কবিতা লেখবার চেষ্টা করে গেছেন। এদিকে তাঁর সহজ দক্ষতা ছিলো বলেই তাঁর সত্যিকার সার্থক লেখার সঙ্গে তাঁরই ব্যর্থ লেখাগুলির ছন্দ এবং রূপকৌশলগত আপাত-সাদৃশ্যের লক্ষণ সকলেরই চোখে পড়ে।

'চরকার গানে' তিনি লিখেছিলেন—

নিঃস্বের মূলধন, রিক্তের সঞ্চয়
বঙ্গের স্বস্তিক চর্‌কার গাও জয়!
চর্‌কায় দৌলৎ! চর্‌কায় ইজ্জৎ!
চর্‌কায় উজ্জ্বল লক্ষ্মীর লজ্জৎ!
চর্‌কার ঘর্ঘর গৌড়ের ঘর ঘর!
ঘর-ঘর গৌরব,—আপনার নির্ভর!
গঙ্গায় মেঘনায় তিস্তায় সাড়া
দাঁড়া আপনার পায়ে দাঁড়া!

বলা বাহুল্য, এই ছন্দের সঙ্গে এখানকার ভাবের কোনো বিরোধ নেই। সে সময়ে চর্‌কা আমাদের জাতীয় জীবনে যে স্বরাজ্যবোধ ও স্বাধিকার-নিষ্ঠার প্রতীক হয়ে উঠেছিল, এই কবিতার দ্রুত উদ্দীপ্ত চলনভঙ্গির মধ্য দিয়ে সেই উৎসাহ-উদ্দীপনার ভাবটি সুপারিস্ফুট হয়েছে। আবার—

মঞ্জুল ও-হাসির বেলোয়ারি আওয়াজে
ওলো চঞ্চলা! তোর পথ হ'ল ছাওয়া যে!

মোতিয়া মতির কুঁড়ি ঘুরছে ও-অলকে
মেখলায়, মরি মরি, রামধনু ঝলকে !
তুমি স্বপ্নের সখী বিদ্যুৎপর্ণা
ঝর্না !

—এখানে ঝর্নার রূপ-গতি-কলনাদের উল্লাস সমুচিত ছন্দোবাহনের সহায়তায়সার্থক কবিতার সামগ্রী হয়ে উঠেছে। আর একটি কবিতায় ঝর্নার বেগ সংগীত, রূপবিভা একই সঙ্গে মনোরম ভাবে অভিব্যক্ত হয়েছে—

খেয়াল নাই—নাই রে ভাই
পাই নি তার সংবাদই
গাই লীলায়,—খিল্‌খিলাই—
বুলবুলির বোল্ সাধি !
বন্‌-ঝাউয়ের ঝোপগুলায়
কাল্‌সারের দল চরে,
শিং শিলায়—শিলার গায়,—
ডাল্‌চিনির রং ধরে !
ঝাঁপিয়ে যাই, লাফিয়ে ধাই,
দুলিয়ে যাই অচল-ঠাট,
নাড়িয়ে যাই, বাড়িয়ে যাই—
টিলার গায় ডালিম্‌-কাট।

প্রথম দৃষ্টান্তের 'লজ্জৎ' ও দ্বিতীয় দৃষ্টান্তের 'ডালিম-কাট' সত্যেন্দ্রনাথের মৌলিক শব্দ-উদ্‌ভাবনের নিদর্শন। যোগ্য ছন্দ নিয়োগের ফলে এখানে ভাবও পীড়িত হয়নি, শব্দও সুবাহিত হয়েছে। এই রকম বহু দৃষ্টান্ত তাঁর বিভিন্ন কবিতা থেকে বিনা-প্রয়াসে তুলে দেখানো যেতে পারে। কিন্তু 'শার্দূল-বিক্রীড়িত' ছন্দের অনুসরণে 'বিদ্যুৎ-বিলাস' কবিতাটিতে তিনি যখন লিখেছেন—

বিদ্যুৎ-ঠোঁট
হানে ধূম্রচূড়

পাথসাট আচোট
বন লোটায় ;

গর্জন, গান
মেশে হর্ষ, খেদ,—
পাশরি ভেদ ;
বজ্রের বিধান
ফুল ফোটায় !

—তখন 'ধূম্রচূড়', 'ঝড়-গরুড়', 'পাখসাট', 'আচোট', প্রভৃতি শব্দের বন্ধুরতা এবং ছন্দের শার্দুল-ক্রীড়া কেমন যেন অনুচিত, অসংগত, প্রয়াসসর্বস্ব অপলক্ষণ বলে মনে হয় ! মেঘ-ঝড়ের মধ্যে কবি যে এক বৃহৎ বিহঙ্গের বিদ্যুৎ-ঠোঁট লক্ষ্য করেছেন, সেই কথাটা সংবাদমাত্র থেকে গেছে। এই রূপকটি সুকল্পিত বটে, কিন্তু কবিমানসের আনন্দে, স্পন্দনে, বিস্ময়ে সজীব হয়ে ওঠেনি।

ঝাপ্‌সার রূপ
শুধু পষ্ট আজ
ভুলাল কাজ
মৌনের অনুপ
মূর্চ্ছনায়
শপ্পের গান
ভ'রে তুলছে মন
সারাটি ক্ষণ
বাষ্পের বিতান
রস ঘনায়।

স্পষ্ট বোঝা যায় যে, ছন্দের দেহটাই এখানে প্রধান বস্তু। 'বাষ্পের বিতান রস ঘনায়'—এ উক্তি রসব্যঞ্জনাহীন সংবাদ মাত্র। ছন্দের ছাঁচের মধ্যে সুকৌশলে কিছু সুরেলা শব্দ বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। নানা ছন্দের নমুনা দেখানো ছান্দসিক বৈয়াকরণের কাজ,—সে কোনো সমর্থ শিল্পীর কাজ নয়। 'গৌড়ী গায়ত্রী ছন্দে'-র নমুনাও এই রকম উৎকট। রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে এই অদ্ভুত ছন্দে তিনি বলেছিলেন—

প্রাণের কাঙাল, মানের নহ
মান ঠেলে পায় কুলির সহ
অসম্মানের ভাগ লহ ! জয় জয় !

তোমায় দেখে প্রাণ উথলে,
হাসি-উজল চোখের জলে
অস্ফুট বোলে দেশ বলে—'জয়! জয়!'

অন্তরের স্পন্দনহীন স্তুতিপ্রয়াস এখানে এই অভিনব ছন্দোনামের (গৌড়ী-গায়ত্রী) শিরোপার জোরে কুহকময় পদ্য হয়ে উঠেছে বটে, কিন্তু এ জিনিস যে অন্তরোৎসারিত কবিতা নয়, সে সত্য কাব্যরসিকের কাছে স্বতঃসিদ্ধ। গুজ্‌রাটি 'গর্‌বা'র ছাঁচে তিনি কয়েকটি গান বেঁধেছিলেন ('বেলা শেষের গান')। এই স্তবকগুলির কোনো-কোনোটি যেমন উৎরে গেছে, অন্য কয়েকটি তেমনি ব্যর্থ হয়েছে। এই গানগুলিতেও অনুপ্রাসের বৈচিত্র্য, শব্দের লালিত্য, সুরের ঝংকার—সবই আছে; তবু মাঝে মাঝে কিসের যেন অভাব ঘটেছে। পাঠককে এরা বিশেষ ভাবে মনে করিয়ে দেয় যে, যান্ত্রিক নিয়মানুগত্যই ভালো কবিতার ছন্দ-সমৃদ্ধির উৎস নয়। অন্তরের আন্তরিকতার অভাব ঘটেছে বলেই কাব্যের ব্যর্থতা এই সব ক্ষেত্রে অনুকূল পাঠকেরও আশাভঙ্গ করে। 'কয়েকটি গান' থেকে প্রথমে তাঁর সার্থক কবিত্বের নমুনা দেখা যাক—

পার্‌বনা একলাটি আজ ঘরে পার্‌বনা রইতে!
চাঁদ ডাকে পাপিয়াকে দুটো কথা কইতে।
নিরালার কোল-ভরা ফুল জাগে আলো-করা,
যেচে কার খুনসুড়ি সইতে।
অথই পাথার-পারা জ্যোছনায় মাতোয়ারা
দিশেহারা হ'ল হাওয়া চৈতে।

'রইতে', 'কইতে', 'সইতে' ও 'চৈতে'-র অনুপ্রাস এখানে শ্রুতিকটু হয়নি। 'অথই পাথার-পারা' চন্দ্রালোকের উত্তেজনা এখানে ছন্দের ছাঁচে পড়ে নিশ্চিহ্ন হয়নি, বরং, ছন্দের শাসন স্বীকার করে নিয়ে সে বস্তু ভালো কবিতার সামগ্রী হয়ে উঠেছে। কিন্তু এই গানগুলির মধ্যে বাইশের স্তবকে যখন দেখা যায়—

কে সে ভরেছিল মন, মনে পড়ে তারে? সেই তরণী?
বিরহিণী যে রোহিণী নিয়েছিল ধরণী?

কোথা রে চাঁদের রাধা কোথা সেই অনুরাধা?
শ্রবণা শ্রবণ-মন-হরণী?
কোথা অতীতের সাথী মুক্ত-হাসিনী স্বাতী?
স্বপন-গাঙে কি বায় তরণী?

—তখন, কানের পাওনার আড়ালে হৃদয়ানুভূতির নিঃস্বতার দৃষ্টান্ত কার না চোখে পড়ে? ভরণী-ধরণী-হরণী-তরণীর রিনিরিনি-তে রসব্যঞ্জনার তৃষ্ণা মেটে না। 'বিরহিণী যে রোহিণী নিয়েছিল ধরণী'—কোথায় সেই রোহিণী? 'চাঁদের রাধা' কোথায়? 'অনুরাধা' কোথায়?—অথবা অতীতের সাথী 'মুক্ত হাসিনী স্বাতী' কোথায়? অর্থহীন, ব্যঞ্জনাহীন, শ্রুতিসুখকর, দীর্ঘশ্বাসের অনুকৃতিময় এই রকম রাশি রাশি প্রশ্নের সমাহার থেকেই কি ভালো কবিতার উদ্ভব ঘটতে পারে? শব্দের দিক থেকে এ ব্যাপার ধ্বন্যতিরেকের দৃষ্টান্ত, ছন্দের দিক থেকে এরই নাম অনুচিত দক্ষতা! ছন্দের সহজ পটুতাও যে ভালো কবিতার বিঘ্ন ঘটাতে পারে, এ তারই দৃষ্টান্ত। কবি তাঁর প্রেরণার কাছে আত্মসমর্পণ না করে এখানে তাঁর পটুতার ওপর নির্ভর করেছেন। 'শ্রবণা শ্রবণ-মন-হরণী'—এরকম শব্দবন্ধ অনুভূতির রাজ্যে আমাদের বেশি দূর নিয়ে যায় না, ক্ষণকালের জন্যে কেবল কানেরই তৃপ্তি ঘটায়। নিরর্থক এই নক্ষত্রের নামাবলী!

সত্যেন্দ্রনাথের শব্দপ্রাচুর্য, ছন্দোবৈচিত্র্য এবং অনুবাদনিষ্ঠা, এই তিনটি একই অভিন্ন প্রবণতার অভিব্যক্তি বলে মনে হয়। ছন্দ-সরস্বতীর প্রথম আবির্ভাবের লগ্নে তিনি বলেছিলেন—

কি দিয়া পূজিব মাগো, কি আছে আমার।
জ্ঞানহীন আমি দীন সন্তান তোমার।

জ্ঞানের নৈবেদ্য সাজিয়ে তিনি কবিতার সরস্বতীকে তুষ্ট করতে চেয়েছিলেন। অনুবাদ-চর্চার মধ্যেও তাঁর জ্ঞানেরই আগ্রহ প্রকাশ পেয়েছে।

বাঙালী কণ্ঠের হসন্তপ্রবণতার ভিত্তি থেকে তিনি নতুন ছন্দ-ধ্বনির প্রাসাদ গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন, এ-কথা স্বীকার করার সঙ্গে সঙ্গে আর একটি কথা স্মরণ করা দরকার। ভঙ্গির অজস্র চাকচিক্য দিয়ে তিনি ভাবের অভাব-অনটন ভরিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন। বর্ণনাপ্রধান কবিতাতেও তিনি পাঠকের মন বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারেন নি। নিখুঁৎ ছন্দ, নির্ভুল

অন্ত্যানুপ্রাস, বহু নাম এবং নানা ঘটনার উল্লেখ সত্ত্বেও তাঁর এই ধরনের বড়ো কবিতাগুলি অন্নবিস্তর ক্লান্তিকর। 'হোমশিখা'-র প্রায় সব ক'টি লেখাতে এবং শেষ দিকের 'অরুন্ধতী', 'মাতা মহু', 'দিল্লী-নামা' প্রভৃতিতেও ছন্দের দীর্ঘবাহিকা-শক্তি নেই। ভিন্ন ভিন্ন কবিতায় বিভিন্ন মাত্রাপরিমাণের সুঠাম পর্বাবৃত্তি আছে বটে, কিন্তু কবিমানসের অনুভূতির উচ্চাবচ-তারতম্য না থাকায় উচ্চারিত ধ্বনির অতি-মসৃণতায় অথবা অতি-লালিত্যে অথবা অতিরিক্ত বিধি-বশ্যতায় ফলে ছন্দের প্রবাহে কেমন এক রকম জড়তা দেখা দেয়। পাঠকের অনুভূতিকে তা নাড়া দেয় না। তবে তাঁর দীর্ঘ আয়তনের সব কবিতা সম্পর্কে এ অভিযোগ স্বীকার্য নয়। সর্বসমেত ২০২ চরণে 'গান্ধিজী' কবিতাটি শেষ হয়েছে; 'সুশ্বেতা' ১২৬ চরণের কবিতা; 'কয়াধু'-তে আছে ১৩৬ চরণ; 'দূরের পাল্লা', 'পাতিল-প্রমাদ', 'দাবীর চিঠি' প্রভৃতি লেখাগুলিও হ্রস্বদেহী নয়। তবু এসব কবিতা পড়বার সময়ে ক্লান্তি বোধ হয় না। কবির অনুভূতির অনুবাদ ঘটেছে এইসব কবিতায়। অর্থাৎ, ছন্দপটু কবির ছন্দোব্যুৎপত্তি প্রদর্শনের তাগিদে নয়,—তাঁর মনোভঙ্গির আহ্বানে-আমন্ত্রণেই এরা আত্মপ্রকাশ করেছে। তাই বর্ণনার মধ্যেও কবির আবেগ নীরব থাকেনি। যেখানে আবেগ গৌণ, সেখানে ছন্দের ছাঁচে বর্ণনার জায়গা হয়েছে বটে, কিন্তু যথার্থ কবিতার স্পন্দন জাগেনি। 'স্কন্দ-ধাত্রী' থেকে কয়েক চরণ তুলে দেখা যাক—

> স্কন্দে বলে, "ইন্দ্র হ'য়ে ত্রিলোক তুমিই নাও,
> ঈশ্বরতার ঈর্ষা জরা ইন্দ্রকে তাড়াও।
> রুদ্র-সেনায় ইন্দ্র-সেনায় যুদ্ধ আসন্ন,
> এমন সময় কে আসে ওই মরাল-নিষণ্ন।
> মাঝে এসে বলেন তিনি "সম্বরো দেবরাজ'
> কী বিপরীত-বুদ্ধি, মরি, দেখি তোমার আজ।

সত্যেন্দ্রনাথের প্রিয় ছন্দের এই কবিতাটির মোট চরণ-সংখ্যা হলো দু'শ বারো। উদ্ধৃত অংশের দ্বিতীয় চরণের শেষে 'ইন্দ্রকে তাড়াও' পড়বার সময়ে উচ্চারণে যে ঝোঁক দেওয়া স্বাভাবিক, ঐ অংশের অর্থের সঙ্গে তার সংগতি নেই। দ্রুত লয়ের এই লঘু ছন্দে স্কন্দের মনোভাবের ঠিক প্রতিলিপি পাওয়া গেল না। বিষয়ের মান রক্ষার চেয়ে ছন্দের বাহ্যিক মর্যাদা বাঁচাবার

চেষ্টা-ই বেশি চোখে পড়ে। 'কয়াধু'-তে এরকম অসংগতি নেই, যদিও সেখানেও একই রীতি ব্যবহার করা হয়েছে। 'মাতা-মহু'তেও ছন্দ-কল্পের (metrical scheme) মধ্যে কেমন এক রকম ভার পড়েছে। ছন্দের বাহিকা শক্তির অভাববশতঃ কবির সব কথা শুনতে পাঠকের ক্লান্তি বোধ হয়—

দনু-দিতি অদিতির আপন
মার পেটের বোন আমি,
বোন্-সন্তান আমরা সব—
সব বোনের এক স্বামী।

আমি অভাগিনী সব-শেষের
প্রেম-চক্রর পাইনি আগ,
সব নীচেই ঠাঁই আমার ;
পাইনি তাঁর ঢের সোহাগ।

দাসীপনা করে সাত বোনের
কাট্‌ল মোর কাট্‌ল কাল
এই কঠিন এই ধুলার
পৃথ্বীপর সাঁঝ-সকাল।

কেবল ধ্বনিভঙ্গির খাতিরে এই বিরস খেদোক্তি শেষ পর্যন্ত শোনবার ধৈর্য রক্ষা করা বিশেষ সহিষ্ণুতার কাজ। ছালিক্য ছন্দের অনুসরণে লেখা 'ভারতের আরতি'-ও কতকটা ক্লান্তিকর,—গানের উপযোগী হলেও গানের পক্ষে তা' অতি দীর্ঘ,—আবার, পঠনীয় কবিতা হিসেবেও তা' অচল।

ছয় ছয় ঋতুর পল্লব-গাঁথা
ফুলময় তোমার কিঙ্খাব পাতা ;
লাখ্ লাখ্ যুগের শিল্পীর মাতা ! জয় ! জয় !

কিংবা—

পাণ্ডব-রাঘব-মৌর্যের প্রসূ !
ক্ষত্রের স্বরগ। বৈশ্যের বসু !
পায় তোর লুটায় হিংসার পশু। জয় ! জয়

বলা বাহুল্য, এ পদার্থ রসোত্তীর্ণ কবিতা নয়।

সত্যেন্দ্রনাথের ছন্দ সম্বন্ধে আর একটি কথার উল্লেখ করেই এ প্রসঙ্গের ছেদ টানা যাবে। সেকালে, রবীন্দ্রনাথের ভাব ও রীতির ব্যাপক অনুকরণের যুগে, নানা ছন্দের নমুনা দিয়ে তিনি বাঙালী কবিদের প্রয়াস-প্রযত্ন একটি নতুন খাতে প্রবাহিত করবার চেষ্টা করেছিলেন। ইংরেজ কবি Swinbnrne-এর যেমন anapaest-এর প্রতি অতিরিক্ত আগ্রহ ছিল, সত্যেন্দ্রনাথের তেমনি শ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দের দিকে অন্তরের টান ছিল। বাঙালী কণ্ঠের হসন্তপ্রবণতাকে তিনি সাদরে গ্রহণ করে অনেক রকম পরীক্ষা করে গেছেন। ইংরেজি কবিতার তৎকালীন বিভিন্ন রূপ-ভঙ্গির দিকে তাঁর আগ্রহ ছিল। ফরাসী, জাপানী, চীনা, জার্মান, আইরিশ, সাঁওতালী, বর্মী, রুষ প্রভৃতি প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্য নানা অঞ্চলের কবিতার ধারা তাঁর জানা ছিল। তবু মনে হয়, Swinburne-এর সমসাময়িক Gerard Manley Hopkins-এর ছন্দ-সাধনার দিকে তাঁর নজর ছিল না,—কারণ, Hopkins-এর কাব্য-সংকলন ১৯১৮ সালের আগে ছাপা হয়নি। সত্যেন্দ্রনাথের অনুবাদ-কবিতার তিনখানি সংকলনে Hopkins-এর একটিও কবিতা নেই। তবু Hopkins-এর সঙ্গে তাঁর সাদৃশ্য দেখা যায়। কবিতার অঙ্গসজ্জার দিকে তাঁরই মতন Hopkins-এরও বিশেষ ঝোঁক ছিল। তিনিও অনেক পড়েছেন। Logaoedic Rhythm, Counterpoint Rhythm, Sprung Rhythm, Rocking Feet ও Outriders—এইসব নাম দিয়ে তিনি তাঁর উদ্ভাবিত ছন্দ-পরিকল্পনার ব্যাখ্যা করেছেন। চলিত ভাষার আত্মিক প্রকৃতির দিকে ইংরেজি কাব্যকে তিনি সাগ্রহে চালিত করেছিলেন। উনিশ শতকের শেষ দিকে Yeats, Dowson প্রভৃতি Rhymers' Club-এর সদস্যেরা সর্বান্তঃকরণে চলিত রীতির অনুসরণ করে গেছেন। কিন্তু Hopkins-এর সাধনায় কোনো কোনো পর্যালোচক যে মৌলিকতা লক্ষ্য করেছেন, সেই কথাটিই এখানে বিশেষ স্মরণীয়। পুরোনো আমলের প্রসিদ্ধ কাব্য-কবিতাদি পড়ে Hopkins শুধু অনুকরণেরই আদর্শ আহরণ করেন নি। তিনি এক জায়গায় বলেছেন—

> The effect of studying masterpieces is to make me admire and do otherwise. So it must be on every original artist to some degree. Perhaps then more reading would only refine my singularity. ১০

১০। Poems of Gerard Manley Hopkins (Author's Preface).

এই 'singularity' বা অনন্য স্বাতন্ত্র্যই যথার্থ কবির সাধনার সামগ্রী। হপকিন্সের সঙ্গে তাঁর অনেক সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায় বটে, কিন্তু তাঁর লেখাতে প্রকৃত singularity-র অন্বেষণ নেই। তিনি যা বলে গেছেন, সে তাঁর নানা বিদ্যা, বিপুল তথ্যসংগ্রহ বিভিন্ন ভাষাজ্ঞান এবং নাগরিক পরিবেশে আবদ্ধ ব্যক্তিগত স্বভাবের দান। পরিবেশকে সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করে বৃহৎ জীবনের সার্বভৌম, সর্বকালীন যে সত্যস্বরূপের অভিব্যক্তি বড়ো বড়ো কবিদের লেখায় ধরা পড়ে, সে জিনিস তাঁর কাব্যে নেই। Hopkins-এর লেখায় তা আছে কি নেই, সে আলোচনা বর্তমান গ্রন্থের স্বীকার্য নয়। এখানে এই কথাই বরং বক্তব্য, যে, ছন্দের বিচিত্রতার মধ্য দিয়ে তাঁর জীবন-দর্শনের কোনো গূঢ় স্বাতন্ত্র্য,—কোনো অভিনব, অসাধারণ, বা প্রবল ব্যক্তিত্ব আত্মপ্রকাশ করেনি। রবি-রশ্মির সাক্ষাৎ লালনে দিন যাপন করে সেই সর্বব্যাপক প্রভাব থেকে আত্মরক্ষা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। তাঁর মনোভঙ্গির মধ্যে সূক্ষ্ম জটিল কোনো আবর্ত ছিলো না—বরং বেগ ছিল, উদ্দীপনা ছিল, শক্তির উচ্ছ্বাস ছিল। তাঁর বহু বিচিত্র ছন্দোভঙ্গির মধ্যে গূঢ় শিল্প-কর্ম (subtlety) বিরল,—সেখানে বেগ আছে, উদ্দামতা নেই (নজরুল ইসলাম ছিলেন উদ্দামতার ভক্ত),—জগতের বিচিত্র ধ্বনিচেতনার তাড়নায় তিনি বাংলা ছন্দে বহু ভঙ্গি সঞ্চার করেছেন, কিন্তু, তাঁর নিজের অন্তরাত্মার তেমন স্বাতন্ত্র্য ছিলো না বলেই ছন্দকে তিনি বিশিষ্ট কোনো উপলব্ধির বাহন করে তুলতে পারেন নি। তবু, বাংলা ছন্দে তাঁর অনুশীলন তুচ্ছ নয়। তাঁর সমসাময়িক ও উত্তরবর্তী কবিদের মধ্যে অনেকেই তাঁর অনুসরণ করেছিলেন।

চিত্রকল্প

শব্দ, ছন্দ এবং চিত্রকল্প—কবিতার এই তিন উপকরণের সহযোগিতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের চমৎকার একটি মন্তব্য দিয়েই কথা শুরু করা যাক। তিনি লিখেছিলেন—

> গদ্যে প্রধানতঃ অর্থবান শব্দকে ব্যূহবদ্ধ করে কাজে লাগাই, পদ্যে প্রধানতঃ ধ্বনিমান শব্দকে ব্যূহবদ্ধ করে সাজিয়ে তোলা হয়। ব্যূহ শব্দটা এখানে অসার্থক নয়। ভিড় জমে রাস্তায়, তার মধ্যে সাজাই বাছাই নেই, কেবল এলোমেলো চলা-ফেরা। সৈন্যের ব্যূহ সংহত সংযত, সাজাই বাছাইয়ের দ্বারা সবগুলি মানুষের যে সম্মিলন ঘটে তার থেকে একটা প্রবল শক্তি উদ্ভাবিত হয়। এই শক্তি স্বতন্ত্রভাবে যথেষ্টভাবে

প্রত্যেক সৈনিকের মধ্যে নেই। মানুষকে উপাদান ক'রে নিয়ে ছন্দোবিন্যাসের দ্বারা সেনাপতি এই শক্তিরূপের সৃষ্টি করে। এ যেন বহু ইন্ধনের হোমহুতাশন থেকে যাজ্ঞসেনীর আবির্ভাব। ছন্দসজ্জিত শব্দব্যূহে ভাষার তেমনি একটি শক্তিরূপের সৃষ্টি।

ছন্দের আলোচনাসূত্রে রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্যের পরেই দেখা গেল চিত্রসৃষ্টি সম্বন্ধে তাঁর আর একটি মন্তব্য—

> চিত্রসৃষ্টিতেও একথা খাটে। তার মধ্যে রেখার ও রঙের একটা সামঞ্জস্যবদ্ধ সাজাই বাছাই আছে। সে প্রতিরূপ নয় স্বরূপ। তার উদ্দেশ্য চৈতন্যকে কবুল করে নেওয়া—এইতো স্বয়ং দেখলুম।১১

কবিতার 'চিত্রকল্প' মানে কবির চৈতন্যের এই রকম কবুলতির সংকেত—তাঁর চেতনার স্বাক্ষর, তাঁর প্রেরণার সৃষ্টি! কবি তাঁর ইন্দ্রিয়চেতনার মধ্যে যে বিশ্বকে গ্রহণ ও ধারণ করেন, সেই বস্তুবিশ্বের রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শ-ঘ্রাণের নানা উপকরণ থেকে তাঁর বিশেষ মর্জির প্রয়োজন অনুসারে এক-একরকম সাজাই বাছাই ঘটে থাকে। শব্দ ও ছন্দের ফ্রেমে এই রকম এক-একটি ছবি এসে ধরা দেয়। সেই ছবির মাধ্যমে বহির্জগতের সংকেত পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সে শুধু বহির্জগতের প্রতিরূপ মাত্র নয়, সে হোলো কবিচৈতন্যের বিশেষ লগ্নের অভিব্যক্তি। সার্থক কবিতার একদিকে আবেগ, অন্যদিকে সংবাদ, এই দুইই থাকতে পারে, কিন্তু এই দুটি দিকই পরস্পরের অবিচ্ছেদ্য সহচর। কবিতা 'means of reference' এবং 'emotive instrument'—যুগপৎ এই দুই-ই। পাশ্চাত্ত্য আলংকারিক I. A. Richards বলেছেন—'Poetry affords the clearest example of subordination of reference to attitude.'।

সত্যেন্দ্রনাথের কবিতায় কবিচেতনার এই সাজাই-বাছাইয়ের বহু নিদর্শন আছে। ইন্দ্রিয়জ্ঞানের সঙ্গে মনন ও কল্পনার অক্লান্ত, সানন্দ সহযোগিতার ফলে শব্দে-ছন্দে বহির্জগৎ ও মনোজগতের বহু তথ্যসংকেতের (reference) এক-একটি ব্যূহ রচিত হয়েছে। সব ক্ষেত্রে সব তথ্য অবশ্য কবির মেজাজের বশ্যতা স্বীকার করেনি। কিন্তু কোনো কবিরই সমস্ত রচনায় সে রকম পূর্ণ সাফল্য দেখা যায় না। যেখানে attitude-এর কাছে reference আত্মসমর্পণ করে, সেখানে চিত্রকল্প সার্থক হয়,—অন্যত্র দেখা দেয় অসার্থকতা। সত্যেন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। তাঁর চিত্রকল্পমালার

১১। গদ্যছন্দ (ছন্দ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)।

আলোচনায় প্রথমতঃ এই সত্যটি সহজেই চোখে পড়ে যে, তাঁর মনে গভীর ভাবমগ্নতার মেজাজ ছিল বিরল। বহির্জগতের নানা ঘটনার চাঞ্চল্য এবং বিচিত্রতা পর্যবেক্ষণের দিকেই তাঁর স্বাভাবিক আগ্রহ ছিল। তাঁর কবিতায় বর্ণনার বহুলতা,—ধ্যানের বিরলতা! সেখানে যেসব ছবি সত্যিই রসোত্তীর্ণ হয়েছে, চিত্রকল্পের শ্রেণী-বিভাগের সাধারণ রীতি অনুসারে সেগুলিকে বস্তুভূমিক (concrete) ও ভাবভূমিক (abstract), এই দু'ভাগে ভাগ করা যায়।

কেবলমাত্র চর্মচক্ষুর দৃষ্টি দিয়ে ভাবব্যঞ্জক (suggestive) ভালো ছবি দেখা যায় না। ছবির কেবলমাত্র কয়েকটি উপকরণের দিকেই যে কবি বেশি মনোযোগ দেন, তাঁর চিত্রণসামর্থ্য ক্ষীণ। অপরপক্ষে, সার্থক চিত্রকল্পের মূলে সক্রিয় থাকে কবির ভাবদৃষ্টি।

> না জানে সুপ্তির স্বাদ, জড়তার বারতা না জানে,
> ভাঙনের মুখে বসি' গাহে গান প্লাবনের তানে,
> নাহিক বাস্তুর মায়া, মরিতে প্রস্তুত চিরদিনই!
>
> —পদ্মার প্রতি : 'কুহু ও কেকা'

এখানে পদ্মার 'দিগন্ত-বিস্তৃত হাস্যের কল্লোল' শুনে এবং দেখে,—'উচ্ছৃঙ্খল, দুরন্ত-দুর্বার' রূপ উপভোগ করে,—কবি পেয়েছেন প্রলয়ঙ্করী; সুন্দরী এক নারীমূর্তির সাদৃশ্য। চিরচঞ্চল, ভয়লেশশূন্য সেই নারী-স্বভাবের কয়েকটি লক্ষণ শব্দ ও ছন্দের সহযোগিতায় ভাবব্যঞ্জক এই ব্যূহ রচনা করেছে। কবিতার শিরোনাম থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, কবি পদ্মানদীর কথা বলছেন। তবু মনে হয়, এ যেন ভীষণা, সুন্দরী এক নারীর রূপ। বস্তুলক্ষণ যে আদৌ নেই, তা নয়,—কিন্তু ভাবলক্ষণই এখানে বেশি দেখা গেল। কবিচিত্তের আহরণী-শক্তি ইন্দ্রিয়জ্ঞানের বিশেষ বিশেষ তথ্য সংগ্রহ করেছে,—বন্ধনী-শক্তির সাহায্যে সেগুলিকে তিনি একত্র সংবদ্ধ করেছেন,—রহস্যময়ী সমীকরণ-শক্তির কৌশলে শব্দে-ছন্দে যথোচিত আশ্রয় লাভ করে বস্তুজগতের সেই বিশেষ লক্ষণগুলি সম্পূর্ণ এক-একটি ছবি হয়ে উঠেছে। এই হোলো চিত্রকল্পের রূপায়ণ-রহস্য। চিত্রকল্পের সার্থক বিন্যাসের মধ্য দিয়েই ফুটে ওঠে কবির ব্যক্তিত্ব,—তাঁর রূপানুভূতির বৈশিষ্ট্য,—তাঁর আবেগের প্রকৃতি, মননের ধারা,—দুর্নিরীক্ষ্য অন্তরাত্মার অভিজ্ঞতা!

[ক] শাঁওল-বরণ শাঁওলাতে ছায় কোমল মাটি,
মাটির কোলে পাপড়ি মেলে ভুঁই চাঁপাটি।
মগন ছিল পাতাল-তলে
জাগ্‌ল সে আজ কিসের ছলে?—
বুঝি ঠেক্‌ল মাথায় বৃষ্টিধারার রূপার কাঠি!

ভুঁই চাঁপা: কুহু ও কেকা

[খ] শালিক শুক বুলায় মুখ
থল্‌-ঝাঁঝির মখ্‌মলে,
জরির জাল আঙ্‌রাথায়
অঙ্গে মোর ঝল্‌মলে।

—ঝর্ণার গান: বিদায় আরতি

[গ] ওই নিঝুম নিথর রোদ খাঁ খাঁ
শিরীষ ফুলের ফাগ-মাখা,
ঢুলঢুলে কার চোখ দুটি কালো?
রাঙা দুটি হাতে লাল রুলি!

—জ্যৈষ্ঠী-মধু: ঐ

[ঘ] মরি পাখ্‌নার ঢাক্‌নায় স্পন্দে তনু,
ভরি' পালকের এস্‌রাজ পুলকের সুর!

— ময়ূরমাতন: বেলা শেষের গান

[ঙ] সিংহলে ওরে বলে মল্লি-আলি!
জংলী বেদের মেয়ে রূপেব ডালি!
গাছে ওঠে, ডালে চড়ে মাটিতে পা'টি না পড়ে
পা ঝুলিয়ে ফুল ছড়ি দোলায় খালি।

—অর্কিড ফুল: শিশু-কবিতা

এই পাঁচটি দৃষ্টান্তের মধ্যে একসঙ্গে পাঠকের চোখ-কান দু'য়েরই পরিতৃপ্তির আয়োজন আছে। বলা বাহুল্য, এর কোনোটিই স্বভাবোক্তি মাত্র নয়। কবি তাঁর বিশেষ বিশেষ ভাব-প্রকাশের জন্যেই এইসব ছবি সাজিয়েছেন। রূপদৃষ্টির অভিজ্ঞতা তাঁর মনে যে উপলব্ধি জাগিয়েছে, সে তো শুধু

তথ্য মাত্র (reference) নয়,—তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে কবির আবেগ (emotion)। আবেগময় এক-একটি মর্জির (attitude) বশ্যতা স্বীকার করে রূপজগতের উপকরণ এইসব ক্ষেত্রে ছন্দোবদ্ধ এক-একটি ব্যূহ রচনা করেছে।

সত্যেন্দ্রনাথের কবিতায় গুণভূমিক চিত্রকল্পের প্রয়োগ কম,—বস্তুভূমিক চিত্রের সংখ্যাই বেশি এবং এইসব ছবির বিশেষত্ব এই যে, প্রত্যেকটির মধ্যেই জড়িয়ে আছে কানের স্বীকৃতি এবং সহায়তা। ওপরে যে পাঁচটি উদ্ধৃতি দেখানো হয়েছে, সেগুলির প্রত্যেকটিতে চোখ এবং কান এক সঙ্গে এই দুটি ইন্দ্রিয়েরই পরিতৃপ্তি ঘটেছে। চিত্রকল্প অনুসন্ধানের সংকল্প নিয়ে সত্যেন্দ্রনাথের কাব্য-পরিক্রমায় আত্মনিয়োগ করলে তাঁর অতি তীক্ষ্ণ শ্রুতিচেতনার নানা প্রমাণ পাওয়া যায়। এ থেকে এই সিদ্ধান্তে পৌছোনো যায় যে, তাঁর চিত্রকল্পের এই বিশেষ দুটি লক্ষণই সেগুলিকে বিশেষত্ব দিয়েছে,—প্রথমতঃ, বস্তুভূমিকতা, দ্বিতীয়তঃ, শ্রুতিতর্পণ। পঞ্চেন্দ্রিয়ের মধ্যে কানই ছিলো তাঁর প্রধান ইন্দ্রিয়। সত্যেন্দ্র-কাব্যের চিত্রকল্প-স্বভাবের মধ্যে ধ্বনিধর্মের তীক্ষ্ণতা এক অনস্বীকার্য সত্য। 'ময়ূর-মাতন' থেকে যে দৃষ্টান্তটি (ঘ) ওপরে তুলে দেওয়া হয়েছে, তাতে এ বিশেষত্ব বিশেষ ভাবে চোখে পড়ে। পাখনা, পালক, স্পন্দন—এই ক'টি উপকরণ ওখানে চোখের গ্রাহ্য—কিন্তু 'পালকের এস্‌রাজ পুলকের সুর', এই সংকেতের মধ্য দিয়ে কবিচেতনার যে সত্য ধরা পড়েছে, সে তাঁর শ্রুতিসংবেদনেরই প্রাবল্য! এই কবিতার ছন্দগত স্পন্দনটি তদুপরি অতিরিক্ত লাভ। স্থির দৃশ্যের ছবি, গতিশীল দৃশ্যের ছবি, এবং পরিচিত বস্তু-জগতের বিশেষ বিশেষ লক্ষণের সমাহারে এমন কল্পসৃষ্টি,—যা দেখে বাস্তব দৃশ্যের ছবি বলে ভ্রম হয়,—সত্যেন্দ্রনাথের কবিতায় এই তিন রকম চিত্রকল্পই ব্যবহৃত হয়েছে। প্রথম শ্রেণীর দৃষ্টান্ত দেখা যাচ্ছে প্রথম ও পঞ্চম (ক ও ঙ) উদাহরণে,— তৃতীয় শ্রেণীর নিদর্শনের জন্যে পুনরায় পঞ্চম উদাহরণটি (ঙ) স্মরণীয়। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে, ঐ বর্ণনায় 'আর্কিড ফুল' হয়ে উঠেছে 'জংলী বেদের মেয়ে'। আর, দ্বিতীয় শ্রেণীর উদাহরণ হিসেবে নিচের উদ্ধৃতিটি নির্ভরযোগ্য—

উড়িয়ে ফুঁয়ে তুলোট-পুঁথি ধুলোট খেলে চুলবুলে
ফুল-বিলাসী দখিন হাওয়া তাই !

এই ছবিতে ফুল-বিলাসী দখিন-হাওয়ার অস্থিরতা গোপন থাকে নি। ধুলো উড়িয়ে ফুলের বন ছুঁয়ে ছুঁয়ে সেই হাওয়া যেন সবেগে এগিয়ে গেল।

কিন্তু চক্ষু-কর্ণের উদ্দীপনা যখন মাত্রা ছাড়িয়ে যায়, তখন কবির রচনাতেও দেখা দেয় তাঁর অসংযত আহরণী শক্তির অমিত উচ্ছ্বাস। ফলে, রূপের আতিশয্যে, ছবির ভিড়ে—কবির অভিপ্রায়ের বাঁধন শিথিল হয়ে যায়। তখন অনেক ছবির ভিড়ে, সুনির্দিষ্টভাবে বিশেষ কিছুই যেন আর চোখে পড়ে না। মনে পড়ে, রবীন্দ্রনাথ লিখে গেছেন—

> মধুকর সম ছিনু সঞ্চয় প্রয়াসী—
> কুসুম-কান্তি দেখি নাই, মধু-পিয়াসী।

সত্যেন্দ্রনাথের স্বভাবের মধ্যে ছিলো সঞ্চয়নিষ্ঠ সেই মধুকরের ব্যস্ততা। তাঁর চিত্রকল্পের আলোচনায় এ বিশেষত্বের কথা অনুল্লিখিত থাকা উচিত নয়। সব ক্ষেত্রে না হলেও এ রকম অভ্যাস সাধারণতঃ কবির দোষের মধ্যেই গণ্য। এখানে এই ধরনের একটি চিত্রসংকরের নমুনা তুলে দেওয়া হোলো—

> সোনার কাঠি ছুঁইয়ে দে রে, এ নিদ্ মহল কার আছে তজ্‌বিজে?
> বিভাবরীর নীলাম্বরীর আঁচল ওঠে মোতিব আভায় ভিজে?
> হোরার কালো চুলের রাশে কোথায় থেকে ধূপের ধোঁয়া লাগে
> বন্-কপোতের গ্রীবার নীলে জাফরানী নীল মিলায় অনুরাগে!
> পাশ্-মোড়া দেয় স্বপ্নে উষা আধো-খোলা আধ্-ফোটা ফুল পারা!
> সোনা মুখের হাই লেগে হয় মুহুর্মুহু আকাশ আপন-হারা!
> বরুণ গলে মেঘ-মহলে দোলে কমল-মালা,
> ছোপ রেখে যায় সোনার ধোয়াট, নীল ফটিকের বিরাট্ তোরণ আলা।
>
> —সিঞ্চলে সূর্যোদয়: 'বিদায়-আরতি'

সিঞ্চলে সূর্যোদয় দেখে একটি স্তবকেই তিনি এতো ছবি ছড়িয়েছেন! বিভাবরীর নীলাম্বরীর আঁচলের দিকে চোখ রাখ্‌তে-না-রাখতেই চোখ ফেরাতে হয় হোরার কালো চুলের দিকে,—সেখান থেকে বন-কপোতের গ্রীবার নীলে-জাফ্‌রানে,—সেখান থেকে আবার ফিরতে হয় আধো-খোলা, আধ্-ফোটা ফুলের মতন উষা যেখানে নিদ্রাভঙ্গের আয়োজন করছেন, সেই

দিকে,—সহসা দেখা যায় কোন্ এক 'সোনা মুখের হাই'! কিন্তু কবির যেন অবসর নেই, রূপ-মধুকর কবি তাঁর পাঠককে চকিতে আকর্ষণ করেন অন্য ছবির দিকে,—দেখা যায়—'মেঘ-মহলে দোলে কমল-মালা'!

এই সূত্রে আর একটি ছবির কথা মনে পড়ে

স্বর্ণ শরে পূর্ণ এ কি গন্ধরাজের তূণখানি!—
পুষ্পকান্তি ললাটে কার তিলক শোভে জাফ্‌রাণী!
মোতির পরে সোনার থর!
চাঁদের বুকে সূর্যকর!
সদ্য-জাগা যৌবনে এ কোন্ কামনার রাজধানী।

—নাগকেশর: অভ্র-আবীর

এখানে পর পর স্বর্ণশরে পূর্ণ তূণ, পুষ্পকান্তি ললাটের তিলক, মোতির পরে সোনার থর এবং চাঁদের বুকে সূর্যকর, এই চারটি ছবি পাওয়া গেল এবং প্রত্যেকটি পৃথক হলেও সবগুলি একই লগ্নের ধ্যান এবং অভিজ্ঞতা! কিন্তু 'চিত্রশরৎ'-এ (অভ্র-আবীর) আছে লগ্ন বদলের সংবেদন। সেখানে বাইরে দৃশ্যপটের দ্রুত বদল হচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে উৎপ্রেক্ষাও বদলে যাচ্ছে—

এই যে ছিল সোনার আলো ছড়িয়ে হেথা ইতস্তত—
আপনি খোলা কমলা-কোয়ার কম্‌লা-ফুলি রেঁায়ার মত,—
এক নিমিষে মিলিয়ে গেল মিশনিশে ওই মেঘের স্তরে,
গড়িয়ে যেন পড়ল মসী সোনায় লেখা লিপির পরে।

বলা বাহুল্য, এ ছবির এই সাংকর্য কাব্যামোদীর বরণীয়! দাশরথি রায়, গোপাল উড়ে,—এবং তাঁদের পরবর্তী আধুনিকতর মধুসূদন দত্তের মতন সত্যেন্দ্রনাথও ছিলেন উৎপ্রেক্ষায় মুক্তহস্ত!

কবিতার প্রকার ও রূপগঠন

শব্দ, ছন্দ এবং চিত্রকল্প,—সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যকলার এই তিন প্রদেশের কথা লেখা হোলো। এ ছাড়া তাঁর কবিকৃতির আরো কয়েকটি দিকের কথা বিবেচ্য। কবিতার রূপগঠন সম্পর্কিত বিচিত্র সামর্থ্যের জন্যেও এ-কালের বাঙালী কবিদের মধ্যে তাঁর নাম স্মরণীয়। 'বেণু ও বীণা'তে একদিকে যেমন পয়ার, ত্রিপদী ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন ছন্দোরূপ দেখা গেছে, অন্যদিকে তেমনি চার চরণের

স্তবক-বন্ধে প্রথমের সঙ্গে চতুর্থের এবং দ্বিতীয়ের সঙ্গে তৃতীয়ের অন্ত্যানুপ্রাসের বাঁধন ('মমতাময়'),—তিন চরণের স্তবকে প্রতি চরণের মিল-বন্ধন ('আলেয়া), —ছয় চরণের স্তবকে প্রথম ও দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ চরণের মিল এবং সেই সঙ্গে তৃতীয়-চতুর্থের মাত্রা-পরিমাণের সঙ্গে বাকি চারটির সমপরিমিত ব্যবধান রক্ষার নমুনা ('মৎস্য-গন্ধা'),—এবং এই রকম আরো বহু বিচিত্রতা দেখা যায়। 'বেণু ও বীণা'তে রবীন্দ্রনাথের 'কণিকার' মতন কয়েকটি ছোটো কবিতাও সংকলিত হয়েছে। তাছাড়া কিছু চতুর্দশপদীও আছে। 'কুহু ও কেকার' 'কু' কবিতাটি চার-চার চরণে গাঁথা চারটি স্তবকে সম্পূর্ণ এবং প্রতি স্তবকের শেষ চরণের প্রশ্নধ্বনিটি অভিনবত্বময়। ছন্দের বিশেষত্বই এ-কবিতার একমাত্র কলাবৈশিষ্ট্য নয়। প্রতি স্তবকের শেষে একটি প্রশ্নকেই কবি বার-বার জায়গা দিয়েছেন। তা'তে অর্থালংকারের কাজ হয়েছে, সন্দেহ নেই,— সঙ্গে সঙ্গে কবিতাটির রূপগত কারুকার্যও দেখা দিয়েছে।

উনিশ শতকে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের আমলেই আধুনিক স্তবক-পরিকল্পনার সূচনা হয়। মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, বিহারীলাল চক্রবর্তী এবং এই সময়ের অন্যান্য বহু কবি স্তবক-বন্ধের বৈচিত্র্য-বিধানের চেষ্টা করেছিলেন। নবীনচন্দ্রের 'পলাশীর যুদ্ধে' সেকালের দশ চরণের বৃহত্তম স্তবকের নমুনা আছে। রবীন্দ্রনাথের হাতে বাংলা কবিতার অন্যান্য দিকের সঙ্গে স্তবক-বন্ধের ক্ষেত্রেও বহু বৈচিত্র্য ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথের সমকালীন ও অনুবর্তী কবিরা কতকটা তাঁরই অনুসরণে এবং কিছু পরিমাণে পশ্চিমী (প্রধানতঃ ইংরেজি কবিতার) কাব্যের অনুকরণে এদিকে বৈচিত্র্য সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন। অর্থাৎ, বাংলা কবিতায় স্তবক-বন্ধের কায়দা কবিতার রূপগঠন ব্যাপারে অপেক্ষাকৃত আধুনিক কৌশল। এ কেবল কতকগুলি চরণের ইচ্ছামাফিক গুচ্ছবিভাগ নয়। সম্পূর্ণ কবিতাটির ভাবমণ্ডল স্তবকের এক-একটি গ্রন্থিতে যেন এক-একটি সৌষম্যের বন্ধন স্বীকার করে নেয়। সত্যেন্দ্রনাথ সেই আদর্শ মনে রেখেই স্তবকের নানান্ রূপ সৃষ্টি করে গেছেন। 'পাল্কীর গান', 'পিয়ানোর গান', 'চরকার গান', 'ঝর্নার গান' ইত্যাদি নানা গানের সুর নিয়ে তিনি নানা রূপের কবিতা লিখেছেন; আবার সামাজিক দোষ-ত্রুটির কথা নিয়ে বাংলায় ফরাসী verse-de-socie'te'-র মতন আর এক ধরনের কবিতাও লিখেছেন ('দোরোখা একাদশী'—'বিদায় আরতি')। তাঁর শ্লেষাত্মক কবিতাগুলির মধ্যেও রূপগত বৈচিত্র্য দেখা যায়। 'হসন্তিকা'-র 'শ্রীশ্রীটিকিমঙ্গল' মূল

গায়েন ও দোহারের পৃথক পৃথক অংশে ভাগ করা; আবার 'কাশ্মীরী কীর্তন' বা 'মদিরা মঙ্গল' অন্য রূপের দৃষ্টান্ত। 'জলচর-ক্লাবের জলসা রঙ্গ', 'গন্ধমাদন', 'কেরানি স্থানের জাতীয় সংগীত' এবং 'সর্বনী'তে আছে 'প্যারডি'র লক্ষণ। 'হুঃ' এবং 'অ!' (হসন্তিকা) কবিতা দুটিতে লঘু-কঠোর স্বর-ব্যঞ্জনের দ্রুত ছন্দ-গতির সঙ্গে স্তবক-বন্ধের রূপকৌশলও চোখে পড়ে—

এই চট্ করে যাহা বলে ফেলা যায়
চুট্‌কি তাহারে কয়,
ওগো ছোট লেখা যত লেখে ছোট লোকে
জানিবে সুনিশ্চয়।

ওই চুট্‌কি রচনা কেট্ কেট্ গ্র্যাম
বিকি-কিনি চলে চোটে,
ও যে ফুট্-কড়ায়ের ছুট্‌কো বেসাতি
হুণ্ডি চলে না মোটে।

ভুয়ো সজ্‌নের খুঁটি চুট্‌কি রচনা
দেখিতে নিরেট বটে,
ভায়া, ভর দিলে তারে ভেঙে পড়ে চাল
আয়ু-সংশয় ঘটে।

ওগো লিখো না ছুট্‌কি, লিখিলে পড়িবে
যশোভাগ্যেতে দ',
আর পণ্ডিত-সভা পুছিবে না তোরে
দুখ না ঘুচিবে।—
(কোরাস)······অ!

তাঁর 'হসন্তিকা'তে এবং অন্যান্য বইয়ে স্তবক-বন্ধনহীন একটানা পদ্যরূপও দুর্লভ নয়। কিন্তু স্তবকের বৈচিত্র্য দেখাবার দিকেই তাঁর বেশি আগ্রহ ছিল। 'হসন্তিকা'র 'দশাবেতর স্তোত্র' (জয়দেবের ছন্দে) থেকে আর-এক রকম স্তবকের নমুনা দেওয়া যেতে পারে—

পোলাওয়ে করেছ সুধাময় আর কালিয়ায় অতি 'টেষ্ট‌ফুল'!
মারিয়া রেখেছ সৌরভে অহো! বিল্‌কুল্!

দেবতা ! হইলে মছ্‌লি বেবাক !
বলিহারি যাই তোমারি ।

আবার গম্ভীর ভাবের অন্তর তরঙ্গিত স্তবক রয়েছে 'বর্ষ-বোধন' প্রভৃতি কবিতায়—

কই ভারতের বরুণ-ছত্র—দিগ্বিজয়ীর সাগর-জয়ের স্মৃতি ?
মহাসোনা সুখত্রা আজ কার ?
যব, শ্রীবিজয়, সমুদ্রিকা, বরুণিকা কাদের বাড়ায় প্রীতি ?
সিংহলে কার জয়ের অহঙ্কার ?
প'ড়ে আছে অচিন দ্বীপে হিস্পানীয়ার দর্প-দেকের খোলা—
ঝাঁজ্‌রা জাহাজ তিমির পাঁজর হেন,
পর্তুগীজের সমান ভাগে গোল পৃথিবীর নিলে যে আধ গোলা'
ফিলিপিনায় পিন্‌ পুঁতে ঠিক যেন।
কোথায় মায়ারাষ্ট্র বিপুল মাওরি-পেরু-লঙ্কা-মিশর-জোড়া ?
ছায়ার দেশে বুঝি স্বপন-রূপে ?
হারিয়ে গতি ধাবন-ব্রতী ময়দানবের সিন্ধুচারী ঘোড়া
বাড়ব-শিখায় নিশ্বাস ফেলে চুপে।

বর্ষ বোধন . বিদায়-আরতি

'বিদায় আরতি'র 'নরম-গরম-সংবাদ'-এ 'নরম' আর 'গরম' দুপক্ষের সংলাপের মধ্যে নেপথ্য-প্রেরিত হ্রস্ব ধ্বনির 'কিন্তু ততঃ কিম্‌' এবং 'সম্প্রতি টিম্‌ টিম্‌', এই দুটি অংশ শুধু ছন্দেরই সৌকর্য বিধান করেনি, কাব্যরূপেও কতকটা অভিনবত্ব ঘটিয়েছে। কোরাস-এর ব্যবহার তাঁর ব্যঙ্গ-কবিতাতেও যেমন দেখা যায়, উৎসাহ-উদ্দীপনাময় অন্য এক শ্রেণীর কবিতাতেও তেমনি বিদ্যমান ('নবজীবনের গান' স্মরণীয়)।

তাঁর কাব্য-প্রকারের বৈচিত্র্যও এই সূত্রে স্মরণ করা যেতে পারে। মনন-প্রধান, খেয়াল-প্রধান, বস্তুবর্ণন-প্রধান এবং আখ্যান-প্রধান,—কবিতার প্রকারগত এই চার শাখার প্রতিটির দৃষ্টান্ত আছে সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যপ্রবাহে। রাষ্ট্র-সমাজ-ধর্ম-সম্পর্কিত তথ্যভূয়িষ্ঠ বিশেষ কয়েকটি লেখাতে আছে মননপ্রধান কবিতার উদাহরণ ('দাবীর চিঠি,' 'সেবা-সাম' ইত্যাদি) ; 'কুহু ও কেকা'র

'তুমি ও আমি', 'ফুলের ফসল'-এর 'কিশোরী' ইত্যাদি হোলো খেয়াল-প্রধান কবিতার দৃষ্টান্ত। 'কিশোরী'র শুরুতেই দেখা যায়—

তার জলচুড়িটির স্বপন দেখে
অলস হাওয়ায় দীঘির জল
তার আলতা-পরা পায়ের লোভে
কৃষ্ণচূড়া ঝরায় দল !

প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কবিতাটি কবির এই খেয়ালের ঝংকারে স্পন্দিত হয়েছে। সত্যেন্দ্রনাথের বস্তুবর্ণন-প্রধান কবিতার দৃষ্টান্ত অনাবশ্যক। কোনো রকম রসভাষ্য ব্যতিরেকেই কবি যেখানে বিশ্বের এক বা একাধিক বস্তু সম্বন্ধে তাঁর ঔৎসুক্যমাত্র প্রকাশ করেন, সেখানেই এই শ্রেণীর উদাহরণ পাওয়া যায়। 'কুহু ও কেকা'র 'গ্রীষ্মচিত্র' এই ধরনের কবিতা। 'কুম্ভজাতক' অবলম্বনে লেখা 'সুরার কাহিনী',—বৌদ্ধযুগের আর একটি কাহিনী অনুসরণে লেখা 'সুশ্বেতা',—তাছাড়া, 'কয়াধু', 'মল্লিকুমারী', 'অরুন্ধতী' ইত্যাদি তাঁর আখ্যান-প্রধান কবিতার উদাহরণ। আর এক ধরনের লেখায় মনন ও আখ্যান বর্ণনার মিশ্র লক্ষণ ফুটেছে। 'সবিতা'-য় এই শাখাটির প্রথম উন্মেষ, এবং 'হোমশিখা'তে এর পরিণতি দেখা যায়। 'সবিতা'র স্তবকবন্ধ এবং রূপসৌকর্যের সঙ্গে 'হোমশিখা'র 'সমীর', 'সিন্ধু' ইত্যাদি কবিতার সাদৃশ্য আছে। আট-চরণের এক একটি ব্যূহ সাজিয়ে এই কবিতাগুলিতে তিনি পঞ্চভূতের বন্দনা করেছিলেন।

সত্যেন্দ্রনাথের চতুর্দশপদী কবিতার ভাবে এবং গঠনে মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ, উভয়েরই অনুসৃতির লক্ষণ আছে। মধুসূদনের চতুর্দশপদীর সকল ক্ষেত্রে অষ্টক ও ষট্‌কের মর্যাদা রক্ষা করা হয়নি। মনে হয়, প্রথম জীবনে কবিতা লেখার প্রথম সূত্রপাতকালে সত্যেন্দ্রনাথ মধুসূদনের চতুর্দশপদীর প্রসঙ্গ ও আদর্শের প্রভাব কিছু পরিমাণে আত্মসাৎ করেছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ সেন ও অক্ষয়কুমার বড়ালের চতুর্দশপদীতে পরিণততর রূপসৌকর্য দেখা গেছে। অবশ্য, চতুর্দশপদীর নিখুঁৎ ভাবশাসন দেবেন্দ্রনাথের লেখাতেই বেশি চোখে পড়ে। রবীন্দ্রনাথের 'কড়ি ও কোমল', 'নৈবেদ্য', 'চৈতালী' প্রভৃতির চতুর্দশপদী কবিতাগুলিতে রূপগঠনের যে আদর্শ দেখা গেছে, সত্যেন্দ্রনাথের লেখায় তার হুবহু অনুকরণ নেই। রবীন্দ্রনাথ প্রবহমান পয়ারে পংক্তি-

প্রান্তিক মিল রক্ষা করেছেন, কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ মধুসূদনের মতন বিদেশি 'সনেটের' আদর্শে পর্যায়বদ্ধ মিলের রীতি মেনে নিয়েছেন ('বেণু ও বীণা'র 'স্বর্গাদপি গরীয়সী' স্মরণীয়)। তবে, একথা সুনিশ্চিত যে সত্যেন্দ্রনাথের ব্যক্তিস্বভাবের প্রবণতা চতুর্দশপদীর নিবিড় ভাবশাসনের অনুকূল ছিলো না। তাঁর সারা জীবনের কবিকর্মের এষণা ও নিষ্ঠা চালিত হয়েছে প্রধানতঃ অঙ্গসৌষ্ঠবের দিকে।

অনুচিন্তা

করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় [১৮৭৭-১৯৫৫]

যতীন্দ্রমোহন বাগচী [১৮৭৭-১৯৪৮]

কুমুদরঞ্জন মল্লিক [জন্ম ১৮৮২]

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত [১৮৮৭-১৯৫৪]

মোহিতলাল মজুমদার [১৮৮৮-১৯৫২]

কালিদাস রায় [জন্ম ১৮৮৯]

কাজী নজরুল ইস্‌লাম [জন্ম ১৮৯৯]

করুণানিধান, যতীন্দ্রমোহন, কুমুদরঞ্জন, যতীন্দ্রনাথ, মোহিতলাল, কালিদাস রায় ও নজরুল ইস্‌লাম—সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের সমকালীন প্রসিদ্ধতমদের মধ্যে এই সাতজন কবির প্রত্যেকের মধ্যেই সত্যেন্দ্রনাথের প্রভাবের কিছু কিছু চিহ্ন আছে। এঁদের কবিকর্মের পরিমাণ কম নয়। রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ প্রভাবের মধ্যে বাস করে নিজেদের পৃথক পৃথক ব্যক্তিস্বভাবের তাগিদ অনুসারে এঁরা সকলেই কাব্য-রচনায় নিযুক্ত থেকেছেন। এই সাতজন ছাড়া সত্যেন্দ্রনাথের প্রভাবিত সমকালীন উল্লেখযোগ্য কবিদের মধ্যে যথাস্থানে অন্যান্য অনেকের নাম করা হয়েছে। কিরণধন চট্টোপাধ্যায়, নরেন্দ্র দেব, হেমেন্দ্রকুমার রায়, কান্তিচন্দ্র ঘোষ, সুরেশ চক্রবর্তী, সুকুমার রায়, সুশীলকুমার দে, বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণদয়াল বসু, প্যারীমোহন সেনগুপ্ত, সাবিত্রী-প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রলাল রায় প্রভৃতি আরো অনেকের নাম মনে পড়ে বটে, কিন্তু এঁদের সকলের কথা এই গ্রন্থের স্বল্পপরিসর একটি অধ্যায়ের মধ্যে আলোচনা করা সম্ভবও নয়, অভিপ্রেতও নয়।

সত্যেন্দ্রনাথের মৌলিক ও অনুবাদ সমগ্র কাব্য-প্রবাহের আলোচনা থেকে তাঁর বিশেষত্বের প্রধান যে লক্ষণগুলি দেখা গেল, তাঁর উত্তরবর্তী বাংলা কাব্যাদর্শে তাঁর প্রভাবের কথা উত্থাপনের আগে সেই লক্ষণগুলি এখানে পুনর্বার স্মরণীয়। খাঁটি বাংলা ভাষা এবং ছন্দের প্রতি আগ্রহ,—তদ্ভব ও দেশি শব্দের সঙ্গে তৎসম ও বিদেশী শব্দের বহুল ব্যবহার,—তানপ্রধান, ধ্বনিপ্রধান এবং বিশেষভাবে শ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দের নৈপুণ্য,—ঐতিহাসিক, পৌরাণিক, বৈজ্ঞানিক এবং সমকালীন সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় প্রসঙ্গের চিন্তা,—

গীতিকবিতার প্রকারগত বৈচিত্র্য ও রূপগত কৌশলের প্রয়াস,—মিলের বিচিত্রতা, শব্দের অভিনবত্ব, চিত্রকল্পের কৌশল,—রবীন্দ্র-যুগের একান্ত রবীন্দ্র-ভক্ত কবি হয়েও ক্লাসিক্যাল কাব্যাদর্শের দিকে কিঞ্চিৎ অনুরাগ—এই-গুলিই তাঁর কাব্যসাধনার বিশিষ্ট লক্ষণ। এ ছাড়া অনুবাদকের অক্লান্ত অধ্যবসায় ছিলো তাঁর স্বভাবের অন্যতম বিশেষত্ব—এবং সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল পর্যালোচকের দৃষ্টি, বৈয়াকরণের শব্দজ্ঞান, ছান্দসিকের সৌষম্যচিন্তা!

রবীন্দ্র-শিষ্যদের মধ্যে প্রবীণতম করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর জন্মস্থান শান্তিপুরের এবং পিতার কর্মস্থান পঞ্চকোটের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রেরণায় প্রথম কাব্য-রচনা শুরু করেন। তাঁর পিতা নৃসিংহচন্দ্র ছিলেন শিক্ষক,—তিনি স্বর্ণকুমারী দেবী সম্পাদিত 'ভারতী' এবং জ্ঞানদানন্দিনী দেবী সম্পাদিত 'বালক' পত্রিকার গ্রাহক ছিলেন। পিতার সাহিত্যপ্রীতি, বিবেকানন্দের আদর্শ, রবীন্দ্রনাথের প্রভাব এবং প্রকৃতির রূপমাধুর্য—এই চতুর্যোগের প্রভাবে করুণানিধানের কবিত্ব-সম্ভাবনার সূচনা ঘটেছিল ১৮৯৬ থেকে ১৯০২ সালের মধ্যে। বেনোয়ারিলাল গোস্বামী, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, দেবেন্দ্রনাথ সেন, অক্ষয়কুমার বড়াল প্রভৃতি সাহিত্যসেবকের আনুকূল্যে প্রথম জীবনের আর্থিক দুঃখকষ্টের মধ্যেও তিনি সাহিত্যচর্চা অব্যাহত রাখতে পেরেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ঝরা ফুল'-এর (১৯১১] প্রশংসা করেছিলেন,—'সাহিত্য'-সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতিও নবপর্যায় 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় তাঁর প্রশংসা করেন।[১]

নদীয়া জেলার জামসেরপুরে (জন্মস্থান) শৈশব কাটিয়ে কলকাতায় এসে হেয়ার-স্কুলে ভর্তি হবার পরে যতীন্দ্রমোহন বাগচী—বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রভৃতির সাহিত্যকর্মের সাক্ষাৎ আকর্ষণে আকৃষ্ট হন। বিবেকানন্দের বক্তৃতা শুনে,—অধ্যাপক মনোমোহন ঘোষ, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রভৃতি শিক্ষকের কাছে পাঠ নিয়ে,—রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, গোবিন্দ দাস (ভাওয়ালের), সুধীন্দ্রনাথ ও দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিজয়চন্দ্র মজুমদার ইত্যাদি খ্যাতনামা ব্যক্তির বন্ধুত্ব লাভ করে 'ভারতী' ও 'সাহিত্য'

১। করুণানিধানের কাব্যগ্রন্থপঞ্জী :—বঙ্গমঙ্গল (১৩০৮), প্রসাদী (১৩১১), ঝরা ফুল (১৩১৮), শান্তিজল (১৩২০), ধান-দূর্বা (১৩২৮), শতনরী (হেমচন্দ্র বাগচী-সম্পাদিত কাব্য-সঙ্কলন—১৩৩৭), রবীন্দ্র-আরতি (১৩৪৪), শতনরী (কালিদাস রায়-সম্পাদিত, ১৩৫৫), গীতায়ন (১৩৫৬), গীতারঞ্জন (১৩৫৮), ত্রয়ী (১৩৬১)।

পত্রিকায় তিনি প্রথম কবিতা লেখা শুরু করেন। করুণানিধানের মতো যতীন্দ্রমোহনও ছিলেন কবিবৎসল দেবেন্দ্রনাথের প্রিয়পাত্র।[২]

বর্ধমান জেলার উজানী-নিবাসী শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক অজয়ের তটবর্তী গ্রাম্য প্রকৃতির চির-আসক্ত কবি। মাথ্রুন গ্রামের স্কুলে দীর্ঘকাল শিক্ষকতার পরে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। নগর-জীবনের কোলাহল থেকে দূরে বাস করে, সমকালীন সাহিত্যিক গোষ্ঠীসংস্পর্শের বাইরে থেকে, তিনি তাঁর বৈষ্ণব ও বাউল মনোধর্মের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করেছেন। তবু, সমকালীন সাহিত্য-প্রবাহের কিছু কিছু লক্ষণ তাঁর লেখাতেও দুর্লক্ষ্য নয়।[৩]

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের জন্মস্থান বর্ধমান জেলার পাতিলপাড়া গ্রাম এবং নিবাস ছিলো শান্তিপুরের হরিপুর গ্রাম। ১৮১১ সালে শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে বি, ই, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি যখন কৃষ্ণনগরে জেলা-বোর্ডের অধীনে চাকরি করতেন, সেই সময়ে তাঁর প্রথম কবিতার বই 'মরীচিকা' ছাপা হয়।[৪]

নদীয়া জেলার কাঁচরাপাড়া গ্রামে মাতুলালয়ে মোহিতলাল মজুমদার জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মাতুলবংশ ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জ্ঞাতি; কবি দেবেন্দ্রনাথ সেনের পিতামহ এবং তাঁর প্রপিতামহ ছিলেন সহোদর ভাই। তাঁদের পৈতৃক নিবাস ছিলো হুগলি জেলার বলাগড় গ্রামে। মোহিতলাল নিজে বলেছেন যে, বাংলা সাহিত্যের সেবার ব্যাপারে পিতা নন্দলাল মজুমদারের কাছে তিনি সর্বতোভাবে ঋণী! ১৯০৪-এর প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ১৯০৮ সালে তিনি কলকাতা মেট্রোপলিটন ইনষ্টিটিউশান থেকে বি-এ পাশ

২। যতীন্দ্রমোহন বাগচীর কাব্যগ্রন্থপঞ্জী :—লেখা (১৩১৩), রেখা (১৩১৭), অপরাজিতা (১৩২০), নাগকেশর (১৩২৪), বন্ধুর দান (১৩২৫), জাগরণী (১৩২৯), নীহারিকা (১৩৩৪), মহাভারতী (১৩৪৩), পাঞ্চজন্য (১৩৪৮), কাব্যমালঞ্চ (কবিতা-সংকলন, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৫৭)।

৩। কুমুদরঞ্জনের কাব্যগ্রন্থপঞ্জী :—শতদল, (১৩১৩), বনতুলসী (১৩১৮), উজানি (১৩১৮), একতারা (১৩২১), 'বীথি' এবং 'বীণা' (১৩২৩), বনমল্লিকা (১৩২৬), নূপুর (১৩২৮), রজনী-গন্ধা (১৩২৯), অজয় (১৩৩৪), তূণীর (১৩৩৫) চুণকালি (১৩৩৭), স্বর্ণসন্ধ্যা (১৩৫৫) শ্রেষ্ঠ কবিতা (১৩৬৪)।

৪। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের গ্রন্থপঞ্জী :—মরীচিকা (১৩৩০), মরুশিখা (১৩৩৪), মরুমায়া (১৩৩৭), সায়ম্ (১৩৪৮), ত্রিযামা (১৩৫৫), নিশান্তিকা (১৩৫৯), অনুপূর্বা (কাব্য-সঙ্কলন, ১৩৫৩) ইত্যাদি।

করেন। 'মানসী'-সম্পাদক ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উৎসাহে, কবি ও শিক্ষাব্রতী ডক্টর সুশীলকুমার দের (মোহিতলালের ছাত্রজীবনের বন্ধু) সান্নিধ্যে, 'বীরভূম'-সম্পাদক কুলদাপ্রসাদ মল্লিকের আগ্রহে মোহিতলালের কাব্যচর্চার সূত্রপাত হয়। কলেজ ছাড়ার পরে প্রথমে স্কুলের শিক্ষকতা, তারপর সরকারী জরীপ বিভাগে কানুনগো পদ গ্রহণ করে কলকাতার বাইরে পূর্ববঙ্গে কিছুকাল কাটিয়ে পুনরায় কলকাতায় প্রত্যাবর্তন এবং স্কুলের কাজে পুনর্বহাল,—তারপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা—পর পর এই ছিলো মোহিতলালের কর্মজীবনের প্রধান ক'টি স্তর। সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি ছিলেন বহুকর্মা ব্যক্তি। মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে পরিচয়ের পরে তিনি 'ভারতী' পত্রিকায় লিখতে আরম্ভ করেন।[৫]

শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় বর্ধমান জেলার কড়ুই গ্রামে লোচনদাস ঠাকুরের বংশে জন্মগ্রহণ করেন। কলকাতায় স্কটিশ চার্চ কলেজে ভর্তি হবার পরে তিনি কলকাতার তৎকালীন সাহিত্যিক-সমাজের সংস্পর্শে আসেন। প্রথম বর্ষের 'ভারতবর্ষ' (১৯১৩) পত্রিকায় তাঁর 'বৃন্দাবন অন্ধকার' কবিতাটি ছাপা হবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কবিখ্যাতি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। ভবানীপুর মিত্র ইন্‌স্টিটিউশানে দীর্ঘকাল শিক্ষকতা করে বেশ কিছুদিন হোলো তিনি অবসর গ্রহণ করেছেন।[৬]

বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামের কবি কাজী নজরুল ইসলামের পূর্বপুরুষ ছিলেন পাটনার অধিবাসী। তাঁর পিতা কাজী ফকির আহ্‌মদ ছিলেন সাধক প্রকৃতির লোক। ১৩১৪ সালের চৈত্র মাসে নজরুলের পিতৃবিয়োগ হয়। পিতৃব্য কাজী বজলে করিম সাহেবের উৎসাহে বালক নজরুল উর্দু-ফার্সী মিশেল বাংলায় কবিতা লেখা শুরু করেন এবং গ্রাম্য 'লেটোর' দলে যাত্রাভিনয়ের গান লিখে খ্যাতিলাভ করেন। আসানসোলের এক রুটির দোকানে কাজ করার সময়ে ময়মনসিংহ নিবাসী পুলিশ-সাব-ইন্সপেক্টর কাজী রফিউদ্দীনের

৫। মোহিতলালের কাব্যগ্রন্থ :— দেবেন্দ্র-মঙ্গল স্বপন-পসারী (১৩২৮), বিস্মরণী (১৩৩৩), স্মরগরল (১৩৪৩), হেমন্ত-গোধূলি (১৩৪৮), ছন্দ-চতুর্দশী (১৩৫৮)।

৬। কালিদাস রায় :—কুন্দ (১৩১৫), কিশলয় (১৩১৮), পর্ণপুট-১ম (১৩২১), বল্লরী (১৩২২), ব্রজবেণু (১৩২২), ঋতু-মঙ্গল (১৩২৩), ক্ষুদকুঁড়া (১৩২৯)।

লাজাঞ্জলি (১৩৩১), চিন্তচিন্তা (১৩৩২), রসকদম্ব (১৩৩২), আহরণী (১৩৩৫), হৈমন্তী (১৩৪৩), বৈকালী (১৩৪৫), পর্ণপুট (২য় ভাগ-১৩২৮), ঋতু-মঙ্গল (২য় ভাগ-১৩২৭), আহরণ (অধ্যাপক তারাচরণ বসু সম্পাদিত ; ১৩৫৭), গাথাঞ্জলি (১৩৬৪), সন্ধ্যামণি

চোখে পড়ার ফলে তিনি রফিউদ্দীন সাহেবের স্ব-গ্রাম কাজীর-সিমলায় গিয়ে বছরখানেক দরিরামপুর স্কুলে পড়েছিলেন,—সেখান থেকে ফিরে রাণীগঞ্জের সিয়ারসোল রাজস্কুলে ভর্তি হন। রাণীগঞ্জে তাঁর সহপাঠীদের মধ্যে ছিলেন উত্তর কালের প্রসিদ্ধ লেখক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। ১৯১৭ সালে ৪৯ নম্বর বাঙালি পল্টনে যোগ দিয়ে ১৯১৯ অবধি তিনি সেই কাজে নিযুক্ত ছিলেন। পল্টন ভেঙে যাবার পরে চাকরির সন্ধানে কলকাতায় এসে ৩২ নম্বর কলেজ স্ট্রীটে বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-সমিতির আপিসে মৌলবী মুজফ্ফর আহ্মদ, আফজাল উল্-হক ইত্যাদি গুণগ্রাহী বন্ধুর সঙ্গে তিনি দেখা-সাক্ষাৎ করেন। ১৩২৬ সালের 'সওগাতে' এবং 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-পত্রিকায়' তাঁর গদ্য ও পদ্য দু'রকম লেখাই ছাপা হয়েছিল। ১৩২৮ সালের কার্তিক সংখ্যার 'মোসলেম ভারতে' 'বিদ্রোহী' ও 'কামালপাশা' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাংলার শক্তিমান নবীন কবিদের মধ্যে তাঁর আসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।[৭]

এই সাতজনের মধ্যে করুণানিধান, যতীন্দ্রমোহন, যতীন্দ্রনাথ, মোহিতলাল এবং কালিদাস রায় ছিলেন 'ভারতী'-দলের সঙ্গে অপেক্ষাকৃত নিকট সম্পর্কে জড়িত। অনুসৃত কাব্যাদর্শের বিচারে কুমুদরঞ্জন এবং নজরুল ইসলাম, এঁদের দুজনকে যদিও বলা যায় পৃথক রীতি ও প্রবণতার সাধক, তবু 'ভারতী'-দলের সান্নিধ্য থেকে এঁরা দুজনেই ছিলেন অপেক্ষাকৃত দূরবর্তী। করুণানিধানের স্বপ্নবিলাস যে বিশেষভাবে সত্যেন্দ্রনাথেরই স্মারক, সে-কথা শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন। তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত করুণানিধানের 'শতনরীর' ভূমিকায় বলা হয়েছে—'জাগ্রৎ সক্রিয় সতর্ক দৃষ্টিতে আমরা যে মাধুরী লাভ করি—তাহাতে ক্লান্তি আসিলেই আমাদের অবসন্ন মন কিছুক্ষণ স্বপ্নমাধুরী উপভোগ করিয়া অলস আনন্দ পাইতে চায়। এই স্বপ্নমাধুরী আমরা কাব্যেও পাইতে পারি,—এই মাধুরী প্রধানতঃ 'রূপে' ফুটিয়াছে করুণানিধানের রচনায় আর 'ধ্বনিতে' ফুটিয়াছে সত্যেন্দ্রনাথের

৭। নজরুল ইসলামের কবিতার বই :—অগ্নিবীণা (১৩২৯), দোলন চাঁপা (১৩৩০), প্রলয়-শিখা, বিষের বাঁশী, ভাঙার গান, ছায়ানট (১৩৩১), পূবের হাওয়া চিত্তনামা, সাম্যবাদী (১৩৩২), বুল্‌বুল্ (গান), সর্বহারা, ফণিমনসা, সিন্ধু-হিন্দোল (১৩৩৪), চক্রবাক, সন্ধ্যা, চোখের চাতক (গান), জিঞ্জীর, সাতভাই চম্পা, ঝিঙেফুল (ছোটদের কবিতা ১৩৩৫), চন্দ্রবিন্দু, জুলফিকার (১৩৩৯), বন-গীতি (ঐ) গুলবাগিচা (১৩৪১), গীতিশতদল (ঐ) ইত্যাদি। কাব্যসংকলন—'সঞ্চিতা' (১৩৩৫)। অনুবাদ কাব্য—রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ, কাব্যে আমপারা

কবিতায়।' করুণানিধানের রূপবিলাস, সুরবিলাস, স্বপ্নবিলাসের সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথের 'নীল পরী', 'লাল পরী', 'জর্দা পরী' প্রভৃতি কবিতাগুলির বা ঐ শ্রেণীর অন্যান্য লেখার ধ্বনিগত সাদৃশ্য সহজেই অনুভূত হয়।

রূপের তরী ভাসায় পরী গৌরী চাঁপার রঙ্‌ মেখে,
পদ্ম-গোলাপ নিন্দি পাখা পরিয়েছে তার অঙ্গে কে।
কোন্ মহুয়া-মদির সুরা
পান করে ওই ফুল-বধূরা!
পালিয়ে গেছে প্রাণ-বঁধুয়া বিম্বাধরের দাগ রেখে!

—তন্দ্রাপথে

এরকম ধ্বনিময় ইন্দ্রিয়ানুভূতির অভিব্যক্তি করুণানিধানের বহু রচনায় বর্তমান। মোহিতলাল তাঁর 'ভাষা ও ছন্দের অমোঘ সৌষ্ঠবের' কথা বলেছেন,—'শব্দ ও ছন্দ-গত রূপোল্লাসের'ও উল্লেখ করেছেন।

যতীন্দ্রমোহনের কবিতায় 'পল্লীবাসী খাঁটি বাঙালীর ভাষা' এবং বাংলার গার্হস্থ্য ভাবনা-বাসনার প্রকাশ, দুইই দেখা যায়।

ভাদর আসে মরা গাঙে ভরা বন্যা নিয়ে—
রাঙা জলে এপার ওপার একসা করে দিয়ে
লগির গোড়া পায় না তলা, মিলে না আর থই,
দিনে রাতে তবু আমার কাজের ছুটি কই।
হঠাৎ যেদিন বানের জলে ছাপিয়ে উঠে মাঠ,
হাঁটু নাগাল ধানের জমি, গলা-নাগাল পাট,
কানাকানি বানের জলে ধানের আগা দোলে,
টলমলিয়ে ডিঙা আমার চলে তারি কোলে।

—খেয়া-ডিঙি

করুণানিধানের সঙ্গে যতীন্দ্রমোহনের কবিপ্রকৃতির সাদৃশ্য আছে শব্দে, ছন্দে, রূপানুভূতিতে। সত্যেন্দ্রনাথের শব্দ ও ছন্দের স্পর্শকাতরতার লক্ষণ এঁদের দুজনের লেখাতেই সুস্পষ্ট। এই সূত্রে যতীন্দ্রমোহনের গম্ভীর সুরের নিসর্গ-বন্দনার একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে—

শরাস্তৃত সরোবর ; তীরে তীরে তারি তালীবনশ্রেণী ;
শ্যামল-সরসী-শিরে পদ্ম-বিভূষণা শৈবালের বেণী।

—সরোবরে সন্ধ্যা

এই ধ্বনিতরঙ্গের সঙ্গে করুণানিধানের 'রেবা'র সাদৃশ্য স্মরণ করা অসংগত হবে না—

জল-বেণী-রম্যা রেবা হিল্লোলিয়া বরকান্তি উন্মাদিনী প্রায়,
অরণ্য-নেপথ্য-পথে তরঙ্গিছে শিলাঙ্গনে তুরন্ত ধারায় ;
কুন্দবর্ণ বারি-ধূমে আবরি' সীমান্ত-বাস ধায় আত্মহারা—
কবে তুমি হে নর্মদা ! বিদারিলে মন্ত্রবলে মর্মরের কারা ?

—রেবা

পূর্বোক্ত দু'জনের মতো কুমুদরঞ্জনও পল্লী-প্রকৃতির কবিতা লিখেছেন। কিন্তু এদিকে তাঁর একাগ্রতা আরো বেশি। সমকালীন এই সাতজনের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথের প্রভাব থেকে তিনিই বোধ হয় সর্বাধিক মুক্ত থাকবার চেষ্টা করেছেন। শব্দে এবং ছন্দে বিশেষ এক রকম অমসৃণতার আতিশয্যই তাঁর কবিতার বিশেষত্ব। যতীন্দ্রমোহনের 'ঝরণা ঝারা'-তে ('নীহারিকা') সত্যেন্দ্রনাথের প্রভাব চোখে পড়ে; তাঁর 'অপরাজিতা' (১৩২০) গ্রন্থ-নামেতেও সত্যেন্দ্রনাথের 'ফুলের ফসল' এর নামের কিঞ্চিৎ প্রভাব অনুমান করা যায়। হয়তো সত্যেন্দ্রনাথের কবিতা থেকে প্রেরণা পেয়েই তিনি 'চরকার সংগীত' (প্রথম প্রকাশ: 'যমুনা' অগ্রহায়ণ, ১৩২৮) লিখেছিলেন। কিন্তু কুমুদরঞ্জন অপেক্ষাকৃত স্বাধীন, স্বত্ববান কবি। তাঁর কবিকর্মের বিশেষত্ব দেখা যায় তাঁর উপমার সারল্যে, অসংবৃত ভাষায় দীপ্যমান উদাসীন চিত্রকল্পের সিঞ্চনে।

জানি, তুমি সব গুণরাশিনাশী,
সকল শক্তিহরা
করঙ্গ তব দুখীর রক্ত
আঁখির সলিলে ভরা।

—অজয়

—দারিদ্র্যের এই মূর্তি কল্পনার মধ্যে কুমুদরঞ্জনের বিশিষ্ট সাদৃশ্য-পর্যবেক্ষণের দৃষ্টান্ত আছে। কিন্তু সত্যেন্দ্রীয় ছন্দ-চেতনার অনুসৃতি তাঁর লেখাতে যে আদৌ না পাওয়া যায়, এমন নয়। কুমুদরঞ্জনের অপেক্ষাকৃত পরবর্তী লেখা থেকে নিচে এরকম একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হোলো—

তোমাদের আচরণে দোষ দেব না,
করনা পছন্দ যে নিষ্ঠাপনা।

বায়ুর মতন ঠিক মন চঞ্চল,
কোন্ ফুল ভর গিয়া কার অঞ্চল,
নিজেরা নিজেকে ভাব ডেস্‌ডেমোনা।

—পথভ্রষ্টা : শনিবারের চিঠি, শ্রাবণ, ১৩৪৩

কুমুদরঞ্জনের মসৃণ ছন্দ-সামর্থ্যের আর একটি দৃষ্টান্ত—

অজয়ের বুকে চলে লহরীর নর্তন,
হয় নাই পৃথিবীর কোন পরিবর্তন।
আমারি সে দিন গেছে—গেছে দিন ফুরায়ে,
পুলকের উষ্ণতা সব গেছে জুড়ায়ে।

—(অবেলায়) স্বর্ণসন্ধ্যা

অধ্যাপক তারাচরণ বসু শ্রীযুক্ত কালিদাস রায়ের কাব্যসঞ্চয়নের ভূমিকায় মোহিতলালের যে মন্তব্যটি স্মরণ করেছেন, তা'তে তাঁর ছন্দোনৈপুণ্যের কথাই বিশেষভাবে স্বীকার করা হয়েছে। সম্পাদক স্বয়ং তাঁর ক্লাসিক্যাল ও রোমান্টিক উভয় ভঙ্গির উল্লেখ করে, প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতি এবং বাংলার সমাজ ও প্রকৃতি, এই দুটি প্রধান প্রসঙ্গের অতিরিক্ত সূক্তিমূলক, ব্যঙ্গমূলক, নীতিমূলক ইত্যাদি আরো কয়েকটি কাব্যশাখার উল্লেখ করেছেন। সত্যেন্দ্রনাথের অনুসরণকারী কবিদের মধ্যে তাঁরও নাম স্মরণীয়।

ধারা-যন্ত্রের ঝর্ঝর নাদে চর্চ্চরী তালে নূপুর রবে
বেণু বীণা-তানে, শুকপিক-গানে ধরা ভরা আজি মধুৎসবে
সীৎকার তুলে "শৃঙ্গক"-ফণা মণিমণ্ডিত নাগরী-করে,
আবীরে-আঁধার পুর-চত্বর ভুজগ-পুরীর রূপটি ধরে।

—প্রাচীন কবিদের বসন্ত (ঋতুমঙ্গল)

এসো— গিরিদরী ভরি থর ঝরণারি হর্ষে,
অনারত ঝর ঝর প্রাণরস বর্ষে,
ধূসরে শ্যামল করি ও-চরণ স্পর্শে;
আর— অমল কমল দলে ভরি ধরণী!

এসো— পুলকিত পল্লীর খল খল হাস্তে
হরষিত কৃষাণীর চল চল আস্তে
চপলায় চমকিত আলোকিত লাস্তে,
অই— ঘন ঘন মুখরিত তব সরণী।

—বর্ষা বরণ (ঐ)

সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যাদর্শের প্রতি অনুরাগের লক্ষণ দুটি দৃষ্টান্তেই সুপ্রকাশ। ধ্বনিময়, অচলিত, স্ব-প্রণীত, সমাসবদ্ধ, গ্রাম্য, অনেক রকম শব্দ প্রয়োগের দিকে শ্রীযুক্ত কালিদাস রায়ের আগ্রহ চোখে পড়ে। ইতিহাস ও পুরাণকথার উল্লেখ, প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্য নানা কবির কাব্যপাঠের ফলে কবিকর্মের বিচিত্র অন্বেষণ, অনুবাদের উল্লেখযোগ্য প্রয়াস, এ সবই তাঁর রচনায় বর্তমান।

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, মোহিতলাল মজুমদার এবং কাজী নজরুল ইস্‌লাম, —এই তিনজনের কবিকর্ম ও কাব্যাদর্শ সম্পর্কে বর্তমান অধ্যায়ের অতি সংকীর্ণ পরিসরে অত্যাবশ্যক তথ্যগুলির কেবলমাত্র উল্লেখও দুঃসাধ্য। রবীন্দ্র-যুগের বাংলা সাহিত্যের ধারায় সত্যেন্দ্রনাথের সমকালীন এই তিনজনের প্রত্যেকেই বিশিষ্ট কবিধর্মের এবং পৃথক পৃথক মননাদর্শের স্বাক্ষর রেখেছেন।

'ভারতী', 'প্রবাসী', 'বীরভূম' প্রভৃতি পত্রিকায় প্রথম কাব্যরচনার সময়ে মোহিতলাল সজ্ঞানে রবীন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথের অনুসরণ করেছিলেন বটে, কিন্তু দীর্ঘ সাধনার একাগ্রতার মধ্য দিয়েই তিনি পেয়েছিলেন আপন ব্যক্তিত্বের সাক্ষাৎ। তাঁর প্রথম যুগের গঠন-পর্বের লেখায় সত্যেন্দ্রনাথের ধ্বনিপ্রীতি, শব্দলোলুপতা, ইতিহাস-আসক্তির প্রভাব আছে। 'বিস্মরণী'র 'ঘুঘুর ডাক', 'বাদল রাতের গান' প্রভৃতি কবিতায় তাঁর এই ধ্বনিপ্রীতির চিহ্ন সুস্পষ্ট। 'কন্যা-শরৎ' থেকে এ-রকম একটি স্তবক এখানে ছাপা হোলো—

দোপাটি ফুল—চুট্‌কি পায়ের,
সন্ধ্যামণির নাকছাবি,
গোট পরেছে অপ্‌রাজিতার
কুন্দকলির সাতনরী-হার,
আঁচল খুঁটে রিংটা ভরা
কৃষ্ণকলির লাখচাবি!

'নুরজাহান ও জাহাঙ্গীর'-এ এবং এই শ্রেণীর প্রসিদ্ধ আর কয়েকটি

লেখায় সত্যেন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ-চিন্তার সাদৃশ্য আছে বটে, কিন্তু মোহিতলালের মনন ও কল্পনার স্বকীয়তা সে সব রচনাতে নিঃসন্দেহে বর্তমান। সাহিত্যের নানা প্রসঙ্গে গভীর চিন্তাপ্রসূত যে প্রবন্ধগুলি নবকুমার কবিরত্ন লিখে গেছেন, মোহিতলাল যেন সেই ধারাটিকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথের সমকালীন যে সাতজন কবির কথা এখানে বলা হোলো, তাঁদের মধ্যে প্রধানতঃ মোহিতলাল এবং কালিদাস রায়ের সাহিত্য-প্রবন্ধগুলিতেই নবকুমার-প্রবর্তিত (বলা বাহুল্য, এ ধারাও রবীন্দ্র-প্রদর্শিত) এই বিশেষ ধারাটি অনুবাহিত হয়েছে।

বাংলার সাহিত্য-ক্ষেত্রে নতুন এক ভাব-স্ফুরণের সন্ধিতে যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এবং কাজী নজরুল ইসলাম, উভয়েই কবিতা লেখা শুরু করেছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথের ধ্বনিবিলাসের ঝোঁকটি কিছু পরিমাণে আত্মসাৎ করে উচ্ছ্বাসময় শব্দতরঙ্গের বাহনে নজরুল তাঁর অদম্য, স্বতঃস্ফূর্ত বিপ্লব-কথা প্রকাশ করলেন। আর, সত্যেন্দ্রনাথের বিরল-শ্রব্য নৈরাশ্য ও দুঃখবাদের ক্রমশঃ প্রসার দেখা গেল যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের লেখার মধ্যে। সত্যেন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—

জীবন কুস্বপন—জনম ভুল!
চলেছি ভেসে ভেসে স্রোতের ফুল।
বুঝি মরণ সনে,—
মরিতে ক্ষণে ক্ষণে,
না পাই তল কিবা না পাই কূল!

—ফুলের ফসল

তাঁর এই উক্তি দেখে স্বভাবতই মনে পড়ে যে অক্ষয়কুমার বড়াল্ই ছিলেন এরকম নৈরাশ্যের প্রসিদ্ধ কবি। সত্যেন্দ্রনাথের মধ্যে তাঁরই প্রতিধ্বনি শোনা গিয়েছিল। তারপর, যতীন্দ্রনাথ এসে লিখলেন—

শিখায় শিখায় হেরি তব রূপ, রূপে রূপে তব শিখা,
তৃষিত মরুর নীরস অধরে তুমি ধরো মরীচিকা।
নিখিল বিশ্বে খুঁজে ফিরি তোমা যত পতঙ্গ সবে,
হে-বৈশ্বানর, অবিনশ্বর ভস্মে শান্তি লভে।

১৩১৭ থেকে ১৩২৯ সালের মধ্যে লেখা যতীন্দ্রনাথের 'মরীচিকা'র কয়েকটি কবিতায় সত্যেন্দ্রীয় শব্দ-সন্ধানের সাদৃশ্য দেখা যায়। তা'ছাড়া কবিতার স্তবক-বন্ধনে, ভাবচ্ছেদ-পরিকল্পনায় (সত্যেন্দ্রনাথের 'মহানামন' এবং যতীন্দ্রনাথের 'ঘুমের ঘোরে' তুলনীয়) এবং ছন্দসৌষম্যে মোহিতলালের মতন সে যুগে তিনিও ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথের অনুসরণকারী কবি।

১৩২৭ সালের বৈশাখ সংখ্যার 'মোসলেম ভারত' পত্রিকায় কাজী নজরুল ইসলামের 'বাঁধনহারা' (পত্রোপন্যাস) ছাপা শুরু হয়। 'ভারতের সাধারণ ভাষা' সম্বন্ধে ঐ সংখ্যাতেই অধ্যাপক মুহম্মদ শহীদুল্লাহ প্রভৃতি কয়েকজনের প্রবন্ধাদি বেরিয়েছিল এবং 'মোস্‌লেম ভারত' নামে একটি কবিতায় শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক লিখেছিলেন—

ফেলবো ভাবার তাজমহলে
আরব উষার সূর্যকর!

বাংলা কবিতার ভাষায় হিন্দী-ফার্সী শব্দের প্লাবন এনেছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে, আধুনিক কালে সত্যেন্দ্র নাথই ছিলেন এ পথের প্রথম পথিক।

নজরুলের প্রভাবে এবং সমকালীন মুসলমান সাহিত্যিকদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে কুমুদরঞ্জন 'আরব উষার সূর্যকর'-এর কথা স্মরণ করেছিলেন! কিন্তু মোহিতলাল প্রেরণা পেয়েছিলেন সাক্ষাৎ সত্যেন্দ্রনাথেরই কবিতা থেকে। নজরুলও কতকটা তাঁরই কাছে ঋণী। রবীন্দ্রনাথের পরে দ্বিজেন্দ্রলাল এবং সত্যেন্দ্রনাথের প্রভাবই ছিল সে যুগের বাংলা কবিতার ব্যাপকতম যুগাদর্শ। 'মোসলেম ভারতে'র দ্বিতীয় সংখ্যায় (জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৭) নজরুলের 'বোধন' কবিতায় হাফিজের লেখা একটি গজলের অনুসৃতিতে দ্বিজেন্দ্রলালের সুরের প্রতিধ্বনি শোনা গেল। তারপর তৃতীয় সংখ্যায় হাফিজের ছন্দ ও ভাব অবলম্বন করে নজরুল লিখলেন—

বাদ্‌লা কালো স্নিগ্ধ আমার কান্ত এলো রিম্‌ঝিমিয়ে
বৃষ্টিতে তার বাজলো নূপুর পায়জোরেরই শিঞ্জিনী যে।
ফুট্‌লো উষার মুখটি অরুণ, ছাইল বাদল তাম্বুধরায়;
জম্‌লো আসর বর্ষা-বাসর, লাও সাকী লাও ভর্‌-পিয়ালায়!

'রিম্‌ঝিমিয়ে'-র সঙ্গে 'শিঞ্জিনী বে'-র এই অনুপ্রাস দেখে মোহিতলাল মুগ্ধ হয়েছিলেন। ক্রমে নজরুলের আরো অনেক লেখাতেই এই ধরনের চমকপ্রদ অনুপ্রাসের প্রাচুর্য দেখা গেল।

সত্যেন্দ্রনাথের মতন নজরুলও শব্দানুরাগী কবি। তবে, তাঁর ছন্দের অভিনবত্ব সত্যেন্দ্রনাথের মতন প্রভূত অনুশীলনের ফল নয়। সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন বিদ্বান, শান্তস্বভাব, মস্তিষ্কপ্রধান; নজরুল বিদ্যানুরাগী, চঞ্চল, হৃদয়প্রধান! তবু সত্যেন্দ্রনাথের কবিতা সম্বন্ধে নজরুলের অন্তরের আসক্তি ছিল। একাধিক উৎপ্রেক্ষার অনুগমন, পুরাণের বহুল উল্লেখ, নিপীড়িত গণচিত্তের প্রতি সহানুভূতি, এইসব লক্ষণ উভয়ের কবিতাতেই বর্তমান। সত্যেন্দ্রনাথ প্রবর্তক। নজরুল অনুসরণকারী। শব্দ এবং ছন্দের আগ্রহের দিক থেকে তো বটেই, তা' ছাড়া সত্যেন্দ্র-সাদৃশ্যের আরো অনেক চিহ্ন রয়েছে 'নজরুলের কাব্যে। নজরুলের এক শ্রেণীর কবিতা পড়তে পড়তে সত্যেন্দ্রনাথের তথ্যগত বিচিত্রতা, প্রসঙ্গগত প্রাচুর্য, পুরাণাদির উল্লেখ এবং আরো নানা বিশিষ্টতার কথাই বিশেষভাবে মনে পড়ে।

শব্দসূচী ও প্রসঙ্গসংকেত

তৎসম, তদ্ভব, দেশি, বিদেশি, ধ্বন্যাত্মক এবং স্ব-নির্মিত বিচিত্র শব্দের ব্যবহার সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কাব্যপ্রবাহের 'বিকাশ' ও 'সমৃদ্ধি-পর্বের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে অন্যতম। বিশেষতঃ দেশি আর তদ্ভব শব্দের দিকেই তাঁর বেশি আগ্রহ ছিল। ইতিহাস, পুরাণ, দর্শন ইত্যাদি নানা ক্ষেত্রে অবাধ বিচরণের ফলে তাঁর কবিকর্মের মধ্যে বহুতথ্যাধিকারী সংগ্রাহকের নৈপুণ্য অপ্রকাশিত থাকেনি। এই কারণেই সত্যেন্দ্র-কাব্যের সাধারণ পাঠকের পক্ষে শব্দগত বাধার অভিজ্ঞতা বিরল নয়।

কবিতার প্রসঙ্গ নির্বাচনে পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, দেশি, বিদেশি এবং তদানীন্তন সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর দিকে তাঁর অনুরূপ আগ্রহের ফলে সাধারণ কাব্য-পাঠকের পক্ষে সে দিকেও কিছু অন্তরায় দেখা দিয়েছে। দুরূহ বা দুর্বোধ্য শব্দ সম্বন্ধে যেমন, প্রসঙ্গ সম্বন্ধেও তেমনি, বিস্তারিত ব্যাখ্যা-সমন্বিত একটি তালিকা তৈরি করা বিশেষ দরকার। বলা বাহুল্য, সেরকম পূর্ণাঙ্গ সূচী প্রণয়ন করা বর্তমান অধ্যায়ের লক্ষ্য নয়। সেজন্যে আরো বড়ো জায়গা দরকার। সত্যেন্দ্রনাথের কবিতাবলীর অর্থোদ্ধার করবার আগ্রহ নিয়ে তাঁর অনুরাগী পাঠকদের পক্ষ থেকে এইরকম একটি অভিধান সম্পাদিত হলে ভালো হয়।

তাঁর গ্রন্থভুক্ত বিভিন্ন কবিতার মধ্যে ব্যবহৃত অল্প-প্রচলিত কয়েকটি শব্দের সূচী এবং সংক্ষিপ্ত টীকা এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে কোনো কোনো কবিতার প্রসঙ্গের সংকেত বর্ণানুক্রমিক ভাবে নিচে ছাপা হোলো:

[প্রথমে শব্দটি, তারপর ঐ শব্দের উৎস-কবিতার নাম, তারপর ঐ কবিতার গ্রন্থ-নাম (যেমন, 'অভ্র-আবীর'-এর জন্য 'অ-আ'), এবং সর্বশেষে অর্থোল্লেখ— এই রীতি অনুসারে এখানে শব্দগুলি সাজানো হয়েছে। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে বন্ধনী-চিহ্নের মধ্যে আ, ই, তু, ফা, সং, হি, এই রকম কোনো একটি সংকেতের সাহায্যে ঐ শব্দের মূল ভাষার উল্লেখ করা হয়েছে। একাধিক কবিতায় ব্যবহৃত একই শব্দের পাশে একটি মাত্র কবিতার নামই ছাপা হয়েছে।]

এই তালিকায় ব্যবহৃত চিহ্নাদির ব্যাখ্যা :

অ-আ—অভ্র-আবীর	বি আ—বিদায়-আরতি	ইং—ইংরেজি
কু-কে—কুহু ও কেকা	বে-বী—বেণু ও বীণা	আ—আরবী
তী-রে—তীর্থরেণু	বে-শে-গা—বেলা-শেষের গান	তু—তুর্কী
তী-স—তীর্থসলিল	ম-ম—মণিমঞ্জুষা	ফা—ফার্শি
তু-লি—তুলির লিখন	শি-ক—শিশু কবিতা	সং—সংস্কৃত
ফু-ফ—ফুলের ফসল	হ—হসন্তিকা	হি—হিন্দি
	হো-শি—হোমশিখা	

অ—হ এই গ্রন্থের ১৯৮-এর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

অঞ্চিত—('পুলক-অঞ্চিত') কেলি-কদম্ব : ফু-ফ ভূষিত, পূজিত [সং]।

অক্ষয়—স্বাগত : অ-আ অক্ষয়কুমার দত্ত।

অগ্নিহোত্রী—বারাণসী : কু-কে বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড অনুসারে যাঁরা অগ্নিতে হোম করেন।

অঢেল—ঘুমতী নদী : বি-আ 'আঢেল' প্রচুর।

অতীশ—আমরা : কু-কে বিক্রমপুর-নিবাসী বাঙালি পণ্ডিত দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশ ১০৪২ খ্রীষ্টাব্দে তিব্বতে গিয়ে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেছিলেন।

অথর্ব্বন্—বাজশ্রবা : তু-লি ভৃগুর নামান্তর।

অনূরু—স্বাগত : অ-আ অরুণের নামান্তর, অপ্রাপ্তকালে জন্মবশতঃ তাঁর নিম্নাঙ্গ পরিণত হয়নি; সূর্য-সারথি।

অবনী-গগন-অসিত-মুকুল-নন্দলাল — স্বাগত : অ-আ অবনীন্দ্রনাথ ও গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অসিতকুমার হালদার, মুকুল দে ও নন্দলাল বসু।

অমর সিংহ—নাপ্পি-পীরিতি-কথা : বে-শে-গা সংস্কৃত অভিধান 'অমর-কোষ-প্রণেতা।

অম্বা—মৃত্যুস্বয়ম্বর : অ-আ কাশীরাজের জ্যেষ্ঠা কন্যা।

অল্‌গজালি—ঘুমতী নদী : বি-আ গজলগীতিকার।

অশরণ—সুশ্বেতা : বে-শে-গা নাই শরণ (আশ্রয়) যার; অসহায়। তুলনীয় :—'সঞ্জীবনী সুধা এনেছে অশরণ লাগি রে'—রজনীকান্ত সেন।

অস্তি—মহাসরস্বতী : জরাসন্ধের কন্যা ও কংসের পত্নী। ঊর্ধ্বকমা-চিহ্নিত 'অস্তি' নহ, 'প্রাপ্তি' নহ উক্তিটি অর্থের দিক থেকে কিঞ্চিৎ অস্পষ্ট। এখানে, থাকা বা পাওয়া নও,—তুমি 'দৈবী অসন্তোষ', বোধ হয়, কবির এই মন্তব্যই উচ্চারিত হয়েছে।

অসেচ হরষ—লীলাকমল : কু-ক [সং] যে হর্ষ সেচন করা যায় না।

অস্বরস—দুর্ভাগা : তু-লি স্বরস—স্বেচ্ছা ; অ-স্বরস—স্বেচ্ছার অভাব ; 'অসার' অর্থে।

আউল—বনমানুষের হাড় : অ-আ উচ্ছৃঙ্খল।

আওড়—পরীর মায়া : ম-ম নৃত্যের ঘূর্ণি।

আওতা—সবুজ পরী : অ-আ ছায়া।

আখেরী—ঐ : বে-শে-গা [আ 'আখির'] 'অন্তিম'।

আঙ্‌রা ঝুরো—ঘুমতী নদী : বি-আ [সং অঙ্গার+চূর্ণ]।

আঙার-ধানী—বজ্রকামনা : কু-কে [সং অঙ্গারধানী] ধুনুচী।

আঙিয়া—রাজবন্দিনী : তু-লি [হি আঙিয়া] কাঁচুলি।

আচম্‌কা—কাগজের হাতী : বে-শে-গা [হি 'আচম্ভা'] হঠাৎ।

আচোট—ডালিম ফুল : শি-ক [আ-বিনা ; চোট—আঘাত] অনাহত।

আজ্যপা—বাজশ্রবা : তু-লি হবি-পানকারী পুলস্ত্যসন্তান। উষ্মপা, আজ্যপা, সোমপা, বর্হিষদ্‌, সুকালীন ও সৌম্য—এঁরা দিব্যপিতৃগণ বলে পরিচিত। তর্পণের সময়ে এঁদের উদ্দেশ্যে তর্পণ করা হয়। এঁরা সকলেই প্রজাপতি প্রাচীনবর্হির সন্তান।

আড়—জীর্ণপর্ণ : বে-বী [সং অন্তরাল] আড়াল।

আড়কাটি—ইজ্জতের জন্ম, অ-আ [ইং recruiter]।

আড়-বাড়—ইন্দ্রজাল : অ-আ [আড়—প্রস্থ ; বাড়—দৈর্ঘ্য]।

আড়া [পাল্কী-আড়ায়]—রাত্রিবর্ণনা : হ অন্তরালে, পাল্কীর দণ্ড (?)।

আড়ির মতই আড়—বনমানুষের হাড় : অ-আ স্বভাব-বক্র (?)।

আঢ়ক—পুরীর চিঠি : অ-আ—পালি বা শমীধান্য।

আদ্‌রা—যশ্‌মস্তু : তু-লি সাদৃশ্য।

আদুল—কুঙ্কুম পঞ্চাশৎ : অ-আ [সং উদার] নগ্ন।

আদেখ্‌লে—উড়ো-জাহাজ : বে-শে-গা দেখবার জন্যে যে অতিশয় ব্যগ্র।

আন্‌কো আলো—সর্বজয়া : শি-ক [সং অনীক্ষিত] অভিনব আলো।

আনার—জাফ্‌রানিস্থান : বি-আ [ফা] ডালিম।

আফসানিয়া কাগজ—যশ্‌মস্তু : তু-লি [ফা] চিত্র রচনার সূক্ষ্ম কাগজ।

আফ্‌সায়—ঘুম-গুম্ফায় : বে-শে-গা [ফা] জল ছিটায়।

আফ্‌সে—নেই ঘরের ঘুম পাড়ানি : শি-ক [ফা] ক্রোধে বা নৈরাশ্যে নিষ্পেষিত হয়ে।

আফুলো—ধানের মঞ্জরী : শি-ক পুষ্পহীন।

আব্‌খোরা—পুরীর চিঠি : অ-আ [ফা] জলপাত্রবিশেষ।

আব্‌ডালে—কবর-ই-নুরজাহান : অ-আ অন্তরালে।

আবরুয়া—চরকার আরতি : বে-শে-গা জলধারার ন্যায় সূক্ষ্ম মসলিন।

আলুনি—আদর্শ বিয়ের কবিতা : হ লবণহীন।

আয়সী—উড়ো-জাহাজ : বে-শে-গা [সং আয়স্] লৌহনির্মিত। তুলনীয় : 'আয়সী আবৃত দেহ আইল কাতরে' —মেঘনাদবধ কাব্য।

আর্য্যী—যশ্‌মস্ত্‌ : তু-লি [সং আর্যিকা] মাননীয়া মহিলা।

ইজ্জতের জন্ম—অ-আ এই গ্রন্থের পৃঃ ১৭১ দ্রষ্টব্য। দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহের স্মারক।

ইভরদ—গঙ্গাহৃদি বঙ্গভূমি : অ-আ গজদন্ত।

ইয়ার—মুমূর্ষু তাতার সিপাহীর গান : তী-স (ফা) বয়স্য।

ইলম্—৺গোখ্‌লে : অ-আ [আ] বিদ্যা।

ইলাহি—যশ্‌মস্ত্‌ : তু-লি [আ] উচ্চ, মহান্।

ইস্তক—পুরীর চিঠি : অ-আ [হি] পর্যন্ত।

উছট—দোসর : অ-আ হোঁচট।

উঞ্ছ—অঞ্জলি : অ-আ ভূমিতে বিকীর্ণ ধান্যাদি ফসল।

উড়প—পরিব্রাজক : তু-লি [সং] ভেলা।

উথলাতে—সরযূ : বে-শে-গা বেগে ফুলাইতে।

উদয়-সৌরী—শবাসীন : তু-লি উপাসক সম্প্রদায়-বিশেষ।

উদলা—দোসর : অ-আ উলঙ্গ। তুলনীয় : 'তোমার কেবল ঘোমটা খুলে উদলা করে ফেলা'—'কস্তুরী' : গোবিন্দ দাস।

উদ্গাতা—বাজশ্রবা : তু-লি সামবেদ-গায়ক। হোতা, উদ্গাতা, পোতা, নেষ্টা—এঁরা সকলেই বৈদিক যজ্ঞের ঋত্বিক। পোতা, নেষ্টা প্রভৃতি হোতা, উদ্গাতা ও অধ্বর্যুর সহকারী।

উদ্বেজনা—প্রভাতের নিবেদন : কু-কে চিত্তচাঞ্চল্য।

উপশিরে—মল্লিকুমারী, বি-আ উপশিরায়।

উপসম্পদা—পরিব্রাজক : তু-লি বৌদ্ধ-মতে দীক্ষা।

উরুনাসা—বাজশ্রবা : তু-লি [সং উ রুণস) দীর্ঘ নাসা যার।

উল্‌তে—নষ্টোদ্ধার : কু-কে অবতরণ করতে।

উলসিয়ে-বিলসিয়ে—কয়েকটি গান : বে-শে-গা [সং উল্লসতি বিলসতি]।

উষ্মপা—'আজ্যপা' দ্রষ্টব্য।

একজাই—ঘুমতী নদী : বি-আ

অবিরাম। 'চরকার গান' কবিতাতেও এই অর্থে ব্যবহৃত।

একৃশা—নেই ঘরের ঘুম পাড়ানি: শি-ক [হি] একাকার।

'এজু'-র দল—মদিরা মঙ্গল: হ [ইং educated-এর দল]।

এড়ি—যশমস্ত: তু-লি ত্যাগ করে।

এলে—নেই ঘরের ঘুম পাড়ানি: শি-ক আলুলায়িত বা শিথিল করে।

এলেক—শ্রীশ্রীটিকি মঙ্গল: হ টাকা, কাহন ইত্যাদির চিহ্ন।

এয়োৎ-রেখা—সতী: তু-লি [সং অবিধবা] [এয়ো] সধবার চিহ্ন।

এঁচে—সাল-পহেলী: বে-শে-গা আন্দাজ বা অনুমান করে।

ওক্ত—নেই ঘরের ঘুম পাড়ানি: শি-ক [ফা] সময়।

ওড়ন—হেমন্তে: ফু-ফ ওড়না।

ওলোন—নষ্টোদ্ধার: কু-কে [সং অবতরণ; সং অবলম্বন] লম্বরেখা। নির্ণয়ের জন্যে ব্যবহৃত নিচে ভার বাঁধা সুতোকে ওলনদড়ি বলে।

কম্বক্তা—অম্বল-সম্বরা কাব্য: হ [ফা-কম্‌বখ্‌ৎ] হতভাগ্য।

কমী—দুর্ভাগ্য: তু-লি অল্পতা।

কর্ক'রী—আশার কথা: বে-বী জলপাত্রবিশেষ, বৈদিক বীণাযন্ত্র-বিশেষ।

কর্ণ-শিবি—ইজ্জতের জন্ত: অ-আ অঙ্গরাজ কর্ণ ও উশীনররাজ শিবি। শিবি যুধিষ্ঠির প্রভৃতির চেয়ে অনেক প্রাচীন। তাঁর দানশীলতার কাহিনী সুবিদিত।

কদ্রু—প্রজাপতি দক্ষের কন্যা ও মহর্ষি কশ্যপের পত্নী এবং নাগজননী।

কপিল-গুহা—গঙ্গাসাগর-সঙ্গমের কাছে কপিল মুনির তপস্যার স্থান।

কলমগীর—গুরু দরবার: অ-আ [আ 'কলমা' ইষ্টমন্ত্র] দীক্ষাগুরু অর্থে।

কস্‌কসানি—নেই ঘরের ঘুম পাড়ানি: শি-ক আক্রোশ, প্রতিহিংসা, ক্রোধের ভাব।

কহ্লন—গঙ্গাহৃদি বঙ্গভূমি: অ-আ কাশ্মীরের রাজবংশের ইতিহাস-প্রণেতা।

কয়াধু—ঐ: কু-কে জম্ভাসুরের কন্যা, হিরণ্যকশিপুর ভার্যা, প্রহ্লাদের জননী।

কাংড়ি-জাফ্‌রানিস্থান: বি-আ অগ্নিপাত্র।

কাঞ—হরফ রিপাব্লিক: হ-[কাঁই]।

কাগজের হাতী—বে-শে-গা আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল সম্পর্কে কটাক্ষ।

কাজিয়ে—আদর্শ বিয়ের কবিতা: হ [আ] ঝগড়া।

কানাচ—অনার্যা: তু-লি ঘরের চালের কিনারা; নিকট; অন্তরাল।

কানাৎ—চিত্র-শরৎ: অ-আ [তু] তাঁবু।

কান্ত-লোহা—ইন্দ্রজাল : অ-আ বিশুদ্ধ লোহা বা ইস্পাত।

কাপ—পরেয়া : তু-লি ছলনা। তুলনীয় : 'লোকে বলে পাপ তাপ কদিন লুকায়'—ভারতচন্দ্র।

কার্ব্বা—সাঁঝাই : বে-শে-গা [ফা] গোলাবপাশ।

কাল-ভৈরো—শবাসীন : তু-লি শিবের অংশজাত ভৈরব বিশেষ।

কালসার—অনার্যা : তু-লি কৃষ্ণসার মৃগ।

কালাপাহাড়—বনমানুষের হাড় : অ-আ ষোড়শ শতকের সুলেমান কররানির অধীনস্থ বিখ্যাত সেনাপতি ও হিন্দু-বিদ্বেষী অত্যাচারী মুসলমান দস্যু।

কাশী-নরেশের কন্যারা—বারাণসী : কু-কে অম্বা, অম্বিকা, অম্বালিকা।

কাঁচকড়া—যশ্‌মন্ত্‌ : তু-লি vulcanite।

কিম্মৎ—কালীপ্রসন্ন সিংহ : অ-আ [আ] মূল্য।

কিষণকুঁয়ার—মৃত্যু-স্বয়ম্বর : অ-আ কৃষ্ণকুমারী।

কীলিকা-প্রয়োগ কল—'কীলিকা' মানে ছোটো কীলক ; ছোটো যন্ত্র বিশেষের অঙ্গ অর্থে ব্যবহার ?

কুট্টি-চাতুরী—যারা দূতীর কাজ করে চরিত্রভ্রংশ ঘটায়, তাদের কুট্টনী বা কুট্টিনী বলে। কুট্টনীসুলভ চাতুর্য অর্থে প্রয়োগ।

কুদ্‌রৎ—হরফ্‌-রিপারিক : হ [আ] সামর্থ্য।

কুরকুট্টি—শিল : শি-ক [ধ্বন্যাত্মক শব্দ] গভীর কালো অর্থে।

কুর্শী—শিরাজ-ই-হিন্দ্‌, বে-শে-গা [আ] chair।

কেতা দুরন্ত—প্রেম ও গৌরব : তী-স (আ) কায়দামতো।

কোঙার—হরফ-রিপারিক : হ [সং কুমার]।

কোট—দুর্ভাগা : তু-লি [সং কোট্ট-দুর্গ] অধিকার।

কোট-কেরল—শিরাজ-ই-হিন্দ্‌, বে-শে-গা : মালাবার দুর্গ (?)।

কোড়া—কয়াধু : বি-আ চাবুক, বেত।

কোথি—শ্রীশ্রীটিকিমঙ্গল : হ 'কোথাও' অর্থে।

কৌশিক—মহাসরস্বতী : অ-আ বিশ্বামিত্র।

কৃষ্ণদাসের—স্বাগত : অ-আ কৃষ্ণদাস পালের।

ক্রব্যাদ—বাজশ্রবা : তু-লি মাংসাশী রাক্ষস।

ক্কোণী—আশার কথা : বে-বী [সং 'ক্কু'—শব্দ করা, +ণী = শব্দময়] (ক্ষোণী—পৃথিবী) বাদ্যযন্ত্রবিশেষ।

খট—অক্রব : বে-বী—খাদ।

খবীশ—সুরার কাহিনী : বে-শে-গা [আ] বিদ্বেষবুদ্ধিময়।

খয়রাৎ—তাজ : অ-আ [আ] দান, বিতরণ।

খাঞ—হরফ রিপাব্লিক : হ [খাঁই] আকাঙ্ক্ষা।

খাটুলি—শবাসীন : তু-লি ছোটো খাট্।

খাটো—মুগ্ধা : কু-কে খর্ব, ক্ষুদ্র।

খাড়ু—সতী : তু-লি হস্তালংকার-বিশেষ।

খান্দান—ইজ্জতের জন্ম : অ-আ [ফা] বংশ।

খান্দানী—সরযূ : বে-শে-গা [ফা] খান্দানের বিশেষণার্থে প্রয়োগ।

খাপ্রা-রাঙা—তাতারসির গান : অ-আ ভাঙা কলসীর টুকরোর মতন রাঙা।

খামৃখা—যশ্মন্ত : তু-লি [ফা] হঠাৎ, অকারণ।

খামি—আমি : কু-কে অলংকারের অংশ বা মধ্যমণি।

খাস-গেলাস—ঘুমন্তী নদী : বি-আ গেলাসের মতো অভ্রনির্মিত বাতিদান।

খিদ্‌মদ্‌গার—কাশ্মীরী কীর্তন : হ [আ, ফা] সেবক।

খিরনির—তাজ : অ-আ তরুবিশেষ।

খিলকাঠি—সতী : তু-লি অলংকারের বন্ধনী।

খুঞি—হরফ রিপাব্লিক : হ বেতের বা বাঁশের পেটিকা। [খুঞ্জি]।

খুঞ্চেপোষ—ইল্‌শে গুঁড়ি : অ-আ বারকোষের সূক্ষ্ম আচ্ছাদন-বস্ত্র।

খুনসুড়ি—ইল্‌শেগুঁড়ি : অ-আ লঘু কলহ।

খুস্‌রোজ—কবর-ই-নূরজাহান: অ-আ [ফা] আনন্দের দিন।

খেলুনিয়া—মৌলিক গালি : অ-আ খেলার সঙ্গী।

খোদ—রাত্রি বর্ণনা : হ (আ) স্বয়ং।

খোস—খোসবায়, খোসপোষাকী ইত্যাদিতে : [আ] সুন্দর।

খোয়ানো—খোয়ানো ও খোঁজা : তী-রে [সং ক্ষয়] নষ্ট করা।

খোয়ারের—শ্রীশ্রীটিকিমঙ্গল : হ ক্ষতির।

গক্কর—জাফরানিস্থান : বি-আ স্থান-নাম।

গগন-ভেড়—গঙ্গাহৃদি বঙ্গভূমি : অ-আ গগনে লগ্ন বা 'দিগন্তবিস্তৃত' অর্থে (?)

গড়া—নিষ্কলঙ্ক দরিদ্র : তী-স এক রকম মোটা কাপড়।

গর-বনেদী—ইজ্জতের জন্ম : অ-আ যা' বনেদী নয়।

গলুই—পুরীর চিঠি : অ-আ নৌকার প্রান্তভাগ।

গাওনা—সাল্‌-পহেলী : বে-শে-গা আসরে গান।

গাঁজনি—সুরার কাহিনী : বে-শে-গা fermentation।

গাদ—কাঠগড়া : বে-শে-গা [হি] ময়লা।

গান্ধার—ভারতের আরতি : বে-শে-গা কান্দাহার দেশ। গান্ধার সুর হোলো স্বরগ্রামের তৃতীয় সুর 'গা'।

গাব্বা—জাফরানিস্থান : বি-আ আসন [?]।

গায়বী—দার্জিলিঙের চিঠি : কু-কে [আ] অদৃশ্য, গুপ্ত, গোপনীয়।

গুজর—জাফরানিস্থান : বি-আ স্থানবিশেষ ?

গুজ্‌রী—শিরাজ-ই-হিন্দ্ : বে-শে-গা পায়ের অলংকার।

গুল—গুল্‌গুলাবি, গুল্‌শিরাজী ইত্যাদি প্রয়োগে : [ফা] ফুল।

গুলেল—জাফরানিস্থান : বি-আ 'সুগন্ধ' অর্থে।

গুঁড়ি—কৃষ্ণকেলি : ফু-ক চূর্ণ।

গৃহমেধী—চরকার আরতি : বে-শে-গা গৃহে অনুশীলনের যোগ্য। 'গৃহমেধী' শব্দের অর্থ গৃহস্থ।

গেতো—আলোর পাথার : বি-আ মন্থর বা দীর্ঘসূত্রী নৌকাবিশেষ (?)।

গেরম্বারি—অম্বল-সম্বরাকাব্য : হ গর্বিত।

গোকর্ণ ছাঁদ—জাফরানিস্থান : বি-আ শিব বিশেষের নাম গোকর্ণ। গোরুর কানের মতন আকৃতি।

গোথ্‌রী—দূরের পাল্লা : গরুর ক্ষুরের মতন টোপ্ তোলা।

গোড়েন সুর—আলোর পাথার : বি-আ 'গড়িয়ে যাচ্ছে' অর্থে।

গৈবী—ছন্দ-হিন্দোল : বে-শে-গা (আ) অদৃশ্য, গুপ্ত, গোপনীয়।

গ্রাম্ভারি—অম্বল্-সম্বরা কাব্য : হ গর্বিত, গম্ভীর (?)

ঘড়িক ঘড়ি—চিত্রশরৎ : অ-আ প্রতি ঘণ্টায়, ঘন ঘন।

ঘরানা—যোগাস্তা : ম-ম উচ্চবংশীয়।

ঘুরুণি—ঘুমভাঙা : তী-রে যে ঘোরায় (আদরার্থে)।

ঘুরঘুট্টি শিল : শি-ক (ধ্বন্যাত্মক শব্দ)।

ঘোঁট—ঘুম-গুম্ফায় : বে-শে-গা জটলা, আন্দোলন।

চন্‌মনে—মৌচাক : শি-ক চাঞ্চল্য-সূচক অব্যয়পদ।

চর্চরিকা গাথা—মেঘের বারতা : বে-বী নৃত্যসংগীত বিশেষ।

চাতরে—কয়াধু : বি-আ [সং চত্বর]।

চান্‌কিয়ে—সর্বজয়া : শি-ক জড়তা দূর ক'রে।

চারকো—তাজ : অ-আ পর্বত-বিশেষ।

চার্বাক ও মঞ্জুভাষা—ঐ : কু-কে ভারতের নাস্তিক্যবাদী দার্শনিক চার্বাক ও তাঁহার প্রণয়িনী।

চালি—বিদ্যার্থী : ভু-লি মঞ্চ বা ঘরের ছোট চাল।

চাঁছি—পাল্কীর গান : কু-কে যা চেঁছে তোলা হয়।

চাঁদি—সরস্বতী : অ-আ রূপা।
চাঁপাই আলো—আলোর পাথার : বি-আ চাঁপা রঙের আলো।
চিড়িয়া-গাড়ী—উড়োজাহাজ : বে-শে-গা পাখির মতো গাড়ি [হি]।
চিঠা—আখেরী : বে-শে-গা ফর্দ বা হিসাব।
চিলু—ঘুমতী নদী : বি-আ চিতা ?
চিয়াতে—মৃত্যু স্বয়ম্বর : অ-আ চেতনা সঞ্চার করতে অর্থাৎ সুপ্তভাগ্য জাগাতে।
চুক্—যশ্‌ মস্ত : তু-লি (হি) ত্রুটি।
চুক্‌লি—যশ্‌মস্ত্‌ : তু-লি (ফা) আড়ালে নিন্দা।
চুঙ্গি (চুঙি)—বাঁকা : তী-রে বাঁশের ছোট নল।
চুনি—শিশুহীন পুরী : বে-বী চয়ন ক'রে।
চুবন—কুক্কুটপাদ মিশ্রের প্রশস্তি : হ ভুবন।
চেরাগ—কবর-ই-নূরজাহান : অ-আ (ফা) প্রদীপ।
চোরাই সোহাগ—বনগীতি : তী-রে গোপন আদর।
চোঁচের তুলি—যশ্‌মস্ত্‌ : তু-লি আঁশ বা শোঁয়ার তুলি।
চৌকি—ঘুমপাড়ানী গান : তী-রে পাহারা।
চৌচাপটে—আখেরী : বে-শে-গা পূর্ণ মাত্রায় বা ফলাও ভাবে।
চৌরস—ভারতের আরতি : বে-শে-গা [সং-চতুরস্র] চওড়া।
ছন্ন—গঙ্গাহৃদি বঙ্গভূমি : অ-আ আবৃত।
ছা—গাঁয়ের পালা : ম-ম শাবক।
ছাঁচতল—ঘুম-ভাঙ্গা : তী-রে ঘরের চালের প্রান্তভাগ।
ছাড়ান-ছিড়েন—রণচণ্ডীর গান : তী-রে অব্যাহতি।
ছিল্‌কে—সাল্‌ পহেলী : বে-শে-গা ছাল, ত্বক্‌।
ছেপ্‌কা তাল—আলোর পাথার : বি-আ গানের তালবিশেষ।
জগঝম্প—মন যারে চায় : তী-রে বাদ্যযন্ত্রবিশেষ।
জম্বীর—ছন্দহিন্দোল : বে-শে-গা [সং] গোঁড়া লেবু।
জলচক্কীর—চাঁদনী রাতের চাষ : ম-ম জলের চক্রবৎ তরঙ্গ।
জলটুঙ্গি—ম-ম জলমধ্যস্থ উচ্চগৃহ।
জলুসী টোটা—ইন্দ্রজাল : অ-আ জৌলুষময় কার্তুজ।
জাড়—জীর্ণপর্ণ : বে-বী জাড্য, শীতবোধ।
জান—মরিয়া : তু-লি দৈবজ্ঞ।
জাবনা—গরু ও জরু : ম-ম গবাদি পশুর খাদ্য।
জাব্দা—আখেরী : বে-শে-গা [আ] দৈনিক হিসাবের খাতা।
জিরেন কাটে—তাতারসির গান :

অ-আ রসের জন্যে বিশ্রাম দিয়ে কাটা খেজুর গাছ।

জীয়ে—কয়াধু: বি-আ জীবিত থেকে।

জুড়ুনি—ঘুম ভাঙা: তী-রে যে জুড়োয় (আদরার্থে)।

জুয়ায়—অরুন্ধতী: বে-শে-গা জোগায়।

জেব—রাত্রি বর্ণনা: হ (ফা) পকেট।

জেল্লা—কুঙ্কুমপঞ্চাশৎ: অ-আ ঔজ্জ্বল্য।

জেয়াদা—সর্বদমন: বি-আ [আ] প্রচুর।

জৈত্র ধনুর্ধারী—[সং জি+এণ্ = জৈত্র] —অর্থাৎ জয়শীল। ইন্দ্রের ধনু জৈত্র-ধনু নামে প্রসিদ্ধ।

ঝরোখা—যশ্‌মন্ত্: তু-লি জানলা।

ঝামট—দোসর: অ-আ ঝাপ্‌টা।

ঝামর হাওয়া—বর্ষানিমন্ত্রণ: অ-আ মৃদু মন্দ বাতাস।

ঝিনা—চকোরের গান: অ-আ ধ্বন্যাত্মক শব্দ?

ঝুম্‌রো বট—কাজরী পঞ্চাশৎ: অ-আ ঝাঁকড়া।

ঝুঁঝিয়ে ঝরে—কাজরী পঞ্চাশৎ: অ-আ বেগে নিঃসৃত হয় [হি]।

টক্কর—জাফরানিস্থান: বি-আ ঠোকর।

টঙ্—অনার্যা: তু-লি উচ্চস্থিত মঞ্চ বা কুটীর।

টক্ক—দুঃখকামার: তী-রে মজবুত।

টক্ক-জেলে—৺গোখ্‌লে: অ-আ অর্থলোভী।

টাট—পাল্কীর গান: কু-কে পাত্র-বিশেষ, থালা।

টিকলি—ভাদ্রশ্রী: কু-কে অলংকার-বিশেষ।

টিকিমেধ যজ্ঞ—ঐ: অ-আ কালীপ্রসন্ন সিংহ কাঞ্চনমূল্য দিয়ে তর্কে পরাজিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের টিকি কিনতেন, এই জনশ্রুতির স্মারক।

টিপিসাড়ে—ঝিঁঝিঁ: ম-ম চুপিসাড়ে।

টুপিয়েছে—ভোরাই: বে-শে-গা ধ্বন্যাত্মক শব্দ।

টোকা—ভাদ্রশ্রী: কু-কে পত্রনির্মিত ছত্র।

টো টো—বিদ্যার্থী: তু-লি ধ্বন্যাত্মক শব্দ; বৃথা ভ্রমণ অর্থে।

টোপের—মনোজ্ঞা: তী-রে শিকারের জন্যে রক্ষিত প্রলোভনের।

ঠাম—দেবদাসী: তু-লি ভঙ্গি, আকার।

ঠুঙি—তাতারসির গান: অ-আ ছোট ঠোঙা।

ঠুন্‌কো—অরুন্ধতী: বে-শে-গা ভঙ্গুর (দেশি শব্দ)।

ডগমগ—মন যারে চায়: তী-রে [হি] আবিষ্ট।

ডগের হাঁড়ল—সুরার কাহিনী: বে-শে-গা গাছের শীর্ষস্থ গহ্বর।

ডাকা-বুকো—মূর্তমদন: ম-ম দুঃসাহসী বা অসমসাহসী ব্যক্তি।

ডাগরগুচ্ছি—হেমন্তে : কু-ক বৃহৎ গুচ্ছবিশিষ্ট।

ডাটি—অঙ্কুর : তী-রে [সং দণ্ড]।

ডাণ্ডা-ডেরা—সুরার কাহিনী : বে-শে-গা তাঁবু ও তার সরঞ্জাম।

ডামাডোল—ঝোড়ো হাওয়ায় : কু-কে গণ্ডগোল।

ডায়ার ও ডায়ারে—ফরিয়াদ : বে-শে-গা কুখ্যাত জালিয়ানওয়ালা বাগ ব্যাপারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পাঞ্জাবের লাট মাইকেল ও'ডায়ার এবং জেনারেল ডায়ার।

ডাল্—কয়াধু : বি-আ নিক্ষেপ কর্ [হি]।

ডাঁশা—জলটুঙ্গি : ম-ম গৃহনির্মাণের দণ্ডবিশেষ।

ডিশিন নিশিন পাড়া—নাপ্পিপীরিতি কথা : বে-শে-গা চীনাপল্লী অর্থে (?) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র সেন (D. C. Sen) মহাশয়ের অধ্যাপনা সম্পর্কে কটাক্ষ এবং তৎপ্রসঙ্গে পূর্ববঙ্গীয় উচ্চারণরীতির কঠোর সমালোচনা।

ডেল্‌কো—সাল্‌-তামামী : বে-শে-গা দীপাধার [সং দীপবৃক্ষ]।

ড্যাকরা—নেই ঘরের ঘুমপাড়ানি : শি-ক অশিষ্ট।

ঢন্‌ঢনানি—মৌলিক ঝাঁকামুটে : হ শূন্যগর্ভতা।

ঢেঁড়ি—সতী : তু-লি কর্ণভূষণ-বিশেষ।

ঢ্যাপ—জাফরানিস্থান : বি-আ শালুকের ফল।

তজ্‌বিজ্‌—সুরার কাহিনী : বে-শে-গা [ফা] অনুসন্ধান।

তত্ত্ববোধের—স্বাগত : অ-আ তত্ত্ববোধিনী সভা ও পত্রিকা সম্পর্কিত।

তনু—পিয়ানোর গান : অ-আ দেহ।

তমসুক-তাজ—লাজের কাহিনী : শি-ক [আ ও ফা] তমসুক-খত (bond); তাজ (crown)।

তলব—দুর্ভাগা : তু-লি [আ] উগ্রতা, আহ্বান।

তল্পী—অলক্ষণ : তী-রে দ্রব্যসামগ্রী, পুঁটুলি।

তয়ফা—পুরীর চিঠি : অ-আ [আ] নর্তকী।

তাগ—অনার্যা : তু-লি নিশানা।

তাতারসি—পান্সীর গান : কু-কে গুড়ের তপ্ত রস।

তান্‌কা—জাপানী কবিতা বিশেষ।

তাঁবে—আদর্শ বিয়ের কবিতা : হ [আ] আজ্ঞাধীন।

তিতিয়া—মিলনানন্দ : তী-রে ভিজিয়া।

তিত্তিরে—ঘুমতী নদী : বি-আ পক্ষিবিশেষ।

তুণ্ড-পুটে—কোনো নেতার প্রতি : বি-আ [সং] মুখে।

তুলক্লাম—রেলগাড়ীর গান : শি-ক [আ] তুমুল আন্দোলন।

তেহাই—রাজা-কারিগর : বে-শে-গা [ত্রিভাগিকা] তবলায় তিনের আঘাত।

তোড়াদার—ইন্দ্রজাল : অ-আ গুচ্ছ-গুচ্ছ বা বহুলার্থক শব্দ (?); যে বন্দুকের ভিন্ন ভিন্ন অংশ খোলা যায় (?)।

তোড়ে—ইন্দ্রজাল : অ-আ ভিন্ন করে ব ভাঙে [হি]।

তোষাখানা—তিলক : বি-আ [ফা] মূল্যবান দ্রব্যের ভাণ্ডার।

ত্বষ্টা—সন্ধিক্ষণ : বিশ্বকর্মা। বেদে ও পুরাণে ত্বষ্টা দেবতাদের অস্ত্র-যন্ত্রাদির নির্মাতা রূপে উল্লিখিত।

ত্রিপিটক—সূত্র, বিনয় ও অভিধর্ম—বৌদ্ধশাস্ত্রের এই তিন বিভাগ।

থম্‌থমিয়ে—গোপন কথা : ম-ম স্তম্ভিত ভাবে।

থাউকো—আখেরী : বে-শে-গা থোক হিসেবে।

থানা—স্বর্গদ্বারে : অ-আ : পাহারা।

থিতায়—আলোর পাথার : বি-আ [সং স্থিত] নিচে জমে।

থির—ঘুমতী নদী : বি-আ [সং স্থির]।

থুই—হিন্দোল বিলাস : বি-আ রাখি [সংস্থাপন]।

দড়—যশ্‌মন্ত্ : তু-লি [সং দৃঢ়]।

দধীচি—ভৃগুবংশীয় অথর্বার পুত্র। দেবতাদের উপকারের জন্যে দধীচি স্বেচ্ছায় দেহত্যাগ করেন। তাঁর অস্থি দিয়ে বজ্র নির্মাণ করে ইন্দ্র বৃত্রাসুরকে বধ করেন।

দনু-দিতি-অদিতি—মহর্ষি কশ্যপ প্রজাপতি দক্ষের ত্রয়োদশ কন্যাকে বিবাহ করেন। এঁরা সকলেই কশ্যপের পত্নী। দনুর গর্ভে দানব, দিতির গর্ভে দৈত্য এবং অদিতির গর্ভে আদিতেয় বা দেবতাদের উৎপত্তি হয়। বৈদিক সাহিত্যের কোনো কোনো অংশে আকাশকে 'অদিতি' এবং পৃথিবিকে 'দিতি' বলা হয়।

দময়ন্তী—বিদর্ভের অধিপতি রাজা ভীমের কন্যা ও নিষধরাজ্যের অধিপতি রাজা নলের ভার্যা। মহাভারতের স্মরণীয় নারীচরিত্র।

দম্‌কা—সাল্‌-পহেলী : বে-শে-গা [ফা] হঠাৎ।

দম্বল—অম্বল-সম্বরাকাব্য : হ দইয়ের মাজা।

দরকচা—রাজা-কারিগর : বে-শে-গা দর [ফা] অর্ধ; কচা [কাঁচা] সংকর শব্দের নমুনা, আধ-পাকা অর্থে।

দরাজ—তোরাই : বে-শে-গা [ফা] বিস্তৃত, মুক্ত।

দরীগৃহ—শোভিকা তু-লি গুহাগৃহ; রাজরঙ্গগৃহ (?)

দাগড়া—কয়াধু : বি-আ দাগ বা চিহ্ন।

দাক্ষায়ণী—দক্ষের কন্যা অদিতি প্রভৃতি দক্ষের যাবতীয় কন্যাই দাক্ষায়ণী, কিন্তু শিবের পরিণীতা সতীই এই নামে বিশেষ পরিচিতা।

দাগা—কোনো নেতার প্রতি : বি-আ আঘাত।

দানেশ মন্দী—শ্মশান শয্যায় হরিনাথ দে : কু-কে জ্ঞানীদের শিরোমণি।

দাব্ড়ি-ভোতা—৺গোথ্‌লে : অ-আ ভঁৎসনার ফলে ভোঁতা।

দামাল—রাখাল মেয়ে : ম-ম দুরন্ত।

দিন-দেওয়ালি—জাফরানিস্থান : বি-আ দিবালোকের দীপালি।

দিশ্‌পাশ—ছন্দ-হিন্দোল : বে-শে-গা [সং দিশাপার্শ্ব] চতুর্দিক অর্থে।

দুনো—গোপন কথা : ম-ম দ্বিগুণ।

দেওডাঙ্গা—সিঞ্চলে সূর্যোদয় : বি-আ মেঘের ডাঙ্গা।

দেয়ালা—লালপরী : অ-আ [সং দেবলীলা] স্বপ্নে শিশুর হাসিকান্না।

দেয়াসিনী—ময়ূর মাতন : বে-শে-গা [সং দেববাসিনী] পূজারিণী।

দোব্‌জা—সবুজ পরী : অ-আ ময়ূর-কণ্ঠিরঙের রেশ্‌মী উত্তরীয়।

দ্রাপি—সিন্ধু : হো-শি ভূষণ।

ধামসায়—ঝড়ের ছবি : শি-ক দলন করে।

ধুকুড়ি কাঁথা—নবাব ও গোয়ালিনী : তী-রে ছেঁড়া কাঁথা।

ধুনী—কুলাচার : বে-বী ধুনো জ্বালাবার পাত্র।

নওরোজা—ঘুমতী নদী : বি-আ [ফা] নববর্ষের দিন।

নক্‌লী—ভাদ্রশ্রী : কু-কে নকল রাত অর্থাৎ মেঘাচ্ছন্ন দিন।

নকীব লাজের কাহিনী : শি-ক [আ] রাজগৃহের ঘোষক।

নচিকেত—কঠোপনিষদে নচিকেতার আখ্যান : ক্রুদ্ধ পিতা বালক নচি-কেতাকে যমকে অর্পণ করেন। বালক নচিকেতা যমালয়ে উপস্থিত হয়ে যমের সাক্ষাৎ লাভ করেন এবং তাঁর কাছ থেকে ব্রহ্মবিদ্যা অবগত হন। একটি বৈদিক অগ্নির নামও নচিকেতা।

নজগজে—কাগজের হাতী : বে-শে-গা যা' দৃঢ় নয়।

নদুয়া-তদুয়া—তাজা-বে-তাজা : তী-রে নবনীতকোমল দেহ।

নবজীবন—স্বাগত : অ-আ 'নবজীবন' পত্রিকা স্মরণীয়।

নহর—ফরিয়াদ : বে-শে-গা [আ] খাল।

নাকাল—গাঁয়ের পালা : ম-ম নিগ্রহ, নিগৃহীত।

নাগাড়—নেই ঘরের ঘুমপাড়ানি : শি-ক অবিরাম, একটানা।

নাচার—কয়াধু : বি-আ [ফা] নিরুপায়। নাদুস-নুদুস—বিকাশ-

ভিখারী : তী-রে মোটা, গোলগাল।

নাম্নি পীরিতি কথা—বে-শে-গা : কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক অধ্যাপকের (দীনেশচন্দ্র সেন) অধ্যাপনার ত্রুটি সম্বন্ধে কটাক্ষ।

নাবাল—সন্ধ্যার পূর্বে : তী-রে ঢালু।

নাসত্য—বৈদিক দেবতা অশ্বিনীকুমার নাসত্য নামে পরিচিত। নাসত্য যুগ্মক, এঁরা দেববৈদ্য। ঋগ্‌বেদের আসিবনসূক্ত এঁদেরই স্তুতি। বৈদিক ও পৌরাণিক আখ্যানে দেখা যায় যে ইন্দ্র এঁদের যজ্ঞের ভাগ প্রদানে সম্মত ছিলেন না। মহাভারতে চ্যবন ঋষি এঁদের প্রসাদে যৌবন লাভ করেন ও তিনিই এঁদের যজ্ঞের ভাগ প্রদান করেন। বেদে নাসত্যদের বহুকীর্তি বিবৃত আছে।

নিঋ´তি—বৈদিক অমঙ্গলের দেবতা।

নিকাশীচিঠি—ইন্দ্রজাল : অ-আ নির্গমের ছাড়পত্র।

নিকিয়ে—আলোর পাথার : বি-আ মুছে।

নিকুছি—ঘুমপাড়ানোর গল্প : ম-ম মরণ, শেষ।

নিখ্‌তি—স্নেহের নিরিখ : তী-রে নিক্তি, ছোট তুলাদণ্ড।

নিখাদ—ছেলের দল : কু-কে খাদহীন।

নিড়েন—ভাদ্রশ্রী : কু-কে তৃণ উৎপাটনের অস্ত্র।

নিতল রসে—বর্ষানিমন্ত্রণ : অ-আ 'অতল' অর্থে।

নিদান-শল্য—মল্লিকুমারী : বি-আ মৃত্যুবাণ।

নিদালি—মুক্তবেণী : বে-শে-গা নিদ্রাকর্ষণের মন্ত্র।

নিদু—অনার্যা : তু-লি নত।

নিবিদ্‌—সিন্ধু-তাণ্ডব : অ-আ বেদের প্রাচীন গদ্যাংশ ; বৈদিক মন্ত্রের মধ্যে যেগুলি গদ্য, সেগুলিকে নিবিদ্‌ বলা হয়।

নিবীত—[সং] উপবীত ; উত্তরীয়।

নিমখুন—ভাবান্তর : তী-রে [ফা.] অর্ধ, অর্থাৎ প্রায় খুন।

নিষ্ক—শোভিকা : তু-লি স্বর্ণমুদ্রা-বিশেষ।

নীলাব—হরমুকুট গিরি : অ-আ নীল আবের তুল্য প্রস্তরখণ্ড (?)

নুলো—ইল্‌শে গুঁড়ি : অ-আ ছিন্নহস্ত।

নেষ্টা—বাজশ্রবা : তু-লি বৈদিক যজ্ঞের ঋত্বিক বিশেষ। 'উদ্গাতা' দ্রষ্টব্য।

নোল—তুমি ও আমি : কু-কে [আঞ্চলিক বাংলা—লোল] ঢিলা, আল্‌গা।

নোনছা—কাঞ্চন ফুল : ফু-ফ : [সং লবণ-স্পর্শ ?]

পতর-আঁটা—আলোর পাথার : বি-আ লোহা বা অন্য ধাতুর পাতযুক্ত।

পরকোলা—কয়েকটি গান : বে-শে-গা [ফা] কাচ।

পয়জার—যশ্‌মন্ত : তু-লি [ফা] চটিজুতা।

পরাশর—বশিষ্ঠের পৌত্র, শক্তি্‌র পুত্র ও ব্যাসদেবের পিতা। প্রসিদ্ধ বিষ্ণুপুরাণের বক্তা পরাশর। একখানি স্মৃতিসংহিতার প্রণেতা হিসাবেও পরাশরের প্রসিদ্ধি আছে।

পরেয়া—ঐ : তু-লি অস্পৃশ্য।

পরিষৎ—স্বাগত : অ-আ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ।

পলকা—নেই ঘরের ঘুমপাড়ানি : শি-ক ভঙ্গুর।

পলা—ঘুম-ভাঙা : তী-রে প্রবাল।

পশলা—ময়ূরমাতন : বে-শে-গা বর্ষণ।

পসুরি—৺গোখলে : অ-আ পাঁচ সের পরিমাণ।

পহেলি—সাল্‌ পহেলী : প্রথম; বছরের প্রথম দিন।

পঁইছে—সতী : তু-লি হস্তালংকার-বিশেষ।

পাটন—নমস্কার : বে-শে-গা [সং পত্তন, পট্টন] দেশ, প্রদেশ।

পাটা—পাল্কীর গান : কু-কে কাঠের তক্তা।

পাথার জল—ভোরাই : বে-শে-গা [সং প্রস্তার] অকূল জল।

পাথান-ছোঁয়া—আলোর পাথার : বি-আ গরুর স্তন স্পর্শ করে যে (ঘাস)।

পাশ মোড়া—সিন্ধুলে সূর্যোদয় : বি-আ পাশ ফেরা।

পাঁচন-বাড়ি—গাঁয়ের পালা : ম-ম যষ্টিবিশেষ।

পিঙ্গ—ঝোড়ো হাওয়ায় : কু-কে [সং] হরিতাভ পাটল।

পুণ্ড্র—স্বাগত : অ-আ উত্তরবঙ্গ (বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির ইঙ্গিত)।

পুরূরবা—চন্দ্রবংশীয় রাজা বুধের পুত্র ও চন্দ্রের প্রপৌত্র। কালিদাসের বিক্রমোর্বশী কাব্যে পুরূরবা-উর্বশীর প্রণয় কাহিনী স্মরণীয়।

পুষ্পলাবী—বাসন্তিকা : ম-ম পুষ্প-চয়নকারিণী তু: 'মেঘদূত'।

পুঁটে—পাল্কীর গান : কু-কে শিশুর টিক্‌লি জাতীয় অলঙ্কার।

পেগম্বর—নওরোজের গান : ম-ম ঈশ্বর।

পোতা—পাল্কীর গান : কু-কে গৃহভিত্তি।

পোস্তা-গাঁথা—যশ্‌মন্ত্ : তু-লি ভিত্তি-গাঁথা।

পোয়াল—পাল্কীর গান : কু-কে—খড়।

পোঁছা—পাল্কীর গান : কু-কে হাতের নিচের দিক (পোঁচা)।

প্রসেনজিৎ—বুদ্ধদেবের সমসামায়িক কোশলরাজ। ইনি বুদ্ধের অনুগত ভক্ত ছিলেন। প্রকৃত নাম বোধ

হয় অগ্নিদত্ত। Rhys Davids বলেন—'Pasendi (used as a designation for several kings) is in reality an official epithet and……the king's real personal name was Agnidatta.,—(Buddhist India, ch. 1. p. 10)

প্রহ্লাদ—হিরণ্যকশিপুর পুত্র ও প্রসিদ্ধ বিষ্ণুভক্ত। পিতা বিষ্ণুদ্বেষী হিরণ্যকশিপুর হাত থেকে রক্ষা করবার জন্মেই বিষ্ণু নৃসিংহরূপে আবির্ভূত হয়ে হিরণ্যকশিপুকে বধ করেন। জ্ঞান এবং ভক্তির জন্যে প্রহ্লাদ বিখ্যাত।

প্রাপ্তি—মহাসরস্বতী : কংসের অন্যতমা পত্নী। কামপত্নীবিশেষ। 'অস্তি' দ্রষ্টব্য।

ফক্কিকা—নাপ্পি-পীরিতি কথা : বে-শে-গা ফাঁকি।

ফয়তা—বেতালের প্রশ্ন : বে-শে-গা [আ] উপাসনা।

ফর্‌কায়—দুপুরে : তী-রে ফর্ ফর্ ধ্বনির সঙ্গে ওড়ে।

ফর্দায়—বানর : তী-রে উন্মুক্ত স্থানে।

ফারখৎ—নাপ্পি-পীরিতি-কথা : বে-শে-গা ব্যবধান।

ফিরোজ—শিরাজ-ই-হিন্দ : বে-শে-গা নীলাভ হরিদ্বর্ণ মণি।

ফুরসৎ—হিন্দোল-বিলাস : বি-আ [আ] অবসর।

ফুলকরী—ঘুমতী নদী : বি-আ ফুলের নক্শা।

ফুলসাক্ষি—ঐ : কু-কে সহজিয়া সম্প্রদায়ের একটি শাখা,—এরা কোন একটি ফুলকে পরকীয়া নায়িকা নির্বাচন করে থাকে (চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের টীকা দ্রষ্টব্য)।

ফেঁকড়ি—স্বপ্নাতীত : তী-রে গাছের ক্ষীণ প্রশাখা।

ফ্যানসা—পাল্কীর গান : কু-কে ফেনযুক্ত।

বকাঞ্চ ফুল—ঘুমতী নদী : বি-আ পুষ্পবিশেষ।

বখেড়িয়া—ইন্দ্রজাল : অ-আ কলহ-প্রবণ।

বগ্‌লী—মৌচাক : শি-ক [ফা] থলি।

বলক—অবসান : ফু-ক তেজ (উথলানো)।

বহুড়ি—পাল্কীর গান : কু-কে [বধূটী] বালিকা বধূ।

বাচক্নবী—বচক্নু ঋষির কন্যা; উপনিষদে ইনিই যাজ্ঞবল্ক্যের পত্নী প্রসিদ্ধ ব্রহ্মবাদিনী গার্গী।

বাথান—পাল্কীর গান : কু-কে গোশালা বা গোচারণের মাঠ।

বাওয়া ডিম্ব—সর্বশী : হ ভ্রূণহীন ডিম।

বাজশ্রবা—উপনিষদের প্রসিদ্ধ ঋষি; কঠোপনিষদে যে নচিকেতার কাহিনী

বর্ণনা করা হয়েছে, তিনি বাজশ্রবার বংশধর।

বার—যশ্‌মন্ত্: তু-লি ('দরবারে দাও বার') সপারিষদ্ সভার অধিবেশন।

বাধ্রীণস ছাগ—বাজশ্রবা: তু-লি যজ্ঞে ব্যবহৃত বৃদ্ধ ছাগ।

বিগাড়্—ফরিয়াদ: বে-শে-গা প্রতিকূল ভাগ্য।

বিনতা—দক্ষ প্রজাপতির অন্যতমা কন্যা ও মহর্ষি কশ্যপের অন্যতমা পত্নী। এঁর গর্ভে গরুড় প্রভৃতির জন্ম হয়। বিনতা পক্ষী জাতির জননী। 'কদ্রু' দ্রষ্টব্য।

বিরূঢ়ক—সম্রাট প্রসেনজিতের পুত্র। শাক্যবংশীয়েরা শাক্যকন্যা পরিচয় দিয়ে প্রসেনজিৎকে এক দাসীকন্যা দান করেন, তাঁর গর্ভেই এঁর জন্ম হয়। বিরূঢ়ক পরে এই প্রতারণা জানতে পেরে শাক্যরাজ্য জয় করেন এবং বহু শাক্যবংশীয়কে হত্যা করে প্রতিশোধ নিয়েছিলেন।

বিঠোবা—দেবদাসী: তু-লি মহারাষ্ট্রে বিট্‌ঠল বা বিষ্ণু 'বিঠোবা' নামে প্রচলিত।

বিভ্রথ—বাসন্তী-স্বপ্ন: তী-রে [সং বিভ্রান্ত]।

বিথার—ভোরাই: বে-শে-গা [সং বিস্তার]।

বিল্‌কুল্—হিন্দোল-বিলাস: সম্পূর্ণ।

বিশাই—চরকার আরতি: বে-শে-গা বিশ্বকর্মা।

বুরুজ—যশ্‌মন্ত্: তু-লি [আ] দুর্গপ্রাকারের পোস্তা।

বুঁট—হরমুকুটগিরি: অ-আ বুটি (?)

বুঁদি—তাজ: অ-আ মণিবিশেষ।

বেগর—গাঁয়ের পালা: ম-ম (ফা) বিনা, ব্যতীত।

বেজার—ভাবান্তর: তী-রে [ফা] বিরক্ত।

বেয়াদব—যশ্‌মন্ত্: তু-লি [ফা] অশিষ্ট।

বৈবস্বত—সূর্যসারথি: তু-লি দক্ষিণ দিক।

বৈবস্বতী—বিবস্বান্ বা সূর্যের কন্যা: যমুনা। যমুনা যমের ভগিনী।

বৈষ্ণব লালা—স্বাগত: অ-আ লালাবাবু (কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ)।

বোঁচা—নস্য: তী-রে বসা বা কাটা নাক।

বোঁট—পিয়ানোর গান: অ-আ বৃন্ত।

ব্যাঙাপিতল—নেই ঘরের ঘুমপাড়ানি: শি-ক পিত্তলবিশেষ; তুলনীয়: 'সোনারূপা নহে বাপা এ বেঙা-পিতল'—চণ্ডীমঙ্গল।

ব্রহ্মদত্ত—ব্রহ্মদত্ত কাশীর রাজা ছিলেন, কোশলরাজ এঁর প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। বৌদ্ধ জাতকের বহুস্থানে ব্রহ্মদত্তের কথা আছে। জাতক অনুসারে ব্রহ্মদত্ত বুদ্ধের বহু পূর্ববর্তী

হওয়াই উচিত। কিন্তু ব্রহ্মদত্ত বোধ হয় বুদ্ধের সমসাময়িক অথবা কিছু পূর্ববর্তী।

ভড়কায়—কাগজের কাতী: বে-শে-গা [সং 'ভ্রষ্ট' থেকে?] ভয় পেয়ে উদ্‌ভ্রান্ত হয়।

ভর্গদেব—মহাসরস্বতী: ব্রহ্মা, মহাদেব ও জ্যোতিঃ অর্থে 'ভর্গ' শব্দের প্রয়োগ প্রচলিত।

ভর্ণা—ঝর্ণা: বি-আ পূর্ণ, ভরা।

ভাক্ত—শবাসীন: তু-লি ধর্মসম্প্রদায়বিশেষ।

ভালাই—অনার্য্য: তু-লি মঙ্গল বা ভালো।

ভূলোক—মহাসরস্বতী: অ-আ মৎস্য-পুরাণে ভূলোক, ভূবর্লোক, স্বর্লোক, মহর্লোক, জনলোক, তপোলোক ও সত্যলোক—এই সাতটি লোকের কথা বলা হয়েছে।

মটকা—পাল্কীর গান: কু-কে ঘরের চালের মাথা।

মড়াঞ্চে—নেই ঘরের ঘুমপাড়ানি: শি-ক মৃতবৎসা।

মণি-পাম্-হুম্—ঘুম-গুম্ফায়: বে-শে-গা মণিপদ্মে হুংকার (বৌদ্ধ ধর্মাচার)।

মণি-শিখ—তাজ: অ-আ মণিযুক্ত চূড়া।

মধুমৎত্বিষ—তাজ: অ-আ মধুবৎ দীপ্তিময়, অর্থাৎ মধুবর্ণ।

মধুক—আমরা: কু-কে মহুয়ার ফুল।

মধুক্রম—চিত্রকূট: তী-স মৌচাক।

মনামুনি—দুর্ভাগা: তু-লি মনো-বিনিময়।

মন্যু—বাজশ্রবা: তু-লি ক্রোধ, অভিমান।

মরণ-অধৃষ্য—বিদ্যুৎপর্ণা: তু-লি [সং ধৃষ্য-ধর্ষণীয] মৃত্যুহীন।

মহর্লোক—মহাসরস্বতী: ভূলোক দ্রষ্টব্য।

মলিদা—বর্ষানিমন্ত্রণ: অ-আ [ফা] এক রকম মিহি পশমী কাপড়, এখানে ধূসরতা-সূচক।

মাজা—আমি: কু-কে (সং মধ্য) কোমর।

মাঝাই বেলা—আলোর পাথার: কু-কে মধ্যবেলা।

মাথট—ইজ্জতের জন্য: অ-আ [সং মস্তক-বর্ত] মাথা পিছু চাঁদা।

মারীচ—১। প্রজাপতি মরীচির পুত্র প্রজাপতি কশ্যপ। ইনি দেবতা, অসুর, মানব, দানব, সর্প, বিহঙ্গ ইত্যাদির স্রষ্টা। ২। স্বর্ণমৃগের রূপ ধারণ করে সীতার বিভ্রম উৎপাদনকারী রাক্ষস বিশেষ।

মিস্রাম, মিতান—ভারতের আরতি: বে-শে-গা মিশর-মেসেপোটেমিয়া দেশ (?)।

মিম—যশ্‌মন্ত্: তু-লি রক্তবর্ণ(?)।

মিশির জমী—চিত্রশরৎ, অ-আ [হি

মিস্‌সী] এখানে ঘোর কালো রঙ, অর্থে।

মুঞ্জবান পাহাড়—হিমালয় শ্রেণীর অন্তর্গত মুঞ্জবৎ বা মুঞ্জবান্ গিরি। যজ্ঞের জন্যে এখান থেকে মুঞ্জতৃণ ও সোম আহরণ করা হোতো।

মুড়ে—কাগজের হাতী : বে-শে-গা মুণ্ডে।

মুশ্‌ব্বরে—একটি চামেলীর প্রতি : [আ] গন্ধদ্রব্য বিশেষ।

মুসাবিদা—কালীপ্রসন্ন সিংহ : অ-আ [ফা মুসার্‌বাদা] এখানে মূল্যের 'খসড়া' অর্থে।

মুহড়া—ইন্দ্রজাল : অ-আ যুদ্ধে সম্মুখে অবস্থান।

মেড়ে—গান : অ-আ [সং 'মর্দন'] মর্দন করে।

মোরচা-বন্দী মেঘগঞীনে—ইন্দ্রজাল : অ-আ 'মুরচা' বা 'মোরচা' [ফা] দুর্গপ্রাচীর ; গঞীন—দুর্গ ?।

মৈনাক—হিমালয়ের পুত্র ও দেবী পার্বতীর ভ্রাতা। ইন্দ্র যে সময়ে পর্বতসমূহের পক্ষচ্ছেদন করেন, তখন মৈনাক সমুদ্র-গর্ভে আত্মগোপন করেন ; ফলে মৈনাকের পক্ষ ছিন্ন হয়নি। সমুদ্র-গর্ভস্থিত পর্বতকেই বোধ হয় সেকালে মৈনাক বলা হোতো।

মৌলি-মণি—অঞ্জলি : অ-আ মাথার মণি।

যবনে রুধলে সাকেত—সরযূ : বে-শে-গা পতঞ্জলির মহাভাষ্যের একটি দৃষ্টান্তের (লঙ্) স্মারক। 'যবন সাকেত অবরোধ করলো' এই অর্থে।

যম-জাঙাল—যমের রাস্তা, মৃত্যুপথ।

যুবন্ হিয়া—বিদ্যুৎপর্ণা : তু-লি যৌবন-হৃদয়।

রদ্দি—আখেরী : বে-শে-গা [আ] নিকৃষ্ট।

রসান—আখেরী : বে-শে-গা অলংকার উজ্জ্বল করবার জন্যে ব্যবহৃত রাসায়নিক জল।

রাজতরঙ্গিণী—পণ্ডিতবর কল্‌হনের সংস্কৃত ভাষায় রচিত কাশ্মীরের ইতিহাস। প্রাচীন ইতিহাস, প্রাচীন মুদ্রা ও অন্যান্য বিশ্বাসযোগ্য উপাদান অবলম্বন করে কল্‌হন এই ইতিহাস রচনা করেন।

রামগোপালের—স্বাগত : অ-আ রামগোপাল ঘোষ।

রিষ্টি—অঞ্জলি : অ-আ অকল্যাণ, কল্যাণ।

রুখু—কুকুমপঞ্চাশৎ : অ-আ রুক্ষ।

রুজু-দিয়ে—আখেরী : বে-শে-গা [আ] পেশ ক'রে।

রেয়াৎ—বেতালের প্রশ্ন : বে-শ-গা [আ] দয়া, অব্যাহতি।

রোকড়—সাল-তামামী : বে-শে-গা নগদ টাকার হিসেব।

রোক্কা—আখেরী : বে-শে-গা [আ] চিঠি।

রোকে—ইন্দ্রজাল : অ-আ (অন্যত্র অনুজ্ঞা অর্থে 'রোখো' ব্যবহৃত) কলহ করে, বাধা দেয়।

রোঁদ—রাত্রিবর্ণনা : হ [ইং round]।

লব-লবি—ইন্দ্রজাল : অ-আ যুদ্ধাস্ত্রের অংশবিশেষ।

লম্বশাট—নিষ্কলঙ্ক দারিদ্র্য : তী-স দীর্ঘ ও প্রশস্ত পরিধেয় বস্ত্র।

লালচ্—রাজবন্দিনী : তু-লি [হি] লালসা।

লোরপর্দায়—ময়ূর মাতন : বে-শে-গা অশ্রুর পর্দায়।

লেহা—কুঙ্কুমপঞ্চাশৎ : অ-আ স্নেহ, মমতা।

লোলাব—হরমুকুটগিরি : অ-আ লোল অর্থাৎ শিথিল আবের মতো প্রস্তরখণ্ড (?) 'নীলাব' দ্রষ্টব্য।

শমস্-উল-উলামা—শ্মশান-শয্যায় আচার্য হরিনাথ দে : কু-কে আরবী শাস্ত্রে সুপণ্ডিত।

শুকদেব—ব্যাসপুত্র পরমনির্লিপ্ত ভক্ত। ভাগবত এই শুকদেবের উপদিষ্ট।

শুঁঠের মত শিঠা—দেবদাসী : তু-লি শুষ্ক আদার মতো নীরস।

শ্যামিকা—পরীক্ষা : কু-কে মালিন্য, খাদ।

সড়িয়ে—সুরার কাহিনী : বে-শে-গা পচিয়ে।

সনক—ব্রহ্মার মানসপুত্র সনক, সনন্দন, সনন্দ ও সনৎকুমার। মহা-তপস্বী, মহাজ্ঞানী। ২। প্রাচীন সাংখ্যাচার্য্য বিশেষ।

সবন—অরুন্ধতী : বে-শে-গা যজ্ঞ ইত্যাদি।

সর-কর্দায়—ময়ূর-মাতন : বে-শে-গা [ফা] মাথার পাগড়িতে (?)।

সাড়—সতী : তু-লি সংজ্ঞা।

সাড়ে চুয়াত্তর—ঐ : কু-কে চিতোরে নিহত রাজপুত বীরগণের পৈতার ওজন সাড়ে চুয়াত্তর মণ, এরূপ প্রবাদ; তৎসূত্রে স্বদেশভক্ত বীর হত্যার পাপের দিব্য।

সাদ্—ষশমন্ত্ : তু-লি [ফা] সরল।

সাঁচা—অরুন্ধতী : বে-শে-গা [সং সত্য]।

সাঁঝাই—ঐ : বে-শে-গা সন্ধ্যার গান।

সিগার-সঙ্গীত হ : চিত্তরঞ্জন দাস স্মরণীয়।

সিঞায়ে—রাজ-বন্দিনী : তু-লি [সং সীবন] সেলাই ক'রে।

সুধন্বা—মহাভারতে প্রসিদ্ধ ক্ষত্রিয় রাজ-কুমার ও যোদ্ধা। অর্জুনের প্রতিদ্বন্দ্বী যোদ্ধারূপে সুধন্বা খ্যাতিলাভ করে ছিলেন।

সোঙারিয়া—মমি : বে-বী স্মরণ করে। সোঁতা—চকোরের গান : অ-আ স্রোত।

স্বর্ণগর্ভ—হিরণ্যগর্ভ।

স্নেহদেবী—মৃত্যু-স্বয়ম্বর : অ-আ স্নেহলতা দেবী।

স্বিন্ন—প্রাবৃটের গান : কু-কে সিক্ত।

হদ্দমুদ্দ—গরু ও জরু : ম-ম [আ] যতদূর সম্ভব।

হসন্তিকা—এই গ্রন্থের ১৮৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য। ডক্টর সুকুমার সেন লিখেছেন : 'আসল মানে 'হাপর', তাহা হইতে ব্যঙ্গার্থ অগ্নিস্ফুলিঙ্গ'।

হাটুরে—পাল্কীর গান : কু-কে হাটে যে বিক্রয় করে।

হাড়ল—সুরার কাহিনী : বে-শে-গা গহ্বর।

হাবাত—যক্ষমূর্তি : বে-বী হাভাত, অর্থাৎ ভাতের কাঙাল ; হতভাগ্য।

হাবিস করে—মৌচাক : [ইং half ease-এর লিপ্যন্তর। জ্ঞানেন্দ্র মোহন দাশের 'বাঙ্গালা ভাষার অভিধান' দ্রষ্টব্য] শি-ক উত্তোলন ক'রে।

হারীতি—সুশ্বেতা : বে-শে-গা বৌদ্ধা-গমপ্রসিদ্ধ স্ত্রী-দেবতা।

হালফিল—রাত্রি বর্ণনা : হ [আ] এখন।

হালাক—অনার্যা : তু-লি [আ] প্রাণান্ত।

হিঙুল—সাঁঝাই : বে-শে-গা ঘোর লোহিত।

হিন্দোলা—কাজরী পঞ্চাশৎ : অ-আ দোলা।

হুজ্জৎ—রেলগাড়ীর গান : শি-ক গোলমাল।

হুদোয়—চরকার গান : [আ হদ্ থেকে গ্রাম্য হুদ্দা] অধিকারভুক্ত স্থানে বা এলাকায় অর্থে।

হুনর—রাজা-কারিগর : [ফা] কলাজ্ঞান।

হুরী—নওরোজের গান : ম-ম [আ] স্বর্গের পরী।

হুঁঃ—এই কবিতাটি অহিংসা সত্যাগ্রহ আন্দোলনের পূর্বে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় লেখা হয়।

হ্যাপা—আদর্শ বিয়ের কবিতা : হ হাঁক, ঝোঁক, ঝঞ্ঝাট।

পরিশিষ্ট

সত্যেন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ প্রিয়জন ও বিদগ্ধমণ্ডলী

অজিতকুমার চক্রবর্তী : জন্ম ১৮৮৮ (?); বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে শান্তিনিকেতনে শিক্ষকতা (১৯০৬-১৯১৬ ?); ১৯১১ সালে অধ্যয়নার্থে অক্সফোর্ড যাত্রা। তারপরে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে 'বিচিত্রা' বিদ্যালয়ের শিক্ষক। রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রসিদ্ধ সমালোচক। 'বাতায়ন', 'কাব্য পরিক্রমা', 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ' প্রভৃতি গন্থের এবং 'ভারতী', 'প্রবাসী' প্রভৃতি পত্রিকার লেখক। মৃত্যু পৌষ ১৩২৫ (ইং ১৯১৮)।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর : জন্ম ৭ই আগষ্ট, ১৮৭১। রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র। বিখ্যাত শিল্পী। প্রাচীন হিন্দু ও মোগল শিল্পের বিশেষ চর্চা করে আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলাব নবযুগ প্রবর্তন করেন। কলকাতার সরকারী শিল্প-বিদ্যালয়ের সহকারী-অধ্যক্ষ ও অধ্যক্ষ (১৯০৫-১৯১৬)। গ্রন্থাবলী : 'ভারত-শিল্প', 'রাজকাহিনী', 'ক্ষীরের পুতুল' 'বাগীশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী' ইত্যাদি। শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠানের সর্বাধ্যক্ষ (১৯৪১)। মৃত্যু ১৯৫১।

অবনীন্দ্রনাথের কন্যা করুণা দেবীর সঙ্গে ভারতী-গোষ্ঠীর মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের বিবাহ হয়। কতকটা সেই সূত্রে এবং তা'ছাড়া তাঁর নিজের সাহিত্য-প্রীতির ফলে মণিলালের বন্ধুদের সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ যোগ স্থাপিত হয়। সত্যেন্দ্রনাথের 'তীর্থরেণু' বইয়ের 'নামটি কালি ছাদে' লিখে দিয়েছিলেন।

অমলচন্দ্র হোম : জন্ম ১৮৯৩। পিতা গগনচন্দ্র হোম। ১৩১৪ সালের শেষ দিকে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের সঙ্গে পরিচিত হন। 'অতি আধুনিক বাংলা সাহিত্য' নামে একটি বাংলা বই এবং Rammohon Roy—the Man and his Works (১৯৩৩), Some Aspects of Modern Journalism in India (১৯৩৫) প্রভৃতি ইংরেজি বই লিখেছেন। সত্যেন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ প্রভৃতি 'ভারতী'-যুগের কোনো কোনো লেখক সম্পর্কে বিশেষ উৎসাহী আলোচক। বহু ইংরেজী পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। পশ্চিম-বঙ্গ প্রচার-বিভাগের

অধিকর্তা হিসেবে কিছুদিন নিযুক্ত ছিলেন। প্রাক্তন সম্পাদক—Calcutta Municipal Gazette.

অসিতকুমার হালদার: ১৯১১ সালে জোড়াসাঁকোর 'বিচিত্রা' বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন এবং রবীন্দ্র-নাট্যের অভিনয়ে কবির সঙ্গে রঙ্গমঞ্চে একত্র অবতীর্ণ হন। সংগীত-চিত্র-সাহিত্যশিল্পী। গ্রন্থাবলী: 'খেয়ালিকা,' 'রকমারি,' 'বুদ্‌বুদ্‌,' 'কল্লান্তিকা,' 'প্রক৯প্তিকা,' 'নাম্নীর নামে,' 'রাজসখা,' 'মেঘদূত,' 'ঋতুসংহার,' শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ইত্যাদি।

'অভ্র-আবীর'-এর ভূমিকায় গ্রন্থের 'পরিকল্পনাকৃৎ' রূপে অসিতকুমারের উল্লেখ আছে। সত্যেন্দ্রনাথের 'তুলির লিখন' বইখানির প্রচ্ছদ পরিকল্পনা করেছিলেন।

অক্ষয়কুমার দত্ত: ১৮২০-১৮৮৬। সত্যেন্দ্রনাথের পিতামহ। 'তত্ত্ব-বোধিনী'র সম্পাদক। গ্রন্থাবলী: 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার,' 'চারুপাঠ,' 'ধর্মনীতি,' 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' ইত্যাদি। বাংলায় পাশ্চাত্ত্য প্রথায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে জ্ঞানানুশীলনের ধারা প্রবর্তন করেন।

সত্যেন্দ্রনাথের 'হোমশিখা' 'পূজ্যপাদ পিতামহ' অক্ষয়কুমার দত্তের নামে উৎসর্গ করা হয়।

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়: ১৮৮৩-১৯৬০। জন্ম বিহারের ভাগলপুর শহরে ১৮৮৩র ২৬-এ অক্টোবর। পিতা—মহেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে মাতুল সম্পর্ক। ১৩৩৪-১৩৪১ 'বিচিত্রা' সম্পাদনা করেন। মৃত্যুকাল পর্যন্ত 'গল্পভারতী' মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। সত্যেন্দ্রনাথের মাতুল কালীচরণ মিত্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। সেই সূত্রে কবির ব্যক্তিগত জীবনের তথ্যাধিকারী।

কনকলতা দত্ত: কবিজায়া।

কালীচরণ মিত্র: সত্যেন্দ্রনাথের মাতুল। 'হিতৈষী', 'তৃপ্তি' ও 'ক্রিটিক্‌'-সম্পাদক। সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর 'মনিমঞ্জুষা' বইখানি কালীচরণ মিত্রের নামে উৎসর্গ করেন। মৃত্যু ১৯৫৮। বর্তমান গ্রন্থের 'কবিজীবনী' অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

কিরণধন চট্টোপাধ্যায়: ১৮৮৭-১৯৩১। ইংরেজিতে এবং দর্শন-শাস্ত্রে এম. এ. পাশ করে বিভিন্ন কলেজে অধ্যাপনা করেন। ১৯২০ সালে স্ত্রী-বিয়োগের পরে কাব্যরচনার সূত্রপাত; মাসতুতো ভাই মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের আহ্বানে 'ভারতী'-দলে যোগদান। ১৯২৩ সালে একমাত্র কাব্যগ্রন্থ 'নতুন খাতা' ছাপা হয়।

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়: জন্ম ১২৮৩। মালদহ জেলার চাঁচল গ্রাম। 'ভারতী' ও 'প্রবাসী'র সম্পাদনা-বিভাগে নিযুক্ত ছিলেন। 'ভারতী' গোষ্ঠীর অন্যতম উপন্যাস-লেখক। প্রথমে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে,—পরে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। রবীন্দ্রনাথের ভক্ত। গবেষণামূলক বহু সাহিত্য-গ্রন্থের রচয়িতা। মৃত্যু ১৯৩৮ (১৩৪৫, ১লা পৌষ)।

চারুচন্দ্রের নামে সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর 'অভ্র-আবীর' বইখানি উৎসর্গ করেছিলেন।

চারুচন্দ্র রায়: প্রসিদ্ধ শিল্পী। সাহিত্যিক শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের ভাগিনেয়। শিশিরকুমার ভাদুড়ী মহাশয়ের 'সীতা' অভিনয়ের মঞ্চসজ্জায় বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন; কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান-শিক্ষা শেষ করে কিছুকাল বার্ড-কোম্পানীর অধীনে ভূ-পরিদর্শকের কাজ করেছিলেন। 'ভারতী' গোষ্ঠীর বন্ধু।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর: ১৮৪৮-১৯২৫। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পঞ্চম পুত্র। নাট্য রচনায়, অভিনয়ে, সংগীতে, মৌলিক ও অনুবাদ সাহিত্যে অসামান্য কৃতিত্বের অধিকারী। শেষ জীবনে তিলকের শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারহস্যের অনুবাদ করেন। 'ভারতী', 'বালক', 'সাধনা' প্রভৃতি পত্রিকার লেখক।

সত্যেন্দ্রনাথের 'তীর্থসলিল' জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নামে উৎসর্গ করা হয়েছিল।

দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী: জন্ম ১২৮০ (ইং ১৮৭৩)। মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'ভারতী' যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, 'ভারতী'র আসরের সেই সূচনাপর্বে 'কান্তিক প্রেসে' যাঁরা আসা-যাওয়া করতেন, দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ তাঁদেরই অন্যতম। চোরবাগানে

কালীতলার কাছে তাঁর বাসাবাড়িতে সে সময়ে নিয়মিত সান্ধ্য বৈঠক বসতো। 'মানসী', 'ভারতী', 'বিচিত্রা'র লেখক। সত্যেন্দ্রনাথের মতন দ্বিজেন্দ্রনারায়ণও ছিলেন গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথের পরম অনুরাগী। কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচী ছিলেন তাঁরই অনুজ। কাব্যগ্রন্থ—'একতারা'। মৃত্যু—১৩৩৪।

ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত: বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রমের শিক্ষক। 'বেণু ও বীণার' প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় যতীন্দ্রমোহন ও দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচীর সঙ্গে ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের নামোল্লেখ করা হয়েছে।

নন্দলাল বসু: জন্ম ৩রা ডিসেম্বর, ১৮৮৩। কলকাতার সরকারী শিল্প-বিদ্যালয়ে পাঠ শেষ করে অবনীন্দ্রনাথের অধীনে শিল্পচর্চায় নিযুক্ত ছিলেন। ১৯১৪ সালে শান্তিনিকেতন কলাভবনের অধ্যক্ষ।

'মণিমঞ্জুষার' প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় সত্যেন্দ্রনাথ লিখেছিলেন: 'সুবিখ্যাত চিত্রশিল্পী বন্ধুবর শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু প্রচ্ছদপটের পরিকল্পনা করিয়াছেন।'

প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়: পিতা দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়। মাতা কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় (বসু)। যশস্বী সাংবাদিক। 'জাহ্নবী' পত্রিকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। সেই সময়ে 'কান্তিক প্রেসে' (কর্নওয়ালিস স্ট্রীট) 'ভারতী'র আসরে যোগ দিতেন।

প্রমথনাথ চৌধুরী: জন্ম ১৮৬৮, পাবনা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম্. এ. পরীক্ষায় ইংরেজি সাহিত্যে প্রথম হন। তারপর বিলাত যাত্রা, ব্যারিস্টারি পাশ। রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবীর সঙ্গে বিবাহ হয়। ১৩২১ সালের বৈশাখ মাসে 'সবুজপত্র' প্রকাশ করেন। যশস্বী গদ্য-পদ্য লেখক। ছদ্মনাম: বীরবল। মৃত্যু ১৯৪৬।

'হসন্তিকা' উৎসর্গ করা হয়েছিল এই প্রমথনাথ চৌধুরীর নামে।

প্রেমাঙ্কুর আতর্থী: জন্ম ১৮৯০, ১লা জানুয়ারি, ফরিদপুর। পিতা মহেশচন্দ্র আতর্থী। ছাত্রাবস্থায় ১৩ বছর বয়সে কলকাতা থেকে গৃহত্যাগ করে সারা ভারত ভ্রমণ করেন। ২১ বছর বয়সে 'কার মহলানবীশ এণ্ড কোম্পানী'র কাজে যোগ দেন। 'ভারতী', 'ভারতবর্ষ', প্রভৃতি পত্রিকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ

যোগ ছিল। ১৩৩২ সালে সাপ্তাহিক 'নাচঘর' এবং ১৩৩৪-৩৭ সালে 'যাদুঘর' সম্পাদনা করেন। ছদ্মনাম—'মহাস্থবির'। যশস্বী লেখক।

মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়: জন্ম ১২৯৫, ৪ঠা শ্রাবণ। পিতা বাগবাজার নিবাসী অবিনাশ গঙ্গোপাধ্যায়। কলিকাতায় প্রবেশিকা অবধি পাঠ শেষ করে সিমলায় রাজস্ব-বিভাগে চাকরি পেয়েছিলেন। সে কাজ ছেড়ে দিয়ে কলকাতায় আসেন। অতঃপর অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দ্বিতীয়া কন্যা করুণা দেবীর সঙ্গে বিবাহ হয়।

মণিলাল 'কান্তিক প্রেসের' স্বত্বাধিকারী এবং ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং কোম্পানীর অংশীদার ছিলেন। সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে 'ভারতী' (১৩২২-১৩৩০) সম্পাদনা করেন। 'ভারতী'তে এবং অন্যান্য পত্রিকায় তাঁর কবিতা ছাপা হোতো। মনোবিজ্ঞান, শরীরচর্চা, ইত্যাদি বিষয়ে আগ্রহ ছিল। মৃত্যু ১৩৩৫, ২৩-এ ফাল্গুন (ইং ১৯২৯)

সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর 'তুলির লিখন' মণিলালের নামে উৎসর্গ করেছিলেন।

মহামায়া দত্ত: সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের জননী। কবির মৃত্যুর পরে প্রকাশিত 'বেলাশেষের গান' বইখানি 'পরমারাধ্যা মাতৃদেবী শ্রীমতী মহামায়া দত্ত পূজনীয়াসু' নামে উৎসর্গ করা হয়।

মোহিতলাল মজুমদার: ১৮৮৮-১৯৫২। ১৯০৮ সালে বি. এ. পাশ করে—পরে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। প্রথম যুগে 'ভারতী', 'প্রবাসী' ইত্যাদি পত্রিকায় কবিতা লেখার সময়ে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন। যশস্বী কবি ও সমালোচক।

যতীন্দ্রমোহন বাগচী: জন্ম ১২৮৫ নদীয়া জেলার জামশেরপুর গ্রাম। পিতা হরিমোহন বাগচী। কলকাতায় শিক্ষালাভ; ১৯০২ সালে বি. এ.। বিদ্যাসাগরের মৃত্যু উপলক্ষে প্রথম কবিতা রচনা। ১৩১৩-২০ সালে 'মানসী' সম্পাদনা করেন; পরে 'যমুনা' পত্রিকার যুগ্মসম্পাদক হন। যশস্বী কবি। মৃত্যু ১৯৪৮।

রজনীনাথ দত্ত: সত্যেন্দ্রনাথের পিতা। 'তীর্থরেণু' বইখানি 'পরমারাধ্য পিতৃদেবের স্মৃতির উদ্দেশ্যে' উৎসর্গীকৃত হয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর: ১৮৬১-১৯৪১। সত্যেন্দ্রনাথের 'বেণু ও বীণা'র উৎসর্গ-পত্রে লেখা ছিল: 'যিনি স্বদেশের সাহিত্যকে অমর করিয়াছেন, যিনি বর্তমান যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক, সেই অলোকসামান্য শক্তিসম্পন্ন কবির উদ্দেশ্যে এই সামান্য কবিতাগুলি সসম্ভ্রমে অর্পিত হইল।'

এই গ্রন্থের 'কবিজীবনী' ও 'রবিরশ্মি' অধ্যায়দ্বয় দ্রষ্টব্য।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়: ১৮৬৫-১৯৪৩। ১৮৮৯ সালে বি. এ. পাশ করে 'ধর্মবন্ধু', 'Indian Messenger', 'প্রদীপ' (প্রথম সচিত্র উচ্চ শ্রেণীর বাংলা মাসিক পত্রিকা) ইত্যাদি সম্পাদনা করেন। ১৮৯৫ সালে এলাহাবাদ কায়স্থ কলেজের অধ্যক্ষ; ১৯০১ সালে এলাহাবাদ থেকে 'প্রবাসী' প্রকাশ; ১৯০৭—Modern Review। সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যরচনার উৎসাহদাতা।

শান্তি পাল: জন্ম মাঘ ১৩০১। ১৯১৭ সালে কলকাতার হেদুয়া পুষ্করিণীতে Central Swimming Club স্থাপন করেন; বিখ্যাত সন্তরণবিদ্ প্রফুল্ল ঘোষের শিক্ষক এবং চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি 'ভারতী'-গোষ্ঠীর লেখকদেব সাঁতার-শিক্ষক। প্রথম কবিতার বই: 'ছায়া' (১৩৪২)।

সত্যেন্দ্রনাথের কবিতায় শান্তি পালের উল্লেখ:

> 'এমন ক্লাবটি কোথাও খুঁজে
> পাবে না কো তুমি,
> বড়কু-রবীন-শান্তি-যুগল,
> ক্যাটির মিলন ভূমি। —'জলচর ক্লাবের জলসা-রঙ্গ'

শিশিরকুমার ভাদুড়ী: ১৯২১ সালে ম্যাডান সাহেবের 'Bengali Theatrical Company'র রঙ্গালয়ে ক্ষীরোদপ্রসাদের 'আলমগীর নাটকের নামভূমিকায় অভিনয় করে বিস্ময়কর ক্ষমতার পরিচয় দেন। ১৯২৩ সালে কলকাতা ইডেন গার্ডেনের প্রদর্শনীতে দ্বিজেন্দ্রলালের 'সীতা' অভিনয়ের পরে 'আলফ্রেড থিয়েটারে' যোগ দেন। ১৯২৪ সালে 'নাট্য-মন্দিরে' (পূর্ববর্তী মনোমোহন থিয়েটারের সংস্কৃত রূপ) যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর 'সীতা' অভিনয়ে এবং উত্তরকালে শরৎচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন নাট্যাভিনয়ে খ্যাতি অর্জন করেন। ১৯৩০ সালে অভিনয় প্রদর্শনার্থে আমেরিকায় আমন্ত্রণ ও যোগদান। 'শ্রীরঙ্গম' নাট্যশালার প্রতিষ্ঠাতা। মৃত্যু ১৯৫৯।

সতীশচন্দ্র রায়: জন্ম ১২৮৮, বরিশাল জেলার উজিরপুর গ্রাম। বরিশাল ব্রজমোহন কলেজে এফ্‌, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কলকাতায় এসে বি, এ, পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হবার সময়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচিত হন এবং বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রমের কাজে জীবন উৎসর্গ করেন। রবীন্দ্রনাথের 'বিচিত্র প্রবন্ধ' বইখানিতে সতীশচন্দ্র সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ আছে। ১৩১০ সালে বাইশ বছর বয়সে বোলপুরে মৃত্যু। ১৩১৯ সালে অজিতকুমার চক্রবর্তী কর্তৃক 'সতীশচন্দ্রের রচনাবলী' প্রকাশিত হয়।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর: ১৮৪২-১৯২৩। গ্রন্থাবলী: 'বৌদ্ধধর্ম', 'বোম্বাই চিত্র', 'বাল্যকথা' ইত্যাদি। 'ভগবদ্‌গীতা', 'মেঘদূত' প্রভৃতির বঙ্গানুবাদ করেন। ১৭৭৯ শকাব্দের পৌষ-সংখ্যার 'বিবিধার্থসংগ্রহে' প্রকাশিত সত্যেন্দ্রনাথের 'কৃষ্ণকুমারী ইতিহাস' প্রবন্ধটি দেখে মধুসূদন দত্ত তাঁর 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক রচনার প্রেরণা পেয়েছিলেন।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'রঙ্গমল্লী'র উৎসর্গপত্রে লেখা আছে, '...যাঁহার গৌরব মণ্ডিত নামের অনুকরণে বর্তমান লেখকের নামকরণ হইয়াছিল, সেই বহুমানাস্পদ মনীষি শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের করকমলে আন্তরিক শ্রদ্ধাব স্রকচন্দন স্বরূপ এই সামান্য গ্রন্থ সসম্ভ্রমে অর্পিত হইল।'

সুধীরচন্দ্র সরকার—জন্ম ১৮৯২। 'জাহ্নবী', 'ভারতী', 'যমুনা' প্রভৃতি পত্রিকার হিতৈষী-মণ্ডলীর অন্যতম। সত্যেন্দ্রনাথের 'কাব্যসঞ্চয়ন' ও 'শিশু কবিতার' সংকলয়িতা ও প্রকাশক। 'এম্‌, সি, সরকার এণ্ড সন্স লিঃ'-এর অধিনায়ক। গ্রন্থাবলী: 'পৌরাণিক অভিধান' ইত্যাদি।

সুধীরকুমার মিত্র: সত্যেন্দ্রনাথের মাতুলপুত্র। কবির বিশেষ স্নেহের পাত্র। ১৯২১ সালে সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে দার্জিলিঙে গিয়েছিলেন। কবির মৃত্যুর পরে তাঁর অপ্রকাশিত কয়েকটি কবিতা 'ছন্দসরস্বতী'র পাণ্ডুলিপি তাঁর কাছে ছিল। শ্রীযুক্ত শান্তি পাল শ্রীযুক্ত মিত্রের সৌজন্যে কবির কিছু কিছু অপ্রকাশিত কবিতা ইতস্ততঃ পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ করেছেন।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়: জন্ম ১৮৯০। অধ্যাপক, ভাষাতত্ত্ববিদ্‌। 'ভারতী' গোষ্ঠীর লেখকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। সুনীতিকুমার, শিশিরকুমার এবং আরো কেউ কেউ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের Institute-এ

গাঁদাফুলের বাগানে 'মেরিগোল্ড ক্লাব' নামে একটি মজলিশের প্রতিষ্ঠাতৃ-মণ্ডলীর মধ্যে ছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ সেই মজলিসে উপস্থিত থাকতেন।

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় : স্বদেশী আন্দোলনের ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে রক্ষণশীল পিতার মায়া ত্যাগ করে শিল্পবিদ্যা শিক্ষার উদ্দেশ্যে জাপান যাত্রা করেন। 'ভারতী'-চক্রের অন্যতম সভ্য। 'জাপান', 'হানাফী', 'বনস্পতির অভিশাপ', 'নামিকো', 'চিত্রবহা', 'আলু পোড়া' প্রভৃতি গ্রন্থের এবং 'ভারতী', কল্লোল', 'কালিকলম' প্রভৃতি পত্রিকার লেখক।

ঔপন্যাসিক, গল্পলেখক ও অনুবাদক।

সুরেশচন্দ্র সমাজপতি : জন্ম ১৮৭০, কলিকাতা। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দৌহিত্র। প্রথমে 'সাহিত্য কল্পদ্রুম' নামে একখানি পত্রিকা (১২৯৬), তৎপরে, ১২৯৭ সালে 'সাহিত্য-পত্রিকা' সম্পাদনা করেন। নিষ্ঠাবান সাহিত্য-সমালোচক হিসেবে যশস্বী।

মৃত্যু ১৭ই পোষ, ১৩২৭।

সৌরীন্দ্রনাথ মিত্র : উকিল। সত্যেন্দ্রনাথের প্রথম কবিতার বই 'সবিতা' নিজের খরচে ছেপে প্রকাশ করেন।

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় : ঔপন্যাসিক। জন্ম ১৮৮৪। ১৯০৪ সালে বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পরে কুন্তলীন পুরস্কার প্রতিযোগিতায় গল্প রচনা করে প্রথম পুরস্কার পান। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত 'সাহিত্য' পত্রিকায় গল্প লিখে খ্যাতি লাভ করেন। ১৩১৬-২১ সালে স্বর্ণকুমারী দেবীর সঙ্গে এবং ১৩২৩-৩০ সালে মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে 'ভারতী' সম্পাদনা করেন।

হারীতকৃষ্ণ দেব : শোভাবাজার, কলকাতা। Central Swimming Association-এর কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য ছিলেন এবং সেই সূত্রে ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল।

হেমেন্দ্রকুমার রায় : জন্ম ১৮৮৮, কলকাতা। 'বসুধা', 'জন্মভূমি', 'নব্যভারত', 'মানসী ও মর্মবাণী', 'ভারতী' ইত্যাদি পত্রিকায় কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ লিখেছেন। পুরোনো আমলের 'ভারতী'র 'চয়ন'-বিভাগে প্রসাদ

[illegible] ছদ্মনামে বিভিন্ন বিষয়ে নিবন্ধ লিখেছেন। কাব্যগ্রন্থ : ‘যৌবনের গান’ ‘অমর খৈয়াম’ প্রভৃতি। ‘মানসী ও মর্মবাণী’ পত্রিকায় ‘মণিলালের আসর’ নামে ভারতী-গোষ্ঠী সম্পর্কে প্রবন্ধের লেখক।

শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র সেন, সুধীন্দ্রকুমার হালদার, হিরণকুমার সান্যাল, ডাক্তার অঘোরনাথ ঘোষ, গৌরগোবিন্দ গুপ্ত, সুখরঞ্জন রায়, ডক্টর কালিদাস নাগ, গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী, সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুবিনয় রায়, কালিদাস রায়, সুকুমার রায় প্রভৃতি সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তি Marigold Club, Monday Club এবং বন্ধু-সম্মিলনমুখ্য অন্যান্য বিশ্রম্ভ-সভায় যোগ দিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের নৈকট্য লাভ করেছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে সত্যেন্দ্রনাথ যে বন্ধুবৎসল ও সুরসিক ছিলেন, এঁদের অনেকের স্মৃতিসন্ধান করে সে বিষয়ে নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া গেছে। অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র, ডাক্তার দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র, কবি অতুলপ্রসাদ সেন, গিরিশ শর্মা এবং আরও কেউ কেউ সত্যেন্দ্রনাথের বিশিষ্ট প্রিয়জনের মধ্যে গণ্য।